বালক

মাসিক পত্রিকা।

রেভাঃ জে, এম্, বি, ডন্‌ক্যান, এম-এ, বি-ডি

সম্পাদিত ও প্রকাশিত,

২৩ নং চৌরঙ্গী রোড,

কলিকাতা।

১৯১২

সূচী।

(বর্ণানুক্রমিক।)

বালক

১ম বর্ষ] জানুয়ারী, ১৯১২। [১ম সংখ্যা

আমাদের রাজা ও রাণী।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর ভারতবাসীর হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এদেশবাসীর পক্ষে চিরকালই সেদিন এক শুভদিন বলিয়া গণিত হইবে। সেদিনহইতে ভারতের এক নবযুগ আরম্ভ হইয়াছে, কারণ সেদিন ভারতবাসীর প্রতি হৃদয়ের অনুগ্রহ ও সহানুভূতি-প্রকাশ করিবার জন্য আমাদের সম্রাট পঞ্চম-জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী আমাদের দেশে পদার্পণ করিয়াছেন। আমরা

এতদিন রাজমুখ-দর্শন করিতে পাই নাই। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিলাত গিয়াছেন কেবল তাঁহারাই রাজ-দর্শনে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু ভারতের জনসাধারণ এই সুখ, এই সৌভাগ্যহইতে বঞ্চিত ছিল। তাই আমাদের রাজা ও রাণী আমাদের দেশে আসিয়াছেন শুনিয়া দেশশুদ্ধ লোক আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে।

ভারতবাসীর পক্ষে রাজভক্তি স্বাভাবিক। ভারতের ধর্ম্মসমূহ, খ্রীষ্টধর্ম্মের ন্যায়, রাজভক্তিকে ধর্ম্মাঙ্গরূপে বর্ণনা করিয়াছে। রাজা ঈশ্বর-নিযুক্ত, রাজা আমাদের পিতা, রাজনীতিকভাবে আমরা তাঁহার সন্তান, ইহা ভারতবাসীর স্বাভাবিক বিশ্বাস। সুতরাং আমরা রাজাকে ভক্তি করি, সম্মান করি এবং পিতৃভক্তি যেমন প্রত্যেক মানবসন্তানের পক্ষে আবশ্যক, রাজভক্তিও তেমন আবশ্যক মনে করি। যে পিতা-মাতাকে অবজ্ঞা করে সে যেমন ঘৃণার পাত্র, যাহার হৃদয়ে রাজভক্তি নাই সেও সেইরূপ ঘৃণার পাত্র। রাজাই সিংহাসনে আরূঢ় থাকিয়া ভারতের কোটি কোটি প্রজার সম্পত্তি-রক্ষণে, নৈতিক উন্নতি-সাধনে, সামাজিক ও রাজনীতিক মনুষ্যত্বলাভে সবিশেষ সহায় হন। তাই আমরা রাজাকে ভক্তি করিতে বাধ্য। এই জন্যই রাজা আসিয়াছেন শুনিয়া দেশময় এক আনন্দের রোল উঠিয়াছে।

আনন্দের আরও একটি কারণ আছে। ব্রিটিশ সম্রাট পঞ্চম-জর্জ্জ নানা দেশ ও নানা জাতির উপর রাজত্ব করিতেছেন। সুদূর কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা, গ্রেট-ব্রিটন ও ভারতবর্ষ এই সকল দেশেরই রাজা পঞ্চমজর্জ্জ। এই ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীদের মধ্যে ভাষাগত, ধর্ম্মগত, আচার-ব্যবহারঘটিত ও রাজনীতিসম্বন্ধীয় নানা পার্থক্য রহিয়াছে এবং হয়ত অনেক স্থলে বিদ্বেষ-ভাবেরও অভাব নাই, কিন্তু রাজা পঞ্চমজর্জ্জ ইঁহাদের সকলের সম্মিলন-স্থান। তিনি ইঁহাদের সকলেরই রাজা, সকলেই সমভাবে তাঁহার প্রজা।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নাম ভারতবর্ষের প্রতি গ্রামে, প্রতি গৃহে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার নানা স্বর্গীয় গুণ ও ভারতের প্রতি তাঁহার স্নেহ দেখিয়া ভারতবাসীমাত্রই মুগ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার পরে সপ্তমএড্‌ওয়ার্ড নিজের কার্য্যকৌশলে ও প্রজার প্রতি সহানুভূতির দ্বারা চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান রাজা পঞ্চমজর্জ্জ এই দুইজনেরই শাসনপ্রণালী দেখিবার ও চিন্তা

করিবার সুযোগ পাইয়াছেন; সুতরাং তিনি যে প্রকৃতরূপে প্রজারঞ্জন করিতে সমর্থ হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? তিনি নাকি অনেক বিষয়েই তাঁহার ঠাকুরমা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মত-গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবাসীর নিকট তিনি যে তবে বিশেষ সমাদৃত হইবেন ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ন্যায় তিনি জাঁকজমক পছন্দ করেন না। কর্ত্তব্য—ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্যই—তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্রের দ্বারাই তিনি তাঁহার দৈনিক জীবন চালিত করিয়া থাকেন।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুন লণ্ডননগরে প্রিন্স্ জর্জ্জের জন্ম হয়। বাল্যকালহইতেই প্রিন্স জর্জ্জ নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন। সমুদ্রে স্নান করিতে গেলে তিনিই সকলের আগে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন।

যাঁহাদের হস্তে রাজকুমারের শিক্ষাভার ন্যস্ত থাকে, তাঁহাদের দায়িত্ব গুরুতর; কিন্তু প্রিন্স জর্জ্জ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শিক্ষা-কার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। পাদ্রী বার্চ, পাদ্রী টারভার, পাদ্রী অনস্লো ও পাদ্রী ডাকওয়ার্থ ইঁহারা সকলেই কোন না কোন সময়ে রাজকুমারদ্বয়ের শিক্ষক ছিলেন; কিন্তু পাদ্রী ডাল্টনই প্রিন্স জর্জ্জের শিক্ষাসম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দায়িত্ব-বহন করিয়াছেন। তিনি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে রাজকুমারদ্বয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং ছয় বৎসর পরে তিনি তাঁহাদের গভর্ণররূপে মনোনীত হন। পাদ্রীদিগের উপর রাজ-কুমারদ্বয়ের শিক্ষাভার-অর্পণ করিয়া, খ্রীষ্টিয়ান ও খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি যে আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে রাজপরিবার ও প্রকারান্তরে ইংলণ্ড-নিবাসিগণ তাহারই পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারাত বড় বড় বৈজ্ঞানিক-দিগকে আহ্বান করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা পাদ্রীদিগকে আহ্বান করিলেন।

মেজর সিম্‌কিন্ রাজকুমারদের ডাম্‌বেল ও অন্যান্য ব্যায়াম-শিক্ষা দিতেন। ১৮৭৮ সনে ইংলণ্ডের সেনাদের মধ্যে বিভিন্নপ্রকার ব্যায়ামের প্রদর্শনী হয়। মেজর সিম্‌কিন্ কোন এক বিশিষ্ট ব্যায়ামের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পুরস্কারলাভ করেন। প্রিন্স জর্জ্জ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইহাতে বড়ই আনন্দিত হন। ইঁহারা দুজনেই পরদিন মাকে বলেন, "মা, আমাদের শিক্ষক পুরস্কার পাইয়াছেন। তুমি যদি বল, আমরা তাঁহাকে তোমার কাছে লইয়া আসিব; তুমি তাঁহার পুরস্কারলাভে আনন্দপ্রকাশ করিলে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইব।" মার অনুমতি পাইয়া কুমারেরা মেজর সিম্‌কিন্‌কে যাইয়া অমনই খবর দিল। মেজর সিম্‌কিন্ কুমারদ্বয়ের হস্তে বন্দীর মত অবনতমস্তকে আমাদের রাণীমা আলেকজান্দ্রার কাছে আসিয়া উপস্থিত। রাণীমা আলেকজান্দ্রা সুন্দর দুএকটি কথায় আনন্দ-প্রকাশ করিলে মেজর সিম্‌কিন্ অভিবাদন করিয়া বিদায় হইতে-ছিলেন, এমন সময় প্রিন্স জর্জ্জ বলিয়া উঠিলেন, "মা, কর কি, তুমি কি আমাদের শিক্ষকের সঙ্গে করমর্দ্দন করিবে না? সিম্‌কিন অগ্রসর হও, মা তোমার সহিত করমর্দ্দন করিবেন।" মেজর সিম্‌কিন্ এই কথা শুনিয়া লজ্জায় অবনত হইয়া একটু দূরে যাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাণীমা হস্তপ্রসারণ করিয়া করমর্দ্দন

করিলেন এবং বলিলেন, "মেজর সিম্‌কিন্, আপনি কি এমন দুষ্টছেলে কোথাও দেখিয়াছেন? কিন্তু আপনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন, ইহারা আপনার পুরস্কারলাভে যেমন আনন্দিত আমিও তেমনই আনন্দিত।" মেজর সিম্‌কিন্ ভাবিলেন, এবার তাঁহার বিপদ্ শেষ হইল, কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যেই টের পাইলেন, ইহা তাঁহার বিপদের আরম্ভমাত্র; কারণ প্রিন্স জর্জ্জ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সিম্‌কিন্‌কে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "এখন আমাদের ঠাকুরমাকে দেখিতে যাইতে হইবে।" সিম্‌কিন্ শুনিয়া অবাক্, কিন্তু কুমারেরা ছাড়িবার পাত্র নহে; সিম্‌কিন্‌কে জোর করিয়া ঠাকুরমার নিকটে উপস্থিত করিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তখন রাজকার্য্যে ব্যাপৃত। প্রিন্স জর্জ্জ দূর-হইতে চেঁচাইয়া বলিলেন, "ঠাকুরমা, ঠাকুরমা, আমাদের শিক্ষক সিম্‌কিন্‌কে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আনিয়াছি। তিনি কাল ব্যায়াম-প্রদর্শনীতে পুরস্কারলাভ করিয়াছেন।" মহারাণী ভিক্টোরিয়া মেজর সিম্‌কিনের দুর্দ্দশা দেখিয়া হাসিলেন এবং দুএকটি কথায় মধুর সম্ভাষণ করিলেন। সিম্‌কিন্ কুমারদ্বয়কে চুপে চুপে বলিলেন, "এখন দয়া করিয়া আমার হাতদুটি ছাড়িয়া দেও, আমি মহারাণীকে সেলাম করি।" তাঁহারা হাত ছাড়িলে পর, তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে সেলাম করিয়া পলাইয়া বাঁচিলেন।

প্রিন্স জর্জ্জের যখন বারোবৎসর বয়স অর্থাৎ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের সঙ্গে নৌবিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত ব্রিটানিয়ানাম্নী রণতরীতে প্রেরিত হন। এই জাহাজে আরও একশপঞ্চাশটী বালক নৌবিদ্যা শিখিতেছিলেন। প্রিন্স

ও তাঁহার ভ্রাতা প্রিন্স এডওয়ার্ড মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পৌত্র ছিলেন, তথাপি তাঁহারা নাবিক সাজিয়া নাবিকের সঙ্গে বাস করিতেন এবং অন্যান্য নাবিকের ন্যায় সমস্ত কাজ করিতেন। দুবৎসর পরে যখন তাঁহারা নৌবিদ্যা শিখিতে বেকান্টিনাম্নী রণতরীতে প্রবেশ করিলেন, তখনও তাঁহারা এইভাবে জীবনযাপন করিতেন। অন্যান্য নাবিকের ন্যায় তাঁহারাও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ স্থানে বাস করিতেন। পালা-অনুসারে তাঁহারাও জাহাজ-পরিষ্কার ও কয়লা-বোঝাই করা প্রভৃতি কার্য্যে যোগদান করিতেন। এদেশে যেমন অনেকে মনে করেন যে, যাঁহার দু পয়সা আছে তাঁহার পক্ষে এরূপ সাধারণ কাজ করা সঙ্গত নহে, ইংলণ্ডে তদ্রূপ নহে, এবং তজ্জন্যই ইংলণ্ড সভ্য-জগতে আজ এত উচ্চস্থান-গ্রহণ করিয়াছে। যে দেশের রাজপুত্রও রণতরীতে সামান্য সামান্য কাজ করিতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত নহেন, সে দেশের মহত্ত্ব যে বৃদ্ধি পাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পক্ষান্তরে যে দেশে দু পয়সা হাতে হইলেই সাধারণ কাজ করাকে অবমাননার বিষয় মনে করা হয়, সে দেশের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

ছাব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রিন্স জর্জ্জ নৌবিদ্যা-শিক্ষা করিয়া তাহাতে পারদর্শিতালাভ করিয়াছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কনওয়েনাম্নী রণতরীতে যে সকল বালক নৌবিদ্যা-শিক্ষা করিতেছিলেন তাঁহা-দিগকে প্রিন্স জর্জ্জ এই উপদেশ দিয়াছিলেন, "তোমাদের প্রত্যে-কের তিনটী গুণ থাকা আবশ্যক। এই তিনটী গুণ থাকিলে তোমরা নিশ্চয়ই জীবনপথে কৃতকার্য্য হইবে। যে তিনটী গুণের কথা বলিলাম তাহা এই—সত্যপ্রিয়তা, বাধ্যতা এবং উৎসাহ। সত্য-প্রিয়তা থাকিলে তোমাদের অধীনে যাহারা কর্ম্ম করিবে তাহারা তোমাদিগকে বিশ্বাস করিবে। বাধ্যতা থাকিলে যাঁহারা তোমাদের উপরে কাজ করেন তোমরা তাঁহাদের বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারিবে, এবং উৎসাহ না থাকিলে কোন দিন কোন নাবিক কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না।" নৌবিদ্যা শিখিবার সময় প্রিন্স জর্জ্জ যে নীতিশিক্ষা করিয়াছিলেন, এই উপদেশে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে প্রিন্সেস মেরীর সহিত প্রিন্স জর্জ্জের শুভবিবাহকার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। এই বিবাহে কেবল যে রাজপরিবারস্থ সকলে এবং ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণই উপস্থিত ছিলেন, তাহা নহে, কুইন মেরীর মাতা ডাচেস্ অব্ টেক রিচমণ্ডনগরের জনসাধারণকেও নিমন্ত্রণ করিতে ভুলেন নাই। কারণ এই রিচমণ্ডেই প্রিন্সেস মেরী তাঁহার বাল্যকালযাপন করিয়াছিলেন এবং সেখানকার অনেকেই প্রিন্সেস মেরীকে জানিত ও স্নেহ করিত।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মে কেন্‌সিংটনপ্রাসাদে প্রিন্সেস মেরীর জন্ম হয়। প্রিন্সেস মেরীর জননী অতিধার্ম্মিকা রমণী ছিলেন। বাল্যকালহইতেই প্রিন্সেস মেরীর হৃদয় যেন ধর্ম্মপথে ধাবিত ও পরোপকারে ব্রতী হয়, সেদিকে তাঁহার মাতার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। রিচমণ্ডের চতুর্দ্দিকস্থ দীনদুঃখীদের সেবা করিয়া বাল্যকালে তিনি বড় তৃপ্তিলাভ করিতেন।

জীবন যে ক্রীড়ামাত্র নহে,—কর্ত্তব্যে পরিপূর্ণ, রাণী মেরীর মাতা বাল্যকালহইতেই তাঁহাকে এই শিক্ষা দিয়াছেন। বাল্যকাল-হইতেই দীনদুঃখীর সাহায্য করিতে তাঁহার মা তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেন। দরিদ্র ও রুগ্নদের জন্য রাণী মেরী বাল্যকালেও অনেক পোষাক স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া দান করিতেন। এখনও তিনি প্রতিবৎসর দীনদুঃখীদের সাহায্যার্থে স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া অনেক পোষাক দান করিয়া থাকেন। রাণী মেরীর মাতা স্বীয় তনয়ার শৈশব-অবস্থাতেই এই শিক্ষা দিয়াছিলেন, "প্রতিদিন অপরের মঙ্গলের জন্য কিছু না কিছু করিবে

আমাদের রাজা ও রাণীর ছয়টী সন্তান; পাঁচটী পুত্র ও একটী কন্যা। প্রথম পুত্রের নাম এড্‌ওয়ার্ড আলবার্ট ক্রিশ্চিয়ান জর্জ্জ এণ্ড্রু পেট্রিক ডেভিড। ইনিই আমাদের ভাবী রাজা।

রাজা পঞ্চমজর্জ্জ অতিপ্রত্যূষে গাত্রোত্থান করেন। সকালবেলা আটঘটিকার সময় রাজা ও রাণী প্রাতরাশ করিয়া থাকেন। তাহার পর ক্ষণকাল দৈনিক কাগজ পাঠ করিয়া, সারাদিন কি করিবেন না করিবেন দুজনের মধ্যে তাহার কথাবার্ত্তা হয়। অনুমান দশ-ঘটিকাহইতে প্রায় একটাপর্য্যন্ত রাজা পঞ্চমজর্জ্জ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। প্রায় দেড়ঘটিকার সময় আবার রাজা ও রাণী আহার করিতে বসেন। এই সময়ে তাঁহাদের সন্তানদের মধ্যেও দু-একজন উপস্থিত থাকেন। বিকালবেলা কখনও কখনও রাজ-কুমারদের লইয়া রাজা খেলা করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজকার্য্য-হইতে অবসর পাওয়া অনেক সময়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে। সন্ধ্যার পর রাজা ও রাণী একত্র হইয়া কিছু না কিছু পাঠ করিয়া থাকেন; কখনও বা রাণী পাঠ করেন, রাজা শুনিয়া থাকেন; কখনও বা রাজা পাঠ করেন, রাণী শুনিয়া থাকেন। রাত্রি সাড়েআট ঘটিকার সময় রাত্রি-ভোজন আরম্ভ হয়। তৎপরে প্রায়ই রাজকার্য্য-সংক্রান্ত দেখা শুনা ও দরবার প্রভৃতি হইয়া থাকে। রবিবারদিন উভয়েই রীতিমত গির্জ্জায় যাইয়া উপাসনায় যোগ দিয়া থাকেন। রাণী মেরীর সবিশেষ চেষ্টা ও ইচ্ছা যে, প্রাসাদস্থ কর্ম্মচারিগণও রীতিমত উপাসনায় যোগদান করেন এবং এই উদ্দেশ্যে রবিবারদিন আহারাদি ও অন্যান্য বিষয়ের এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন যেন সকলেই গির্জ্জায় যোগ দিতে পারেন। রবিবারদিন রাত্রিতে রাজা ও রাণী এবং তাঁহাদের সন্তানগণ একত্র হইয়া ধর্ম্মগীতগান করিয়া থাকেন। রাজকুমারগণ ও রাজকুমারী গান মনোনীত করেন। রাণী মেরীও তাঁহার প্রিয় গানগুলি পিয়ানোতে বাজাইয়া থাকেন। রাণী মেরী ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থপাঠ করিয়া থাকেন। যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ তিনি নিজে ভাল বাসেন তাহা ক্রয় করিয়া বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিতরণ করেন। রাজা পঞ্চমজর্জ্জ নিম্নলিখিত গানগুলি বড়ই ভাল বাসেন :—

"Nearer, my God, to thee", "O God, our help in ages past", "I heard the voice of Jesus

say", "Jesu, meek and lowly", "Holy, Holy, Holy, Lord God Almighty". পঞ্চমজর্জ্জ নৌবিদ্যা শিখিবার জন্য যখন রণতরীতে অবস্থান করিতেন, তখন অনেক সময়ই প্রাতঃকালে জাহাজে উপাসনার কার্য্য নিজেই সম্পাদন করিতেন।

আমাদের রাজা ও রাণী এই যে প্রথমবার ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, তাহা নহে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর বিলাত-পরিত্যাগ করিয়া ভারতাভিমুখে রওয়ানা হন। তখন মহারাজ সপ্তম এডওয়ার্ড জীবিত ছিলেন, সুতরাং তখন প্রিন্স জর্জ্জ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ও রাণী মেরী প্রিন্সেস অব্ ওয়েলস্ নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহারা ৯ই নবেম্বর আসিয়া বম্বে পঁহুছেন। সেদিন সপ্তম এডওয়ার্ডের জন্মদিন। সুতরাং পঁহুছিয়াই জন্মদিন-উপলক্ষে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া প্রিন্স জর্জ্জ টেলিগ্রাফ করেন। ভারতে অবস্থানকালে তাঁহারা ভারতবর্ষের নানা স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং আমাদের ও আমাদের দেশের প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বিলাত ফিরিয়া যাইয়া তিনি ভারতভ্রমণসম্বন্ধে এক বক্তৃতা-প্রদান করেন। বক্তৃতাতে তিনি বলিয়াছিলেন :—

"ভারতবাসীর সরলতা, রাজভক্তি ও ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি আমি সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিয়াছি। আমাদের সদ্বিচার ও সুশাসন ও সাধুতার প্রতি তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। ভারতবর্ষের সকল বিষয় অবগত হইয়া আমার মনে হইতেছে যে, ভারত-সাম্রাজ্যশাসনে যদি আমরা আরও কিছু সহানুভূতি-প্রকাশ করিতে পারি, তবে ভারতশাসন আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ হইবে। আমি সাহস করিয়া ভবিষ্যৎ-বাণীস্বরূপ বলিতে পারি—যদি ভারতবাসীর প্রতি ঐরূপ সহানুভূতি-প্রকাশ করা হয়, তবে তাহারা ঐ সহানুভূতির উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হইবে না। ভারতবর্ষীয় সকল শ্রেণীর লোকের উন্নতি করিবার জন্য আমাদের যে প্রকার ইচ্ছা ও চেষ্টা আছে, তাহাতে আরও বেশীপরিমাণে দৃঢ় বিশ্বাসস্থাপন করিবার আশা কি আমি করিতে পারি না ?"

আমাদের রাজার পর্য্যবেক্ষণশক্তি অতিগভীর। তিনি সত্য সত্যই ভারতবাসীর হৃদয় বুঝিতে পারিয়াছেন। ভারতবাসীও তাঁহাকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছে ; তাই আজ রাজা ও রাণীর আগমনবার্ত্তাতে ভারতের সমস্ত লোক আনন্দিত। ঈশ্বর আমাদের রাজা ও রাণীকে দীর্ঘজীবী করুন।

কনানার বল্লম

বেনি সৈয়দকুলের কাপুরুষ

বহুকাল পূর্ব্বে, আরবদেশের মরুভূমিতে, ইশ্মায়েলের বংশে, বেনি সৈয়দকুলে কনানার জন্ম হয়। কনানা জাতিতে বেডুইন আরব।

বেডুইনজাতীয় যে বালক তরোয়াল এবং বল্লম চালাইয়া আত্মরক্ষা করিতে জানে না, সে যে বাঁচিয়া থাকিয়া যৌবন-অবস্থাপ্রাপ্ত হইবে, ইহা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কনানা কেবল একটী বার বল্লম হাতে করিয়াছিলেন, আর কখনও করেন নাই, তথাপি সেই সময়কার বিস্তর বিখ্যাত শেখ ও ক্ষমতাশালী সর্দ্দার যুদ্ধে মরিয়া গিয়াছেন, কবরস্থ হইয়াছেন, লোকে তাঁহাদের নামও করে না, কিন্তু আজিও কনানার নাম করিয়া জয়ধ্বনি তুলিলে ইশ্মায়েল-বংশীয় লোকেরা রণমদে মাতিয়া উঠে। কনানার হাতের বল্লমও আরবদেশের অতি আদরের স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া গণ্য। প্রাচীনা নারীরা, এবং পক্বকেশ বীরেরা কনানার বল্লমের গল্প বলিতে বড় ভালবাসেন ; এই বল্লমের দ্বারা কেমন করিয়া কনানা আরবদেশ-রক্ষা করিয়াছিলেন, এই কথা তাঁহারা যখন বলেন, তখন আনন্দে তাঁহাদের চক্ষু ছল ছল করিতে থাকে।

আরবদেশের বেনি সৈয়দেরা এক স্থানে বাড়ীঘর করিয়া বাস করে না। তাম্বু খাটাইয়া, নানা সময়ে নানা স্থানে বাস করে ; (ঠিক আমাদের দেশের বেদেদের মত)।

কনানা কোন এক মান্য সর্দ্দারের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ; নিজের সম্পদ্কালে এই সর্দ্দার "মরু প্রদেশের সিংহ" বলিয়া গণ্য ছিলেন।

দায়ূদরাজা বাল্যকালে মেষ চরাইতেন, কিন্তু সে সময়েরও অনেক পূর্ব্বহইতে আরবদেশে প্রচলিত প্রথা-অনুসারে কনিষ্ঠ পুত্রকে পিতার মেষ চরাইতে হইত। এই প্রকার মেষ-চরাণ মানের কাজ বলিয়া কেহ মনে করিত না। কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া কনানাকে পিতার মেষপাল চরাইতে হইত। কিন্তু এ কাজ তাঁহার ভাল লাগিত না। বেশি দিন এ কাজ করিবার প্রয়োজনও ছিল না। কারণ তাঁহার পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল, পুত্রদিগকে মেষপালক না করিয়া নিপুণ যোদ্ধা করিয়া তুলেন, কারণ তিনি নিজে "মরু প্রদেশের সিংহ" ছিলেন। কিন্তু কনানার রুচি অন্যরূপ, তিনি সিপাহির বল্লম উপেক্ষা করিয়া মেষপালকের পাঁচনী পসন্দ করিলেন। ইহাতে তাঁহার পিতা বড় রুষ্ট হইলেন। কনানা যে পাঁচনী ভাল বাসিতেন, তাহা নহে, কিন্তু তিনি বল্লম দুই চক্ষের বিষ দেখিতেন।

অগত্যা পাঁচনী পসন্দ করিতে হইল। অন্য বালকেরা উদ্ধত এবং দুর্দ্দান্ত ছিল, কিন্তু কনানা ধীর, শান্ত ও চিন্তাশীল ছিলেন, তাই সমাজের লোকে তাঁহাকে ভীরু বলিত। দেশের নানাজাতীয় লোকেরা সর্ব্বদা মারামারি কাটাকাটি করিত, কনানার এ সকল ভাল লাগিত না। বয়সে তিনি যত বড় হইয়া উঠিলেন, ঐ প্রকার বিবাদ-বিসংবাদ ততই তাঁহার ঘৃণার বিষয় বলিয়া দৃঢ় সংস্কার হইল। এই কারণে লোকে তাঁহাকে "কাপুরুষ" নাম দিল, আর বলিত যে, যুদ্ধ করিতে কনানার সাহসে কুলায় না।

কাপুরুষনামটীর অপেক্ষা আরবদের বিবেচনায় আর একটী অতি অপ্রিয় নাম আছে, সেটী "বিশ্বাসঘাতক।" চির-কালটা লোকে তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া আসিয়াছে, অবশেষে তাঁহার স্বদেশীয়েরা তাঁহাকে উচ্চরবে "বিশ্বাসঘাতক" বলিয়াও ডাকিতে লাগিল।

এখন কিন্তু অন্যরূপ। যে বল্লমদ্বারা কনানা আরবদেশ-রক্ষা করিয়াছিলেন, আজিও লোকেরা উৎসাহে মাতিয়া ছলছলচক্ষে সেই বল্লমের কাহিনী বলিয়া থাকে।

পাঁচবৎসর বয়স পর্য্যন্ত কনানাকে বালির উপর রৌদ্রে রাখিয়া দেওয়া হইত; গায়ে কাঁথা-কাপড় কিছুই থাকিত না। কোমরে কেবল চামড়ার ঘুন্সি থাকিত।

পরে, দেশাচার-অনুসারে, আর পাঁচবৎসরকাল তাঁহাকে ঘরকন্নার কাজে স্ত্রীলোকদের সাহায্য করিতে হইল। ছাগলের চামড়ার থলিতে দুধের সর ভরিয়া, থলিটা নাড়িয়া নাড়িয়া মাখন তুলিতে হইত, মাখন তোলার দুধ বা ঘোল শুকাইয়া ক্ষীরের মত করিয়া তাই আবার গুঁড়া করিতে হইত; উনানের উপর কিছু থাকিলে চৌকি দিতে হইত, পাছে পড়িয়া যায়; এসকল ছাড়া বালি খুঁড়িয়া তরমুজ তুলিতে হইত।

দশবৎসর বয়স হইলে কনানা তিনবৎসরকাল ছাগ, মেষ ও উষ্ট্র চরাইয়া বেড়াইলেন। বেদুইন-বালকমাত্রকেই এইরূপ করিতে হয়।

অব্রাহাম যৎকালে হাগার ও ইশ্মায়েলকে দূর করিয়া দেন, তৎকালে ইশ্মায়েলের বয়স যত ছিল, তত বয়সের হইলে দেশের রীতি-অনুসারে রাখালের কাজ ত্যাগ করিয়া সমাজের আর পাঁচ-জনের সঙ্গে মিলিয়া নিজের যুদ্ধ করিবার যেমন শক্তি, তদনুসারে কনানার মানসম্ভ্রমলাভ করিবার কথা।

কিন্তু এক্ষণে পিতার সঙ্গে আপনার কর্ত্তব্যবিষয়ে তাহার যে মতান্তর ও বাদানুবাদ আরম্ভ হইল, তাহাতেই তাঁহার যুদ্ধ করিবার শক্তি যাহা কিছু প্রকাশ পাইল।

তৎকালে বেদুইনজাতীয় বালকের উপযুক্ত কাজ অতি অল্পই ছিল। এই জাতীয় লোকেরা নানা বিদ্যায় পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিল, এবং আরবদেশের মধ্যে ইহাদের অনেকে চিকিৎসা-বিদ্যায় অতিনিপুণ বলিয়া গৌরব করিত। কিন্তু ইহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে বল্লম-চালনাবিষয়ে সুখ্যাতিলাভ করিতে হয়। কনানা তা করে না, তাই কেহই কনানার সঙ্গে মিশিতে চাহিল না।

পিতা তিনবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি মানুষের মত মানুষ হইতে প্রস্তুত আছ?" তিনবারই কনানা উত্তর করিলেন, "আমি কাহারও প্রাণ-বধ করিবার জন্য বল্লম হাতে করিতে পারি না—কেবল আল্লা ও দেশের জন্য পারি।"

কেমন করিয়া এভাব তাহার মনে জন্মিল? এপ্রকার ভাব যে আরবদেশীয় লোকের চিন্তা-পথের অতীত! ইশ্মায়েলীয়দিগের হস্ত সকলের প্রতিকূল ও সকলের হস্ত ইশ্মায়েলীয়দিগের প্রতিকূল হইবে, এই পুরাতন-কথা কনানার বিলক্ষণ জানা ছিল। মরুভূমিনিবাসী আরবেরা যে প্রকার যুদ্ধ করিয়া জীবন কাটায়, তাহা কেবল নরহত্যা ও ডাকাইতি-মাত্র। কনানা কি তবে আরব ও ইশ্মায়েলের সন্তান নহেন?

মাঠে মাঠে মেষপাল ও উষ্ট্র চরাইতে চরাইতে কনানা এই সকল বিষয় ভাবিতেন। তিনি মনে মনে বলিতেন, "ঈশ্বর এই সকল প্রাণীর সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং এ সকলকে দেখেন শুনেন, এ গুলিকে কষ্ট দিলে তিনি সন্তুষ্ট হন না; ছেলেবেলাহইতে এই ত শিক্ষা পাইয়াছি। আবার ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পশুর অপেক্ষা মনুষ্য বেশী আদরের ধন। তবে কেন আমরা কাটাকাটি করিয়া মরি ও মারি —হইলামই বা আরবদেশীয় এবং ইশ্মায়েলবংশীয়?"

কনানাকে যে পশুপালনরূপ নীচ কাজ করিতে হইত, ক্রমে তাহা তাঁহার অধিক কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। একাজ তাঁহার পক্ষে শাস্তিবিশেষ। সমাজের লোকে যতটা মনে করিত, তাহার অপেক্ষাও এই কাজে কনানার অধিক মনোকষ্ট হইতে লাগিল। বালক-বালিকারাও তাঁহাকে "কাপুরুষ" বলিয়া ডাকিত, ইহা শুনিলে তাঁহার প্রাণে যে কি যাতনা হইত, লোকে তাহা বুঝিত না।

কনানার এমন কতকগুলি গুণ ছিল যাহার জন্য আরব-যুদ্ধবীরেরা তাঁহাকে হিংসা করিত। পশু-বশ করিবার তাঁহার অতি চমৎকার শক্তি ছিল। উষ্ট্র বা ঘোড়ায় চড়িয়া কনানা যেমন অবলীলাক্রমে দ্রুত যাইতেন, কোন বেনি সৈয়দ তেমন পারিত না। নিতান্ত দুষ্ট ঘোড়া বা উষ্ট্রও তাঁহার বশীভূত হইত। আবার নানাপ্রকার খেলায় ও ঘোড়দৌড়ে কনানা সকলের অগ্রগামী ছিলেন। তাঁহাকে আর সকলের সঙ্গে রাত্রে পশুপাল চৌকি দিতে হইত। তিনি এমন সাবধান ও সতর্ক ছিলেন যে, শত্রু দূরে থাকিলেও তাঁহার চক্ষে পড়িত। আর কোন মেষপালকের এমন গুণ ছিল না।

শস্য পাকিতে আরম্ভ হইলে বেদুইন-বালকেরা মাঠে থাকিয়া পাখী তাড়াইত, ও ফিঙ্গা দিয়া পাখী মারিত; কিন্তু কনানার মত কেহই হাত ঠিক করিয়া ফিঙ্গা চালাইতে পারিত না। আরবের বিবেচনায় লড়াই ও ডাকাইতি অতি লাভজনক কাজ, এত গুণ ও স্বাভাবিক শক্তি থাকিতেও কনানা সে কাজে প্রবৃত্ত হন না দেখিয়া তাঁহার পিতার আরও রাগ হইল।

প্রতি বৎসর শস্যবপনহইতে শস্যকর্ত্তনপর্য্যন্ত তিনমাসকাল বেনি সৈয়দজাতীয় লোকেরা মরুপ্রদেশের একপ্রান্তে নদীতীরে তাম্বু খাটাইয়া বাস করিত।

ইহাদের শিবিরে কম হইলেও পাঁচশত তাম্বু, তাম্বুগুলি সোজা চারিসারিতে খাটান হইত।

কৃষ্ণবর্ণ ছাগলোমের কাপড়দিয়া এই সকল তাম্বু প্রস্তুত হইত। এক একটা তাম্বুর খাড়াই মধ্যস্থলে চার কি পাঁচহাত, আর ধারে তিনহাত। কোন কোন তাম্বু পনের-ষোলহাত চওড়া। এক এক তাম্বুর দুই দুই অংশ। মধ্যস্থলে দমেশক-দেশীয় অতি সুন্দর গালিচার পর্দ্দা খাটান। দুই অংশের এক অংশে পুরুষেরা, অন্য অংশে স্ত্রীলোকেরা ছেলেমেয়েদের লইয়া বাস করিত। গৃহকর্ত্তার প্রিয় ঘোড়া ও ভাল ভাল উষ্ট্রগুলি তাম্বুর খুব কাছে শুইয়া থাকিত, আর দ্বারদেশে কর্ত্তার বল্লম মাটিতে পোতা থাকিত।

যত দূর চক্ষু যায়, এক মন্দগামিনী নদীর উজান-ভাটি, দুই দিকে, হরিদ্রাবর্ণ নদী-জলের ও মরুভূমিস্থ তুষারধবল বালুকারাশির মধ্য-হইতে সঙ্কীর্ণ ভূভাগে অর্দ্ধপক্ক শস্যক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

এই শস্যপূর্ণ মাঠের এখানে সেখানে মাচা বাঁধা হইয়াছে। শস্য পাকিতে আরম্ভ হইলে গ্রামস্থ লোকেরা, পালা করিয়া, এই সকল মাচায় থাকিয়া দিবারাত্র শস্য চৌকি দেয় ও পাখী তাড়ায়। শস্য কাটা হইলে আর চৌকি দিতে হয় না।

দিনের মধ্যে একবার স্ত্রীলোকেরা আসিয়া এই চৌকিদারদিগকে আহার-সামগ্রী দিয়া যায়। ইহারা মাখনতোলা দুধকে ক্ষীর করে, সেই ক্ষীর শুকাইয়া গুঁড়া করে, আবার এই গুঁড়া, মাখন ও খেজুর একসঙ্গে চট্‌কাইয়া একপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করে। ইহাদের ইহাই প্রধান খাদ্য। স্ত্রীলোকেরা চৌকিদারদিগকে এই খাদ্য ও পাখী মারিবার জন্য পাথরের ছোট ছোট টুকরা প্রতিদিন দিয়া যাইত।

তাম্বুগৃহে সংসারের কাজ-কর্ম্মের জন্য যাহারা না থাকিলেও চলিত, এই প্রকার বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও বালকবালিকারা মাঠে মাচায় থাকিয়া শস্য চৌকি দিত। কিন্তু এ বৎসর, অনেক দূরস্থ মাঠে, এক মাচায় একা বসিয়া কনানাকে শস্য চৌকি দিতে হইতেছে।

সমাজের সকল লোকেরই ধারণা এই, কনানার যেমন কর্ম্ম, তেমনি পুরস্কার হইয়াছে। গ্রামের লোকেরা কিসে যে সন্তুষ্ট হয়, কিসে যে তাঁহাকে সাহসী বলিয়া খাতির করে, কনানা তাই ভাবিয়া অস্থির। দূরবর্ত্তী মাঠে পাঠাইয়া দেওয়াতে কনানা বরং সন্তুষ্ট হইলেন, কারণ এখানে তাঁহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিবার কেহ নাই।

স্ত্রীলোকেরা খাদ্য-সামগ্রী আনিয়া লোকদিগকে খাওয়াইয়া ও গ্রামে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, বিনাইয়া বিনাইয়া বলিত। কিন্তু তাহারা কনানাকে কোন কথা কহিত না, খাদ্য-দ্রব্য না দিলে নয়, তাই দিয়া চলিয়া যাইত। মাচাগুলি অনেক দূরে দূরে স্থিত, সুতরাং এক মাচার লোকে অন্য মাচার লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে পায় না। কাজেই কনানা একাকী বসিয়া নানা বিষয় চিন্তা করিতেন। যখন শস্য পাকিয়া উঠিল, তখন দুইটী বিষয়ে তিনি স্বীয় সঙ্কল্প স্থির করিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, শস্য কাটিবার জন্য লোকদের আসিবার আগেই এমন কিছু করিতে হইবে, যাহাতে সকলে টের পায় যে, আমি "কাপুরুষ" নই; তা যদি না পারি, লজ্জায় অবনত মুখে থাকিব। নিজেকে কাপুরুষ বলিয়া জানিব, এবং পলাইয়া এমন স্থানে যাইব, যেখানে লোকের গঞ্জনা সহিতে হইবে না।

(ক্রমশঃ।)
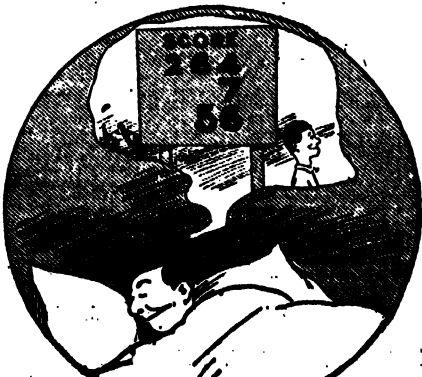
"বোলিং।"

'বোলার' সচরাচর স্বাভাবিক শক্তিতেই বল দিতে থাকে। কথা আছে যে, উৎকৃষ্ট বোলারকে প্রস্তত করা যায় না, সে জন্মাবধিই ঐ প্রকার হয়, যাঁহারা ক্রিকেট খেলিয়া পাকা হইয়াছেন, তাঁহারাও ঐ কথাই বলিয়া থাকেন।

অনেক বিষয় নূতন বোলারের মনে ভাল করিয়া গাঁথিয়া দেওয়া উচিত, তাহার মধ্যে প্রধান কয়েকটি বিষয় এই :—

(১) সোজা বল দিবে।

(২) ক্ষমতার অতিরিক্ত জোরে বল দিবে না, অর্থাৎ এ রকম জোরে বল দিবে যেন কয়েকটা 'ওভারের' পরই ক্লান্ত না হইয়া পড়।

(৩) সাবধান হইবে যেন বল উপযুক্ত স্থানে আসিয়া পড়ে; যদি আস্তে বল দাও, তাহা হইলে বলের টিপ যেন উইকেটের ৪ গজ সামনে পড়ে; যদি মাঝারিরকমে বল দাও, তাহা হইলে বলের টিপটি যেন ৪।৫ গজের মধ্যে পড়ে এবং যদি জোরে বল দাও, তাহা হইলে বলের টিপটি যেন ৫ থেকে ৭ গজের মধ্যে পড়ে।

(৪) মাঝে মাঝে জোর ও টিপ বদলাইতে থাকিবে।

(৫) বলটা যাহাতে একটু বেঁকিয়া অর্থাৎ পাকাইয়া যায় তাহার চেষ্টা করিও।

(৬) 'ব্যাট্‌সম্যানে'র ক্রটির প্রতি নজর রাখিও।

যাহারা নূতন বল দিতে আরম্ভ করিবে, তাহারা যেন উইকেটের ১৮ কিম্বা ২০ গজ দুরহইতে বল দেয়, আর যতদিন না তাহারা বার বার উইকেটে আঘাত করিতে পারে ততদিন ঐ রকম দূর-থেকেই বল দেওয়া অভ্যাস করিতে থাকে। বোলারের ৬-হইতে ১২ গজের মধ্যে "রাণ" করা উচিত, কিন্তু বোলার নিজের জন্য উপযুক্ত দুরত্বটুকু ঠিক করিয়া লইবে। সে বিনাক্লেশে বল দেওয়া অভ্যাস করিবে, এবং যতদূর পারে উঁচু করিয়া বল দিবে, তাহা হইলে বলটি শীঘ্রই জমিহইতে উপরে লাফাইয়া উঠিবে।

সরল ও অক্লান্তভাবে বল দেওয়া অভ্যাস হইয়া গেলে, সে যথাস্থানে বল ফেলিতে চেষ্টা করিবে, কারণ উত্তম বোলার হইবার জন্য এ বিষয়টি সর্বাপেক্ষা আবশ্যক। এইরূপে যথাস্থানে বল ফেলিলে ব্যাটস্‌ম্যান প্রায়ই মুস্কিলে পড়ে এবং হুমনা হয়, তাহাতে হয় সে বল মারিতে পারে না, নয় বল উপরে উঠে এবং সহজে ধরা যায়।

তাহার পর জোর ও টিপ বদলান অভ্যাস করা উচিত। উহা ভাল করিয়া করিতে হইলে যে ভঙ্গীতে বল দেওয়া হইতেছে, সে ভঙ্গীটি বদলান উচিত নহে, কারণ তাহা হইলে ব্যাটস্‌ম্যান বোলারের মতলব বুঝিতে পারিয়া সাবধান হইবে।

উপযুক্ত স্থানে বল ফেলা এবং জোর ও টিপ বদলাইয়া বদলাইয়া বল দেওয়া অভ্যাস হইলে, বল যাহাতে বাঁকিয়া যায় সেইরূপ অভ্যাস করা উচিত। দু রকমে বল 'ব্রেক' করিতে পারে, একটি 'অফ্ ব্রেক', আর একটি 'লেগ্ ব্রেক'। যে ভাল বল দেয়, সে দুই রকমেই ব্রেক করিতে পারে; যে ডানহাতে বল দেয়, সে সচরাচর অফ্ ব্রেক করিতে শিখে; কিন্তু যে বোলার বাঁ হাতে বল দেয়, সে সচরাচর লেগ্ ব্রেক করিতে শিখে। ভাল বোলার দুই রকমেই ব্রেক করিতে পারে।

বোলারের বলটিকে এমন আয়ত্তের ভিতর করা চাই যে, বলটি যেন ব্যাটম্যান্‌কে ঠকাইয়া উইকেটে আঘাত করিবার মত প্রচুর ব্রেক করে। যদিও বল উইকেট তাক্ করিয়া যায়, ডানদিকে বাঁকে, ব্যাটস্‌ম্যান্‌কে মুস্কিলে ফেলে, তাহার ব্যাটের আঘাত লাগিলে কখন কখন লোফা যায়, এবং স্লিপে ক্যাচ হয়, তবুও বোলার যদি দেখে যে, তাহার বল ব্যাটস্‌ম্যান্‌কে ঠকাইয়াছে, কিন্তু উইকেটে আঘাত করিতে পারে নাই, তাহা হইলে তাহার বড় বিরক্তি জন্মে।

তাহার পর, ব্যাটস্‌ম্যানের আত্মরক্ষায় কি ক্রটি আছে তাহা লক্ষ্য করা দরকার। প্রত্যেক ব্যাটস্‌ম্যানেরই কোন না কোন একটি ক্রটি থাকে, সেই ক্রটিটি বোলার যত শীঘ্র ধরিতে পারেন ততই তাঁহার ও তাঁহার দলের পক্ষে মঙ্গল। মনে রাখা উচিত যে, প্রথমে যখন যে ব্যাটস্‌ম্যান্ আসিয়া ব্যাট ধরে তখন তাহাকে একটা 'ওভার পিচড্' বল দেওয়াই ভাল, কারণ 'শর্ট পিচড্' বল দিলে বলটিকে লক্ষ্য করা সহজ হয়, বেশ মারা যায় আর তাহা হইলে ব্যাটস্‌ম্যানের ভরসা হয়। চেষ্টা করিয়া বরাবর যথাস্থানে বল দেওয়া উচিত; যদিও ব্যাটস্‌ম্যান্ বল মারিয়া মাঠের সব দিকেই ছুড়িয়া ফেলিতে থাকে, তবুও হতাশ হইও না। একথা মনে রাখিও যে, ক্রীড়াক্ষেত্রে তোমার ১০ জন লোক আছে; আর ব্যাটস্‌ম্যান্‌কে "আউট" করিবার "বোল" করিয়া ছাড়া আরও অনেক উপায় আছে। 'স্কোর' যাহাতে না বাড়িয়া যায় এইজন্য ক্রমাগত একই রকম বল দেওয়া ভারী ভুল; ব্যাটস্‌ম্যান্ যতক্ষণ না আউট হয়, ততক্ষণ তাহাকে রকমারি বল দিতে থাকিবে।

বিশেষ করিয়া মনে রাখিও যে, যদিও তুমি কয়েকটা লোককে আউট করিয়াছ এবং যদিও ব্যাটস্‌ম্যান্ বেশী স্কোর করিতে না পারিয়া থাকে, তবুও যদি কাপ্তেন তোমাকে বদলাইয়া দেন তাহা হইলে তুমি বিরক্ত হইও না। কাপ্তেনকে অনেক দিক্ দেখিতে হয়, আর প্রায়ই কয়েক ওভারের জন্য বোলারকে বদলাইয়া দিলে সফলতালাভ করা যায়।

তরুণ বোলার একেবারেই যেন উৎকৃষ্ট বোলার হইবার প্রত্যাশা না করে, ভাল বোলার হইতে হইলে অনবরত অভ্যাস করা দরকার।

উচ্চৈঃশ্রবা।

লুসাইপাহাড়ের অজরাজ

আসামদেশে বৃষ্টিপাত বড় বেশী হয়। চড়াপুঞ্জিতে যত বৃষ্টি হয়, পৃথিবীর আর কোন স্থানে তত বৃষ্টিপাত হয় না। কাছাড়, মণিপুর ও চট্টগ্রামের মধ্যস্থলে যে সকল পর্ব্বত, তাহাতে বর্ষাকালে সর্ব্বদা বৃষ্টি হয়।

আসামদেশে বৃষ্টিপাত বেশী, তাই শীতও বেশী—কোন কোন পাহাড়ে শীতকালে তুষার পড়ে। শীতের শেষেই বৃক্ষলতায় নূতন পাতা দেখা দেয়। ফলে সরস্বতীপূজার সময়, শীত যথেষ্ট থাকিলেও, অনেকজাতীয় বৃক্ষলতা নূতন পাতায় সাজিয়া যেন হাসিতে থাকে। দোলের সময়ে ছোট-বড় পর্ব্বত, টিলা ও টিকড়ে নানা জাতীয় ফুল ফুটে; যে টিলায় কাঞ্চনফুলের বন, সে টিলা দেখিতে বড়ই সুন্দর। কোন কোন টিলায় উলুবন। বসন্তকালে উলুঘাসের ফুল হয়, তখন সমস্ত মাঠ শাদা—বাতাসে শাদা উলুবন দোলে, যেন পুরাণে বর্ণিত দধি-সমুদ্র।

ফাল্গুনমাস বটে, কিন্তু বাতাস গরম নহে, বরং ঠাণ্ডা। রাত্রে উলুবনে বেশ পটু হইয়া শিশির পড়ে। আকাশে, লংলেপাহাড়ের মাথায়, মধ্যে মধ্যে মেঘও দেখা যায়; বাতাস মেঘ লইয়া খেলাও করে। বসন্তকালে দুই-চারিবার বৃষ্টিও হয়। তাহাতে উপকার হইয়া থাকে, তাই লোকে বলে, "ফাল্গুনে বর্ষে মাঘের শেষ। ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।" বৃষ্টির জলে স্নান করিয়া বৃক্ষ, লতা, উলুবন, বেতবন আরও প্রফুল্ল হয়।

শাদা উলুবনে ঘন শিশির পড়িলে, হরিণ, ছাগ, খরগোস ইত্যাদি সেই উলুবন ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাদের পায়ের দাগ দেখিয়া, শিকারীরা টের পায়, কি জানোয়ার, কোন্ দিকে গিয়াছে।

এক দিন ভোরের বেলা বন্দুক কাঁধে করিয়া লুসাই যুবক মটুমটু এক ঝর্ণার ধার দিয়া, লাপ্তা-টিলার দিকে চলিয়াছে। এই টিলায় ও টিলার আশে পাশে অনেক বন্য ছাগল থাকিত। ঝর্ণার ধারে ধারে সকালবেলা কাঞ্চন ও নাগেশ্বর ফুল ফুটিয়াছে, সকালবেলার শীতল বাতাস বনময় সেই ফুলের সৌরভ ছড়াইয়া বহিতেছে। কিন্তু শিকার-প্রিয় মটুমটুর সেদিকে "খেয়াল" নাই। সে একদৃষ্টে শাদা উলুবনের দিকে তাকাইতে তাকাইতে চলিয়াছে—অবশেষে এক স্থানে আসিয়া উলুবনে পশুর গমনের চিহ্ন দেখিতে পাইয়া, থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। লক্ষণ দেখিয়া বুঝিয়া লইল যে, দুইটা ধাড়ী ছাগল এই উলুবন ভাঙ্গিয়া, দক্ষিণমুখে, বাতাসের দিকে মুখ করিয়া, চলিয়া গিয়াছে। আরও বুঝিতে পারিল যে, ছাগলদুইটা [illegible] হইল, যেন ব্যস্তভাবে মাঠময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, ব্যস্তভাবে দৌড়ায় নাই। লুসাই-শিকারী চিহ্ন ধরিয়া খানিক দূর গেল। ছাগল-দুইটি মাঝে মাঝে থামিয়াছে, উলুঘাসে দাগ দেখিয়া বোধ হইল, বেশীক্ষণ কোথারও বিশ্রাম করে নাই—শুইয়া পড়িয়া, আবার উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে। উহাদিগকে ক্ষুধায় কাতর বলিয়াও বোধ হইল না—কারণ বিস্তর লতা-পাতা ছিল, সে সকল স্পর্শও করে নাই।

শিকারী মটুমটু বন্দুক হাতে করিয়া, সীতার অন্বেষণকারী লক্ষ্মণের মত, সাবধানে অগ্রসর হইল, ছাগলেরা যেদিকে গিয়াছে, সেই দিকেই যাইতে লাগিল, কিন্তু সে পথ ধরিয়া গেল না। একটু দূরে গেলেই একটা উচ্চ পাথর তাহার চক্ষে পড়িল, পাথরটার গোড়ায় এক গর্ত্ত দেখিতে পাইল। শিকারী কাছে যাইতে না যাইতেই দুইটা ছাগল লাফাইয়া গর্ত্তের মধ্যহইতে উঠিল। দেখিয়াই সে উপরি উপরি দুইবার গুলি করিল—যখন গুলি করে, তখন তাহার চক্ষুদুইটা সদ্যোজাত ছাগ-বৎসের দিকে, কিন্তু হাত ধাড়ীদুইটার দিকে ছিল। তাই গুলি কোনটাকে লাগিল না। নহিলে দুইটাই মারা পড়িত। বাচ্চাদুইটী দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক দেখিতে লাগিল—শিকারীর দিকে যায়, কি মায়ের কাছে যায়—এই যেন ভাবিতে লাগিল।

এমন সময়ে একটা ধাড়ী ম্যা ম্যা করিয়া কি যেন বলিয়া, বাচ্চা-দুইটীকে সাবধান করিয়া দিল। তাহাদের অস্থির ভাব আর রহিল না। তাহারা বুঝিতে পারিল যে, প্রাণীদুইটা দেখিতে তাহাদেরই মত, যাহাদের গায়ের গন্ধ তাহাদেরই গায়ের গন্ধের মত, তাহাদের কাছে যাওয়াই ভাল; তাই অস্থির পায়ে হাঁটিয়া ধাড়ীদের কাছে গেল।

লুসাই-শিকারী ইচ্ছা করিলে ধাড়ী ও বাচ্চা, সকলই মারিয়া ফেলিতে পারিত। এক্ষণে মটুমটু ছাগলদের খুব কাছে—হাত-চল্লিশেক দূরে—এই সময়ে তাহার মনে এক খেয়াল হইল—অন্য শিকারীদেরও যেমন হইয়া থাকে—সে মনে করিল, ধাড়ী-বাচ্চা সবগুলিকে জীবন্ত ধরিতে হইবে। কেমন করিয়া কোন্‌টাকে ধরিবে, এ সকল কিছু না ভাবিয়াই, বন্দুকটা সাবধানে একটা শৈলের গায়ে হেলান দিয়া রাখিয়া, বাচ্চাদুইটার দিকে দৌড়িল। কিন্তু ধাড়ীদুইটার ভাব-গতিক দেখিয়া বাচ্চায়া বিলক্ষণ টের পাইয়াছে যে, বিপদ্ উপস্থিত; বাচ্চাদুইটী আরও বুঝিতে পারিয়াছে যে, এই দ্বিপদ প্রাণীটার ত্রিসীমানায় যাওয়া অবিহিত। শিকারী ব্যক্তি অগ্রসর হইল, হইয়া, হাত বাড়াইয়া যেই ধরিতে গেল, বাচ্চারা

ভূমিষ্ঠ হইবার পর এই প্রথমবার, বিপদ্ কাহাকে বলে, তাহা অনুভব করিতে পারিয়া, অমনি আত্মরক্ষার চেষ্টা পাইল। বড় জোর ঘণ্টাখানিক হইল, ইহারা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, কিন্তু বিধাতা ইহাদিগকে আবশ্যক বুদ্ধিবৃত্তি দিয়াছেন। এবং যদিও বাচ্চারা মানুষের মত দ্রুত চলিতে পারে না, তথাপি খপ্‌করিয়া পাশ কাটাইয়া যাইতে পারিল, কাজেই শিকারী তাহাদিগকে ধরিতে পারিল না—বড়ই নিরাশ হইল।

এদিকে ধাড়ীদুইটা একটু দূরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, এবং এক-প্রকার কাতর শব্দ করিয়া, পলাইয়া কাছে আসিবার জন্য বেচারী-দিগকে উত্তেজিত করিতে ও সাহস দিতে লাগিল। শিকারী উহাদিগকে ধরিবার জন্য যতই লম্ফঝম্প করিতে লাগিল, বাচ্চারা ততই ভয় পাইয়া, দুর্ব্বল পায়ে যথাসাধ্য বলপ্রয়োগ করিয়া, মায়েদের কাছে যাইতে লাগিল। লোকটা এক এক বার হাত বাড়াইয়া দেয়, এক এক বার হামাগুড়ি দেয়, কিন্তু কিছুতেই একটা বাচ্চাকেও ধরিতে পারিল না। একটা বাচ্চাকে, আর একটু হইলে ধরিয়া ফেলিত, কিন্তু স্পর্শমাত্র সেটা পলাইয়া গেল। একটু দূরে পাথুরিয়া জমীতে ভয়-কাতর ধাড়ীদুইটা ছিল। এই শঙ্কটকালে তাহাদের নিকটহইতে উৎসাহ পাইয়াই বাচ্চাদুইটী উলুবন ছাড়াইয়া সাদা জমিতে যাইতে লাগিল। শিকারী এদিকে, ওদিকে, নানা দিকে তাড়া করিয়া ধরিবার চেষ্টায়ই ব্যস্ত ছিল, কাজেই টের পায় নাই যে, ধাড়িরাই বাচ্চাদুইটীকে সাহস দিয়া আপনাদের দিকে লইয়া যাইতেছে। অবশেষে তাহারা লাপ্তাপাহাড়ের নীচের দিকের একটা টিকড়ে গিয়া পঁহুছিল, এখন আর তাহাদের পায় কে? পর্ব্বতের অসমান, উচ্চ চূড়ার দিকেই ধাড়ীদুইটা যাইতে-ছিল, অনেক দূরও উঠিয়াছিল। প্রথমবার জলে পড়িতে পাইলে হাঁসের বাচ্চাদের অবস্থা যেমন, পাথুরিয়া টিকড় পাইয়া এই বাচ্চাদের অবস্থাও তেমনি কতকটা নিরাপদ্ হইল। ইহাদের পায়ের খুরগুলি তখনও শক্ত হয় নাই, বরং রবরের মত নরম। "স্থিয়ান" মাছ নদীতে ছাড়িয়া দিলে যেমন করে, তেমনি করিয়া ইহারা নূতন পায়ে "থরপায়ে" পাথরের উপর দিয়া চলিয়া শিকারীর এলাকা ছাড়াইয়া অনেক দূরে গেল, অবশেষে মায়েরা পথ দেখাইয়া এমন স্থানে লইয়া গেল যে, মটুমটু আর তাহাদের দেখিতে পাইল না।

লুসাই-শিকারী যদি বন্দুক ফেলিয়া না আসিত, বাচ্চারা বা ধাড়ীরা কেহই রক্ষা পাইত না। লুইসাইরা নিতান্ত সেকালের বন্দুক মণিপুরীদের নিকটহইতে কিনিয়া থাকে। তীর ছুড়িতে যেমন, বন্দুক ছুড়িতেও ইহারা তেমনি পটু। এইপ্রকার বন্দুকের পাল্লা ২০০ শত হাতের কম নহে। সে গিয়া বন্দুক লইয়া আসিল। কিন্তু ইতিমধ্যে পাহাড়ের চূড়ার দিকহইতে ঘন কুয়াসা আসিয়া শিকারীর সম্মুখ দিক্‌টা ছাইয়া ফেলিল। শাদা উলুবনে ঘন শিশিরে পায়ের দাগ ধরিয়া ধরিয়া আসিয়া শত্রু তাহাদের সন্ধান পাইয়াছিল, এক্ষণে শাদা কুয়াসায় ঢাকা পড়াতে শত্রু আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না।

লুসাই-শিকারী হতবুদ্ধি হইয়া পাহাড়ের উপরদিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল, "বড় পালাইয়াছে। ঘণ্টাখানেক হইল, এই বাচ্চাদুইটা জন্মিয়াছে, ইহারই মধ্যে এত হুঁসিয়ার!"

ধাড়ীদুইটা কেন যে, আঁকাবাঁকা পথে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়া-ছিল, মটুমটু এখন তাহার কারণ বুঝিতে পারিল।

সারাদিন বনে বনে ঘুরিয়াও মটুমটু কিছু শিকার করিতে পারিল না। সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরিয়া গিয়া, গোটাকতক ভুট্টা পোড়াইয়া খাইল।

(ক্রমশঃ।)

জীবিকা-নির্ব্বাচন।

প্রত্যেকেরই জীবনে এমন একটি সময় আসে, যখন তাহাকে কাজ-কর্ম্মের বিষয় ভাবিতে হয়। এ কথা সত্য যে, এই জগতে এমন অনেক লোক আছে যাহাদের কোন কাজ-কর্ম্ম নাই; তাহারা ভিক্ষা বা চুরি করিয়া অথবা আত্মীয়-স্বজনের গলগ্রহ হইয়া কোন-রকমে দিন-গুজরাণ করে, কিন্তু তোমরা অবশ্য ঐ রকমের লোক নহ, বরং আমরা সকলে আশা করিতেছি যে, তোমরা বড় হইলে কোন না কোন উপযুক্ত কাজ-কর্ম্ম করিয়াই জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবে। তাই তোমাদের জীবনের একটি গুরুতর প্রশ্ন এই যে, তোমরা কি রকম করিয়া তোমাদের কাজ-কর্ম্ম বাছিয়া লইবে। অনেকে নিজেদের কাজ-কর্ম্ম বা ব্যবসায় আগেহইতে মোটেই ঠিক করিয়া লয় না, যে কোনও কাজ পায়, তাহাই করে; কিংবা যদিও তাহারা কোন ব্যবসায় আগে হইতে ঠিক করে, তবুও তাহাদের সেই পছন্দ করাটা ঠিক হয় না। তোমরা সকলেই অবশ্য এই জীবনে কৃতকার্য্য হইতে চাও। এখন তোমরা লেখা-পড়া শিখিতেছ, কিন্তু তোমরা যতদিন বাঁচিবে, ততদিন এখনকার মত লেখা-পড়াই শিখিবে না, বরং কয়েক বৎসরের পর তোমা-দের অন্যরকম কাজে লাগিতে হইবে। সেই কাজ যেন তোমরা ভাল করিয়া করিতে পার, এইজন্য তোমাদের এখনহইতে প্রস্তুত হওয়া

চাই, কাজেই যদিও তোমরা এখন স্কুলে আছ, তবুও এখনই ভবিষ্যতের বিষয়ে ভাবা তোমাদের পক্ষে একেবারে অনাবশ্যক নয়।

কাজ-কর্ম্ম বাছিয়া লইবার সম্বন্ধে প্রথম কথা হইতেছে এই যে, তোমাদের জীবনের লক্ষ্য উঁচু হওয়া চাই, নতুবা তোমরা কিছুতেই জীবনে ঠিক সফলতালাভ করিতে পারিবে না। অনেকে কেবল নিজেদের পেটের ভাবনাই ভাবে; তাহাদের পেট যদি ভরে, তাহা হইলে তাহারা আর কিছু চায় না, কিন্তু পেট যদি না ভরিল, তাহা হইলে তাহাদের কষ্টের আর সীমা থাকে না। আমাদের শারীরিক অভাবগুলি দূর করাও আমাদের নিশ্চয়ই দরকার, কিন্তু আমাদের শরীরই আমাদের সর্ব্বস্ব নয়, আমাদের জীবনের লক্ষ্য আরও উঁচু হওয়া উচিত।

জীবিকা-নির্ব্বাচনসম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা হইতেছে এই যে, আমাদের এমন একটী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত যাহাতে আমরা আমাদের শরীর, মন ও আত্মাসম্বন্ধীয় বৃত্তিগুলিকে ঠিকমতে খাটাইতে পারি। ঈশ্বর সব মানুষকেই অনেক রকম বৃত্তি বা শক্তি দিয়াছেন, কিন্তু সকলের বৃত্তিগুলি সমান নহে; সকলেই যে সকল রকম কাজ করিতে পারেন, তাহা নহে। কেহ হয়ত হাতদিয়া কাজ করিবার শক্তিটিই বেশীপরিমাণে পাইয়াছেন; কেহ হয়ত এমন জ্ঞানী বা কৃতবিদ্য যে, তিনি অপর লোককে উচিতমত শিক্ষা দিতে পারেন; কেহ বা ব্যবসায়-বুদ্ধি লইয়া জন্মিয়াছেন; আর কেহ বা দক্ষ চিকিৎসক হইতে পারেন।

কাজ-কর্ম্ম বিবেচনাপূর্ব্বক মনোনীত করা যে কেমন প্রয়োজনীয়, আমরা ঐ সকল বিষয় চিন্তা করিয়া তাহা সহজে বুঝিতে পারিব। ধর, ঈশ্বর আমাকে বণিকের প্রয়োজনীয় বৃত্তিবিশিষ্ট করিয়াছেন; এ রকম স্থলে আমি যদি বণিক না হইয়া চিকিৎসকের কার্য্যে ব্যাপৃত হই, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আমি অকৃতকার্য্য হইব, এবং অপর লোকেরও বিপদ্‌গ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। কিংবা, ধর, আমি ছেলেদিগকে পড়াইবার শক্তিবিশিষ্ট হইয়াছি, এইরূপ স্থলে আমি যদি রাজমিস্ত্রীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তবে আমার সংসার চলিবে কি না, সন্দেহ। সংক্ষেপে বলি, ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেক জনকে নানারকম বৃত্তি বা শক্তি দিয়াছেন, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বৃত্তি বা শক্তি অনুসারে কাজ-কর্ম্ম বাছিয়া লওয়া দরকার। আমাদের ছেলেবেলায়ও সেই সকল বৃত্তি বিকাশ ও প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং ভবিষ্য জীবনের জন্য এখনই সুবন্দোবস্ত করিয়া প্রস্তুত হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। আমাদের বৃত্তিগুলি যেন পূর্ণ বিকাশ পাইতে পারে এবং আমরা যেন সেগুলিকে প্রয়োজনীয় কার্য্যে লাগাইতে পারি, এইজন্য আমাদের চিন্তা করা দরকার।

কাজ-কর্ম্ম বাছিয়া লওয়ার সম্বন্ধে অন্য একটী কথা এই যে, আমাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া অপরের মঙ্গলের চেষ্টা করা উচিত। আমরা যদি অন্যান্য লোকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করি, তবে আমাদের এমন ব্যবসায় মনোনীত করা চাই যাহাতে আমাদের সংসার চলে অথচ আমরা অপরের মঙ্গল-সাধনের জন্য সুযোগ পাই। দুঃখের বিষয়, টাকার লোভ বড় বাড়িয়া উঠিয়াছে; আজিকালি অনেকে ধনের প্রতি এমন আসক্ত হইয়াছে যে, অন্যান্য লোকের বিষয়ে ভাবিবার তাহাদের সময়, সুযোগ বা রুচি নাই। টাকাই তাহাদের সর্ব্বস্ব। ঐ প্রকার জীবন যথার্থ জীবন নহে। আমরা যে কোন কার্য্যে ব্যাপৃত হই না কেন, ইচ্ছা করিলে অপরকে সাহায্য করিবার সুযোগ পাইতে পারি, তবে কোন কোন ব্যবসায়ে ঐরকম সুযোগ বেশী, আর কোন কোন ব্যবসায়ে তাহা কম। আমরা এমন কোন কাজ বাছিয়া লইব, যাহাতে প্রচুরপরিমাণে অপরের উপকার করিতে পারি। যাঁহারা স্বার্থত্যাগপূর্ব্বক অপরের মঙ্গল-লক্ষ্য করিয়া জীবনযাপন করিয়াছেন, তাঁহারা ইহজীবনে প্রকৃত সুখপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বদেশানুরাগী হইতে চাহি, তবে এই প্রকার জীবনযাপন করা আবশ্যক। স্বদেশানুরাগ ও বিদেশ-বিরাগ এক কথা নহে, বরং যিনি যথার্থ স্বদেশানুরাগী, তিনি যে কোন কার্য্যে ব্যাপৃত হউন না কেন, অন্যান্য লোকের প্রতি বিদ্বেষ-প্রকাশ না করিয়া নিজ মাতৃভূমির উন্নতির জন্য কায়মনোবাক্যে কাজ করিয়া থাকেন। কাজকর্ম্মনির্ব্বাচনসম্বন্ধে আমাদের শেষ কথাটী এই যে, আমাদের জীবনের সম্বন্ধে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কি, ইহা জানিতে আমাদের চেষ্টা করা উচিত। তিনি আমাদের পিতা, সুতরাং তিনি যে আমাদের জীবনের জন্য সুব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা শক্ত কথা নয়। তিনি আমাদের প্রত্যেকের জন্য কোন না কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য ঠিক করিয়াছেন, এবং সেই কার্য্যসাধনার্থে আমাদের উপরে নির্ভর করিতেছেন। আমাদের জীবন গচ্ছিত ধনমাত্র; আমাদের সেই ধন তাঁহারই পরিচর্য্যায় প্রয়োগ করা উচিত। অতএব কাজকর্ম্ম-নির্ব্বাচন করিবার সময়ে আমরা ঈশ্বরের কথা ভুলিয়া যাইব না, বরং তাঁহার ইচ্ছা জানিয়া সেইমত চলিবার চেষ্টা করিব। জীবিকা-নির্ব্বাচন করা সামান্য কথা নহে, কেননা তাহার উপর আমাদের ভাবী সুখ ও কৃতকার্য্যতা অনেকটা নির্ভর করে।

সাপে কেমন করিয়া কি খায়?

তুমি কি কখনও কোন সাপকে কিছু খাইতে দেখিয়াছ? যদি পল্লীগ্রামে তোমার বাড়ী হয়, তবে দেখিয়াছ; কিন্তু কলিকাতার অনেক যুবকে হয় ত দেখে নাই। সাপের আহার করা এ সংসারে এক অতি আশ্চর্য্য বিষয়। সাপে যখন যাহা খায়, আস্ত গিলিয়া খায়, তোমার মত চিবাইয়া, চুষিয়া খায় না। ছবিতে বেশ করিয়া দেখ,—ঘাড়হইতে লেজপর্য্যন্ত সাপের মেরুদণ্ড—হাড়গুলি রুদ্রাক্ষের মালার মত যেন গাঁথা, গলার ভিতরে আবার শ্বাসনালী, কতকগুলি রক্তাধার আছে।

সাপে ইন্দুর, ব্যাঙ, মাছ ইত্যাদি নানা প্রাণী ধরিয়া খায়। নিজের মাথাটা যত বড়, সাপে অনেক সময়ে তাহার অপেক্ষাও দ্বিগুণ চওড়া প্রাণী ধরিয়া উদরসাৎ করে। এ অবস্থায়, আহারকালে, সাপের কণ্ঠনালী ও মাড়ি ফাঁক হইয়া যাওয়া আবশ্যক। কিরূপে, আহারকালে, সাপের মুখের হাঁ, কণ্ঠনালী ইত্যাদি আবশ্যকমত বড় হইয়া যায়, বুঝাইয়া দিতেছি।

সাপে ব্যাঙ, মাছ ইত্যাদি ধরিলে একেবারে গিলিয়া ফেলে। সাপের দাঁত আছে বটে, কিন্তু আমরা এবং আরও অনেক প্রাণী যেমন মাড়ির দাঁতে মাংস ইত্যাদি চিবাইয়া খাই ও খায়, সাপে তেমন করিয়া চিবায় না; উহাদের দাঁতে মাংস-চিবান যায় না। তবে দাঁতদিয়া উহারা কি করে? ব্যাঙ, মাছ ইত্যাদি দাঁতদিয়া চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে গিলিয়া ফেলে।

সাপের মাথার সমস্ত হাড়ই, রুদ্রাক্ষের মালার রুদ্রাক্ষের মত, কোন প্রাণীকে কামড়াইয়া ধরিবার বা গিলিবার সময়ে নড়ে চড়ে। ইহারা এক চোয়ালের দাঁতদিয়া কোন প্রাণীকে ধরে, ধরিয়া ভিতরের দিকে টানিয়া লয়, এবং অন্য চোয়ালের দাঁতদিয়া শক্ত করিয়া ধরে। অনেকক্ষণ এইরূপ করাতে প্রাণীটা ক্রমে গলাদিয়া নামিতে থাকে।

১ নং ছবি।

যত নামিতে থাকে, মাথার, গলার ও ঘাড়ের হাড়গুলি তত সরিয়া গিয়া উদরে পঁহুছিবার পথ চওড়া ও সহজ করিয়া দেয়। সাপে প্রাণীটাকে যত গিলিতে থাকে, পীঠের ও পাঁজরের হাড়গুলিও তত সরিয়া ফাঁক হইয়া যায়। আহার হইয়া গেলে, সাপ রহিয়া রহিয়া আপন দেহ প্রসারিত করিতে থাকে। ক্রমে হাড়গুলি ঠিক ঠিক স্থানে যায়। ফলে সাপের দেহের হাড়, মাংস, শিরা ইত্যাদি সকলই নিজের শরীরের অপেক্ষা বড় ব্যাঙ ইত্যাদি প্রাণী ধরিয়া গোটা গিলিবার উপযোগী।

একবার চিড়িয়াখানায় সাপের ইন্দুর খাওয়ার ছবি তোলা হয়, তদ্বিবরণ এই, ১ নং ছবি একটা ইন্দুরের ছবি, গিলিবার সময়ে পাছে ইন্দুরের উপরকার চোয়ালের দাঁত লাগিয়া সাপের গলার চামড়া কাটিয়া যায়, এই জন্য সাপের সম্মুখে দিবার আগে ইন্দুরের উপর-চোয়ালির দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

২ নং ছবিতে দেখ, সাপে ইন্দুর ধরিয়া গিলিতেছে। ইন্দুরটা প্রায় গলার অর্দ্ধেক পথ গিয়াছে। ১ নং ছবিতে দেখ, সাপের গলা কত মোটা হইয়াছে। ৩ নং ছবিতে দেখ, সাপের মাথা ও মুখ, স্বভাবতঃ যেমন, তেমনি হইয়াছে, কিন্তু ইন্দুরটা উহার গলার ভিতরে। দেখ সাপের মাথা অপেক্ষা ইন্দুরের মাথা ও সাপের দেহ অপেক্ষা ইন্দুরের দেহ কত বড় ও মোটা। ২ নং ছবিতে ইন্দুর সাপের গলার অর্দ্ধেক পথ গিয়াছে, সুতরাং কোন্ হাড়গুলি সাপের আর কোন্ গুলি বা ইন্দুরের, স্পষ্ট বুঝা যায় না।

২ নং ছবি।

সাপে কোন প্রাণী—মনে কর, ইন্দুর—ধরিতে গেলে, ইন্দুরের

মাথাটা আগে সরু সরু দাঁতদিয়া কামড়াইয়া ধরে, এমন করিয়া
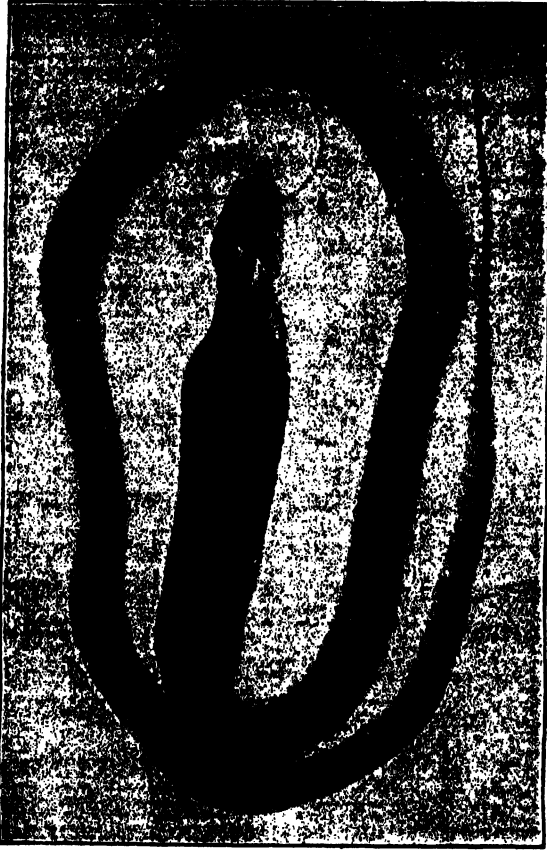
৩ নং ছবি।

ধরে যেন ইন্দুর পলাইতে না পারে, ধরিলেই সাপের সমস্ত চোয়ালির দাঁত, হাড়, শিরা ইত্যাদি আবশ্যকমত বিস্তারিত হইতে থাকে। মনে কর, ইন্দুরটাকে ডানদিকের নীচের ও উপরকার চোয়ালিতে চাপিয়া ধরিয়াছে। এখন বামদিকের নীচেকার ও উপরকার এবং তালুর দিকের চোয়ালিদিয়া, ইন্দুরটার গলার কাছটা ধরিবে। এখন ডানদিকের চোয়ালিদিয়া ইন্দুরটাকে মাথার একটু নীচের দিকে ধরিয়া, মুখের ভিতর দিকে একটু টানিয়া লইবে। এই প্রকারে একবার এদিকের, একবার ওদিকের চোয়ালিতে ধরিয়া ধরিয়া ইন্দুরটাকে গলার মুখের কাছে আনিবে। এক্ষণে সাপ পঞ্জরের হাড়দিয়া ইন্দুরের মাথা ও গলা কসিয়া ধরিবে। এক্ষণে ইন্দুর আর যায় কোথায়? এখন দুই দিকের চোয়ালিতে ধরিয়া ইন্দুরকে গলার ভিতর দিয়া "চালান" দিতে থাকিবে। আর একবার দাঁতদিয়া ধরিয়া, সাপ ইন্দুরের দেহের উপর ওষ্ঠ বুলাইতে ও ওষ্ঠদিয়া আবার চাপিয়া ধরিয়া, ভিতর দিকে টানিতে থাকে, খানিকক্ষণের মধ্যে ইন্দুরটা একবারে গলার মধ্যে নীত হয়, ৩ নং ছবি দেখ। এখন সাপ মাথাটা এক পাশে বাঁকাইবে, কাজেই ইন্দুর পিছন হটিয়া মুখের দিকে পিছাইয়া আসিতে পাইবে না। এইরূপে মাথা বা ঘাড় বাঁকাইয়া সাপ পঞ্জরের হাড় দিয়া ইন্দুরকে কষিয়া ধরিয়া, ভিতর দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। বার বার এই-প্রকার করিলে পর ইন্দুরটা সাপের উদরে গিয়া উপস্থিত হইল। এইরূপে খাদ্য উদরসাৎ করাতে সাপের ভারী পরিশ্রম হইল, তাই খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিল।

সাপ অনেকপ্রকার। কতকগুলি বিষধর, কতকগুলির বিষ নাই। কিন্তু সকলপ্রকার সাপেরই শরীর-যন্ত্রের গড়ন ও বন্দোবস্ত প্রায় একই প্রকারের।

অনেক সাপে পাখী ধরিয়া খায়। আসামদেশের জঙ্গলে এক-প্রকার অতি প্রকাণ্ড সাপ আছে, সে সাপে হরিণ ও ছাগল ইত্যাদি ধরিয়া খায়। অনেক সাপ জলে থাকে। অনেক সাপ মাটীর ভিতরে গর্ত্ত করিয়া থাকে। তক্ষকনামক একপ্রকার ছোট ছোট সাপ গাছের কোটরে থাকে।

আমাদের দেশে বৎসরে কম হইলেও ২০ হাজার লোক সর্পাঘাতে মারা যায়।

ভদ্রতা।

(প্রাপ্ত।)

সেদিন আমি একটি বড় বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষকের কার্য্যা-লয়ে গিয়াছিলাম। আমার কাজ শেষ হইয়া গেলে, আমি কয়েক-খানি কাগজ-পত্রে সহি-মোহরের অপেক্ষায় সেইখানে বসিয়া আছি, এমন সময়ে সেই বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র তাহাদের প্রধান-শিক্ষকের সহিত কি রকম আচরণ করিল তাহা লক্ষ্য করিলাম। আমি যতক্ষণ সেখানে বসিয়াছিলাম, সেই সময়ের মধ্যে সাত জন ছাত্র তাহাদের প্রধান-শিক্ষকের কাছে আসিল, কিন্তু কেহই তাঁহাকে প্রণাম করিল না, তিনিও যে তাহাদের কাছে প্রণাম-প্রত্যাশা করিয়া থাকেন, তাহা বোধ হইল না! সেই বালক-গুলিকে দেখিয়া বোধ হইল যে, তাহারা সকলেই ভদ্র-সন্তান, তবুও দেখ এই সামান্য বিষয়টি তাহাদের শিক্ষার অন্তর্গত হয় নাই। আর একদিন আমি আমার এক বন্ধুর সহিত বসিয়া আছি, এমন সময়ে দুইটি বালক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিল, তাহারা তথায় আসিবামাত্রই আমি তাহাদের ভদ্র-ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। আমি আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কে? তিনি বলিলেন, তিনি ইহাদের চেনেন না, তবে তিনি ইহাদের

দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহারা অমুক বিদ্যালয়হইতে আসিয়াছে, কারণ তিনি জানেন সেই বিদ্যালয়ের ছেলেরা বড় ভদ্র ও শিষ্ট। ঐ ঘটনার কয়েক দিন পরে, আমি একদিন ট্রামে চড়িয়া যাইতেছিলাম। ঐ ট্রামখানি বিদ্যালয়ের বালকে পূর্ণ ছিল। সামান্য কাপড়-চোপড়-পরা এক প্রবীণ ভদ্রলোক সেই ট্রামে উঠিলে, কোন বালকই তাঁহাকে একটু বসিবার ঠাঁই দিল না, বরং কোনও কোনও বালক তাঁহার পিছনহইতে তাঁহাকে লইয়া মস্করা জুড়িয়া দিল। শেষে একজন উকিল তাঁহার আসন ছাড়িয়া উঠিয়া খুব ভদ্রতার সহিত সেই বৃদ্ধলোকটিকে তাঁহার আসনে বসিতে উপরোধ করিলেন, তাহাতে অধিকাংশ ছাত্রই যেন বড় লজ্জিত হইল।

ইউরোপের এক রাজা একবার একজন খুব গরীব লোককে তাঁহার সঙ্গে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করেন, রাজার সেব্য যে সমস্ত খাদ্য-সামগ্রী দেওয়া হয়, সে তাহা জীবনে খায় নাই। তবুও সে ভুল না করিয়া কোন রকমে খাওয়া শেষ করিল, শেষে হাত ধুইবার জন্য ছোট কাচের বাটি করিয়া যে জল দেওয়া হয় তাহা প্রত্যেক নিমন্ত্রিতকেই দেওয়া হইল। সেই লোকটী জানে না যে, সেই জল লইয়া কি করিতে হয়, তাই সে সেই জলের বাটিটা তাহার মুখের কাছে তুলিয়া জলটুকু পান করিয়া ফেলিল। তাহাতে অন্য নিমন্ত্রিতেরা হাসিয়া উঠিল এবং তাহাকে ঠাট্টা করিতে লাগিল, সে লোকটি বড় অপ্রতিভ হইল, কিন্তু তাহার কি ভুল হইয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারিল না। রাজা সেই নিমন্ত্রিতের সেই অপ্রতিভ ভাব দেখিয়া এবং অন্য নিমন্ত্রিতগণের অশিষ্ট আচরণে লজ্জিত হইয়া, তাহাদের দিকে ক্রুদ্ধভাবে তাকাইলেন, এবং নিজের জলের বাটিটি তাঁহার মুখের কাছে তুলিয়া ইচ্ছা করিয়া জলটুকু পান করিয়া ফেলিলেন। রাজা ঐ রকম করাতে অন্য নিমন্ত্রিতদিগকেও বাধ্য হইয়া তাহাই করিতে হইল, ইহাতে তাহারা বড়ই বিরক্ত হইল, রাজা কিন্তু তাহাতে বড় আমোদ-অনুভব করিলেন।

পরস্পর আলাপ করিতে হইলে ভদ্রতা সবিশেষ আবশ্যক। ভদ্রতার মূলসূত্র আপনার বিষয়ে ভাবিবার আগে পরের বিষয়ে ভাবা। যে বালককে ছেলেবেলাহইতে ভদ্রতার সূত্রগুলি পালন করিতে বাধ্য করা হয়, ভবিষ্যতে সে বহু বন্ধুলাভ করে, এবং তাহার জীবনের পথ সরল হইয়া উঠে। আমরা সকলেই জানি যে, যে ছেলে সর্ব্বদা সকলের আগে কথা কয়, যে সর্ব্বদাই ভাল বসিবার ঠাঁইটুকু খুঁজে, যে সর্ব্বদা ভাল জিনিষটুকু চায়, কখন পরের বিষয়ে ভাবে না, তাহাকে আমরা কি রকম ঘৃণা করি। সে রকম ছেলেকে কেহ সঙ্গী করিতে চাহে না, কেহ তাহাকে তাহার নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহে না, এবং সে নিজেও বুঝিতে পারে না যে, কেন তাহার কোন সাথী বা বন্ধু নাই।

এই প্রবন্ধের গোড়াতে যে কয়েকটি গল্প বলিয়াছি তাহাতে তোমরা দেখিয়াছ, যে যত পরের সুখ-সুবিধার বিষয়ে ভাবিয়াছে, সে তত ভদ্র; আর যে যত পরের সুখ সুবিধার বিষয়ে ভাবে নাই, সে তত অভদ্র। বাস্তবিক, প্রথমে পরের বিষয়ে ভাবাই ভদ্র হইবার একটি সহজ নিয়ম। যদি আমরা সকলেই ঐ রকম করিতাম, তাহা হইলে আমাদের জীবনে কি এক বিরাট বিভিন্নতাই দেখা যাইত। তাহা হইলে সকালে বিদ্যালয়ে আসিয়া কোন ছাত্রই শিক্ষক-মহাশয়কে প্রণাম না করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইত না, জল-যোগের সময়ে কোন ছাত্রই কোন ছাত্রকে ঠেলিয়া আগে বাহির হইবার চেষ্টা করিত না, কোন ছাত্রই বাড়ীতে মায়ের উপর হুকুম চালাইত না। ট্রেণে কোন লোকই আগে গাড়ীতে উঠিবার জন্য অন্যকে ধাক্কা দিত না। অন্যের সুখ-সুবিধার কথা আগে ভাব—ইহাই যদি সকলেরই মূলমন্ত্র হইত, তাহা হইলে সত্যসত্যই আমাদের এই জগৎ এক বিভিন্ন জগৎ হইত।

অনেক বালকের ধারণা এই, ভদ্র হওয়া হীনতার চিহ্ন। "আমি যদি সকলের সঙ্গে ভদ্র-ব্যবহার করি, তাহা হইলে সকলে ভাবিবে আমি অন্ত্যজ"। এই রকম ধারণার মূলে কোনই সত্য নাই, ইহা একটা মহাভ্রম। একদিন সকলের সঙ্গে ভদ্র-ব্যবহার করিয়া কি ফল হয়, তাহা দেখ দেখি। তুমি দেখিবে, লোকে তোমাকে অখাতির করিবে না, বরং তুমি আরও বেশী খাতির পাইবে।

অনেকে আবার বলে, "চাকর গুলাকে গাল-মন্দ না দিলে তাহারা আমাদের বাধ্য থাকে না।" এ কথাও সত্য নহে। যে লোক তাহার চাকরদের সহিত নরমভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত কথা কয়, সেই তাহাদের শ্রেষ্ঠ সেবা পায়। আমি জানি, একটি লোক তাহার চাকরদের বড় গালি-গালাজ করে, তাই সে কখনও কোন ভাল চাকর পায় না; তবুও সে কখন বুঝিতে পারে না যে, কেন সে সর্ব্বদা সকলের চেয়ে খারাপ চাকর পায়। যে লোকের সব চেয়ে ভাল চাকর আছে, আমি দেখিয়াছি তিনি কখন কোনরকমে তাঁহার চাকরদের সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করেন না। তাহারা জানে যে, তাহাদের মনিবের সেই নরম কথাই অবশ্য পালন করিতে হইবে। তাহারা কখন তাহাদের মনিবকে রাগ করিতে দেখে নাই, এইজন্য তাহারা তাঁহাকে ভক্তি করে।

যে ভদ্রতা প্রকৃত, তাহার পাত্রাপাত্র নাই; গরীব, বড়লোক, সম্ভ্রান্ত, অসম্ভ্রান্ত সকলেরই সহিত তাহা করা চলে, এবং সেই ভদ্রতাই ভদ্রলোকের চিহ্ন। বাঙ্গালীর ছেলেদের এই ভদ্রতাটুকু অন্য কাহারও কাছে শিখিবার দরকার নাই, কারণ তাহাদের একপুরুষ পূর্ব্বের লোকেরা এমন ভদ্র যে, তাঁহারা যাঁহারই সংস্পর্শে আসেন, তাঁহারই শ্রদ্ধা ও প্রশংসালাভ করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বালকদিগের এই কথা স্মরণ করিয়া আনন্দ-অনুভব করা উচিত। তাঁহারা এই একটি অতিমূল্যবান পৈতৃক-সম্পত্তি পাইয়াছে, অতএব বাল্যকালহইতেই তাহারা এই মহৎ উদাহরণের অনুবর্ত্তী হইয়া চলুক।

“ফিল্‌ডিং।”

ছেলেরা সচরাচর ক্রিকেটের এই অংশে (অর্থাৎ ফিল্‌ডিংএ) বেশী মনোযোগ দেয় না। এটা বড় দুঃখের বিষয়, কেননা ফিল্‌ডিং ক্রিকেটের একটী প্রধান অংশ, এবং অনেক দিন ধরিয়া অভ্যাস না করিলে আমরা তাহাতে সফলতালাভ করিতে পারি না। অনেক সময়ে দেখা যায়, যে ভাল ব্যাট করে, সে ফিল্‌ডিংকে তুচ্ছ বা বিরক্তিকর মনে করে। ঐ রকম ছেলে আপনাকে উৎকৃষ্ট ক্রিকেটার মনে করিতে পারে, কিন্তু তাহা ভুল। যদিও সে ৫০ রাণ্ করে, তথাপি তাহার মন্দ ফিল্‌ডিংএর জন্য তাহার দল অনেক সময়ে জয়লাভ করিতে পারিবে না। যাহারা ক্রিকেট শিখিতেছে, তাহাদের ফিল্‌ডিংএর বিষয়ে এই কয়েকটী কথা মনে রাখা দরকার।

এই বালকটীর নাম এ, ই, জে, কলিন্স: ইঁহার বাড়ী বিলাতের ক্লিফ্টন বলিয়া একটী জায়গায়। বিদ্যালয়ের বালকদিগের একটী ক্রিকেট-ম্যাচে এই বালকটী এক ইনিংসে ৬২৮টী রাণ্ করেন, আউট হন নাই। ইঁহার খেলা পাঁচদিন ধরিয়া চলিয়াছিল, এবং সবশুদ্ধ ৮ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। আর কেহ বোধ হয় কখনও এক ইনিংসে এত রাণ্ করেন নাই।

১। তোমার সকল সময়ে সতর্ক ও উদ্‌যোগী থাকা চাই।

২। যতদূর সম্ভব, তুমি সর্ব্বদা দুই হাত ব্যবহার করিবে।

৩। যখন বল্‌টা ঠিক তোমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, তখন তোমার পা জুড়িয়া রাখিও যেন হাত দিয়া বল্ থামাইতে না পারিলে তাহা তোমার পায়ে লাগিয়া থামিয়া যায়।

৪। বল্‌টি ধরিয়াই ইতস্ততঃ না করিয়া ছুড়িয়া ফেলিবে।

৫। বল্‌টী ঠিক 'উইকেট-কিপারের' মাথা লক্ষ্য করিয়া ছুড়িবে, কিংবা এমনভাবে ছুড়িবে যাহাতে উহা মাঠহইতে একটী লাফে ঠিক বেলের উপরে পড়িতে পারে।

৬। যখন একজন ফিল্‌ডার উইকেট-কিপার বা বোলারের কাছে বল্‌টা ছুড়িতেছে, তখন অন্যান্য ফিল্‌ডারের সতর্ক থাকা আবশ্যক, যেন উইকেট-কিপার কিংবা বোলার তাহা ধরিতে না পারিলে যাহারা তাহাদের পিছনে ফিল্‌ডিং করিতেছে, তাহাদের মধ্যে একজন তাহা ধরিতে পারে।

৭। সর্ব্বদা ক্যাচ্ করিবার জন্য উদ্‌যোগী থাকা দরকার। অনেক সময়ে ব্যাটস্‌ম্যান বল মারিলে ফিল্‌ডারের মনে হয় যে ক্যাচ্ করা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব; কিন্তু যাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তাহা যে নিশ্চয়ই অসম্ভব, এমন নয়। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, যে বল্‌টা ধরিবার আমাদের আশা নাই, খুব চেষ্টা করিলে তাহা ধরা যায়।

৮। চুরট্ মুখে দিয়া মাঠে যাইও না এবং ফিল্‌ডিং করিবার সময়ে তোমার বন্ধু-বান্ধবের সহিত কথোপকথন করিও না।

৯। কাপ্তেন কিংবা বোলার তোমাকে যেখানে দাঁড়াইতে আদেশ করেন, সেই-স্থানে তুমি খুসি হইয়া দাঁড়াইবে। তোমাকে মাঠের কোন্ জায়গায় দাঁড়-করান হইয়াছে, সর্ব্বদা তাহা মনে রাখিও, নতুবা কাপ্তেন বা বোলার বিরক্ত হইবেন। কাপ্তেন কিংবা বোলার ব্যতীত অন্য কেহ যেন আর এক জন ফিল্‌ডারকে আদেশ না করে। যদি তুমি কোন জায়গায় দাঁড়াইতে ভালবাস, তাহা হইলে কাপ্তেনকে জানাইও। সকলেই যে সকল জায়গায় ভাল ফিল্‌ড করিতে পারে, এমন নয়, এবং কাপ্তেনের বুদ্ধি থাকিলে তিনি প্রত্যেক ফিল্‌ডারের স্বাভাবিক শক্তি ও ইচ্ছামত তাহাকে দাঁড় করাইবেন।

১০। 'আম্পায়ারের' নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে কোন কথা বলিও না; বিনাবাক্যব্যয়ে তাহা শিরোধার্য্য করিও।

হারানিধি

সে অনেক দিনের কথা, জাপানে এক কুলাঙ্গার ছেলে ছিল, সে তাহার বাপ-মার মুখে চূণ-কালী দিয়াছিল; তবুও তাহার পিতা-মাতা তাহাকে বড় ভাল বাসিতেন। কিন্তু তাঁহাদের আত্মীয়েরা তাঁহাদের বুঝাইতে লাগিলেন যে, এরকম ছেলেকে ত্যাজ্য-পুত্র করা উচিত। সে দেশের রীতি এই যে, ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করিতে হইলে সব আত্মীয়কে ডাকিয়া একটা সভা করিয়া বাপকে তাঁহাদের সম্মুখে ত্যাগ-পত্রে সহি-মোহর করিতে হয়। আত্মীয়-স্বজনের পীড়াপীড়িতে পিতা অগত্যা এই রকম একটি সভার বন্দোবস্ত করিলেন।

ছেলে সে কথা শুনিতে পাইল। সে তাহার বদ্ সঙ্গীদের কাছে বাপ-মার সম্বন্ধে নানা মস্করা করিয়া বলিল যে, যে ঘরে সেই সভা হইবে সেই ঘরে সে হঠাৎ গিয়া ঢুকিবে এবং ডাকাইতের মত শাসাইয়া মোটা টাকা দাবী করিবে, যতক্ষণ না টাকা পাইবে ততক্ষণ উঠিবে না।

সে বাড়ীর দরজায় আসিয়া দুয়ারের একটি ছেঁদায় চোক দিয়া দেখিল যে, তাহার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনেরা গোল হইয়া বসিয়া আছে। পিতার সহি-মোহরের জন্য একজন আত্মীয় পিতার হাতে ত্যাগ-পত্র দিলেন, পিতা ছলছল চোকে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "হয়ত পরে আমার ছেলেটি ভাল হইতে পারে।"

মা বলিলেন, "হাঁ, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা যা'ক, দেখা যা'ক সে ভাল হয় কি না।"

তবুও আত্মীয়েরা সেই ত্যাগ-পত্রে সহি করিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু পিতা-মাতা কেবল ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, আর ছলছল চোকে বলিতে লাগিলেন, "তার যে সমস্ত বদ্ অভ্যাস আছে, তা' সে হয়ত পরে ছাড়িয়া দিবে।"

আত্মীয়েরা ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন, কিন্তু পিতা সেই দলিলে দস্তখত করিলেন না। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে ও শুনিতে শুনিতে ছেলেটীর হৃদয়ে এক নূতন ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল; তাহার পিতা ও মাতার স্নেহ তাহার হৃদয় স্পর্শ করিল! সে হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া তাহার পিতা-মাতার নিকট ক্ষমা চাহিল, এবং সেই অবধি কুপথত্যাগ করিল।
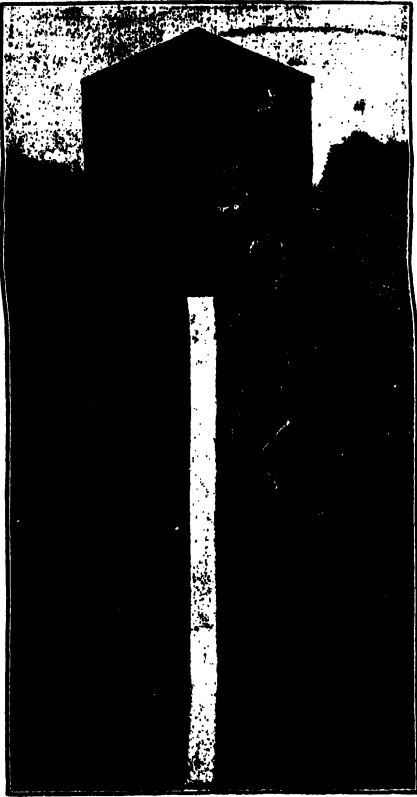
১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এম্, সি, সি বনাম অক্সফোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয় এই দুইটী প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট-ক্লাবে "ম্যাচ্" হয়। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ই দুর্দ্দশা হয়। ঐ দলের পক্ষে একজন লোক কম ছিল। নয়জন খেলিবার পর বোর্ডে ঐরূপ লেখা আছে, দেখা গিয়াছিল। আশা করি, এ বছর আমাদের এখানকার কোন ক্লাব উহা পড়িয়া হিংসা দেখাইবে না!
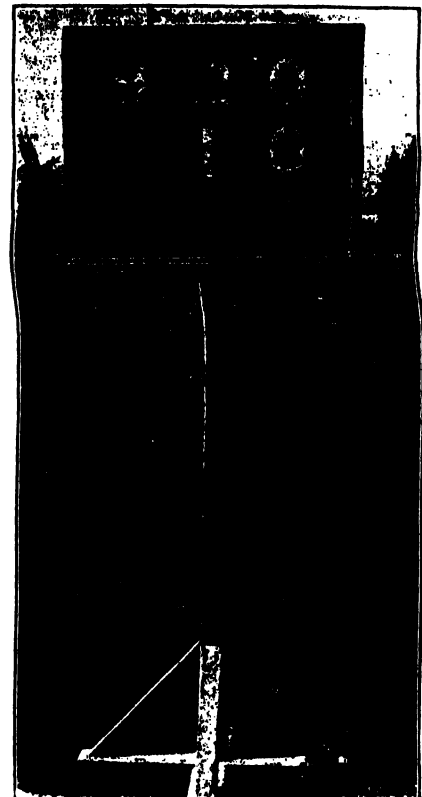
১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্টমাসে ওরলিন্স-ক্লাব রিকলিং গ্রীণ-ক্লাবের সহিত রিকলিং গ্রীণে ম্যাচ্ খেলিতে গিয়াছিল। তাহারা যখন যায়, তখন তাহারা ঘুণাক্ষরেও মনে করে নাই যে, তাহাদের সেই দিনকার খেলার কথা জগৎ-প্রসিদ্ধ হইবে। কারণ সে দিন ওরলিন্স ক্লাব এক ইনিংসে ঐ প্রকার "স্কোর" করে। এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে আর কোন দলই এত "স্কোর" করিতে পারে নাই।

সুযোগ।

সব দেশেই দুইরকমের লোক আছে; তাহার ভিতর এক-রকমের লোক তাহার স্বদেশকে শ্রদ্ধেয় করিয়া রাখে, আর এক-রকমের লোক তাহার স্বদেশকে অশ্রদ্ধেয় করিয়া ফেলে। তুমি গরীব হও বা বড়লোক হও, তুমি যেই হওনা কেন, তুমি ঐ দুইরকমের লোকের মধ্যে একরকমের হইতে পার। চল্লিশ-বৎসর আগে যে ছেলেটি মোম-বাতি তৈয়ার করিত, সে এখন মন্ত্রি-সভার সভ্য। টাকা-কড়ির জোরে, বন্ধু-বান্ধবের খাতিরে কিম্বা কোন মুরুব্বীর সুপারিষে তিনি বড় হন নাই, তিনি তাঁহার মাথা ঘামাইয়াই বড়লোক হইতে পারিয়াছেন।

পরে তুমি যাহা হইবে, এখন তুমি তাহার গোড়া গাঁথিতেছ। এখন তুমি যেমনভাবে ভাব, যেমনভাবে কাজ কর, যেমন-ভাবে সময় কাটাও, বড় হইয়া তুমি তেমনই মানুষ হইবে। আমি তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছি না, জগতে যে কথাটি তোমার সবচেয়ে দরকারী, সেই কথাটি যাহাতে তুমি বেশ বুঝিতে পার, আমি শুধু তাহারই চেষ্টা করিতেছি। সে কথাটা কি? সে কথাটি এই যে, এখন তুমি যেমন করিয়া তোমার ভবিষ্যৎটি গড়িয়া তুলিতেছ, পরে তাহা তেমনই ছাড়া আর কিছুতেই অন্যপ্রকারের হইতে পারিবে না।

কি চাও তুমি? তুমি কি জীবনে বিফল হইতে চাও, যাঁহারা তোমাকে ভাল বাসেন তাঁহাদের কি তুমি নিরাশ করিতে চাও, তোমার স্বদেশের কাছে তুমি কি অকৃতজ্ঞ হইতে চাও? তাহা হইলে বেশী কষ্ট করিবার দরকার কি? জেলে আর বেকারদের জন্য যে সমস্ত সরকারী কারখানা আছে, সেখানে যাহারা আছে তাহা-দের কাহারও কাছে চাহিলেই বিফলজীবনলাভের ব্যবস্থা-পত্র পাইবে। একটি ব্যবস্থা-পত্র পড়িয়া দেখ—

ছেলেবেলা পড়াশুনা	... ...	০
সন্ধ্যাবেলা সদালোচনা	... ...	০
খারাব বইপড়া	...	১০০০
		১১$\frac{১}{২}$
খেলা-ধূলা (প্রতিদিন)		১২
১৫ হইতে ২০ বছরের জীবন		লক্ষ্যহীন!

ঐ ব্যবস্থা-পত্র মতে চলিয়াছে এমন কোনও ছেলেকেই জীবনে সফল হইতে দেখি নাই!

কিন্তু তুমি জীবনে সফল হইতে—তোমার বাপ-মার মুখ উজ্জ্বল করিতে—তোমার স্বদেশকে আরও বেশী শ্রদ্ধেয় করিতে চাও কি? চাও যদি ত এখনই তুমি সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পার। হাজার হাজার বড়লোক এ সম্বন্ধে তোমাকে খুব ভাল ভাল ব্যবস্থা-পত্র দিতে পারেন। একটি এই—

ছেলেবেলা	...	খুব ভাল করিয়া কাটিয়াছে।
খেলাধূলা	...	শরীর ও মনের স্বাস্থ্যকর।
সন্ধ্যাবেলা	...	পড়া-শুনা ও নির্ম্মল আমোদ-প্রমোদ।
পড়া-শুনা	...	ভাল ভাল বই।
সঙ্গী	...	সাধু।
জীবনের লক্ষ্য	...	আগেহইতে ঠিক।
ভবিষ্য-গঠন	...	আপনার কার্য্য ও বিশ্বাস মত।

যদি তুমি তোমার পড়িবার সব বইগুলি নাও পাও, যদি তুমি দরকারমত বিদ্যালয়েও পড়িতে না পাও, তবুও তুমি যে জিনিষটি সব চেয়ে শক্তিশালী ও চমৎকার, সে জিনিষটি পাইতে পার। সে জিনিষটি কি?—জ্ঞান। যে ছেলে উন্নতি করিতে চায়, সে জ্ঞানের বলে কি না করিতে পারে? জ্ঞান ও উৎসাহ যদি একসঙ্গে কাজ করে, তাহা হইলে মানুষ সব বিষয়েই জয়ী হইতে পারে। বিজ্ঞান-বিদ্ বলেন,—তুমি যেমন ভাব, তেমনই হইতেছ। ছেলেবেলা যদি তুমি ভাল থাক, বুড়াবেলাও ভালই থাকিবে।

আমাদের সফলতা যদি আমাদেরই উপরই নির্ভর করে, তবে এত মানুষ জীবনে বিফল হয় কেন? অনেকরকমের বিফলতা আছে। খুব অল্প লোকই অনিবার্য্য কারণে বিফল হয়। কেহ কেহ মনোযোগের অভাবে, কিম্বা অবস্থামত না চলিয়া অথবা অগ্রদৃষ্টি না করিয়া বিফল হয়। অনেকে আবার কুড়েমী করিয়া, উন্নতি বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া কিম্বা অসচ্চরিত্রের জন্য বিফল হয়। কিন্তু প্রায় সকলেই একটীমাত্র কারণে বিফল হয়, সেটি এই—যখন সুযোগ আসে তখন তাহারা ইচ্ছা করিয়া চোক বুজিয়া বসিয়া থাকে।

বালক

১ম বর্ষ] ফেব্রুয়ারী, ১৯১২। [২য় সংখ্যা।

কনানার বল্লম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

২

প্রাচীন সর্দ্দারের প্রতিজ্ঞা

কনানা মাচায় বসিয়া আছেন। এদিকে রৌদ্রের তেজ অতি ভয়ানক। কিন্তু কনানার সেদিকে খেয়াল নাই। গুল্‌তির জন্য একগাদা পাথরের টুক্‌রা পাশে রহিয়াছে, সেগুলি রৌদ্রে এত গরম হইয়াছে যে, স্পর্শ করিলে হাতে ফোস্কা পড়ে, কিন্তু কনানা সেগুলি অনেকক্ষণ হাতে করেন নাই, কাজেই জানেন না যে, এত গরম হইয়াছে। বারকোশে মোহনভোগ ও খেজুর একপাশে রহিয়াছে। তিনি একটুও মুখে দেন নাই।

পাথরের টুক্‌রাগুলি আরও গরম হইয়া উঠিল। দলে দলে পাখী আসিয়া শস্য খাইতে, এবং খাইতে খাইতে ঝগড়া করিতে লাগিল, কে তাড়াইবে? কনানার ত সেদিকে দৃষ্টি নাই। কনানা মাচাতে যোগাসনে একমনে বসিয়া আছেন, কোন দিকে খেয়াল নাই, বসিয়া বসিয়া কেবল গুল্‌তির চামড়া গুটাইতেছেন, আবার খুলিতেছেন; আর নিজের ভবিষ্যৎ ভাবিতেছেন।

একটু দূরে অন্য মাচায়, দুইটী ছেলে লইয়া এক প্রাচীনা শস্য-চৌকি দিতেছিল। ছেলেদুটী কনানার অপেক্ষা ছোট। সেই বৃদ্ধা চেঁচাইয়া বলিল, "ওহে বাপু, তোমার এমন সাহস, আর তুমি এমন অলস কেন? চক্ষু মেলিয়া দেখ, পাখীতে যে সব খাইয়া গেল! তুমি মরিয়া আছ, না ঘুমাইয়া রহিয়াছ?"

এই কথা শুনিয়া কনানার যেন ধ্যান ভাঙ্গিল। তিনি গুল্‌তিতে করিয়া পাথর ছুড়িয়া সমস্ত পাখী তাড়াইয়া দিলেন, একটাও রহিল না। আবার গালে হাত দিয়া তিনি ধ্যানে মগ্ন হইলেন; একেবারে যেন বাহ্যজ্ঞানরহিত।

এমন সময়ে ঘোড়ার খুরের শব্দ ও শুষ্ক শস্যের খস্‌খসানি তাঁহার কানে আসিল। তিনি মাথা তুলিয়া দেখিলেন, পিতা আসিতেছেন। দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। সমস্ত বেনিসৈয়দ-জাতীয় লোকে তাঁহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে শিথিল দেখিলেও তিনি ভীত হন না, কিন্তু পিতা এ অবস্থায় দেখিয়া ফেলিয়াছেন, বড় লজ্জার কথা।

বৃদ্ধ ক্রোধভরে কহিলেন, "কনানা, ও কনানা! এ কি এ? এ বৃদ্ধকালে জালিয়ে যে আমার হাড় কালি করিলি। তোর জন্ম না হইলেই যে ভাল হইত। ঘোল টানিতে দিলে, তুই মাখন মাটী করিস্! ভেড়া চড়াইতে পাঠাইলে, ভেড়া-চুরি হয়! শস্য-চৌকি দিতে দিলে পাখীতে খাইয়া ফেলে! পুরুষদের সঙ্গে তুই পরিশ্রম করিতে চাহিস না। স্ত্রীলোকদের করণীয় সহজ কাজ করিতে দিলে, তাও ভাল করিয়া করিস্ না। এ আমার অতি দুঃসময়; নানা দুঃখে কষ্টে আমাকে ঘেরিয়া ধরিয়াছে; এসকল দেখিয়াও তুই হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকিস্? তোকে লইয়া আমি কি করি?"

কনানা মাচাহইতে নামিয়া পড়িলেন, এবং মাটীতে কপাল ঠেকাইয়া পিতাকে "সালাম" করিলেন, বলিলেন,—"বাবা, যদি
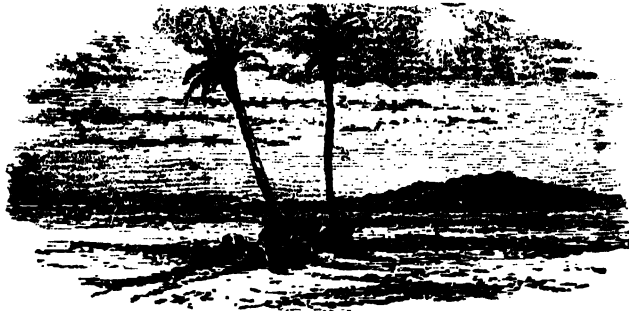
আমার প্রতি স্নেহ-মমতা থাকে ত আমায় কাটিয়া ফেলুন। তা যদি না করিতে চান, অনুমতি করুন, আমি কোন দেশে চলিয়া যাই—কারণ এখানে ত আমাহইতে কোন কাজ-কর্ম্ম হয় না। কিন্তু আমাকে কখনও অকৃতজ্ঞ, নিমকহারাম বলিবেন না। কি দুঃখে কষ্টে যে আপনাকে ঘেরিয়া ধরিয়াছে, তা ত আমি জানি না।"

বৃদ্ধ ক্রোধভরে কহিলেন, "সকলে জানে, আর তুমি জান না?"

"আমি কিছুই জানি না, বাবা! আজি কুড়ি-বাইশদিন হইল, এই মাঠে চৌকি দিতে আসিয়াছি, কেহ আমায় ওসব কথা বলে নাই—যে আসিয়াছে, সেই আমায় কেবল ভৎর্সনা করিয়াছে।"

বৃদ্ধ ভৎর্সনার ভাবে বলিলেন, "তবে শুন। তোমার যে দুই ভাই সওদাগরদের সঙ্গে দূরদেশে গিয়াছিল, একজন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এমন জখম হইয়াছে যে, উঠিতে বসিতে পারে না। আর একজনকে রসিদ বরকত কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে; কোন্ কালে তাদের কাকে আমাদের লোকেরা নাকি খুন করিয়াছিল। তাদের সঙ্গে যত ঘোড়া, গাধা, উট ছিল—সেই সাদা উটসমেত—সকলই কাড়িয়া লইয়া, রসিদ দম্মেশকের দিকে গিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া কনানা বলিল, "এ দলে আমাদের ত বেশী কিছু ছিল না—কেবল চারিটা উট ছিল, তার মধ্যে শাদাটাই কেবল ভাল, বাকিগুলি ত বুড়া, মালও বেশী কিছু ছিল না। কেবল কিছু মধু আর রাঙ্গামাটী; বেশী দামী নয় ত। তবে ভাইয়েদের বিপদ্, বিপদ্ বটে।"

কথাগুলি সত্য, আর ইহাতে কনানার মনের প্রকৃতভাব জানা গেল। কিন্তু বৃদ্ধ কনানার মুখে ওকথা শুনিবার প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, কনানা তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যগ্র হইবে। তাই আরও রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তুমি, বাপু, নিতান্তই ভেড়া; তুমি কি আমায় উটের ও সওদাগরি জিনিষের দামের কথা বুঝাইয়া সান্ত্বনা দিতে চাও? বরকত তোমার ভাইয়ের জন্যে কত চাহিবে, তা ভাবিয়া দেখিয়াছ?—সে যা চায়, তা না দিতে পারিলে তাহাকে মারিয়া ফেলিবে, তা জান? আর আমার সেই সাদাউটের দাম কত, তা খতাইয়া দেখিয়াছ কি? সেই উটের দ্বারা আমার পিতা কত বিষয় করিয়াছেন, আমারও যা কিছু দেখ, তাও সেই উটের দ্বারা উপার্জ্জন করিয়াছি। সাতরাজার ধন দিলেও এমন উট পাওয়া যায় না। তুমি নাকি বড় বুদ্ধিমান, এই কথার উত্তর দেও দেখি? তুমি যদি কেবল কথার সাগর না হইয়া বল্লম চালাইতে তৎপর হইতে, আমার কোন ভাবনা ছিল না; দুর্দ্দান্ত বরকতকে তুমি জব্দ করিতে পারিতে।"

কনানা দাঁড়াইয়া কহিলেন, "বাবা, আমাকে একটা ঘোড়া, একথলিয়া দানা, একমশক জল দিন, আমি রসিদ বরকতকে তাড়া করিয়া যাইব। আমি তাহাকে প্রাণে মারিব না, কিন্তু আল্লার

অনুগ্রহে ভ্রাতাকে সেই শাদাউটে চড়াইয়া আপনার কাছে আনিয়া দিব।"

শুনিয়া বৃদ্ধ চটিয়া গেলেন। বলিলেন, "ওরে বোকা, রসিদ বরকত আগুন, আর তুমি পতঙ্গ; রসিদ বরকত ঘূর্ণা-বাতাস, আর তুমি একগাছা নলমাত্র। যাও, মাচায় গিয়া পাখী তাড়াও। হয়ত সন্ধ্যা না হইতেই ঘুমাইয়া পড়িবে। আর দেখ, কাল সকাল-বেলা শস্য-কাটা আরম্ভ হইবে, তখন তোমাকে খাটিতে হইবে।"

কনানা দাঁড়াইলেন, এবং বৃদ্ধ পিতার ক্রুদ্ধ মুখপ্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,

"বাবা, সন্ধ্যাপর্য্যন্ত আমি পাখী তাড়াইব। অন্যলোকের হাতে শস্য কাটিবার কাজ দিউন। আমি মরুভূমিতে খুঁজিয়া আমার ভাইকে উদ্ধার করিতে যাইব। আপনি ত আমাকে গরু-ভেড়ার মধ্যে গণ্য করেন; দেখা যাউক, আমি কি করিতে পারি।"

বৃদ্ধ এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং বলিলেন, "অনেকবার বলিয়াছি, ভরসা করিয়া তোমার হাতে ঘোড়া দেওয়া যায় না।"

কনানা উত্তর করিয়া কহিলেন, "তবে শুনুন, আমার এই পাদুখানিই আমার ঘোড়া। মহম্মদসাহেবের দিব্য করিয়া বলিতেছি, এই পায়ের জোরে আপনার পুত্রকে সাদাউট-সমেত ফিরাইয়া আনিবই আনিব। বাবা, আমি এমন কিছু করিব, যেন আপনার অভিশাপের পাত্র না হইয়া আশীর্ব্বাদের ভাগী হই। আল্লা আমাকে এই কাজে যাইতে বলিতেছেন। বলুন, আমি যদি আমার ভাইকে উটসমেত আনিয়া দিতে পারি, আপনি আমাকেও আশীর্ব্বাদ করিবেন?—কিন্তু তাও বলিয়া রাখি, কেবল আল্লার ও আরবদেশের জন্যে বল্লম ধরিব, আর কোন কারণে নহে।"

বৃদ্ধ যোদ্ধার মুখাবয়বে একটু বিরক্তি অথচ সদয়ভাব দেখা দিল। তিনি কতকটা উপহাসের ভাবে, এবং কতকটা বাৎসল্যভাবে কহিলেন, "আচ্ছা, তবে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব।" এই বলিয়া বৃদ্ধ ঘোড়া হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন।

বৃদ্ধ যেমন বলিয়াছিলেন, তদনুসারে পরদিন প্রাতঃকালে শস্য-কাটা আরম্ভ হইল, কিন্তু কনানা ক্ষেতে বা মাচায়, কোথায়ও নাই।

প্রায় কেহই কনানার কথা ভাবিল না, যে জনকতক ভাবিল, তাহারা মনে করিল, ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভয়ে সে হয়ত কোথায়ও লুকাইয়া আছে।

শোকভারে ক্লান্ত ও বিষণ্ণবদন বৃদ্ধ শস্য-কাটা দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া এদিকওদিকে গিয়া দেখিতেছেন বটে, কিন্তু রহিয়া রহিয়া কনানার কথা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতেছে। কখনও ভাবেন, কনানার বিষয়ে আমার যে ধারণা হইয়াছে, তাহা হয়ত ঠিক নহে। ভাবিলেন একটা ঘোড়া দিলে আর যাত্রাকালে তাকে আশীর্ব্বাদ করিলে ভাল হইত।

৩

হোরেবপর্ব্বতের গোড়ায়।

যে সময়ে বালুকাময়ী মরুভূমির একপ্রান্তে বালুকারাশিতে সূর্য্য অস্ত গেল, সেই সময়ে কনানা মাচাহইতে নামিলেন। শস্য কুড়াইয়া ছাগলের লোমের তৈয়ারি এক থলিয়ায় ভরিলেন, ভরিয়া পিঠে বাঁধিলেন। মাঠে কেহ ছিল না যে, যাত্রাকালে দুইকথা বলিয়া যাইতে হইবে। তিনি পাচনী হাতে করিয়া, মরুভূমি-দিয়া উত্তর-পশ্চিমদিকে চলিলেন।

কনানার সমবয়স্ক একটী বালক মরুভূমির ইন্দুর-শিকার করিতে বাহির হইয়াছিল। বালকটী শিকারের আশায় বালির উপর শুইয়া পড়িয়াছিল। কনানা তাহাকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন, দেখিতে পান নাই। দেখিতে পাইলে কনানা অন্যদিক্-দিয়া যাইতেন। অকস্মাৎ উক্ত বালক উপহাসভাবে বলিয়া উঠিল, "কনানা যে রে! এখানে কি মনে করিয়া? ইন্দুরে কামড়াইবে যে রে, পালা, পালা! অন্ধকাররাত্রে একা কোন্ সাহসে এই মাঠে আসিয়াছিস্?"

রাগে কনানার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। হাত যেন আপনি পাচনী কশিয়া ধরিল, এবং আঘাত করিবার আশয়ে অমনি তাহা উঠাইল। কিন্তু তাহার প্রকৃতির কোমলভাব প্রবল হওয়াতে আঘাত করা হইল না। শিকারী-বালকের বিদ্রূপে কনানা যে কতটা রাগিয়া উঠিয়াছিলেন, এবং তাহাকে যে বিষম আঘাত করিতে উদ্যত ছিলেন, অন্ধকারপ্রযুক্ত সে তাহা দেখিতে পায় নাই। রাগ-সম্বরণ করিয়া লইয়া কনানা শান্তভাবে কহিলেন, "হোরেবপর্ব্বতের দিকে যাইতেছি।" এই কথাকয়েকটীমাত্র শিকারীবালক শুনিতে পাইল, কিন্তু একথায় সে কান দিল না। কনানা চলিয়া গেলেন, শিকারী-বালক তাঁহার বিষয় একেবারে ভুলিয়া গেল।

হোরেবপর্ব্বত কোথায়? এবিষয়ে কনানা যাহা কিছু জানিতেন, তা অতি সামান্য। তিনি জানিতেন যে, বেনিসৈয়র্দদিগের ব্যবসায়ী-দল কয়েকদিন হইল, দক্ষিণের পথ ধরিয়া মক্কার দিকে যাইতেছিল, পথে রসিদ বরকত তাহাদিগকে ধরিয়া উত্তরদিকে দম্মেশকের দিকে লইয়া গিয়াছে।

বালুকাসমুদ্র-দিয়া হোরেবপর্ব্বতের চূড়াটী বহুদূরহইতে দেখিতে পাওয়া যায়, দেখিয়া পথিকেরা গন্তব্য-পথ চিনিয়া লইতে পারে। পাঠককে মনে করাইয়া দি, এই হোরেবপর্ব্বতে ইস্রায়েলের প্রধান যাজক হারোণের কবর হইয়াছিল। হোরেবপর্ব্বতের চূড়া আকাশ-
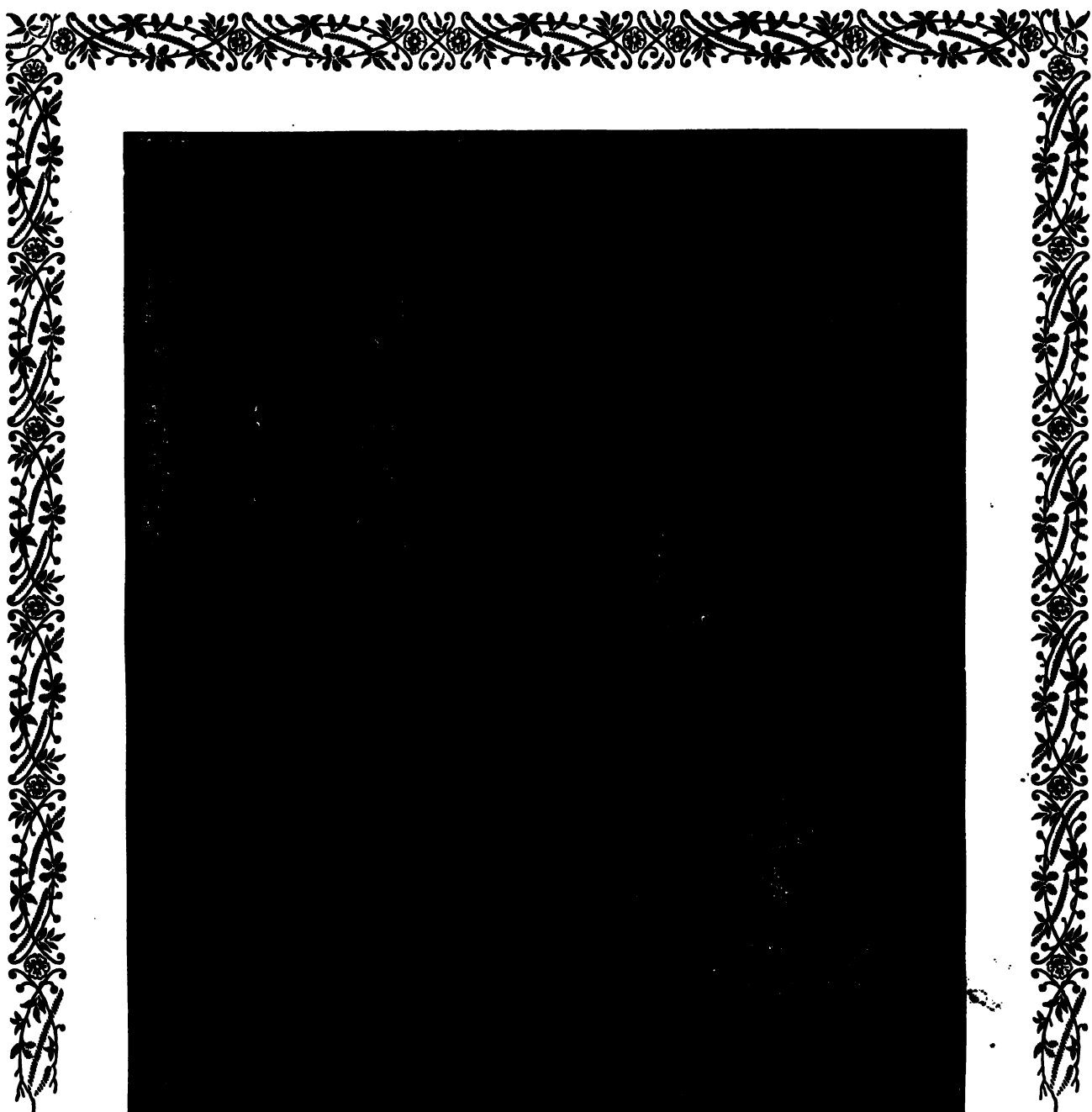
Photograph by Johnston and Hoffmann.

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতার প্রিন্‌সেপ্‌স্‌-ঘাটে রাজা বক্তৃতায় বলিতেছেন—"দিল্লির দরবারে আমি ভারতের শাসনপ্রণালীসম্বন্ধে যে পরিবর্ত্তন-ঘোষণা করিয়াছি, তাহাতে কলিকাতার কতকপরিমাণে ক্ষতি হইবে বটে, কিন্তু তোমাদের নগর সর্ব্বদাই ভারতের প্রধান নগর হইয়াই থাকিবে।"

ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, কি দিনের বেলা, কি রাত্রিকালে, সে চূড়া স্পষ্ট দেখা যায়। যেসকল লোক আরবদেশহইতে উত্তরমুখে যিরূশালেম ও দম্মেশকের দিকে, এবং সুরিয়াহইতে দক্ষিণমুখে মেদিনা ও মক্কার দিকে যায়, এই পর্ব্বতের চূড়া তাহাদের পথপ্রদর্শক। আর এই পর্ব্বতের আশপাশের তলভূমি পথিকদিগের ও পশুগণের বিশ্রামস্থান।

কনানা ভাবিলেন, আমাদের পঁহুছিবার অনেক আগে সেই পথিকের দল বা কারাভান হোরেবপর্ব্বত ছাড়াইয়া যাইতে পারে, নাও পারে। যদি গিয়াই থাকে, ফিরিয়া আসিবে ত। যাহাই হউক, হোরেবপর্ব্বতে গেলে পথিকদিগের নিকট সেই কারাভানের বিষয়ে সংবাদ পাইতে পারিব—আরবদেশের আর কোথায়ও গেলে সংবাদ পাওয়া যাইবে না।

এই বালুকাময়ী মরুভূমি-দিয়া কনানা গন্তব্যপথ চিনিয়া লইলেন—আসামদেশের আভরেরা যেমন নিবিড় বনের ভিতরেও পথ চিনিয়া লয়। দিবাভাগে প্রখর সূর্য্য, রাত্রিকালে আকাশের তারকাবলি আরবদেশীয় পথিকদিগের পথপ্রদর্শক, এ দুই থাকিতে আরবদেশে আরবপথিকের পথ হারাইবার ভয় মনেও স্থান পায় না। কনানা রাত্রিকালে অকাতরে হোরেবপর্ব্বতের দিকে চলিলেন।

এই মরুভূমিতে, কনানার পশ্চাৎদিকে চন্দ্রোদয় হইল। তাই দেখিয়া বালক কোরাণের দ্বিতীয় সুরার এইপদ সুর করিয়া আওড়াইলেন—

জীবন্ময় ও অনন্ত একই ঈশ্বর।
একা সর্ব্বেসর্ব্বা তিনি, নাহিক অপর।
নিদ্রা কিম্বা তন্দ্রাবেশ নাহিক তাঁহার।
তাঁর হস্তগত সবে জানিবেক সার।
সবার পালক তিনি, অতীব মহান্।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাঁহার সমান।

কনানার দীর্ঘ-ছায়া রূপার মত ধবল-বালুকার উপরে পড়িয়াছে। সেই ছায়া দেখিতে দেখিতে কনানা আবার কোরাণের পদ ধরিলেন—

ঈশ্বরি ঈশ্বর, তিনি মঙ্গল-আলয়,
যা কিছু মঙ্গল তব, তাঁহাহৈতে হয়।
অমঙ্গল তবে যাহা ঘটিছে তোমার,
নিজকর্ম্মদোষে—এই জানিবেক সার।

এমন সময়ে বহুদূরে আকাশে যেন কোন কিছু দেখিতে পাওয়া গেল। অন্য লোকের চখে হয়ত এই কোন কিছু পড়িত না। কিন্তু কনানা রাখাল, রাখালের চখে কি ইহা না পড়িয়া পারে? কনানা ঐ ছায়াবৎ কোন কিছু একমনে দেখিতে লাগিলেন। উহা একবার এদিকে, একবার ওদিকে যাইতে ও কখনও দৃষ্টির অগোচর হইতে, আবার বালিয়াড়ির আড়ালহইতে বাহির হইতে লাগিল। এইরূপে উহা ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিল।

ঐ ছায়াবৎ কোন কিছু কোন্ দিকে আসিবে, তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া কনানা অনেকটা সরিয়া গেলেন ও উহা নিকটবর্ত্তী হইলে এক বনের আড়ালে গিয়া লুকাইলেন।

ঐ কোন কিছু একদল লোক। প্রথমে জনকতক অশ্বারোহী চলিয়া গেল, ইহারা পরবর্ত্তী লোকেদের একপ্রকার চালক। ইহাদের পরে ঘোড়ায় ও উটে চড়িয়া বিস্তর লোক আসিল; কাহারও মুখে কথাটী নাই, কেবল উট ও ঘোড়ার পায়ের শব্দ আর বল্লম, তরোয়াল ইত্যাদির ঝন্‌ঝনানি শুনিতে পাওয়া গেল। পরে কতকগুলি উট ও উটের বাচ্চা আসিল, তাহার পরে কতকগুলি লোক পদব্রজে বিস্তর ছাগ ও মেষ তাড়াইয়া লইয়া গেল; তাহার পরে তাম্বু ও তৈজস-বোঝাই কতকগুলি উট লইয়া একদল লোক আসিল; সকলের শেষে অস্ত্রধারী লোকেরা স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগকে উট, ঘোড়া ও গাধায় চড়াইয়া লইয়া আসিল।

এত লোক চলিয়া গেল, কাহারও মুখে কথাটী নাই, কেবল বালুকাভূমিতে চলনশীল মানুষের ও পশুদের পদশব্দ যা কিছু শুনা গেল।

নিতান্ত নিঃশব্দ কতকগুলি মনুষ্য ও পশুর গমনশীলা ছায়ামাত্র।

কনানার পক্ষে এপ্রকার দৃশ্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; পাছে কোনপ্রকার বাধাবিপত্তি ঘটে, এই ভাবিয়া কনানা বনের মধ্যে লুকাইয়াছিলেন। অনেকবার কনানাকে এপ্রকার দলে যোগ দিতে হইয়াছে।

মরুভূমি-দিয়া দল বাঁধিয়া গমনকালে কোন আরবকে একাকী পাইলে এই লোকেরা বেগার্ ধরে, এবং যতদিন না সে পলাইয়া যাইতে পারে, ততদিন তাহাকে ছাগ, মেষাদি পশুপাল তাড়াইয়া লইয়া যাইতে হয়। কনানা কেন, এ অবস্থায় পড়িলে আরববালকমাত্রেই লুকাইয়া থাকে।

এই লোকেরা চলিয়া গেলে কনানা আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন, রাত্রি প্রভাত হইল। একটু বেলাও হইল। রৌদ্র যখন অতি প্রচণ্ড, তখন কনানা বিশ্রাম করিবার উপযুক্ত একটী স্থান পাইলেন। বালুকারাশির মধ্যে একটা শৈল ছিল। কনানা সেই শৈলের আড়ালে একটী স্থান ঠিক করিয়া শুইয়া পড়িলেন। এখানে বিলক্ষণ ছায়া ছিল।

যাহারা মরুভূমিতে দীর্ঘপথ চলিয়াছে, তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ, ও প্রচণ্ড রৌদ্রে পুড়িয়া অবসন্ন হইয়াছে, কেবল তাহারাই বাইবেলের শ্রান্তিজনক-ভূমিতে শৈলের ছায়ার মাধুর্য্য বুঝিতে পারে।

এইপ্রকার বিশ্রাম-স্থান না পাইলে, কনানাকে বালুকাখনন করত গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে যথাসাধ্য বিশ্রাম করিতে হইত।

কনানা দেখিতে পাইলেন, আশে পাশে ঘাসের মধ্যে মনুষ্য ও পশুর বিকট সাদা কঙ্কাল পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু কনানা সে সকলের প্রতি বড় একটা ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।

(ক্রমশঃ।)

চা

যাহারা চা খায়, তাহাদের প্রত্যেকেই জানে যে, একরকম গাছের পাতাহইতে চা তৈয়ারী হয়, কিন্তু যাহারা কখনও সত্য সত্য গাছ আরজায় নাই বা চা তৈয়ারী করে নাই, তাহাদের মধ্যে কয়জন কি করিয়া উহা তৈয়ার হয় তাহা জানে, তাহা আমি জানি না। আমি তোমাদের কি করিয়া চা-গাছ জন্মায় এবং পরে পাতাগুলি লইয়া কি করা হয়, তাহা বলিব, তাহা হইলে তোমরা চা খাইতে খাইতে অন্য লোকদের সে কথা বলিতে পারিবে।

যে গাছের পাতা (প্রভৃতি) হইতে চা হয়, সে গাছগুলকে এমনভাবে আরজান হয়, যেন সেগুলি দেখিতে ঠিক ঝোঁপের মত হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে আসামাই চাএর উৎপত্তি দেখিবার উৎকৃষ্ট স্থান। মনে কর, আমরা শীতের শেষাশেষি, মাঘমাসে, আসামে একটা চা-বাগান দেখিতে গিয়াছি। সেখানে গিয়া আমরা কি দেখিতেছি? আমরা দেখিতেছি, আমাদের চারিদিকে কএকক্রোশ জুড়িয়া তিন কি চারফিট উঁচু বেঁটে বেঁটে ও মুড়া মুড়া বা ছাঁটা ছাঁটা ঝোঁপ উঁচু জায়গায় সারি-দিয়া রোপিত রহিয়াছে। দুইটী ঝোঁপের মাঝখানের জায়গাটুকু বেশ কোদালি-দিয়া খোঁড়া, একটীও আগাছা দেখা যাইতেছে না, আর বাগানের রাস্তাগুলি শুষ্ক ও ধূলিপূর্ণ, কেবল আইলের ধার-দিয়া যে একটী সরু পথ গিয়াছে, তাহা কুলিদের পায়ে পায়ে শক্ত হইয়া গিয়াছে। সময়ে সময়ে চা-গাছের ঝোঁপগুলির মধ্যে মধ্যে বড় বড় গাছ জন্মায়, শীতকালে সেগুলিতে সচরাচর পাতা থাকে না। তাহা হইলে, হলদেটে-কটা লম্বা লম্বা ফালি জমী-গুলিতে বছরের এই সময়ে ঐ রঙেরই চাএর ঝোঁপগুলি হইয়া রহিয়াছে এবং তাহাদের মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে লম্বা লম্বা নেড়া গাছগুলি খাড়া রহিয়াছে, তুমি মনে মনে এইরকম একটী ছবি আঁকিয়া লও। দূরে চা-বাগানের শেষ সীমানায় ঘন জঙ্গল হইয়া আছে এবং তাহার পিছনে হয়ত হিমালয়ের গিরিশ্রেণী কিম্বা আসাম ও ব্রহ্মদেশের মধ্যবর্ত্তী নাগাপাহাড়গুলি রহিয়াছে। খুব ভোরে চা-বাগানের চারিদিকে খুব কুয়াসা হয়, আর উঁচু উঁচু গাছগুলিহইতে নীচের ধূলিময় পথে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল পড়িতে থাকে। একটু বেলা হইলে, কুয়াসা কাটিয়া যায়, এবং ভারতীয় শীতঋতুর উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত তপনকিরণে সকলই প্রফুল্ল দেখায়।

তাহার পর, তিনমাসের মধ্যে খুব পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ছোট ছোট শুষ্ক চা-গাছের ঝোঁপগুলিতে আবার কুঁড়ি ধরিয়াছে, আর সবুজ সবুজ চক্‌চকে কিশলয় ও পাতা গজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। যদি জমী ভাল হয় আর চায়ের ঝোঁপগুলি বেশ বড় ও সুস্থ থাকে, তাহা হইলে এই সময়ে চা-বাগানগুলি ঠিক একটা বড় ময়দানের মত দেখায়; তখন, বর্ষাকালে কলিকাতার গড়ের মাঠ যত সবুজ দেখায় তাহার অপেক্ষাও, এই চা-বাগানগুলি সবুজ দেখায়। কিশলয়গুলি নির্দ্দিষ্টপরিমাণ উঁচু হইলে, কুঁড়ি ও উপরকার পাতাগুলি কুলিরা চট্‌পট্ ছিঁড়িয়া লয়; এই কাজে তাহাদের খুব ছেলেবেলাহইতে অভ্যাস আছে। প্রথমতঃ চাএর ঝোঁপগুলি-হইতে কুঁড়ি ও পাতাগুলি এমন সাবধানে ছিঁড়িয়া লওয়া হয়, যেন সবুজ সবুজ কিশলয়গুলি বেশ সমানভাবে গজাইতে পারে। একটীও কিশলয় যাহাতে অন্য কিশলয়-গুলির অপেক্ষা বেশী উঁচু না থাকিতে পারে, এইরকম বন্দোবস্ত করা হয়। তাই, পরে যখন একটী চাএর ঝোঁপে দুশ-পাঁচশো কিশলয় রোদ ও বাতাস লাগিয়া, যতদূর পারে, তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠিতে থাকে, তখন যে কিশলয়গুলি উচিত-মত উঁচু হইয়াছে, সেগুলি সব ছিঁড়িয়া লইয়া, যে কিশলয়গুলি তখনও ছিঁড়িবার মত হয় নাই, সেই অপুষ্ট কিশলয়গুলিকে বাঁচাইতে ছেদকদের কোনই অসুবিধা হয় না।

ছেদনের মরসুমের মাঝামাঝি, যখন ঝোঁপগুলি হু হু করিয়া বাড়িতে থাকে, তখন শত শত কুলি প্রত্যেক সপ্তাহ ধরিয়া কেবল ছেদনের কার্য্যই করিতে থাকে। স্ত্রীলোক ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই এই কাজের বেশী উপযোগী। পুরুষেরা সচরাচর মোটা কাজ করে বলিয়া, এ কাজ তাহারা বড় আস্তে আস্তে করে। সন্ধ্যাবেলা বড় বড় বাঁশের ঝুড়ি করিয়া পাতাগুলি কুঠিতে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে কি ঝুড়ি ওজন করা হয়, এবং যে কুলি যত পাতা ছিঁড়িয়া আনে, সে সেই হিসাবে কম বা বেশী মজুরী পায়।

তোমরা যে চা খাও, তাহা কাল, শুষ্ক ও পাকান; তোমরা হয়ত ভাবিতেছ যে, সরস, সবুজরঙের কুঁড়িগুলি আর কচি কচি চা-পাতাগুলি কি করিয়া অমন হয়। প্রথমে চাএর সবুজ সবুজ পাতাগুলি খুব ছড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া রোদে শুকান হয়, সময় সময় সমস্ত দিনই শুকান হয়। ভাল করিয়া শুকান হইলে, পাতা ও ডাঁটাগুলি বেশ নরম হয়, তখন সেগুলি পাকাইলে ভাঙ্গিয়া যায় না। তখন পাতাগুলি পাকাইবার যন্ত্রে ফেলিয়া, চাএর দোকানে তোমরা যে চা কেন তাহা যে রকম পাকান, সেইরকম পাকান আর ডাঁটাগুলি ছোট ছোট টুক্‌রা করা হয়। চাএর পাতাগুলি যখন পাকাইবার যন্ত্রহইতে বাহির করা হয়, তখন সেগুলি ভিজা ও তালপাকান থাকে, আর সেগুলিহইতে বেশ সুগন্ধ বাহির হইতে থাকে, তাহার পর তালগুলি মোটা চালুনীর সাহায্যে ভাঙ্গা হয়। কুলিদের ছোট ছোট ছেলেরা এই কাজ করে। তাহারা দিনের পর দিন চা-কুঠীতে বসিয়া কেবল উহাই করিতে থাকে, কেবল কয়েক ঘণ্টার জন্য একবার বাহিরে যায়, আবার কখনও চা-কুঠীতে বসিয়াই ভাত খায়। বৎসরের যে সময়ে কাজের খুব ভীড়, সে সময়ে সকালে ফর্সা হইলেই কাজ আরম্ভ হয়, আর মাঝরাত্রিপর্য্যন্ত কাজ চলে। চালুনীদিয়া চালিয়া পাকান পাতাগুলি ভাঙ্গা হইলে পর, সেগুলি, একটী ঠাণ্ডা জায়গায় বিছাইয়া, গাঁজিতে দেওয়া হয়। চা গাজাইবার জন্য সচরাচর একটী আলাদা ঘর থাকে। সেই ঘরের দেওয়ালের ফুকরগুলি ভিজা নেক্‌ড়াদিয়া ঢাকিয়া চা-গুলিকে ঠাণ্ডা রাখা হয়। যখন পাতাগুলি গাঁজিতে থাকে, তখন উহাদের রঙ্‌ বদ্‌লাইয়া যায়। শেষে সবুজরঙ্‌এর পাতাগুলি মেটেরঙ্‌এর হইয়া পড়ে। তাহার পর, পাতাগুলি যাহাতে ভাল থাকে, সেইজন্য সেগুলিকে শুকান হয়। না শুকাইলে পাতাগুলি শীঘ্রই টকিয়া যায়। পিতলের ছেঁদাওয়ালা বারকসে পাতাগুলি পাত্‌লা করিয়া বিছাইয়া যন্ত্রের সাহায্যে এমন এক জায়গায় লইয়া যাওয়া হয়, যেখানে উহাদের উপর-দিয়া গরম হাওয়ার একটা হল্‌কা বহিয়া যায়, তাহাতেই উহারা শুকাইয়া উঠে। পাতাগুলি শুকাইলে একেবারে কাল হইয়া যায়, আর সেগুলিহইতে বেশ "খুশবু" বাহির হইতে থাকে। ধূলি না লাগে এইজন্য পাতাগুলি তাহার পর সেখানহইতে সরাইয়া ফেলা হয়, আর তাহার পর সেগুলি ভাল-মন্দ রকমে ভাগ করাও হয়। ফ্লাওয়ারী-অরেঞ্জ-পিকো, অরেঞ্জ-পিকো, পিকো ও সুচঙ্‌ সচরাচর এই চাররকমের চা হয়। ফ্লাওয়ারী-অরেঞ্জ-পিকো ও অরেঞ্জ-পিকো এই দুইরকমের চাএ নাকি কেবল চাএর কুঁড়িই থাকে, এই চাএর যেগুলি সবচেয়ে ভাল সেগুলি যদি ঠিকমত তৈয়ার করা হয়, তাহা হইলে কাল হয় না, বেশ সোণালী-কমলার রং থাকে, সেই জন্যই এই দুইরকম চাএর ঐ নাম হইয়াছে। পিকো ও সুচঙে চাএর বড় পাতা ও অঙ্কুরের নিরেশ অংশগুলি থাকে।

সবশেষে রকমারি চাগুলি ভিতরে রাঙতামোড়া কাঠের বাক্সে বাক্সবন্দী করা হয়। চা-ভরা কাঠের বাক্সগুলিতে যাহাতে বৃষ্টির জল না লাগে, তাহার জন্য খুব সাবধান হওয়া দরকার হয়, কারণ সে বাক্সগুলি সেঁতসেঁতে হইয়া গেলে, ভিতরের চা খারাব

হইয়া যায়। চাএর বাক্সগুলি গরুর-গাড়ী কিম্বা ট্রলী বা ঠেলাগাড়ী করিয়া রেলওয়ে-ষ্টেশনে কিম্বা জাহাজঘাটে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানহইতে সেগুলি রেলে কিম্বা নদী-দিয়া কলিকাতায় কিম্বা চট্টগ্রামে চালান দেওয়া হয়। ঐ দুই জায়গাহইতে অধিকাংশ চা লণ্ডনে রপ্তানী করা হয়। কিছু অষ্ট্রেলিয়ায়, কিছু পারস্যোপ-সাগরে এবং কিছু অন্য অন্য স্থানেও যায়। গতবৎসরে কলিকাতা-হইতে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড (প্রায় আধসের) চা রপ্তানি করা হইয়াছিল। অতএব, তোমরা দেখিতে পাইতেছ, ভারতবর্ষে চাএর কত বড় কারবার চলিতেছে, আর কত লোক চা আরজাইতে, তৈয়ার করিতে, কেনা-বেচা করিতে ও রপ্তানী করিতে লাগিয়া রহিয়াছে। এই চা জগতের কত পরিবারই না পান করিতেছে।

পৃথিবীর আর যে সমস্ত জায়গায় চা আরজান ও প্রস্তুত করা হয়, তাহা ভারতবর্ষের মত করিয়া করা হয় না। চীন-দেশে চা হাতদিয়া পাকান, আর কাঠকয়লার চুলায় "ভাপান" হয়। অনেক চৈনিক চা চাপিয়া ইটের মত করিয়া উত্তর-এসিয়ায় পাঠান হয়। চীন-গবর্ণমেণ্ট লাসার লামাদিগকে উপহারস্বরূপে ঐ ইষ্টকাকৃতি চা পাঠাইয়া থাকেন। ঐ চাএর কিছু কিছু মাঝে মাঝে তিব্বত ও ভারতবর্ষেও আনা হয়। দার্জ্জিলিংএর বাজারে ঐ চা কিনিতে পাওয়া যায়। তিব্বতীয়েরা, তোমরা যেমন অধি-কাংশ লোকে চিনি ও দুধ দিয়া চা-পান কর, তেমন করিয়া চা-পান করে না, সোরা ও মাখম কিম্বা ঘী-দিয়া চা খায়। আসামে

চাএর চাষ হইবার অনেক আগে চৈনিক চা ইউরোপে রপ্তানী হইত। ভারতে চাএর চাষ গতশতাব্দীর গোড়ায় আরম্ভ হয়, সেই সময়েই আসাম ও ব্রহ্মদেশের মধ্যবর্ত্তী অরণ্যে চা যে আপনাআপনি জন্মে, ইহা আবিস্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু উত্তর-ব্রহ্মে স্থানীয় ব্যবহারের নিমিত্ত অনেকদিনহইতেই চাএর চাষ হইত। ভারত ও চীন ছাড়া, জাপান, সিংহল ও জবদ্বীপও পৃথিবীর প্রধান প্রধান চা-উৎপাদক দেশ। অন্যান্য দেশেও চাএর চাষ হয়, কিন্তু বড় কমপরিমাণে।

উচ্চৈঃশ্রবা।

লুসাইপাহাড়ের অজরাজ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ভয় পাইলে বন্য ছাগেরা পর্ব্বতের চূড়ার দিকে বা পর্ব্বতের গায়ে হেলান টিকড়ের উপরে এমন স্থানে গিয়া থাকে যে, সে স্থান যমেরও অগম্য। এইরূপ একস্থানে বাচ্চাদুইটীকে লইয়া ধাড়ীরা গিয়া পঁহুছিল। এখন কোন ভয় নাই। এইখানে থাকিয়া মাসাধিককাল তাহারা এই নিরাপদ্ টিকড়ের আশে পাশে বেড়াইয়া আহারের জোগাড় করিতে লাগিল—দূরে খোলা জায়গায় মোটেই গেল না।

গৃহস্থের বাড়ীর পোষা ছাগলের অপেক্ষা জঙ্গলী ছাগল বেশী বলবান, আর শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। এই বাচ্চাদুইটী সাতআট-দিনের মধ্যে এত বাড়িয়া উঠিল এবং এমন শক্ত-সমর্থ হইল যে, বন্য কুকুর দেখিয়া ধাড়ীরা যখন প্রাণ হাতে করিয়া বায়ুবেগে ছুটিয়া পালায়, তখন তাহাদের সঙ্গে সমানে দৌড়িতে পারে।

বাচ্চাদুইটীর জন্মদিনে যেমন কুয়াসা হইয়াছিল এবং ঘন শিশির পড়িয়াছিল, এখন আর তেমন হয় না। এক্ষণে সকল পাহাড়েই ঘাস, সকল পাহাড়েরই বৃক্ষলতা ফলময়। এক্ষণে ধাড়ীদুইটার আর বাচ্চাদুইটীর আহারের ভাবনা নাই—বাচ্চারা লেজ নাড়িয়া নাড়িয়া বেড়ায়, আর কচি উলুঘাসের ডগা খুঁটিয়া খুঁটিয়া খায়।

একটা বাচ্চার নাকের ডগা শাদা, তাই আমরা এই গল্পে সেটাকে "শ্বেতনাসিক" বলিব। এটার সঙ্গীর ইহারই মধ্যে সিং দেখা দিয়াছে, আর একটা একটু লম্বা। এটার কান-দুইটা সদাই খাড়া। এটাকে আমরা "শৃঙ্গী" বলিতে চাই। এই বাচ্চাটী দেখিতেও একটু ভাল।

দুইটী বাচ্চাই একই বয়সের ও একই অবস্থাপন্ন; কাজেই দুই-জনের বেশ মিল। দুইজনে লাফা-লাফি করে, মারামারি করে, দৌড়া-দৌড়ি করে; সমস্ত দিনই অস্থির, চঞ্চল। একটা চলিয়া যায়, অন্যটা পিছনদিকে সেটাকে গুঁতাইতে থাকে। এই করিতে করিতে, একটা টিকড় সম্মুখে দেখিতে পাইলে, একটা গিয়া টিকড়ের চূড়ায় চড়িয়া মাথাটী নাড়িয়া ও মাটীতে লাফ মারিয়া এমন ভাব-ভঙ্গী করে যেন, সেইই টিকড়ের রাজা; অন্যটাকে কাছে ঘেঁসিতে দেয় না। অন্যটা কাছে গেলে চক্ষু রাঙ্গায়, কানদুটী খাড়া করে। এদিকে অন্যটা খুব কাছে আসিলে গুঁতাগুঁতি আরম্ভ হয়। অবশেষে সেটা মাটীতে "পদাঘাত" করে, যেন বলে, "ওরে ভাই, আমি কেল্লা দখল করিতে আসি নাই রে।" কিন্তু অমনি আপনি গিয়া, একটা টিকড়ে চড়িয়া, এটাকে চক্ষু রাঙ্গায়, লাথি দেখায়, মাথা নাড়ে। ভাব এই, আয় না লড়া যাউক। কার কত জোর, দেখা যাইবে।

"শ্বেতনাসিক" একটু মোটাসোটা; তাই এইপ্রকার লড়াইতে তাহারই প্রায় জিত হয়। কিন্তু দৌড়াদৌড়িতে সে "শৃঙ্গীর" সঙ্গে পারিয়া উঠে না। সে সমস্ত দিন ব্যস্ত, চঞ্চল; সকালহইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত সে কেবল লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ায়, সে নিতান্ত চটপটে; সারাদিন ব্যস্ত।

টিলার এখানে সেখানে যে সকল ছোট ছোট কন্দর থাকে, তাহারই কোনটাতে ধাড়ীদুইটা বাচ্চা বুকে করিয়া, একটা অপর-টার কাছে শুইয়া থাকে। ইহারা এমন কন্দরে থাকে, যেন বৃষ্টি হইলে গায়ে জল না লাগে, অথচ সকালবেলা রৌদ্র পোহাইতে বা সূর্য্যের তাপ পাইতে পারে। কারণ লুসাই-অঞ্চলে বারো-মাসই রাত্রে একটু শীতবোধ হয়; এইজন্য মানুষ কি পশু-পক্ষী, সকলেই সকালবেলার অপ্রখর রবিকিরণ ভালবাসে। সকলের আগে এই বাচ্চাদুইটীর ঘুম ভাঙ্গে। বিছানা যেমন অলস মানুষকে এবং অলস যেমন বিছানাকে ভালবাসে, ভোরের ঘুম ভাঙ্গিলেও অলস যেমন বিছানার মায়া ছাড়িয়া উঠিতে চাহে না, "শ্বেতনাসিক" অনেকটা সেই ধরণের। ঘুম ভাঙ্গিলেও সে হাত-পা গুটাইয়া, শুইয়া শুইয়া লেজ নাড়িতে থাকে—লেজ থাকিলে অলস মানুষেও, বোধ হয়, তাই করিত। সকলের শেষে "শ্বেত-

Pho
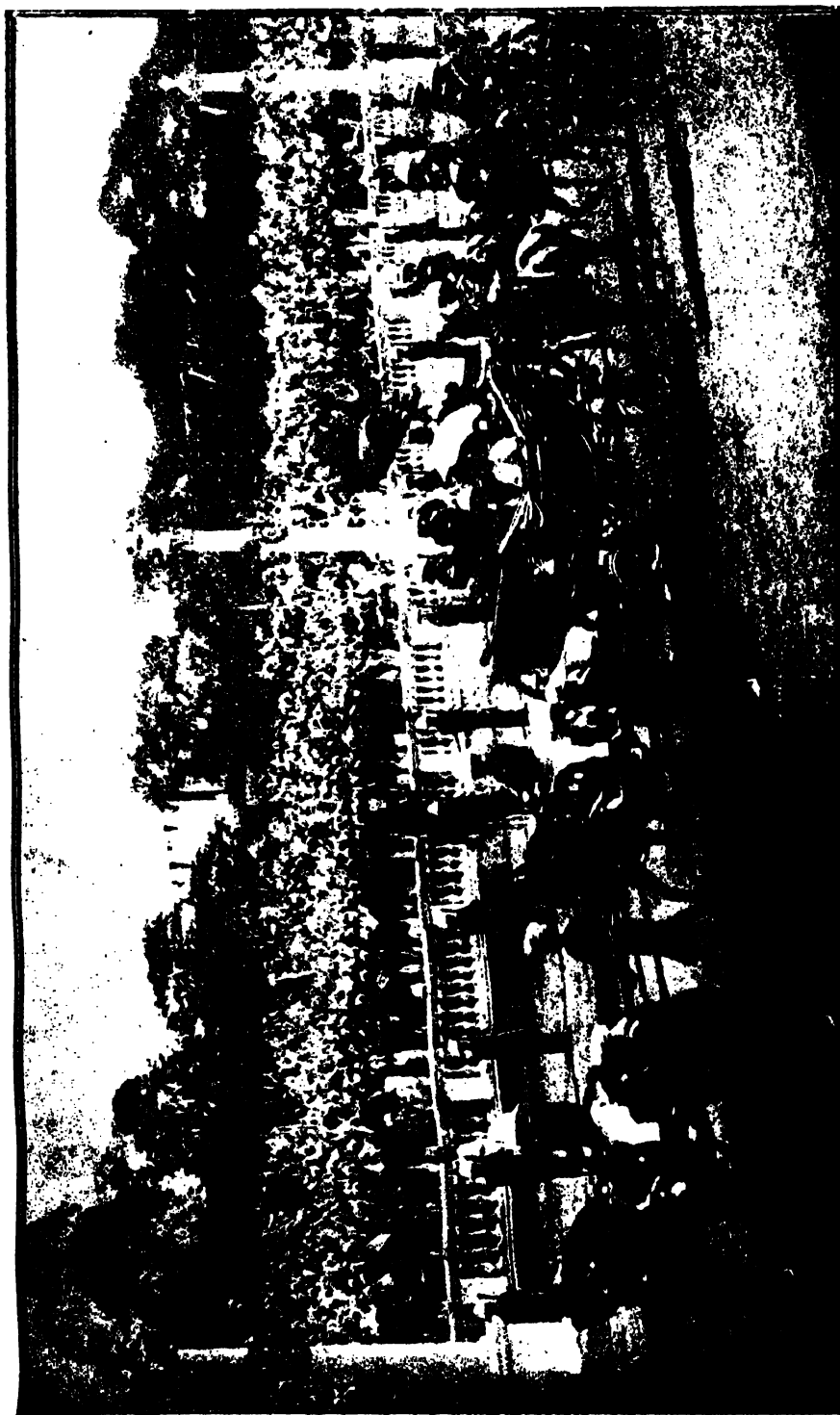
১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বরে রাজা ও রাণী প্রজাগণের জয়ধ্বনি শুনিতে শুনিতে রেড্ রোড ধরিয়া কলিকাতায় প্রবেশ করিতেছেন

নাসিক" উঠিয়া আলস্য ভাঙ্গিতে থাকে। এই বেচারার একটা কান ডগার দিকে একটু চেরা। "শৃঙ্গী" যখন তখন তামাসা করিয়া সেই কানটা কখনও অতি আস্তে কামড়াইয়া দেয়, কখনও বা পায়ের নখ দিয়া আঁচড়ায়। "শ্বেতনাসিক" যখনই একটু অন্যমনস্ক থাকে, "শৃঙ্গী" অমনি সেই কানটা কামড়াইয়া দিয়া তাহাকে জ্বালাতন করে। সকালবেলায় কোন কোন দিন, "শ্বেতনাসিকের" কাটা কান কামড়াইয়া ধরিয়া এমন টান মারে যে, বেচারার কষ্টবোধ হয়, কিন্তু "শৃঙ্গী" আহ্লাদে আটখানা!

পাহাড়ের ছাগলেরা সর্ব্বদাই দল বাঁধিয়া বাহির হয়। দল বাঁধিয়া চলাতে শত্রু বা বিপদের কারণ সময় থাকিতে কাহার না কাহারও চখে পড়েই। কিন্তু লুসাইপ্রদেশ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিবার পর, চট্টগ্রামে যাওয়া-আসা করিবার সুবিধা হওয়াতে, লুসাই-শিকারীরা পাহাড়ে ছাগল শিকার করিতে বিলক্ষণ ব্যস্ত ছিল। একা মটুমটু বিস্তর ছাগল মারিয়াছে। তাহার খড়ের চালে ও বেড়ায় সুন্দর সুন্দর শিংসমেত কত ছাগলের মাথা রহিয়াছে। আবার মাচার উপরে একরাশি ছাগলের চামড়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। শীতকালে চট্টগ্রামের বাজারে এই সকল লইয়া গিয়া বেচিবে। এক্ষণে লংলেপাহাড়ে ত বন্য ছাগল নাই, বলিলেই হয়; একটু দূরে যদিও আছে, কিন্তু ছাগলের আর সে কালের মত বড় দল নাই। এখনকার বড় বড় দলে বড় জোর ত্রিশ-বত্রিশটা করিয়া ছাগল থাকে। আবার অনেক ভগ্ন ও পলাতক দলে পাঁচ-সাতটার বেশী থাকে না।

জ্যৈষ্ঠমাসের আরম্ভে মটুমটু শিকারে বাহির হইয়া, দুই-একবার লংলেপাহাড় ছাড়াইয়া আইজলের দিকে গিয়াছে। কারণ এই সকল পাহাড়ে অনেক শিকার পাওয়া যায়। আমাদের গল্পে উল্লিখিত ধাড়ীদুইটা আর সকল ছাগলের সঙ্গে দল বাঁধিয়া ঘাস খাইতে বাহির হয়, কিন্তু ইহারা বড় "হুঁসিয়ার"। শিকারীর গন্ধ পাইলেই একপ্রকার ডাক ডাকিয়া দলস্থ সকলকে সাবধান করিয়া দেয়, যেন বলে, থাম, আর এক-পাও আগে যেও না; এই ডাক শুনিবামাত্র দলস্থ সকল ছাগল অমনি থামিয়া দাঁড়ায়, এক-পাও নড়ে না। তাহাতে সকলে বাঁচিয়া যায়; কারণ আর একটু আগে গেলেই শিকারীর চখে পড়িত, ও প্রাণ হারাইত। আবার অবস্থা বুঝিয়া অন্য নানাপ্রকার ডাক ডাকিয়া কখনও দৌড়িয়া যাইতে, কখনও বা ডাহিনে কিম্বা বাঁয়ে ভাঙ্গিতে বলিয়া দেয়। ইহাতে সকলেই রক্ষা পায়। এইপ্রকারে শত্রুর চখে "ধূলা দিয়া" ছাগলেরা অন্য পাহাড়ে চলিয়া যায়।

কিন্তু একদিন এক বাঁশবনের ধার-দিয়া যাইতে যাইতে ছাগলেরা এক নূতন রকমের বিদ্‌ঘুটে গন্ধ পাইল। কিসের গন্ধ, জানিবার জন্য যেই দাঁড়াইল, অমনি বাঁশবনের ভিতরহইতে একটা চিতাবাঘ একলাফে আসিয়া, "শ্বেতনাসিকের" মাকে ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিল, দুই-একবার নাড়াচাড়া করিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিল।

এই দেখিয়া শৃঙ্গী ও তাহার মা ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল। শ্বেতনাসিকের মা মরিয়া গেল। বেচারা "শ্বেতনাসিক" মরা মায়ের কাছেই হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। চিতাবাঘ তাহার মাকে উদরসাৎ করিবার পূর্ব্বেই ঘাড় কামড়াইয়া ধরিয়া এক আছাড়ে শ্বেতনাসিককে মারিয়া ফেলিল।

৩

শৃঙ্গীর মা "নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব," মাঝামাঝি আকারের। শরীরটী বেশ আঁটাসাঁটা। শিংদুইটী পাটনাই ছাগলের শিংএর মত লম্বা, এবং শিংএর ডগার দিকটা বেশ তীক্ষ্ণ। পাগুলি খুব লম্বা লম্বা, এইজন্য আমরা ইহাকে "দীর্ঘভুজা" নাম দিয়াছি। দীর্ঘভুজার শিং যেমন তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিও তেমনি তীক্ষ্ণ, ফলে সে বিলক্ষণ চতুর। লংলেপাহাড়ের আশে পাশে দিন দিন বিস্তর শিকারী আসিতে আরম্ভ করিয়াছে; মটুমটু ত সকালহইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত এ টিলায় ও টিলায় ঘুরিয়া বেড়ায়। এখানে আর ছাগলদের বাস করা চলে না। তায় আবার সকালবেলা শ্বেতনাসিক ও তাহার মাকে বাঘে খাইল। তাই দীর্ঘভুজা মনে মনে স্থির করিল, এখানে আর থাকা হইবে না।

দীর্ঘভুজা লংলেপাহাড়ের ঢালু বহিয়া খরপায়ে উপরদিকে উঠিতে লাগিল। যাইতে যাইতে যেই একটা টিকড়ে উঠিতে যায়, অমনি দাঁড়াইয়া দুইতিন-মিনিট থাকে, নড়েও না, চড়েও না; যেন পাথরের ছাগল। এইরূপে দাঁড়াইয়া সে ভাল করিয়া দেখে, টিকড়ের আশে পাশে কোথায়ও কেহ আছে কি না।

একবার এইরূপে তাকাইয়া দেখিতে পাইল, পিছনদিকের পাহাড়ে কৃষ্ণবর্ণ কি একটা চলিয়া বেড়াইতেছে। এ আর কেহ নয়, সেই মটুমটু। লুসাই-শিকারী যেখানে, সেখানহইতে দীর্ঘভুজাকে স্পষ্ট দেখা যাইবার কথা, কিন্তু ছাগলটা শিকারীকে যেই দেখিতে পাইল, অমনি দাঁড়াইয়া গেল, একটুও নড়িল না। তাই শিকারীর চখে পড়িল না। মটুমটু একটা টিকড়ের আড়ালে যেই গেল, দীর্ঘভুজা অমনি জোরে দৌড়িল, তাহার বাচ্চা, শৃঙ্গী মায়ের পিছনে পিছনে লাফাইতে লাফাইতে চলিল। এক-একটা টিকড়ের মাথায় উঠে, আর ভাল করিয়া এদিক-ওদিক দেখে; কিন্তু শত্রু বা মিত্র (অর্থাৎ অন্য ছাগল) কাহাকেও দেখা গেল না, তাই সে আর কোন ভয় নাই ভাবিয়া একটু ধীরে ধীরে চলিল।

এইরূপে ইহারা সমস্ত দিন পথ চলিল। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময়ে, দীর্ঘভুজা কালাছড়ানামক ঝর্ণার উজানদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া উঠিতে উঠিতে উপরদিকে, পাহাড়ের চূড়ার খুব কাছে, যেন কোন কিছু চলিয়া যাইতে দেখিল। প্রাণী, চিনিতে পারিল না। অনেকক্ষণ তাকাইয়া দেখিতে পাইল, উহাদের গায়ের রং ধূসরছাগলের রং; পায়ের ও চলিবার ধরণ-ধারণ ছাগলের মত। উহারা বাতাসের উজানদিকে যাইতেছে। উহাদের দৃষ্টিপথের বাহিরে বাহিরে থাকিয়া, উহারা চলিয়া গেলে, যেখান-দিয়া গিয়াছিল, দীর্ঘভুজা সেইখানটা-দিয়া গেল। তখন বুঝিতে পারিল, সে যা

ভাবিয়াছিল, তাহাই ঠিক। পায়ের দাগ দেখিয়া সে বুঝিল যে, এইখান-দিয়া বড় দুইটা ছাগল গিয়াছে; গন্ধদ্বারা টের পাইল যে, ছাগল-দুইটা পাঁঠা। বন্য ছাগ-সমাজের এক রীতি বড় চমৎকার; মাদীরা বাচ্চা লইয়া স্বতন্ত্র দল বাঁধিয়া চরিয়া বেড়ায়, আর পাঁঠারা দল বাঁধিয়া স্বতন্ত্র থাকে। কেবল বসন্তকালে, ফাল্গুন-চৈত্রমাসে, "লগ্নসারের" সময়ে ছাগেরা দিনকতক ছাগীদের দলে মিশে।

পাঁঠা-দুইটা যে পথ ধরিয়া গিয়াছে, সে পথ ছাড়াইয়া শৃঙ্গীর মা ঝর্ণা ছাড়াইয়া গেল, আর এখানে ছাগদের গতিবিধি আছে ভাবিয়া, একটু আশ্বস্ত হইল। পাহাড়ের গায়ে একটা গর্ত্ত দেখিতে পাইয়া বাচ্চাটীকে লইয়া সেই গর্ত্তে রাত্রিযাপন করিল। পরদিন সকাল-বেলা উঠিয়া আবার পথ চলিতে, এবং চলিতে চলিতে লতাপাতা ও ঘাস খাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে একস্থানে কোনরূপ গন্ধ পাইয়া দীর্ঘভুজা থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। আবার এই গন্ধ ধরিয়া একটু অগ্রসর হইল। ক্রমে বেশী গন্ধ পাইতে লাগিল। তাহাতে দীর্ঘ-ভুজা বেশ বুঝিতে পারিল যে, এইখান-দিয়া একটু পূর্ব্বে একদল ছাগল বাচ্চা লইয়া চলিয়া গিয়াছে। সে গন্ধ ধরিয়া ঠিক চলিল। ডাহিনে বা বামে গেল না। বাচ্চাটী নাচিতে নাচিতে, লাফাইতে লাফাইতে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। "দীর্ঘনাসিক" থাকিলে আজ শৃঙ্গীর কতই না আনন্দ হইত!

(ক্রমশঃ।)

-:*:-

কুকুরের বুদ্ধি

কুকুরের কি চিন্তাশক্তি আছে,—কুকুর কি ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজ করে? যাঁহারা কুকুর পুষিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই বলিবেন, "হাঁ, কুকুরে ভাবিয়া-চিন্তিয়া, বুঝিয়া-শুঝিয়া কাজ করে।" বিলাতের "নেল্"নামে একটী বিলাতী কুকুরের বিবরণ এই কথার প্রমাণ।

নেল প্রকাণ্ড কুকুর। গায়ের লোম ভাল্লুকের লোমের মত ঘন। চক্ষু-দুইটী কটা, কিন্তু খুব উজ্জ্বল। এই কুকুর এক রেল-ষ্টেশনে থাকে, সকলের প্রিয়—যাঁহারা রেলপথে যাওয়া-আসা করেন, তাঁহারাও অনেকে নেল্‌কে চিনেন ও ভালবাসেন।

নেল ষ্টেশনের নানা আফিসে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেরাণীরা লেখাপড়ার কাজ করেন, নেল্ অবশ্য তা করে না; কিন্তু রেলে কাজ করিতে করিতে যে সকল লোক মরিয়া যায়, তাহাদের ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণের জন্য নেল্ লোকদের নিকটহইতে চাঁদা আদায় করে।

তোমরা কুকুরের গলায় লণ্ঠন, ব্যাগ, বাজারের পুঁটুলী ঝুলিতে দেখিয়াছ। নেলের গলায় ছোট একটী টিন-বাক্স। এই বাক্সের উপরদিকে এক ছিদ্র আছে, এই ছিদ্র এত বড় যেন ইহা-দিয়া সিকি, আধুলি, টাকা গলিতে পারে।

কতকগুলি ট্রেণে ছোট ছোট গাড়ী জোতা থাকে। আর যে-গুলি স্থানীয় ট্রেণ, সেই ট্রেণগুলির গাড়ী লম্বা লম্বা। ঠিক আজিমগঞ্জ-রেলের গাড়ীর মত—এক-একখানা গাড়ী যেন এক-একখানা গোয়ালঘর। নেলের চিন্তাশক্তি আছে, তাই সে ছোট ছোট গাড়ীর ট্রেণ আসিলে, ট্রেণের কোন গাড়ীতে উঠে না; প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া, যে আরোহীরা নামে, তাহাদের কাছে গিয়া চাঁদা চায়। কিন্তু লম্বা লম্বা গাড়ীর ট্রেণ আসিয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইলে নেল্ অমনি লম্ফ-দিয়া গাড়িতে উঠে, এবং একগাড়িহইতে অন্য গাড়িতে যায়। সে গাড়িতে ঢুকিয়া লোকদের মুখের দিকে "সতৃষ্ণনয়নে" তাকায়। সকলের কাছেই গিয়া দাঁড়ায়, এবং অল্পবিস্তর পায়।

কোন আরোহী যদি একমনে খবরের কাগজ পড়িতে থাকেন, নেল্ কাগজ ধরিয়া টানে না বা লোকটার হাঁটুর উপর পা তুলিয়া দেয় না—ভদ্রব্যবহার বেশ জানে। সে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গাঝাড়া দেয়, তাহাতে, বাক্সে টাকা-পয়সা যা থাকে, সেগুলি ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজে। আরোহীর অন্যমনস্কতা ভাঙ্গিয়া যায় এবং নেলের বাক্সে কিছু দেন। নেল্ অমনি অন্যলোকের কাছে যায়।

কতকক্ষণ ট্রেণ থাকে, নেল্ তা বেশ জানে। (চিন্তা করিবার শক্তি আছে যে!) ঘণ্টা বাজিতে না বাজিতে নেল্ লম্ফ-দিয়া নামিয়া পড়ে।

এইরূপে চাঁদা-সংগ্রহ-করা নেলের পৈতৃক ব্যবসায়। উহার পিতা ইংলণ্ডের ওয়াটার্লু-ষ্টেশনে এইরূপে চাঁদা আদায় করিত। উহার ভগিনীও এই কাজ করে।

কমাণ্ডার পিয়ারী।

উত্তরকেন্দ্রের কাছাকাছি।

পিয়ারীনামক একজন সাহসী লোক পৃথিবীর উত্তর-কেন্দ্র-আবিষ্কার করিবার জন্য কয়েকবৎসরপূর্ব্বে যাত্রা করেন, তাঁহার ভ্রমণের বিবরণ বলি, শুনিলে চমৎকৃত হইবে।

পৃথিবীর উত্তরকেন্দ্রে কি আছে না আছে, দেখিবার জন্য কুড়িবৎসর ধরিয়া পিয়ারী নিতান্ত উৎসুক ছিলেন। ইহা জানিয়া কতকগুলি গুণগ্রাহী-লোক চাঁদা করিয়া কিছু টাকা তুলেন, এবং চলিল, সে স্থানে কেবল বরফ—বরফের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাপ—গঙ্গা পূজার দিন গঙ্গার জলে ডাব-নারিকেলের মতন ভাসিয়া বেড়ায়। মাস-দুই-আড়াই পরে "রুজবেল্ট" যেখানে আসিল, সেখানহইতে উত্তরকেন্দ্রের কাছাকাছি ডাঙ্গা বা ভূমি খুব নিকটে, পিয়ারী আগেহইতেই এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। তিনি এই ডাঙ্গা-জমিকে "গ্র্যাণ্ড ল্যাণ্ড" বলেন—আমরা "মহাতীর" বলিব।

"রুজবেল্ট"-নামে একখানি ধূঁয়ার জাহাজ ঠিকঠাক করিয়া দেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই তারিখে আবশ্যক জিনিসপত্র ও লোকজন সঙ্গে লইয়া পিয়ারী উত্তরকেন্দ্র দেখিবার জন্য যাত্রা করেন। পথে, ইটানামক বন্দরে গিয়া আরও আবশ্যক জিনিস-পত্র এবং চল্লিশজন এস্কিমো লোক ও তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদিকে, আর কম হইলেও ২০০ শত কুকুর জাহাজে তুলিয়া লয়েন। এস্কিমোরা বরফের উপর-দিয়া গিয়া শিকার করিতে পারে। আর পায়ের তলায় ঘন লোম-থাকাতে এই কুকুরেরা ভ্রমণকারীদের গাড়ী টানে।

মাসখানেক পরে "রুজবেল্ট"-জাহাজ ইটাবন্দর ছাড়িল। এখন ইউরোপ বা আমেরিকার সভ্যদেশবাসীদের সঙ্গে পিয়ারীর দলের কোন সম্বন্ধ রহিল না। এক্ষণে উত্তরসমুদ্রের যে স্থান-দিয়া জাহাজ

বড় কড়ায় দুধ জাল দিয়া উনানের উপর রাখিয়া দিলে যেমন সর পড়ে। অত্যন্ত ঠাণ্ডাহেতু কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের জলের উপরিভাগ তেমনি জমিয়া যায়। কাঠি দিয়া নাড়িলেই দুধের সর ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু এই জমাট জল বরফ, এবং খুব পুরু, তাই জাহাজের ধাক্কা লাগিয়া ভাঙ্গে না। এইজন্য এ সমুদ্রে জাহাজের চলাচল হইতে পারে না।

দিনদশেক পরে পিয়ারীর জাহাজ এইরূপ স্থানে আসিয়া পঁহুছিল, আর অগ্রসর হইতে পারিল না। তাই শেরিদননামক অন্তরীপে শীতকাল-যাপন করিবার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। খাদ্য-সামগ্রী জাহাজহইতে ডাঙ্গায় নামান হইল। তাম্বু খাটান হইল। কাঠের বাক্স ভাঙ্গিয়া, সেই তক্তাদিয়া ঘর বাঁধা হইল। পিপা

মাটীতে বসাইয়া কুকুরদের থাকিবার জায়গা করিয়া দেওয়া হইল। এসকল করা হইল কেন?—যদি ঝড়ে জাহাজ ভাঙ্গিয়া যায়। এস্কিমো লোকেরা নানাদলে শিকারে বাহির হইল। এদেশে খরগোস ও একপ্রকার হরিণ পাওয়া যায়। বরফের উপর-দিয়া চলিবার জন্য একপ্রকার গাড়ী তৈয়ার হইল—এ গাড়িতে চাকা নাই, আর কুকুরে এই গাড়ী বরফের উপর-দিয়া টানিয়া লইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে পঁচিশখানা গাড়ী তৈয়ার হইল।

১৩ই অক্টোবরহইতে আকাশে আর সূর্য্য দেখা দিল না। এখন ভারী অন্ধকার ও দারুণ শীত। রাত্রে কিন্তু চাঁদ উঠে। এস্কিমোরা মাসখানেক পরে শিকার লইয়া আইসে। মরা খরগোস ও মরা হরিণ গুদামে জমা থাকে—আবশ্যকমত মাংস খাওয়া হয়। নানাস্থানে বরফের চাপদিয়া ঘর বাঁধা হইল (ইঁটখোলায় কুলিরা ইঁট সাজাইয়া যেমন ঘর তৈয়ার করে)। সেই সকল ঘরে খাদ্যসামগ্রী জমা কর হইল।
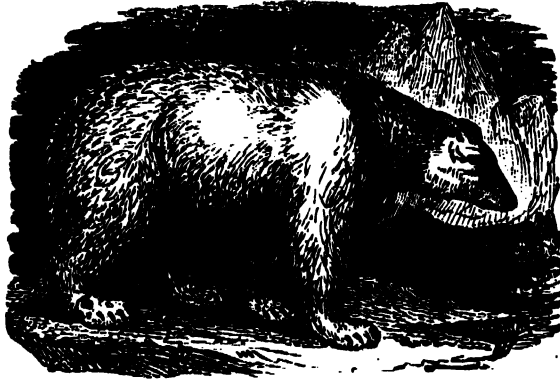
কিছু দিন পরে এক মহাবিপদ্ উপস্থিত হইল। কম হইলেও ৮০ টা কুকুর মরিয়া গেল। কুকুরদের আহারের জন্য তিমিমাছ শুকাইয়া আনা হইয়াছিল। জানা গেল, তাই খাইয়া, পেটের অসুখ হওয়াতে কুকুরগুলি মরিয়া যাইতেছে। সমস্ত তিমিমাছ ফেলিয়া দেওয়া হইল। পিয়ারী পূর্ব্বে এই দেশে আসিয়াছিলেন, তাই জানিতেন, দেশের কোথায় কি পাওয়া যায়। এক্ষণে তিনি কুকুরগুলিকে খরগোস ও হরিণের মাংস দিতে লাগিলেন, আর এস্কিমো লোকেরাও বেশী বেশী হরিণ ও খরগোস শিকার করিয়া আনিতে লাগিল।

ফেব্রুয়ারীমাসের শেষাশেষি শীতের প্রভাব কমিয়া আসিল। পিয়ারী সঙ্গীদিগকে জানাইলেন যে, এখন উত্তরকেন্দ্রের দিকে যাত্রা করিবার সময় উপস্থিত। অনন্তর জাহাজখানি হেক্লা-অন্তরীপে রাখিয়া কেন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ২১ জন এস্কিমো, ১২০টা কুকুর, ও কতকগুলি চাকাশূন্য টানাগাড়ি ছয় দলে ভাগ করিয়া পিয়ারী যাত্রা করিলেন। নানা দলের নানা কার্য্য;—কোন দলের কার্য্য আগে আগে গিয়া পথ দেখা। কোন দলের কার্য্য শিকার করা, কোন কোন দলের কার্য্য খাদ্যসামগ্রী রক্ষা করা ও প্রস্তুত করা ইত্যাদি। একমাস পথ চলিবার পর, পিয়ারী একস্থানে উপস্থিত হইলেন, দেখেন, সম্মুখে জল, কেবল জল,—পার হইবার কোন উপায় নাই। সাতদিন সকলে এইখানে রহিলেন। দিনের বেলা বেশ রৌদ্র; আকাশে মেঘ নাই; আকাশ সুন্দর নীলবর্ণ। এপ্রিলমাসে তাঁহারা গাড়ি চড়িয়া বরফের উপর-দিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। এস্কিমোরা এস্থানের কোথায় কি, তাহা বেশ জানে। খানিকদূর গেলে পর, দিন-আষ্টেক পরে আবার ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সাত-আট-দিন পরে ঝড়বৃষ্টি থামিল। এদিকে খাদ্যসামগ্রী ফুরাইয়া আসিল। ১২০টা কুকুর আর জনত্রিশেক মানুষ—রোজ কত মাংস ও ময়দার দরকার, ভাবিয়া দেখ। পশ্চাৎ-ভাগে যেখানে খাদ্যসামগ্রী জমা হইল, সেইখানে লোক পাঠান হইল। দিনকতক পরে তাহারা ফিরিয়া আসিল। বলিল, খানিক দূর গিয়া দেখি, সম্মুখে কেবল জল—অর্থাৎ তরল জল। জল জমিয়া বরফ হইলে উহারা বরফের উপর দিয়া যাইতে পারিত। পিয়ারী নিরাশ হইলেন না। বলিলেন, "কুচ্ পরোয়া নাই—আমাদের আহারের বন্দোবস্ত আমরাই করিয়া লইব।"

পরদিন আবার উত্তরমুখে যাত্রা করিলেন। কোথায়ও থামিলেন না। দশঘণ্টা পথ চলিয়া পনেরক্রোশ উত্তরে গিয়া পঁহুছিলেন। আর একদিন পথ চলিয়া, তাঁহার অগ্রে হাম্সননামে যে লোকটীর দল যাইতেছিল, পিয়ারী গিয়া তাহাকে ধরিলেন এবং তাহাকে পিছনে ফেলিয়া আপনি আগে গেলেন। কিন্তু বড় ক্লান্ত হইলেন। দারুণ ঝড়-বৃষ্টি—এ বৃষ্টি আমাদের জলবৃষ্টি নহে; তুষার-বৃষ্টি; ভারী ঠাণ্ডা। আমাদের দেশে শীতকালে শিলাবৃষ্টিতে মাঠে থাকিলে যেমন কষ্ট, তাহার অপেক্ষাও কষ্ট হইল। তাহাতে আবার খাদ্যসামগ্রীর অনাটন—"আধপেটা" খাইয়া এই কষ্টে পথ চলিতে হইল। ধন্য উৎসাহ! কিছুদূর গিয়া, এক স্থানে আড্ডা করিতে হইল। ছয়টা কুকুর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল—আর বড় একটা চলিতে পারে না। এই ছয়টাকে মারিয়া, ইহাদের মাংস অন্য কুকুরগুলিকে খাওয়ান হইল। কুকুরেরা দুর্ব্বল হইয়া পড়াতে পিয়ারীর সঙ্গীদের বড় ভাবনা হইল। তাহাদের ইচ্ছা ফিরিয়া যায়; কিন্তু পিয়ারীর মত হইল না—তিনি উত্তরমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভালই করিলেন, কারণ এখানে থাকিলে বা ফিরিলে বরফ গলিয়া সকলেই মারা যাইত। বহুকষ্টে বরফের উপর-দিয়া চলিতে চলিতে ১৮ই এপ্রিল তারিখে পিয়ারী টের পাইলেন যে, বিষুবরেখাহইতে উত্তরমুখে ৮৭°৬'-পর্য্যন্ত আসা হইয়াছে—ইতিপূর্ব্বে কোন ভ্রমণকারী এতদূর আসিতে পারে নাই। কিন্তু এখনও ঢের বাকী, পিয়ারী তাহা বেশ জানিতেন। বরফ গলিতে লাগিল। বড় বড় চাপ জলে ভাসিতে আরম্ভ হইল। কুকুরগুলি ও সঙ্গীরা আহারের কষ্টে দুর্ব্বল, নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল দেখিয়া পিয়ারী ভাবিলেন, আর অগ্রসর হইতে গেলে সকলে মারা যাইবে। তাই, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও, লোকদিগকে বলিলেন, আর না, এখন ফিরিয়া যাইবার আয়োজন করা যাউক। নন্সেন ১৮৯৫ ও কগ্নি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরকেন্দ্র-অভিমুখে

যতদূর যাইতে পারিয়াছিলেন, পিয়ারী তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক অধিকদূর গিয়াছিলেন।

এক্ষণে ফিরিয়া চলিলেন, দক্ষিণমুখে যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু ভারী কষ্ট, কারণ পৃথিবীর এই বরফঢাকা দেশে, বরফে জমাট সমুদ্রপথে উত্তরমুখে যাওয়ার অপেক্ষা এই সময়ে দক্ষিণমুখে যাওয়া বেশী কষ্টকর।

ভারী ঝড়—তুষারবৃষ্টি, বরফের চাপদিয়া ঘর বাঁধিয়া সকলে মিলিয়া রহিলেন। অষ্টপ্রহরকাল এই ঘরে থাকিলে পর, ঝড় একটু থামিল। পিয়ারী সকলকে লইয়া গ্রীণলণ্ডের উপকূলের দিকে চলিলেন। এ অঞ্চলে অনেক শশক ও হরিণ পাওয়া যায়।

তিনচারিদিন পথ চলিবার পর, সকল আশা মাটী হইল। আগে যে এস্কিমো লোকেরা যাইতেছিল, তাহারা বলিল, সম্মুখে তরলজল অর্থাৎ সমুদ্রের জল গলিয়া গিয়াছে, আর জমাট অবস্থায় নাই, এখন যাওয়া যায় কেমন করিয়া?

পরদিন এই জল পার হইবার উপায় খুঁজিলেন, পাইলেন না। তাঁহারা যে বরফের চাপের উপর ছিলেন, সে চাপ তাঁহাদিগকে কূলহইতে দূরে লইয়া যাইতে লাগিল। এখন উপায়? এক-একটা কুকুর মারিয়া, গাড়ীভাঙ্গা তক্তা-দিয়া আগুণ করিয়া, কুকুরের মাংস পোড়াইয়া খাওয়া হয়—খাদ্য-সামগ্রী আর কিছু ছিল না। একদিন ছোট, পাতলা বরফের এক চাপ পাইয়া, অতি সাবধানে সকলে, যথাসর্ব্বস্ব লইয়া, তাহাতে গিয়া উঠিলেন। ক্রমে, অতি সাবধানে, সেই চাপটাকে তীরের দিকে লইয়া যাওয়া হইল। এখন সকলে নিরাপদ্। দূরবীক্ষণ দিয়া পিয়ারী দেখেন, আগে যে প্রকাণ্ড বরফের চাপের উপর তাঁহারা ছিলেন, সেটা দুইখণ্ড হইয়া গিয়াছে।

এখন যে পথ ধরিলেন, এ পথ অতি বন্ধুর অথচ বরফময়। চলিতে চলিতে অনেকে পড়িয়া যাইতে লাগিল। পায়ে ঘা হইল। তুষার লাগিয়া নাক-মুখ কাটিয়া গেল। এদিকে আহারের কষ্টে সকলেই বেশী দুর্ব্বল হইল। অবশেষে পিয়ারী গ্রীণলণ্ডের উপকূলে আসিয়া পঁহুছিলেন। মে-মাসের (আমাদের বৈশাখ) একরাত্রে ভ্রমণকারীরা "রুজবেল্ট"-জাহাজের মাস্তল দূরহইতে দেখিতে পাইলেন। সকলেরই যারপরনাই আনন্দ হইল। জাহাজের কাছে আসিয়া দেখেন, জাহাজ বরফে আট্‌কাইয়া রহিয়াছে। অবশেষে বহুকষ্টে বরফ ভাঙ্গিয়া জাহাজ তরলজলে বাহির করা হইল। ইহাতে অনেক দিন—কয়েকমাস লাগিল। অবশেষে, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর, আমাদের পৌষমাসে, "রুজবেল্ট"-জাহাজ আমেরিকার নিউইয়র্ক-পোতাশ্রয়ে আসিয়া পঁহুছিল।

এইপ্রকার ভ্রমণকারীদের পরিশ্রের ফল কি? নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া ও মনুষ্যজাতিকে জ্ঞাপন করা। পৃথিবীর ও পৃথিবীস্থ নানাদেশের মানচিত্র তোমরা দেখিয়াছ, কিন্তু কোন মানচিত্রে উত্তর বা দক্ষিণ কেন্দ্রের "সটীক" চিত্র নাই। পৃথিবীর যে অংশে কেহ কখনও যায় নাই, সে অংশের মানচিত্র কেমন করিয়া হইতে পারে? এ যাত্রায় পিয়ারী যে সকল স্থানে গিয়াছিলেন, সে সকল স্থানের মানচিত্র হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, আমেরিকাহইতে উত্তর কেন্দ্রের দিকে যাওয়াই ভাল। পিয়ারী এই যাত্রায় অনেক শুষ্কভূমি পাইয়াছিলেন। সে সকলেরও মানচিত্র হইয়াছে।

একটী কথা যেন মনে থাকে—শুইয়া, বসিয়া, তাস, পাশা খেলিয়া সময় কাটাইলে যথার্থ সুখ হয় না। মনুষ্যজাতির ও বিজ্ঞানের মঙ্গলকল্পে দেশভ্রমণ করিলে, কষ্ট সহিলে, যে সুখ হয়, তাহাই যথার্থ সুখ।

সাময়িক-সাহিত্যসেবী

প্রিয় বৎস,

তুমি খবরের কাগজে ও অন্য অন্য সাময়িকপত্র-পত্রিকায় লেখাই তোমার উপজীবিকা করিবে কি না, এ বিষয়ে আমার পরামর্শ চাহিয়াছ। তুমি লিখিয়াছ, তোমার বাবা চান যে, তুমি কোন সম্ভ্রান্ত আফিসের কেরাণী হও; কিন্তু তুমি বোধ করিতেছ, উহার অপেক্ষা কোন অধিকতর স্বাধীনজীবিকাই তোমার ভাল লাগিবে, আর তুমি লিখিতেছ যে, তোমার কিছু কিছু সাহিত্যিকশক্তিও আছে।

আমি তোমাকে পরামর্শ দিবার দায়িত্ব লইতে চাহি না। খুব সম্ভবতঃ এ বিষয়ে তোমার বাবা যাহা বলিতেছেন, তাহাই ঠিক। এ কথা নিশ্চিত যে, তুমি কেরাণী হইয়া যত শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ্ জীবন-যাপন করিতে পারিবে, সাময়িক পত্র-পত্রিকার লেখক হইয়া তত পারিবে না। পক্ষান্তরে, সাময়িক পত্র-পত্রিকার লেখকের মৌলিকতা-প্রদর্শনের অধিকতর সুযোগ আছে। আর নিপুণ সাহিত্য-সেবী সম্ভবতঃ অধিকাংশ কেরাণীরই অপেক্ষা ভাল মাহিয়ানা পায়।

কিন্তু 'নিপুণ সাহিত্য-সেবী' বলিতে আমি কি বুঝি? আমি ধরিয়া লইতেছি যে, তুমি সাময়িকপত্রলেখক হইবার জন্য প্রথমে একখানি ইংরাজী দৈনিক খবরের কাগজের "রিপোর্টার" হইতে চাহিবে। নিপুণ "সাহিত্য-সেবীর" ইংরাজীভাষায় ভালরকম দখল থাকা চাই। কিন্তু কলিকাতায় কিম্বা ভারতবর্ষের অন্য কোন সহরে অতি-অল্পই রিপোর্টার আছে, যাহারা বেশ সরল ও প্রাঞ্জল ইংরাজীতে "প্যারা" (অনুচ্ছেদ) লিখিতে পারে। তাহারা যে সমস্ত 'রিপোর্ট' পাঠায়, তাহার অধিকাংশেরই সংশোধন করিতে হয়।

অনেক 'রিপোর্টই' ভুল ইংরাজীতে ও অপরূপ অপরূপ বাক্যাংশে ভরা। এই জন্য সম্পাদকের অনেক সময় নষ্ট হইয়া থাকে এবং তাঁহাকে বড় কষ্ট পাইতে হয়। আর সময়ে সময়ে যথেষ্ট সাবধান হওয়া সত্ত্বেও সেই সমস্ত আজগবী ইংরাজী কাগজে ছাপা হইয়া যায়, তাহাতে পাঠকদের মধ্যে বড় হাসির ধুম পড়িয়া যায়! সম্পাদককে এই সমস্ত অসুবিধা সহ্য করিতেই হয়, কারণ ঐ 'রিপোর্টার-দের' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 'রিপোর্টার' পাওয়া যায় না। সুতরাং এই টুকু বেশ নির্ব্বিঘ্নে বলা যাইতে পারে যে, যদি কোন লোক বেশ ভাল ইংরাজী লিখিতে পারেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার সাময়িক-পত্রলেখকের অন্য অন্য গুণগুলিও থাকে, তাহা হইলে তাঁহার এই পদ পাইবার খুব সম্ভাবনা আছে।

চাই, নতুবা তিনি কোনও বক্তৃতারই প্রতি শব্দ তুলিয়া লইতে পারিবেন না।

আর একটি গুণ হইতেছে, সকল বিষয়েই কিছু-না-কিছু জ্ঞান থাকা। কোন লোকই যে বিষয়ের কিছুই জানেনা, সে বিষয়সম্বন্ধে কোন বক্তৃতা নির্ভুলভাবে তুলিতে পারে না। মনে কর, কোন রিপোর্টার ইংরাজী-সাহিত্যসম্বন্ধে একটি বক্তৃতা তুলিতে গিয়াছে, কিন্তু সে না জানে বড় বড় লেখক-লেখিকার নাম, না জানে তাঁহাদের বইগুলির নাম, তাহা হইলে সে সেই বক্তৃতাটি কি নির্ভুলভাবে তুলিতে পারিবে? যে বিষয় জানা নাই, সে বিষয়সম্বন্ধীয় যদি কোন বক্তৃতা কোন রিপোর্টারকে তুলিতে হয়, তাহা হইলে তাহার খুবই চতুর হওয়া দরকার। ধর্ম্ম, রাজনীতি, ভূবিদ্যা অথবা মিউনিসিপালিটি-

Photograph by Johnston and Hoffmann.

"হাবড়া"-ষ্টীমার—সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে গঙ্গার-উপর দিয়া প্রিন্সেপস্-ঘাট-অভিমুখে লইয়া আসিতেছে।

অন্য গুণগুলির মধ্যে একটী গুণ হইতেছে, 'শর্টহ্যাণ্ড' (রেখা-লিপি) জানা। এমন কি যে লোক মিনিটে ৮০ কি ৯০টি শব্দ লিখিতে পারে তাহারও, যে লোক কেবল 'লঙ্‌হ্যাণ্ড' (সাধারণ লিপি) জানে, তাহার অপেক্ষা সুবিধা আছে। কারণ যে লোক রেখা-লিপি জানে না, তাহার অপেক্ষা সে তাহার 'নোটগুলি' তাড়াতাড়ি টুকিয়া লইতে পারে বলিয়া তাহার অপেক্ষা সে অধিকতর নির্ভুলও হইতে পারে। কিন্তু যে রিপোর্টার মিনিটে ১৫০টি করিয়া শব্দ না লিখিতে পারে, তাহাকে রেখালিপিকারক বলিয়া ধরা হয় না। অধিকাংশ বক্তাই মিনিটে ১৫০টি শব্দ বলিয়া বক্তৃতা করিয়া থাকেন। তবে কোন কোন বক্তা মিনিটে ১২০টি শব্দের অধিক জান না, আবার কেহ কেহ মিনিটে ১৮০টি শব্দও উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রতি বক্তাই গড়ে ১৫০ টি শব্দ বলিয়া থাকেন। রিপোর্টারের রেখা-লিপির সাহায্যে মিনিটে ১৫০টি শব্দ-লেখা আয়ত্ত করা

সম্বন্ধে কোন-কিছু কখন্ কোন্ বিষয়ে রিপোর্টারকে বক্তৃতা তুলিতে যাইতে হইবে, তাহা যখন তাহার জানা নাই, তখন তাহার অনেক বিষয়েই যে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। আর যে রিপোর্টার যত বেশী বিষয় জানে, সে তত বেশী যে কাজের লোক হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ দেশে রিপোর্টারদের প্রায়ই বক্তার কাছে গিয়া তিনি যে বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার সারসংকলন করিয়া দিতে অনুরোধ করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, ঐ রিপোর্টারেরা অযোগ্য। বিলাতী রিপোর্টারেরা প্রায়ই তাহাদের ঐ কাজ বক্তাকেই করিতে অনুরোধ করেন না।

সাধারণতঃ রিপোর্টার যে বক্তার বক্তৃতার প্রতি শব্দই তুলিয়া আনিবেন, এ রকম প্রত্যাশা করা হয় না; তাহারা বক্তৃতার সার-সংকলন করিয়া আনিতে পারিলেই যথেষ্ট হয়। ইহাতে রিপোর্টারের

জ্ঞান ও বুদ্ধিই অধিক কাজে লাগে, কিন্তু এদেশের রিপোর্টারদের এই দুইটার অভাব আছে। আমি কি বলিতেছি তাহা তুমি যদি নিজ-অভিজ্ঞতাহইতে বুঝিতে চাও, তাহা হইলে তুমি এক বুধবারের বিকাল-বেলা কলিকাতার মিউনিসিপাল-আফিসে গিয়া একটি বিতর্ক শুনিও। তাহার পর, তাহার পরদিন সকালে কোন খবরের কাগজে সেই বিতর্কের বিবরণীটুকু পড়িও, দেখিবে সেই বিতর্কের অন্তর্গত অনেক প্রয়োজনীয় বক্তৃতা বা বক্তৃতাংশ সেই বিবরণীতে ছাড় পড়িয়াছে এবং সেখানে প্রকৃতপ্রস্তাবে যাহা ঘটিয়াছিল, বিবরণীমধ্যে তাহার অতি অপকৃষ্ট আভাসই পাওয়া যাইতেছে। এইরূপ হইবার প্রকৃত কারণ এই যে, ভারতীয় রিপোর্টারদের মিউনিসিপাল-ব্যাপার জানিবার কোনই আগ্রহ নাই, কোন্ বিষয়টি দরকারী, কোন্ বিষয়টিই বা অদরকারী, তাহাও তাহাদের জানা নাই। ভাল বিলাতী রিপোর্টার খবরের কাগজের একটি স্তম্ভে কোন একটি বিতর্কের যতটা চুম্বক করিয়া দিতে পারে, এদেশের অপকৃষ্ট রিপোর্টারেরা চারিটি স্তম্ভে ততটা দিতে পারে না।

হাইকোর্টের বিচারপতিরা আমাকে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা খবরের কাগজে তাঁহাদের দ্বারা বিচারিত মোকদ্দমাগুলির যে সমস্ত বিবরণী পড়িয়া থাকেন, সেগুলি অনেক সময়েই একেবারে ভুল, এবং লোকের মনে বিপরীত ধারণা জন্মাইয়া দেয়। ইহার কারণ এই, ভারতীয় রিপোর্টারেরা প্রায়ই কোন মোকদ্দমাই বুদ্ধির সহিত অনুসরণ করিয়া উহার যুক্তি ও প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয়-গুলি ফুটাইয়া তুলিতে পারে না।

আমি যাহা যাহা বলিলাম, তাহাহইতে তুমি দেখিতে পাইবে যে, রিপোর্টারের কাজে মনকে প্রচুরপরিমাণে অনুশীলনের অধীন করিতে হয়। যে যুবক অন্য অন্য কাজে অক্ষম হইয়াছে, সে যে রিপোর্টারেরর কাজে উপযুক্ত, এইরূপ মনে করা বড়ই ভুল।

এই সঙ্গে আমার বলা উচিত যে, রিপোর্টারের খুব সৎ হওয়া আবশ্যক। ইংলণ্ডে আমি যখন একটী খবরের কাগজে কাজ করিতাম, তখন কখনও শুনি নাই যে, কোন রিপোর্টার ঘুস লইয়া কোন বিষয়ের বিবরণী খবরের কাগজে দিয়াছে বা দেয় নাই। বিলাতের খুব গরীব রিপোর্টারও অসৎ উদ্দেশ্যে দেওয়া কোন উপহার ঘৃণার সহিত ফিরাইয়া দেন। আমার মনে আছে, একবার একটি মোকদ্দমায় একটী লোকের নাম ছিল বলিয়া তাহার নামটি যাহাতে উঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহার জন্য সে একজন রিপোর্টারকে একটী মোহর দেয়। আমি বলিতে দুঃখিত হইতেছি যে, সেই রিপোর্টারের বড় মুখ-খারাব করা অভ্যাস ছিল, কিন্তু সেই মোহরটি যখন তাঁহাকে দেওয়া হয়, তখন তিনি তাহা উহার অধিকারীর মাথা লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া-মারিয়া তাঁহার সেই কুস্বভাবের উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন!

ভারতবর্ষে ঘুষ দেওয়ার বদ্ অভ্যাসটা বড় বেশী; আর আমি (একজন সাহিত্যসেবী) বলিতে লজ্জিত হইতেছি যে, সেই ঘুষগুলি যাহাদের দেওয়া হয়, তাহারা প্রায়ই লইয়া থাকে, এবং এমন কি কখন কখন না দেওয়া হইলে, চাওয়াও হয়। ইহা এই উপ-জীবিকার পক্ষে বড়ই লজ্জার বিষয়। যখন উদার-চরিত্র যুবকেরা বুঝিতে পারিবে যে, সাহিত্যসেবীর দায়িত্বপূর্ণ কাজে সাধারণের বিশ্বস্তভাবে সেবা করিবার প্রচুর সুযোগ পাওয়া যায়, তখনই এই কু-অভ্যাস দূর হইবে। উত্তম সাহিত্যসেবী হইতে হইলে বিশ্বস্ত ও শ্রদ্ধেয় হওয়া চাই। তাঁহাকে অনেক লোক অনেক গোপনীয় কথা বলিয়া থাকেন, সেই সকল কথা অপরের কাছে বলা তাঁহার উচিত নহে। তিনি এমন অনেক জিনিস দেখিবেন বা শুনিবেন, যাহা দোষী লোকে তাঁহাকে কাগজে তুলিতে নিষেধ করিবে, কিন্তু তাহা তাঁহার রিপোর্ট করাই উচিত।

রিপোর্টারের বেতন একশত টাকাহইতে দুইশত টাকা-পর্য্যন্ত হয়। কিন্তু যোগ্য রিপোর্টারে অতিরিক্ত কাজ করিয়া আরও কিছু রোজগার করিতে পারেন। তাহা-ছাড়া বুদ্ধিমান ও নির্ভুল রিপোর্টারের সহকারী-সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হইবার সর্ব্বদাই সম্ভাবনা থাকে। কারণ তিনি যদি নিজের কাজ ভাল করিয়া করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি যে অপরের কাজ-সংশোধন করিবার উপযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি আশা করি, তুমি সাহিত্যসেবী হইবে কি না, এ বিষয়ে তোমার মনস্থির করিবার সাহায্যার্থে, আমি তোমাকে যথেষ্ট কথা বলিয়াছি। "বালকের" কোন এক ভবিষ্যসংখ্যায়, যদি তুমি অনুরাগ দেখাও, তাহা হইলে আরও অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

(জনৈক প্রাচীন সাময়িকসাহিত্যসেবী।)

Published by Rev. J. M. B. Duncan, M.A., B.D., 23, Chowringhee Road, Calcutta, and
Printed by Rakhal Chandra Bhattacharyya, Banerjee Press, 59, Pataldanga Street, Calcutta.

বালক

১ম বর্ষ] মার্চ্চ, ১৯১২। [৩য় সংখ্যা

কনানার বল্লম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পরদিন সূর্য্যাস্তের অল্প পূর্ব্বে কনানা বহুদূরস্থিত হোরেব-পর্ব্বতের "অভ্রভেদী" চূড়া দেখিতে পাইলেন।

হোরেবপর্ব্বতের চূড়া দেখিতে পাওয়াতে তাঁহার সাহস বাড়িল। পর্ব্বতের শিখরদেশে হারোণের শ্বেতবর্ণ সমাধিস্তম্ভ, নীলকৃষ্ণ আকাশে চন্দ্রোদয় হইয়াছে, চন্দ্রালোকে উক্ত শ্বেতবর্ণ সমাধিস্তম্ভ "ধবলগিরির" চূড়ার মত ঝকমক্ করিতেছে। কনানা সেই স্তম্ভ-লক্ষ্য করিয়া অবিশ্রামে পথ চলিতে লাগিলেন।

কনানা কোথায়ও বিশ্রাম করিলেন না। অবশেষে এক ঝর্ণার ধারে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। এই ঝর্ণা হোরেবপর্ব্বতের এক স্থানহইতে নির্গত হইয়া, অল্পদূর বহিয়া গিয়াই বালুকারাশিতে বিলুপ্ত হইয়াছে। কনানা এই ঝর্ণার জলে স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া জলের ধারে শুইয়া পড়িলেন। ভোরের বেলা তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল। ভোরের সময়ে এই স্থানের বাতাস অত্যন্ত শীতল—আমাদের হরিদ্বারের শীতল বায়ুর মত শীতল।

এক্ষণে পথবাহী লোকদের নিকটহইতে কেবল কিছু কিছু জানিয়া লওয়া আবশ্যক, আর কিছু করিবার নাই, একটু পরেই সূর্য্যোদয় হইবে, এখন প্রাতঃকালের নামাজ পড়িবার সময়। যতক্ষণ সূর্য্যোদয় না হয়, ততক্ষণ তিনি ঝর্ণার তীরে পাইচারি করিয়া শীত ভাঙ্গিতে লাগিলেন। ঝর্ণার তীরবর্ত্তী স্থানও নীলবর্ণ আকাশের ন্যায়, নানা জাতীয় লতাতে নীলবর্ণ।

হাঁটিতে হাঁটিতে কনানা অকস্মাৎ স্থগিত হইলেন ও পশ্চাৎ হটিলেন। তাঁহার চক্ষু বাষ্পভরে ছলছল করিতে লাগিল, হাত কাঁপিয়া উঠিল, অজ্ঞাতসারে হাতের পাঁচনী মাটীতে পড়িয়া গেল। তিনি উবুড় হইয়া পড়িয়া সেই স্থানটী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন।

এ কি! এইস্থানের নানা দাগ দেখিয়া বোধ হইল, পশু-পাল লইয়া পথিকের কোন দল এইস্থানে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়াছিল। উটেরা যেখানে যেখানে শুইয়াছিল, সেই সেই স্থানের ঘাস চাপ পাইয়া মাটীতে বসিয়া গিয়াছে, এবং খুঁটীতে বাঁধা উটেরা যতদূর গলা বাড়াইতে পারিয়াছে ততদূর কতকটা কতকটা ঘাস খাইয়াছে, দাগ দেখিয়া তাহাও টের পাওয়া গেল।

পশুপাল লইয়া পথিকেরা সর্ব্বদাই হোরেব-পর্ব্বতের ছায়াতে দিবাভাগে বিশ্রাম করিয়া থাকে। অতএব পথিকেরা যে এখানে বিশ্রাম করিয়া চলিয়া গিয়াছে, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পথিকেরা এদেশে রাত্রিকালেই পথ চলে, রাত্রিকাল শীতল বলিয়া নয়, কিন্তু যার-পর-নাই ক্ষুধিত হইলেও রাত্রি-কালে উটেরা কিছু খায় না, ঘাসেও মুখ দেয় না। দিবাভাগে বিশ্রাম করিলে উটেরা অবাধে দানা-ঘাস খাইতে পায়, তাই লোকে রাত্রে পথ চলে ও দিনের বেলা বিশ্রাম করে।

কনানা মুহূর্ত্তমধ্যে আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মুখমণ্ডল অতিপ্রফুল্ল, কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে মুখশ্রী যেমন হয়, তেমনি সন্তোষপূর্ণ।

একস্থানের ঘাস সমান কাটা নহে। এক-একখাবলের মধ্যস্থলে গাছকতক করিয়া ঘাস রহিয়া গিয়াছে। একটা উট যেখানে শুইয়াছিল, সেখানকার চাপা ঘাসের উপর একদিকে মধুমক্ষিকারা আসিয়া বসিয়াছে। অন্যদিকে বিস্তর পিপীলিকা জমিয়াছে। এইখানে যে উটটা শুইয়াছিল, সেটার সম্মুখের পা

পেটের তলে গুটান ছিল না, সম্মুখের দিকে বাড়ান ছিল; ঘাসে দাগ দেখিয়া ইহা জানিতে পারা গেল।

এই সকল দেখিয়া আরব-বালক কনানা বুঝিতে পারিলেন যে, এই উটটা বুড়া, ইহার সম্মুখের বাম পা খোঁড়া, ইহার মুখে সম্মুখের একটা দাঁত নাই, এবং ইহার পিঠের একদিকে চামড়ার থলিয়া-ভরা মধু ও অন্যদিকে নদীর আঁটালিয়ামাটীর গুঁড়া ছিল। এই গুঁড়া দিয়া লোকে একপ্রকার রং তৈয়ার করে।

কনানা ভাবিলেন, তবে এইখানে যে উটটা শুইয়াছিল সেটা আমাদের সেই বুড়া উট, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন যে, রসিদ বরকত এই সকল উট-চুরি করিয়া, গত পূর্ব্বরাত্রে হোরেবপর্ব্বতহইতে যাত্রা করিয়া দক্ষিণ-দিকে গিয়াছে।

উৎসাহে তিনি উৎফুল্ল হইলেন, বলিলেন, "ঘণ্টাদশেকমাত্র হইল আমার ভাইকে ও শাদা উটটিকে লইয়া ডাকাইতেরা এখান-হইতে হয় মক্কা নয় মদিনার দিকে গিয়াছে," এই ভাবিতে ভাবিতে তিনি পাচনীগাছটা খুব কসিয়া ধরিলেন।

কনানা সহাস্যমুখে বলিয়া উঠিলেন, "ঐ সকল কাড়িয়া লইতে হইবে, যদি না পারি ত আমি কাপুরুষ!"

এইস্থানে তিনি মুহূর্ত্তকাল নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার চক্ষু আপনি দক্ষিণদিকে ফিরিল। স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, এ অতিকঠিন সমস্যা। পিতার কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছিলেন, "রসিদ বরকত আগুন আর তুমি পতঙ্গ। রসিদ বরকত ঘূর্ণা বাতাস, আর তুমি একগাছা নলমাত্র!" এই কথা-গুলি মনে পড়াতে তাঁহার জিদ্‌ ও সাহস বাড়িল।

প্রথমেই তাঁহাকে যাহা করিতে হইল, তাহাতে তেমন সাহসী লোকেরও বুক কাঁপে; তবু তাহা এক অতিমহৎকার্য্যের ভূমিকামাত্র।

কনানা এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "আমি ভাইকে উটসমেত উদ্ধার করিব, না পারি ত বেনিসৈয়দ-সমাজে কাপুরুষ বলিয়া লোকে ডাকিলে ঘাড় পাতিয়া থাকিব।" অনন্তর প্রাচীন হোরেবপর্ব্বতের গা বহিয়া, যেখানে হারোণের সমাধিস্তম্ভ, সেইদিকে উঠিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন, এই স্থানহইতে সমুদ্রবৎ বালুকাময়ী মরুভূমি বহুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

হয়ত এখানহইতে দৃষ্টি করিলে এমন কোন কিছু চক্ষে পড়িতে পারে, যাহা লক্ষ্য করিয়া গেলে রসিদ বরকতের কারাভানকে গিয়া ধরিতে পারা যাইবে।

৪

প্রতিজ্ঞা

পথ খুঁজিতে গিয়া সময় নষ্ট না করিয়া, কনানা হোরেবের বন্ধুর গা বহিয়া বরাবর উঠিতে লাগিলেন। কোনদিকে দৃষ্টি বা কর্ণপাত করিলেন না। কতক্ষণে পর্ব্বতের চূড়াদেশে গিয়া উঠিবেন, ইহাই তাঁহার লক্ষ্য। ভাবিয়াছিলেন যে, এখনও হয়ত সেখান-হইতে রসিদ বরকতের কারাভান দেখিতে পাইবেন।

সে সকল উট খুব বড়, বলবান ও পরিশ্রমে ক্লান্ত হয় নাই, জোরে হাঁকাইয়া লইয়া গেলে, সেগুলিও ঘণ্টায় একক্রোশের অধিক পথ চলিতে পারে না। প্রায় ঘণ্টাদশেক হইল, আরব-ডাকাইত রসিদ বরকত পর্ব্বতের তলাহইতে রওয়ানা হইয়াছে বৈ ত নয়, তায় আবার কতকগুলি উট বড় বৃদ্ধ ও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাই কনানা সেই দস্যুদলকে পর্ব্বতের চূড়াহইতে দেখিতে পাইবার আশা করিলেন। এ দুরাশামাত্র, তবু কনানা ভাবিলেন, এত বড় দল হয়ত দেখিতে পাওয়া যাইবে।

হাত-পায়ের বলে ও কৌশলে যত শীঘ্র পারিলেন, কনানা পাহাড়ে উঠিতেই লাগিলেন। এখন আর প্রাতঃকালের শীতল বাতাস নাই। এ এক চমৎকার স্থান ও চমৎকার দৃশ্য, কিন্তু তিনি এখানকার দৃশ্য দেখিবার জন্য আর এদিক-সেদিক তাকাইলেন না। এমন কি, পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে মরু-প্রান্তরের দিকেও একবার চাহিলেন না। পাহাড়ের উচ্চ চূড়া এখন আর বেশী দূরে নহে, প্রায় কাছে আসিয়াছেন। হারোণের স্তম্ভপর্য্যন্ত যাওয়া তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য, সুতরাং নীচের দিকে আর তাকাইবার অবসর হইল না।

পাহাড়ে উঠিবার সময়ে কেবল উপরদিকে হারোণের সমাধি-স্তম্ভের দিকেই কনানার দৃষ্টি ছিল, যদি আশে পাশে তাকাইতেন, কোথায় কি ঘটিতেছে দেখিতে পাইতেন। বিশেষতঃ যে ঝর্ণার ধারে তিনি রাত্রিযাপন করিয়াছেন, এবং যেস্থানহইতে পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করেন, একটু পরেই যে পাঁচজন অশ্বারোহী আরব সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেন।

ইহারা মুসলমান-সিপাহী, যুদ্ধের সজ্জায় সম্পূর্ণ সজ্জিত। আরব-দেশের উত্তর-সীমান্তপ্রদেশে রণজয়ী মুসলমানেরা ইশ্মায়েলের জয়পতাকা-স্থাপন করিতেছিল; ফলতঃ এই সিপাহীরা সেই অঞ্চল-হইতে আসিয়াছিল।

এই অশ্বারোহীরা অতিবেগে আসিয়াছে, তাই নিজেরা ও অশ্বগণ অতিশয় ক্লান্ত। তাহারা ব্যস্তভাবে ঝর্ণার দিকে আসিল। সঙ্গে যে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য ছিল, তাড়াতাড়ি তাহাই আহার

করিল, এবং সম্মুখের পায়ে শিকল বাঁধিয়া ঘোড়াগুলিকে ছাড়িয়া দিল, শিকলের একদিক্ এক-একজনের কাছে আটকান রহিল। এরূপ করিলে নিজেরা নিদ্রা গেলেও সহজে চোরে ঘোড়া লইয়া যাইতে পারে না।

এই সকল করিয়া সিপাহী কয়জন কাপড়ে গা ও মুখ ঢাকিয়া ঘাসের উপর শুইয়া পড়িল।

এই লোকেরা যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিতে বিলক্ষণ পটু, আর ভাবগতিক দেখিয়াই বোধ হইল, ইহারা কোন দরকারি কাজের জন্য কোথাও প্রেরিত হইয়াছে; ফলে, বিনা দরকারি কাজের অনুরোধে আরবদেশীয় লোকেরা কখন কোন বিষয়ে ত্রস্ত হয় না।

কনানার হারোণের সমাধি-মন্দির পর্য্যন্ত পঁহুছিবার আগেই এই লোকেরা ঘোর নিদ্রায় মগ্ন হইল, এবং ঘোড়াগুলি শুইয়া শুইয়া, উটের মত গলা বাড়াইয়া আশে পাশে ঘাস খাইতে লাগিল।

কনানা হাঁপাইতে হাঁপাইতে ও ব্যস্ততাপ্রযুক্ত কাঁপিতে কাঁপিতে হারোণের সমাধি-মন্দিরে আসিয়া পঁহুছিলেন। মন্দিরটীতে, দক্ষিণ-ভারতের বড় বড় মন্দিরের "গোম্বুজের" মত, সাদা পাথরের থামের উপর সাদা ছাদ স্থাপিত,—হোরেবপর্ব্বতের চূড়ায় চিরস্থায়ী বরফরাশি যেমন।

দক্ষিণে বামে থাম রাখিয়া কনানা অগ্রসর হইলেন। আকাশের দিকে চাহিয়া দিক্-নির্ণয় করত দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে একমনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

চারিদিকেই বালুকারাশি, সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় সারি সারি বালিয়াড়ি পাহাড়ের মত শোভা পাইতেছে। অনেকদূরে কতক-গুলি ছোট ছোট পাহাড় বা টিলা, এবং হরিদ্বর্ণ বৃক্ষাদি। কনানা দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন, ঝর্ণার ধারে সেগুলি খেজুর-গাছ। কিন্তু অনেক করিয়া নিরীক্ষণ করিলেও রসিদ বরকতের কারাভানের বিন্দু-বিসর্গও দেখিতে পাইলেন না।

তিনি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেই লাগিলেন, এমন সময়ে পূর্ব্ব-আকাশ ভেদ করিয়া প্রাতঃ-সূর্য্য-রশ্মি দেখা দিল। পর্ব্বতের পাদমূলস্থ হরিদ্বর্ণ প্রদেশ আলোকিত করিয়া আগেই সূর্য্যরশ্মি হোরেবের ধবল-চূড়া কাঞ্চনবর্ণ করিয়া তুলিল।

এই সূর্য্যালোকে হারোণের শ্বেতবর্ণ সমাধি-মন্দিরও উজ্জ্বল হইল।

চিন্তামগ্ন কনানা গোপুরের নিতান্ত ধারে দাঁড়াইয়া আছেন। এক হাতে পাচনী ধরিয়াছেন, অপর অন্য হাত মেলিয়া সূর্য্যালোক-হইতে চক্ষু আবৃত করিয়াছেন

ব্যগ্রতাপ্রযুক্ত অগ্রসর হইবার অভিপ্রায়ে যেন এক পা বাড়াইয়া দিয়াছেন, এবং একটু বাঁকাও হইয়াছেন, বোধ হইল যেন লম্ফ দিয়া নীচে পড়িতে উদ্যত।

বড় একখানা কাপড় জড়াইয়া কনানা মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়াছেন, আবার উষ্ট্রের লোমজাত দড়ি দিয়া তাহা বাঁধিয়াছেন; কাপড়খানির এককোণ কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, আর দুইকাঁধের উপর দুইকোণ পড়িয়াছে। মেষের চামড়া সিলাই করিয়া গায়ের জামা করিয়াছেন। কি শীত কি গ্রীষ্ম-কালে, কি রৌদ্রে, কি বৃষ্টিতে, সকল সময়ে বেদুইন-রাখালেরা এইপ্রকার জামা গায়ে দেয়। মেষচর্ম্মের জামা পরিলে শরীরে সূর্য্যের উত্তাপ বা শীতকালের ঠাণ্ডা লাগিতে পায় না।

কনানার পাদুখানি বড় সুন্দর, এই সুন্দর খালি পায়ে তিনি মন্দিরের শাদা ছাদে দাঁড়াইয়াছেন, একহাতে পাঁচনী ধরিয়াছেন, হাতের শিরাগুলি দেখিলে ডনগির পালোয়ানেরও হিংসা হয়।

তাঁহার শ্মশ্রুবিহীন মুখমণ্ডল মলিন হইয়াছে বটে, কিন্তু হৃদয়ের ব্যগ্রতাজনিত গণ্ডদেশের যে উজ্জ্বলতা, সে মলিনতা তাহা ঢাকিয়া রাখিতে পারে নাই। বড়ই তাড়াতাড়ি পাহাড়ে উঠিয়া আসিয়াছেন বলিয়া এখনও গভীর ঘন-নিশ্বাস বহিতেছে।

তাঁহার ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত। চক্ষুদুটি ছল ছল করিতেছে। যে হাতখানি কপালে চক্ষুর উপর, তাহা একটু সরিয়া গিয়াছে, যেন দূরবর্ত্তী পাহাড়ের মধ্যদিয়া, খেজুর-বনের ছায়াভেদ করিয়া, আরও দূরে কিছু আছে কিনা, দেখিতে চেষ্টা করিতেছেন।

সূর্য্য ক্রমে উচ্চে উঠিল। বালক-ইশ্মায়েলীয়ের উপরে সূর্য্য-কিরণ পড়িল। এক্ষণে সকালবেলার "নামাজ" পড়িবার সময়। এই সময়ে সকল দেশেই মসজিদে "লা ইল্লাহা ইল্ আল্লা মহম্মদ রসুল ইল্ আল্লা" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে "আজান" দেওয়া হয়। কনানার এস্থানে আজানের দরকার নাই। প্রাতঃসূর্য্যই তাঁহার আজান। তিনি যেজন্য এত দূর আসিয়াছেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া, পাঁচনী একপাশে রাখিয়া ভক্তিভাবে মক্কার দিকে মুখ করিয়া প্রাতঃকালের নামাজ পড়িলেন।

কনানা সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং দুইহাতের পাতা দুই কাণের কাছে রাখিয়া ভক্তিভাবে "বুস্মি আল্লা ঔলহামদ্দা" বলিয়া নামাজ আরম্ভ করিলেন। আবার হাতদুইখানি আড়ে আড়ে বুকের উপর রাখিয়া প্রার্থনার বচন আওড়াইতে লাগিলেন। আবার হাঁটু পাতিয়া মেঝিয়ায় বসিয়া হাতদুইখানি হাঁটুর উপরে রাখিলেন। অনন্তর হাতদুইখানি মাটীতে রাখিয়া উবুড় হইয়া মাটীতে কপাল রাখিয়া নামাজ-শেষ করিলেন।

তিনি অনেকক্ষণ প্রণত অবস্থায় রহিলেন, এবং যে কার্য্যে হাত দিয়াছেন, সে কার্য্য-উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের কাছে বল ও উৎসাহ-ভিক্ষা করিলেন।

প্রাতঃকালের এই নিতান্ত নিঃশব্দ পর্ব্বতশিখরে এক অতি আশ্চর্য্য, হৃদয়স্পর্শী গম্ভীর ভাব ছিল। কনানার যেন বোধ হইল, কাণ পাতিয়া থাকিলে ঈশ্বরের "তথাস্তু" রব শুনিতে পাইবেন।

অকস্মাৎ এই নিস্তব্ধভাব দূর হইল। কনানা উচ্চ চীৎকার-শব্দ ও আর্ত্তস্বর শুনিতে পাইলেন।

যে রব শুনিবার জন্ত তিনি কাণ পাতিয়া ছিলেন, এ ত ঈশ্বরের সে রব নহে। কনানা অমনি উঠিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন।

আরবদেশের পর্ব্বতসকল বেশী উচ্চ নহে। প্রকৃত পর্ব্বতের সঙ্গে তুলনা করিলে হোরেবপর্ব্বত আসামদেশের একটা বড় টিলা-মাত্র। এই প্রথমবার কনানা পাহাড়ের নীচের দিকে তাকাইলেন। সেই ঝর্ণা ও ঝর্ণার তীরস্থ লতা-পাতা সমস্ত তাঁহার চক্ষে পড়িল। আর যে পাঁচজন সিপাহি কম্বল গায়ে ও মাথায় দিয়া একটু আগে ঝর্ণার তীরে শুইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগকেও দেখিতে পাইলেন।

কিন্তু এক্ষণে যাহা দেখিলেন, তাহা অতিভয়ঙ্কর, অতি-শোচনীয়। সেই পাঁচজন সিপাহি এখনও সেইখানে পড়িয়া আছে, কিন্তু আর নিদ্রিত নহে। তাহারা হয় মরিয়া গিয়াছে, না হয় আধ-মরা অবস্থায় পড়িয়া আছে। তিন-জন বেদুইন ডাকাইত ঘোড়া চুরি করিবার জন্য আসিয়াছিল, কিন্তু সিপাহিরা জীবিত থাকিতে ঘোড়া কেমন করিয়া চুরি করিবে? তাই লুকাইয়া আসিয়া ডাকাইতেরা প্রথমে নিদ্রিত সিপাহিদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল।

আরবদেশে এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটিয়া থাকে বটে, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে এপ্রকার ঘটনা কনানার চক্ষুতে কখনও পড়ে নাই। লোক-দের গায়ের যে সকল কাপড় মনে ধরিল, ডাকাইতেরা সে সকল খুলিয়া লইতে লাগিল, কনানা গোপুরের উপরহইতে এই সকল কাণ্ড দেখিয়া ভয়ে একপ্রকার স্পন্দরহিত হইলেন। অবশেষে ডাকাইতেরা মৃত লোকদের অস্ত্রশস্ত্র লইল, এবং তিনজনে তিনটী ঘোড়ায় চড়িল, অপর দুইটী ঘোড়াকে বাঁধিয়া তাড়াইয়া লইয়া উত্তরদিকে ছুটিল।

Photo by Johnston & Hoffmann.

অশ্বপৃষ্ঠে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ।

এই হতভাগ্য লোকদিগের কোনপ্রকার উপকার করিবার কনানার সাধ্য নাই। তিনি যে লোকদিগের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন, তাহারা একরাত্রির পথ আগে গিয়া পড়িয়াছে। কোন কারণে দণ্ডেককাল বিলম্ব হইলে এই প্রচণ্ড রৌদ্রে, উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া বেগে হাঁটিয়া নষ্ট সময়টুকু উদ্ধার করিতে হইবে। রক্তমাংসবিশিষ্ট মনুষ্যদেহে এ কষ্ট সহ্য হয় কি না সন্দেহ।

তিনি ভয়বিহ্বল হইয়া এই দারুণ দৃশ্যহইতে চক্ষু ফিরাইয়া, পর্ব্বতহইতে নামিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে না দেখিতে তিনি নামিয়া সেই ঝর্ণার তীরে আসিলেন, এবং যেস্থানে ঐ পাঁচজন লোকের দেহ পড়িয়াছিল, সেই স্থানের খুব নিকট দিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি দৌড়াইলেন না, কিন্তু সম্মুখদিকে দৃষ্টি-স্থির করিয়া দ্রুতপদে চলিলেন।

এমন সময়ে একটা শব্দ কাণে আসিল। তিনি চমকিয়া উঠিয়া পাচনী কসিয়া ধরিলেন, এবং ফিরিয়া এদিক-ওদিক দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, ভাবিলেন, ডাকাইতেরা আমাকে দেখিতে পাইয়া হয়ত ফিরিয়া আসিয়াছে। না, ডাকাইত নয়, একজন আহত সিপাহী। ডাকাইতেরা মনে করিয়াছিল, সে মরিয়া গিয়াছে; সে এক্ষণে কনুইতে ভর দিয়া একটু উঠিয়া কনানাকে ডাকিতেছিল।

"জল, জল! আল্লার নামে একটু জল দাও।" অতি কষ্টে এই কথা কয়টী বলিয়া বেচারা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেল।

শুনিয়া কনানা ভাবিলেন, থাকুক গে, আমি যাই। লোকটার কাছে যাইবার মন হইল না। গমন-পথে বিলম্ব করিবারও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কেহ যেন তাঁহার কাণে কাণে কোরাণের এই প্রতিজ্ঞাবাণীটি কহিল,—"যে জন দুঃখার্ত্তকে দয়া করে, এমন কি, যে জন পিপাসার্ত্তকে একগণ্ডুষ জল দেয়, ঈশ্বর তাহাকে পুরস্কার দিবেন।"

হোরেবপর্ব্বতের এই জনশূন্য তলদেশে বেদুইন-বালক কনানা সাহসে ভর করিয়া ফিরিলেন, এবং কোমরে কাষ্ঠের যে করঙ্ক ছিল, তাহাতে করিয়া ঝর্ণাহইতে জল আনিয়া আহত সিপাহীর শুষ্ক-কণ্ঠে ঢালিয়া দিতে লাগিলেন।

আহত ব্যক্তি একটু চেতনা পাইয়া কাতরস্বরে কহিল, "ধন্য ঈশ্বর; আর একটু জল দাও, বাবা।"

কনানা তড়িৎ-বেগে ঝর্ণাহইতে আবার করঙ্ক ভরিয়া জল আনিলেন, কিন্তু লোকটী হাঁ করিল না, মাথা নাড়িল মাত্র। তাহার প্রাণ-পাখী পলাই পলাই করিতেছে। কে জল খাইবে?

সে অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। অবসন্ন ইন্দ্রিয়সকলকে বশে আনিবার জন্য ভয়ানক হাঁইফাঁই করিতে লাগিল। বোধ হইল, আসন্ন-মৃত্যুকে তাড়াইয়া দিল বা।

তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, মনে যেন কোন গুরুতর কথা জাগিতেছিল, তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। সে কনুইতে ভর দিয়া কনানার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল—

"তুমি ছেলেমানুষ, এখনও দাড়ি-গোঁপ দেখা দেয় নাই। কিন্তু দেখিতেছি, তুমি আরব। যা বলি, শুন। সম্রাট হারক্লিসের পুত্র রাজকুমার কন্‌স্তান্তিন্ বনের পাতার ন্যায় ও মরুদেশের বালির ন্যায় অগণ্য তুর্কী, গ্রীক ও রোমক সৈন্যসামন্ত লইয়া কনস্তান্তিনোপলহইতে আসিতেছেন। আরবজাতিকে ধরাতলহইতে উৎসন্ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কালিফ উমর এক্ষণে মক্কায় আছেন, তাঁহাকে এই সংবাদ দিয়া সাহায্য চাহিবার জন্য আমরা চিঠি লইয়া মক্কায় যাইতেছিলাম। এই চিঠি তাঁহাকে দিতে না পারিলে আরবদেশ উৎসন্ন হইবে, এবং বিশ্বাসী মুসলমানেরা নির্ম্মূল হইবে। এখন উপায়?"

কনানা ভয়হেতু কথা কহিতে, এবং ব্যাপারটা যে কি, তাহাও সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না, কেবল মাথা নাড়িলেন।

লোকটা আবার বহুকষ্টে কনুইতে ভর দিয়া থাকিয়া কাপড়ের ভিতরহইতে একখানি চিঠি বাহির করিল, করিয়া বলিল—"দোহাই আল্লার, এই চিঠি লইয়া অবিলম্বে মহান্ কালিফের কাছে তোমায় যাইতে হইবে।"

(ক্রমশঃ।)

"হকী"।

বিলাতে যত রকম 'মেঠো' খেলা আছে, তাহার মধ্যে হকীই সবচেয়ে সেকেলে ও একেলে। এই খেলাই সবচেয়ে সেকেলে, কারণ, দেখা যায়, ইহাই ব্রিটিস দ্বীপপুঞ্জের সব জায়গায় আদিকালহইতে খেলা হইতেছে; আর ইহাই সবচেয়ে একেলে খেলা, কারণ, কুল্যে গত কুড়িবৎসরহইতেই ইহা আবার লোকপ্রিয়ভাবে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেখানে খেলা আরম্ভ হইয়াছে। আজকাল বিলাতের হাজার হাজার লোক এই খেলা খেলে, আর ইউরোপের অনেক দেশেও এই খেলা প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু আজপর্য্যন্ত অন্য কোন দেশের হকী-খেলোয়াড়েরা বিলাতের হকী-খেলোয়াড়দের হারাইতে পারে নাই।

যাহা হউক, এই খেলা এদেশের পক্ষে কতদূর উপযোগী আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ তাহাই। এই গুরুতর শারীরিক শ্রমসাধ্য খেলাটি যে এ দেশের পক্ষে খুব উপযোগী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ ইহা বৎসরের সকল ঋতুতেই খেলা যাইতে পারে এবং যে মাঠ নেড়া সে মাঠে যেমন খেলা যায়, যে মাঠে ঘাস আছে সে মাঠেও তেমনই খেলা যায়। তা'ছাড়া ফুটবল-খেলায় যেমন মস্ত মস্ত আছাড় খাইবার ভয় আছে, এ খেলায় তেমন আছাড় খাইবার ভয় তত নাই। তবে ফুটবল-খেলা একপক্ষে হকীর চেয়ে ভাল, কারণ তাহাতে ছেলেদের যত সাহস ও সহ্য করিবার শক্তি জন্মায়, হকী খেলিলে তত জন্মায় না। তা'হউক, এই খেলাই ভারতবর্ষের ছেলেদের অবস্থার উপযোগী। আরও একটা কথা এই যে, এই খেলায় জিতিতে হইলে যত চটপটে ও ছুটিয়ে হওয়া দরকার, তত ভারী ও গায়ে জোর থাকা দরকার নয়; তাই ভারতবর্ষীয়দের এই খেলায় ইউরোপীয়দের না হারাইবার কোনই কারণ নাই।

হকী-খেলা শেখা খুব সহজ। বিশেষতঃ যাহারা "এ্যাসোসিয়েসন ফুটবলের" নিয়মগুলি ও সেই সঙ্গে ক্রিকেটের ব্যাট্ ধরিতে জানে তাহাদের পক্ষে এ খেলা খুবই সহজবোধ হইবে। কিন্তু যাহারা এই খেলা বেশ বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে খেলিতে চায়, তাহাদিগকে এই দুইটী কাজ করিতে হইবে—

প্রথমতঃ, তাহাদের ভাল 'টীমের' বিশেষতঃ কোন ভাল খেলোয়াড়ের খেলিবার ধরণগুলি ও ধরণটি দেখিয়া শিখিয়া লইতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, তাহারা নিজেরা আপনা-আপনি (আর একজন সঙ্গীর সঙ্গে হইলে আরও ভাল হয়) হকীর ছড়ি দিয়া বল্-মারা অভ্যাস করিবে।

হকীর ছড়ি ধরিতে হইলে প্রথমতঃ মনে রাখা উচিত যে, দুই হাতদিয়া উহার হাতল ধরিতে হয়। হকীর ছড়ি কিছুতেই এক হাতদিয়া ধরা উচিত নয়। যে খেলোয়াড় একহাতদিয়া হকীর ছড়ি ধরে, সে না পারে বল্ সাম্‌লাইতে, না পারে শত্রুর বল্‌কাড়া ঠেকাইতে। হাতলে হাতদুইটী খুব ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া রাখা উচিত, আর যতক্ষণ না বল্‌টি মারা শেষ হয়, ততক্ষণ বলের পিছনদিকে খর-দৃষ্টি রাখা উচিত।

প্রথমে বল্ 'ড্রাইভ' করিতে অর্থাৎ তাড়াইতে শিখিতে হয়। 'ফর্‌ওয়ার্ড' (আগের খেলোয়াড়) হউক বা 'ব্যাক্' (পিছনের খেলোয়াড়) হউক, সকলেরই উহা শিখা দরকার। ছড়ি কাঁধের উপরে উঠাইবার নিয়ম নাই বলিয়া বল্-ড্রাইভ্ করিতে হইলে কনুই-অবধি হাতটুকু ও কব্জি দিয়াই করিতে হয়। বল্ মারিবার উদ্যমের সময়ে ছড়ি উরু-সন্ধি (কুঁচ্‌কী) কিম্বা উহার অপেক্ষা একটু উঁচু পর্য্যন্ত তুলা যাইতে পারে এবং বলে আঘাত করা হইলে পর, ছড়িগাছটা যাহাতে উরু-সন্ধির উপরে না উঠিয়া বেশ অবাধে অর্দ্ধচক্রের আকারে ঘুরিয়া বা দুলিয়া যাইতে পারে এমনভাবে

উহাকে চালান চাই। যাহাতে ছড়ি উপরে না উঠিয়া পড়ে, তাহার জন্য বল্ মারিয়াই হাত ও কব্জি ডা'ন-দিক্‌হইতে বাঁদিকে চট্ করিয়া মুচ্‌ড়াইয়া লওয়া উচিত। 'আণ্ডারকাটিঙ্‌' অর্থাৎ বল্ উৎক্ষিপ্ত করিবার (উঁচুতে উঠাইবার) অভিপ্রায়ে ছড়ি কাৎ করিয়া বল্-মারা একেবারে বারণ, যদি ছড়ি সোজা করিয়া বল্-মারা হয়, তাহা হইলে ও দোষ হইবে না।

বল্-ড্রাইভ্ করিতে শিখার পর, 'রিভার্স' অর্থাৎ উল্‌টা-বল্-মারা শিখিতে হয়। এই বল্ মারিতে হইলে হকীর ছড়ির বাঁকাদিক্‌টার ডগাটুকু নিচের দিকে রাখিয়া খেলোয়াড়কে বাঁদিক্‌হইতে ডা'নদিকে বল্‌টি রিভার্স বলের মত করিয়াই মারিতে হয়, কিন্তু একহাতদিয়া। যদি কোন 'হাফ্ ব্যাক্' প্রতিপক্ষ-ফর্‌ওয়ার্ডের বল্‌টি, তাহাকে অনুচিতরূপে বাধা না দিয়া, কাড়িয়া লইতে চায়, তাহাহইলে কাট্ করা শেখা তাহার খুবই দরকার। ফর্‌ওয়ার্ডেরা যখন বল্ ড্রিবল্ করিয়া লইয়া যায়, তখনও কাট্ করা তাহাদের খুব কাজে লাগে, কিন্তু তাহারা কাট্ করিবার ছুতায় যেন প্রতিপক্ষকে অনুচিতভাবে বাধা না দেয় অর্থাৎ যেন তাহার ও বলের মধ্যে গিয়া না দাঁড়ায়। উহার পর আর একটিমাত্র বল্-মারা শেখা দরকার। এই বল্-মারাকে 'জব্' বলে। এই বল্-মারা খুব কাজে লাগে; কিন্তু কলিকাতায়

Photo by P. Bo

রেঞ্জার্স হকী টীম।

এই টীম ১৯১১ সালে এই কাপ্ পাইয়াছেন।

কেবল কলিকাতা-'ক্লাবের' দুই-একজনমাত্র খেলোয়াড় এই কৌশলটির প্রয়োগ করিয়া থাকে। এই বল্ মারিতে হইলে ছড়িগাছা যে কোন একটি হাতদিয়া ধরিয়া হাতটি একেবারে বাড়াইয়া দিতে এবং ছড়ির পিছনদিক্‌টা জমীতে প্রায় ঠেকাইয়া রাখিতে হয়; তাহার পর, প্রতিপক্ষের ছড়ি ডিঙাইয়া বল্‌টি যাহাতে হিট্ করিবার মত সুবিধা-জনক জায়গায় আসিয়া পড়ে সেইজন্য উহাতে উপরি উপরি কএকবার ধাক্কা বা খোঁচা মারিতে হয়। যদি দুইহাতই লাগান হয়, তাহা হইলে ঐ মারাকে 'পুশ্' অর্থাৎ ধাক্কা দেওয়া বা 'স্কুপ্' অর্থাৎ খোঁচাইয়া উপরে তোলা বলে। হাফ্-ব্যাকেরা যখন সপক্ষ-ফর্‌ওয়ার্ডদের কাছে বল্-চালান করিতে চায়, কিম্বা ফর্‌ওয়ার্ডেরা যখন এ উহার কাছে বল্‌টি দিতে চায়, তখন পুশ্ বা স্কুপ্ করা খুব কাজে লাগে।

বল্ মারিতে হয়। ফর্‌ওয়ার্ড যখন বল্ 'ড্রিবল্' করিয়া (গড়াইয়া) লইয়া যায় কিম্বা ব্যাক্‌দের যখন প্রতিপক্ষের আক্রমণে বাধা দিতে হয়, তখন রিভার্স-বল্-চালনার বড় দরকার হয়। এরকম বল্-চালনাকে 'হিট্' অর্থাৎ ঘা বলা যায় না, উহা হাতের কব্জির 'ফ্লিক্' অর্থাৎ ঠোক্‌নামাত্র। এই বল্ মারিবার সময় পা জোড় এবং ছড়িগাছা প্রায় খাড়া করিয়া রাখিতে হয়।

উহার পর বাঁহাত দিয়া 'লাঞ্জ্' বল্-মারা শিখিতে হয়। এই বল্-মারা হকী-খেলোয়াড়দের, বিশেষতঃ ব্যাক্‌দের, না শিখিলেই নয়। এই বল্ মারিতে হইলে খেলোয়াড়কে হাতলের ডগাটুকু শুধু তাহার বাঁহাতদিয়া ধরিয়া বলের দিকে আগাইয়া গিয়া হঠাৎ বল্‌টি মারিতে হয়।

দুইহাতদিয়াই বল্ 'কাট্' করা আয়ত্ত করাও আবশ্যক। এই

পথে পাথর।

কোন দেশে এক রাজা বাস করিতেন, তিনি তাঁহার প্রজাদিগকে এত ভাল করিয়া ও বিচক্ষণভাবে শাসন করিতেন যে, তাঁহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু তাঁহার প্রজাদিগের এই একটা বদ অভ্যাস ছিল যে, যাহার যে কাজ করা উচিত সে নিজে তাহা না করিয়া অন্যের জন্য ফেলিয়া রাখিত, তাই তিনি তাঁহার প্রজাদিগকে একটা শিক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন।

তাঁহার রাজ্যের একটি রাস্তা একটি সরু গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া গিয়াছিল। একদা গভীর রাত্রে তিনি ঐ পথে গিয়া গাড়ির রাস্তার ঠিক মাঝখানে একটি গর্ত্ত খুঁড়িলেন। গর্ত্তটি বেশ গভীর হইলে তিনি উহার ধারে ও মাঝখানে নুড়ি দিয়া সাজাইলেন, তাহার পর তিনি তাঁহার আলখাল্লাহইতে একটি ছোট পুঁটলি বাহির করিয়া গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। পরে রাস্তার একপাশে গিয়া একটি বড় পাথর অক্লেশে খুলিয়া আনিলেন, এবং যে গর্ত্ত করিয়াছিলেন তাহার মুখে বসাইয়া দিলেন, তাহাতে গর্ত্তটির মুখটি একেবারে বুজিয়া গেল।

পরদিন সকালে একটি চাষা তাহার গাড়ি হাঁকাইয়া সেই পথে আসিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, আঃ এদেশের লোকের কুড়েমি বড় ভয়ানক হয়েছে, রাস্তার ঠিক মাঝখানে কে একটা প্রকাণ্ড পাথর ফেলে গেছে, এতে কি দিনের বেলা, কি রাতের বেলা, মানুষ কি পশু সকলেরই বিপদ্ ঘটতে পারে। আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি এপাথরটা এতক্ষণ এখানে পড়ে আছে যে কেউ-না-কেউ অনায়াসে এটা সরিয়ে ফেলতে পারত, কিন্তু সকলেই এমনি কুড়ে যে, এই সহজ কাজটা আর কেউ কর্ত্তে পারে নি। ঐ কথা বলিয়া সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল, পাথর যেমন তেমনি পড়িয়া রহিল।

অল্পক্ষণপরেই একজন সিপাহি আসিল, সে স্ফূর্ত্তির সহিত গান করিতে করিতে আসিতেছিল, গানে সে এমন মাতিয়াছিল যে, পাথরটা দেখিতে পাইল না, ফলে সে পাথরে উছট খাইয়া পড়িয়া গিয়া পথে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে শুধু লোকের অসাবধানতার জন্য বক্ বক্ করিতে করিতেই চলিয়া গেল—পথের পাথর পথেই পড়িয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে একদল সওদাগর কতকগুলি খচ্চর ও ঘোড়ার পিঠে ভারি বোঝাই লইয়া সেই পথ দিয়া চলিল, তাহাদের মধ্যে একজন বলিল এ বড় মজার দেশ! কে জানে এই পাথরটা এখানে কতদিন ধরে পড়ে আছে! কিন্তু কাহারও ইচ্ছা হইল না যে পথের মাঝখানহইতে সে পাথরখানা সরায়।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু কেহ সেই পাথরখানা সরাইবার চেষ্টাও করিল না। তিন-সপ্তাহ কাটিয়া গেলেও যখন সেই পাথরখানা সেই খানেই পড়িয়া রহিল, তখন রাজা তাঁহার প্রজাদিগকে ঠিক সেই রাস্তার সেই জায়গায় জড় হইতে বলিয়া পাঠাইলেন। তাহারা সেই পথে জড় হইলে, তিনি তাহাদের বলিলেন, আমিই এই পাথরখানা এইখানে রাখি, যে এই পথ দিয়া গিয়াছে সে-ই এই পাথরখানা এখানে রাখার জন্য অন্যকে দোষই দিয়াছে, কিন্তু কেহই উহা সরাইবার চেষ্টা করে নাই। এই বলিয়া তিনি ঝুঁকিয়া পাথরখানি তুলিয়া ফেলিলেন; আর প্রজাদের সেই গর্ত্ত ও তাহার ভিতরে একটি চামড়ার থলি রহিয়াছে দেখাইলেন। থলির গায়ে একটি কাগজ মারা ছিল, তাহাতে এই কথা লেখা ছিল, "যে এই পাথরখানি তুলিবে, ইহা তাহারই"। থলির মুখে যে দড়ি বাঁধা ছিল তাহা তিনি খুলিয়া ফেলিলে অনেক চক্‌চকে সোণার মোহর ঝর্ ঝর্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। রাজা বলিলেন, বন্ধুগণ আমাদের এই ব্যাপারহইতে শিক্ষা পাওয়া উচিত, যাহা আমরা নিজেরা করিতে চাই না তাহা অন্যে করিবে—আমাদের এরকম প্রত্যাশা করা উচিত নয়।

উচ্চৈঃশ্রবা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

একটু গিয়াই দীর্ঘভুজা অদূরে ছাগলের একটি দল দেখিতে পাইল—এদলে বড় বেশী নয়, ধাড়ীতে-বাচ্চাতে গোটাযোল ছাগল হইবে। স্বজাতির দেখা পাইয়া বেচারীর মনে আনন্দ ও সাহস দুইই হইল। দীর্ঘভুজা একটা শৈলের উপর দিয়া গলা বাড়াইয়াছিল, তাই ছাগলের দল আগে তাহার চক্ষে পড়িল, দলস্থ কোন ছাগল শৃঙ্গীর মাকে দেখিতে পায় নাই। কিন্তু শৃঙ্গী যখন মায়ের দীর্ঘ গলার উপর মাথাদিয়া দেখিতে চেষ্টা পাইল, তখন দলস্থ একটা মাদী ছাগল তাহাকে দেখিতে পাইল। দলস্থ ধাড়ীরাও চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া চরিতে ও চলিতেছিল। সে একরকম ডাক ডাকিয়া উঠিল, এই ডাক শুনিয়া দলস্থ বাচ্চা-ধাড়ী সকলে

"স্পন্দহীন" হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া গেল। এক্ষণে কোন ভয়-ভাবনা না থাকাতে দীর্ঘভুজা এমন স্থানে গিয়া দাঁড়াইল যেন ছাগলের দলস্থ সকলে তাহাকে দেখিতে পায়। দলস্থ ছাগলগুলি লাফাইতে লাফাইতে টিলার উপর দিয়া আসিল, আসিয়া বামদিকে গোল হইয়া দাঁড়াইল, আর "শৃঙ্গী" ও তাহার মা ডানদিকে গেল।

কাজেই দীর্ঘভুজা বাতাসের উজানদিকে আর ছাগলের দল ভাঁটির দিকে গেল। এতক্ষণ দীর্ঘভুজা ছাগলগুলির গন্ধ পাইয়া পাইয়া আসিয়াছে, এখন দলস্থ ছাগলেরা তাহার ও শৃঙ্গীর গন্ধ পাইতে লাগিল। এতক্ষণ দূরহইতে দীর্ঘভুজার ও তাহার বাচ্চার চেহারা এবং চলন ও ধরণ-ধারণ দেখিয়াছিল, এক্ষণে তাহার গন্ধ পাইয়া বেশ চিনিতে ও বুঝিতে পারিল যে, ইহারা কেবল স্বজাতি নয়, আবার জ্ঞাতি। দীর্ঘভুজা সতর্কভাবে তাহাদের কাছে গেল। একটা গিন্নী-বান্নীগোছের ধাড়ী দলস্থ সকলকে পিছনে ফেলিয়া, দীর্ঘভুজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য একটু অগ্রসর হইল। উভয়ে গন্ধ শুঁকিয়া নাক টানিল ও একটা অপরটার দিকে তাকাইতে লাগিল।

In the jungle.

ছাগলদলের গিন্নী ধাড়ীটা সম্মুখের পা-দুইখানি-দিয়া জোরে মাটাতে "তাল ঠুকিয়া" লড়াই করিবার ভাব দেখাইল; দীর্ঘভুজাও "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া ঘাড় নোয়াইয়া দীর্ঘশৃঙ্গ বাগাইল। একটা অপরটার দিকে অগ্রসর হইল; একটার মাথা অন্যটার মাথায় ঠেকিয়া খটাস্ খটাস্ শব্দ হইল; ঠেলা-ঠেলি চলিল; এমন সময়ে দীর্ঘভুজা ঘাড় একটু যেই বাঁকাইল, তাহার একটা তীক্ষ্ণশিং আগন্তুক ধাড়ীটার কানে ঠেকিল। তাহাতে বেচারীকে বিলক্ষণ একটু লাগিল। তাই সে গন্ধ শুঁকিয়া নাক টানিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং মাথা নাড়িতে নাড়িতে দলস্থ সঙ্গীদের কাছে গেল। দীর্ঘভুজা ধাড়ীটার পিছন ধরিয়া চলিল; "শৃঙ্গী" এই ব্যাপারের মর্ম্ম কিছু বুঝিতে পারিল না, কিন্তু মায়ের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। দলস্থ ছাগলগুলি চাকার মত গোল হইয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া দৌড়িল; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আবার দাঁড়াইল; দীর্ঘভুজা নড়িল না। দেখিয়া সকলে তাহাকে "ঘেরাও" করিয়া দাঁড়াইল। এইরূপে দলস্থ সকলে দীর্ঘভুজাকে আপনাদের দলে গ্রহণ করিল। দীর্ঘভুজাকে সমাজে লইবার বেলা ত এইসকল অনুষ্ঠান হইল, কিন্তু "শৃঙ্গীকে" আপন যোগ্যতার পরিচয় দিতে হইল। এইদলে সাত-আটটী বাচ্চা ছিল। প্রায় সকল বাচ্চাই বয়সে ও আকারে "শৃঙ্গীর" অপেক্ষা বড়। কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি অনেক প্রাণী স্বজাতীয় অপরিচিত প্রাণীকে দেখিলে তাহার সঙ্গে ঝগড়া করে; ঝগড়ার কোন কারণ নাই, অপরিচিত বলিয়া ঝগড়া করে। এই বাচ্চাগুলি "শৃঙ্গীর" সঙ্গে ঝগড়া বাধাইল। স্কুলে নূতন বালক ভর্ত্তি হইলে পুরাতন অনেক ছেলে, নূতন বালকটাকে নূতন বলিয়া, দিনকতক জ্বালাতন করে।

একটা বাচ্চা আসিয়া, না বলা, না কহা, "শৃঙ্গীর" পিছনদিকে সজোরে এক ঢু মারিল। এই হইল, প্রথম অভ্যর্থনা। "শৃঙ্গী" নিজে এইরূপে "শ্বেত-নাসিককে" অকস্মাৎ ঢুঁ মারিয়া আমোদ করিত। কিন্তু তাহাকে এখন যে ঢুঁ খাইতে হইল, তাহাতে তাহার আমোদ না হইয়া বরং রাগ হইল। কে ঢুঁ মারিল, দেখিবার জন্য যেই মুখ ফিরাইল, অমনি আর একটা বাচ্চা গিয়া অন্যদিকে ঢুঁ মারিল। এখন যে দিকে ফিরে, অমনি একটা-না-একটা বাচ্চা ঢুঁ মারিতে আইসে। অবশেষে, বেগতিক দেখিয়া, "শৃঙ্গী" গিয়া মায়ের পেটের নীচে আশ্রয় লইল। দীর্ঘভুজা "শৃঙ্গীকে" রক্ষা করিতে পারিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু বেশীক্ষণ ত সে মায়ের কাছে থাকিতে পাইল না; কাজেই দলস্থ বাচ্চারা বেচারাকে সারাদিন জ্বালাতন করিল; ইহাতে তাহাদের আমোদ হইল বটে, কিন্তু "শৃঙ্গীর" ভারী কষ্ট হইল। সে দেখিল, তাহারা দলে ভারী; সকলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা, কোন পুরুষে কাহারও সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ছিল না, তাই তাহার ভ্যাবা-চ্যাগা লাগিয়া গেল। সে স্বভাবতঃ চঞ্চল, কিন্তু সে চঞ্চলতা এখন কোন কাজে লাগিল

না, অপরপক্ষ যে দলে ভারী! পরদিন সকালবেলা "শৃঙ্গী" ভাবিল, আজ নিশ্চয় উহারা আপনাদের আমোদের জন্য আমাকে বেশী জ্বালাতন করিবে। সকলের বড় বাচ্চাটা বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট, এখন শিং দেখা দেয় নাই; কিন্তু ভাব-গতিক দেখিয়া বোধ হয়, তাহার শিং দীর্ঘভুজার "শৃঙ্গীর" মত মোটা, শক্ত ও খাড়া শিং হইবে না, বাঁকা হইবে। তাই আমরা এই বাচ্চাটার নাম "বক্রশৃঙ্গ" রাখিলাম। সকালবেলা সেইটাই "রণ দিতে" আসিল। সেটাকে আসিতে দেখিয়া, স্বজাতীয় প্রথা-অনুসারে "শৃঙ্গী" পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল; "বক্রশৃঙ্গ" আসিয়া তাহাকে দুই-তিন ঢুঁ মারিল। "শৃঙ্গী" ঢুঁ খাইয়া হাত-পা ছড়াইয়া পড়িল, কিন্তু পড়িয়াই লাফ দিয়া উঠিল, উঠিয়া একটু রাগ করিয়া "রণ দিতে" গেল। দুইজনের মাথা ঠোকা-ঠুকি চলিল, কেহ কাহাকে ছাড়ে না। "শৃঙ্গী" আরও রাগিয়া গেল, তেড়ে গিয়া "বক্র শৃঙ্গকে" জোরে ঢুঁ মারিল। এখন মাথা ছাড়িয়া, একটা অন্যটার কাঁধে ঢুঁ মারিতে লাগিল। ঢুঁ মারে, আর পিছাইয়া যায়, আবার আসিয়া, ঢুঁ মারে। প্রথম প্রথম শৃঙ্গীকে হটিয়া যাইতে হইল, কিন্তু শীঘ্রই তাহার তীক্ষ্ণ শৃঙ্গে বিলক্ষণ কাজ দেখিল। পেটের হাড়ে শিং-এর শক্ত দুই-তিন খোঁচা খাইয়া "বক্রশৃঙ্গ" "রণে ভঙ্গ দিয়া" পলাইল। যে বাচ্চাগুলি কাছে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল, সেগুলি বেশ বুঝিতে পারিল যে, নূতন বাচ্চাটা নেহাৎ ফ্যাল্‌না নয়। সকলে শৃঙ্গীকে "ক্লাসে" ভর্ত্তি করিয়া লইল, বেচারার সকল কষ্ট দূর হইল।

অনেকে বলিয়া থাকেন, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-পদ্ধতি মানুষের গড়া, আর এ সকলের দ্বারা সমাজে অনেক অত্যাচার হইয়া থাকে। মনুষ্য-সৃষ্টির পূর্ব্বেও যেমন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছিল, তেমনি মনুষ্যসমাজ হইবার পূর্ব্বে সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-পদ্ধতিরূপ আবশ্যক ব্যবস্থা বা আইন-কানুনও ছিল, তবে কিনা মনুষ্যজাতির পৃথিবীতে পা দিবার পরে ঐ আইন-কানুনের নানাভাবে গঠন হইয়াছে। সকলপ্রকার বন্য প্রাণীদের সমাজে সামাজিক রীতি-নীতিরূপ আইন প্রচলিত আছে; ঐ প্রাণীদিগের মানসিক অবস্থার যত উন্নতি হয়, উক্ত আইন-কানুনের তত আবশ্যকতা ও মতপরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

পল্লীগ্রামে গৃহস্থের বাড়ীতে গরু থাকে। একটা নূতন গাভী কিনিয়া আনিলে পালের আর দশটা গরুর সঙ্গে নূতনটাকে, আপনার অবস্থা ও শক্তি বুঝিয়া চলিতে হয়। যে গরুটা সকলের অপেক্ষা পুরাতন, পালের মধ্যে সেইটার মান বেশী; পরে যেটা যখন আনীত হইয়াছে, সেই অনুসারে সেটার পালের মধ্যে পদমর্য্যাদা ধার্য্য হইয়াছে। তবে, বিশেষ গুণ থাকিলে, পরে আসিলেও কোন কোন গরু পালের প্রধান হইয়া দাঁড়ায়, যেমন কোন কোন মুন্সেফ দক্ষতাগুণে জেলার জজ্ হইয়া থাকেন। কিন্তু জজ হইতে গেলে মুন্সেফবাবুকে যেমন অনেক শিখিতে, অনেক সহিতে, অনেক "ধাক্কাধুক্কা" খাইতে হয়, পরের আনীত গরুকে পালে উচ্চপদ পাইতে হইলে তেমনি কষ্টস্বীকার করিতে হয়।

অধিকাংশ স্থলে শারীরিক বল, সাহস, এবং চতুরতা থাকিলেই বড় হওয়া যায়, কিন্তু অনেক সময়ে জ্ঞান ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রাধান্য বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। হস্তিদলের যূথপতি যে দলস্থ বা সমাজস্থ সকলের অপেক্ষা বলবান বা অতিদুর্দ্দান্ত, তাহা নহে। বলবান বা দুর্দ্দান্ত পশু দলস্থ আর পশুসকলকে তাড়াইয়া হাঁকাইয়া লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু আপনার অনুগামী করিতে, সঙ্গ লওয়াইতে পারে না। সমাজের লোকেরা যেমন করিয়া দলপতি, এবং সহরের এক-একটি পল্লীর লোকেরা যেমন করিয়া মিউনিসিপল কমিশনর মনোনীত করেন, পশুসমাজে তেমন করিয়া দলপতি মনোনীত করা হয় না, কিন্তু রহিয়া-বসিয়া, ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাচন করা হয়। নর বা মাদী হউক, যে পশুটার চা'ল-চলন, রকম-সকম দেখিয়া দলস্থ আর পশুদের মনে এই ধারণা জন্মে যে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ান ভাল, সেইই দলের চালক বা চালিকা, দলপতি বা দলপত্নী হয়। এবং দলস্থ সকলে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার বশে চলে। দলস্থ অধিকাংশ পশুর সম্মতি-ক্রমে নহে, সকলের সম্মতিক্রমে এইপ্রকার দলপতি মনোনীত হইয়া থাকে। তবে যে পশুদের এইপ্রকার দলপতির অনুগমন করিতে ভাল লাগে না, তাহারা ইচ্ছা করিলে দল ছাড়িয়া, সমাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে—কেহ তাহাদিগকে ধরিয়া রাখে না। যে সকল জন্তু—হাতী, মহিষ, বানর ইত্যাদির মত দল বাঁধিয়া বাস করে, এইপ্রকার প্রাণীর অনেক দলে নর-জন্তু নহে, প্রবীণা মাদী-জন্তুই আপনার শারীরিক শক্তি, সাহস এবং বুদ্ধিবলে সম্পদ্-বিপদ্, সকল সময়ে দলস্থ সকলকে রক্ষা করিয়া থাকে। বন্য মহিষ, বন্য কুকুর এবং বসন্তকালীয় বন্য ছাগের দলে এইরূপ হইয়া থাকে। বন্য মহিষের দলে রাজা ও রাণী থাকে; রাজা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে মারা পড়িলে রাণী দলস্থ কোন মহিষকে রাজপদে অভিষেক করে।

লংলেপাহাড়ের এই বন্য ছাগলের দলে সাতআটটা ধাড়ী, তাহাদের কতকগুলি ছোট বাচ্চা, গোটাচেরেক বড় বাচ্চা, আর একটা হৃষ্ট-পুষ্ট পাঁঠা ছিল, ইহার বয়স দুইবৎসর, বেশ শিং উঠিতেছে; গোঁফ দেখা দিলে অনেক বালক যেমন একটু মুরব্বিপানা ভাব দেখায়, এও তাই করে। দলের মধ্যে এ সকলের অপেক্ষা আকারে বড়, কিন্তু মানমর্য্যাদায় বড় নহে। এক প্রবীণা ধাড়ী দলের "রাণী" বা "গুরুমা"। যে ধাড়ীটা "দীর্ঘভুজার" সঙ্গে "রণ দিতে" গিয়াছিল, সেটা নয়; এটা সেটার অপেক্ষা আকারে খর্ব্ব, ইহার শিং ছোট ছোট। আর এই "গুরুমা" স্থূলকায় পাঁঠাটার মা।

দলস্থ ছাগলেরা এই "রাণীর" বা "গুরুমায়ের" "হুকুম আমলে আনা" বড় একটা আবশ্যক মনে করিত না, কিন্তু সকলেই জানিত, এ বড় "হুঁশিয়ার"; খুব ভাবিয়া-চিন্তিয়া, যে দিকে যাওয়া বিহিত, সেই দিকে যায়। তাই ইহার সঙ্গে সঙ্গে চরিয়া বেড়ান ভাল মনে করিত। ছাগেরা উহার কোন নাম রাখে নাই, কিন্তু নাম নহিলে আমাদের চলে না, তাই উহার নাম "ঠাকুর-মা", আর উহার হৃষ্ট-পুষ্ট দুইবৎসরের বাচ্চাটীর নাম "দশরথ" রাখিলাম।

আমাদের "দীর্ঘভুজার" এক্ষণে ভরাযৌবন, সর্ব্বদাই একটা-না-একটা কাজে ব্যস্ত, স্থির-চিত্ত, চতুরা; সে চক্ষু দিয়া সদাই দেখে, কাণ দিয়া সদাই শুনে, নাক দিয়া সদাই গন্ধ শোঁকে, এবং অষ্টপ্রহর সতর্ক। পাহাড়ের ঢালুতে চরিতে চরিতে, দুই-এক-পা অগ্রসর হইয়াই মাথা তুলিয়া চারিদিকে দেখে, নূতন ধরণের কোন কিছু দেখিয়া মনে সন্দেহ হইলে, যতক্ষণ না বুঝিতে পারে, ওটা কি, ততক্ষণ একদৃষ্টিতে দেখিতেই থাকে; যদি ভয়ের কোনরূপ কারণ না থাকে, আবার ঘাস খাইতে আরম্ভ করে; ভয়ের কারণ থাকিলে নাক বাঁকাইয়া একপ্রকার শব্দ করে, সে শব্দ শুনিয়া দলস্থ ছেলে-বুড়া সকলে দণ্ডবৎ দাঁড়াইয়া থাকে। সকল ছাগলেই এইরূপ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু দীর্ঘভুজা তাহাদের অপেক্ষা অনেকটা ভাল করিয়া করে, এবং ঠিক সময়ে করে। এ কার্য্যে "ঠাকুর-মায়ের" যে বড় একটা ত্রুটি হইত, তাহা নহে; লংলেপাহাড়ের কোথায় কি, তাহার সমস্ত জানা ছিল; তাই অনেক সময়ে দীর্ঘভুজার আগে অনেক বিষয় তাহার চক্ষুতে পড়িত। পাঁচজনকে চালাইবার ও বশে রাখিবার শক্তি দুইটী ধাড়ীরই প্রায় সমান, তাই ঠাকুর-মায়ের ভয় হইল, পাছে দীর্ঘভুজা তাহাকে বে-দখল করে।

Photo by কলিকাতার ইডেন-উদ্যানে সূর্য্যাস্ত। De Luca & Co.

এ দলে একটা অপদার্থ ছিল। সেটার বয়স বৎসরদুই—"দশরথের" সমান বয়স—এটা কিন্তু মাদী। সম্মুখদিকের চাকা-দুইটা না থাকিলে ঘোড়ার গাড়ি যেভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, এই মাদী ছাগলটা সম্মুখের দুই পায়ের হাঁটুতে ভর দিয়া সেইরূপে বসিয়া মাঠে চরিত। ইহার দেখাদেখি দলস্থ আর কোন ছাগলে এরূপ করিত না, তাহারা বুঝিত যে, ওভাবে ঘাস খাওয়া ভাল অভ্যাস নহে। এইভাবে বসিয়া চরাতে এই মাদীটার সম্মুখের দুই পায়ের হাঁটুতে গোলাকার—ডবল পয়সার মত—শক্ত কড়া পড়িয়া গেল। কড়া-দুইটা বাড়িয়া আমেরিকার ডলারনামক টাকার মত বড় হইল। বেচারী আর চটপট চলিতে পারে না—লাফ দিয়া দ্রুত একপাশে যাইতে বা পিছনে হটিতে পারে না; ভাল করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতেও পারে না। তাই আমরা উহার নাম রাখিলাম—"শ্রীমতী হাঁটু-ভাঙ্গা-দ"। যেসকল জন্তুকে দৌড়িয়া প্রাণ বাঁচাইতে হয়, তাহাদের সকলকেই এঁকেবেঁকে লাফাইয়া হাটতে, পাশ-কাটাইতে অভ্যাস করিতে হয়। শিয়ালে বা কুকুরে তাড়া করিলে অনেক সময়ে খরগোস; বন-বিড়ালে তাড়া করিলে ঘুমন্ত শশক; চিতাবাঘকে লাফাইয়া আসিয়া পড়িতে দেখিলে বিভ্রান্ত হরিণ এই অভ্যাসের গুণে বাঁচিয়া যায়।

এই দলে আর একটা বিদ্‌ঘুটেরকমের ছোট মাদী ছাগল ছিল। এটা বড় হড়বোড়ে। সে "গুরুমায়ের" সব কথা শুনিত, একটী কথা কেবল শুনিত না। ভয়ের কারণ দেখিয়া গুরু-মা নাক বাঁকাইয়া শব্দ করিলে সকল ছাগল ঠায় দাঁড়াইয়া যায়, কিন্তু এটা না দাঁড়াইয়া পাইচারী করিয়া বেড়ায়, স্থির থাকিতে পারে না।

দিনকতক ছাগলেরা ভয় পাইতে লাগিল; একস্থানে ভয় পাইলে পলাইয়া অন্যস্থানে যায়। এই ভাবে মাসাধিককাল গত হইল। কিন্তু চারিদিকে পাহারা, তাই কাহারও কোন অনিষ্ট ঘটিল না। গ্রীষ্মকাল যত নিকট হইল, ছাগলগুলি অতি-অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। এক-একবার দলস্থ সকলেই হঠাৎ দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ নিশ্চলভাবে থাকে; না ঘাসে মুখ দেয়, না জাগর কাটে। ক্ষুধামান্দ্য ও অজীর্ণ হইল—যেন কিছু খুঁজিতে লাগিল, কি যে চাই, তাও জানে না। অবশেষে ঠাকুর-মাকেও এই রোগে ধরিল, তাহারও অরুচি ও অজীর্ণ হইল। তাই ঔষধের অন্বেষণে যাইবার উদ্যোগ হইল। সে দলস্থ সকলকে লইয়া, পাহাড়ের ঢালু বহিয়া ক্রমাগত নীচের দিকে যাইতে লাগিল। শালবন ছাড়াইয়া আরও নীচে কাওলাবনে গেল। কেহ জানে না, কোথায় লইয়া যাইতেছে। অনেকে জন্মাবচ্ছিন্নে কখনও এদিকে আইসে নাই। দীর্ঘভুজার মনের ভিতর যেন কেমন কেমন হইতে লাগিল। সে চলিতে চলিতে বার বার থামিয়া যায়; এইপ্রকার স্যাঁৎসেঁতে মাটীতে হাঁটা তাহার ভাল লাগিতেছে না। কিন্তু ঠাকুর-মা ইতস্ততঃ না করিয়া বরাবর চলিল। দলস্থ একটাও ছাগল যদি থামিয়া, যদি তাহার সঙ্গে পিছাইয়া যাইতে উদ্যত হইত, দীর্ঘভুজা নিশ্চয়ই দল ছাড়িয়া সেইটাকে লইয়া ফিরিয়া যাইত। কিন্তু সকলেই নিঃশব্দে ছায়ার মত ঠাকুর-মায়ের পিছন ধরিয়া চলিল, ফলে তাহার গম্ভীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া সকলেরই মনে একটা ভরসা জন্মিয়াছিল। আমাদের "বাদার" মত জমিতে আসিলে ঠাকুর-মা কাণ খাড়া করিয়া, চাঁদবালীর "কালু" জাহাজের কাপ্তানের মত সম্মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া কিছু যেন দেখিতে লাগিল। তাহার খুব কাছে যে ছাগলগুলি ছিল, সেগুলিরও যেন একটু স্ফূর্ত্তি হইল। ইহাদের যে নিতান্ত ক্ষুধা বা তৃষ্ণা পাইয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু ইহাদের প্রাণ কোন কিছু যেন চায়, আর সেই কোন কিছু যেন এখন খুব নিকটে। সম্মুখে একটি মাঠ, আর এই মাঠের একধার দিয়া শাদা একটা রেখা খালের দিকে গিয়াছে। যেখান-হইতে এই শাদা রেখার আরম্ভ হইয়াছে, ঠাকুর-মা সকলকে সেইখানে লইয়া গেল। এইখানে কাশীর চিনির মত শাদা এক পদার্থ বিঘাদশেক জমি জুড়িয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কাহাকেও বলিতে হইল না। ধাড়ী ও বাচ্চা সকলেই, বৈশাখমাসের পিপাসায় কাতর পথিক ডাবের জল যেমন আগ্রহপূর্ব্বক পান করে, তেমনি করিয়া ঐ শাদা পদার্থ চাটিয়া খাইতে লাগিল। এমন উপাদেয় পদার্থ, বোধ হয়, ইহজন্মে উদরস্থ হয় নাই। সকলে প্রাণ ভরিয়া এই জিনিস চাটিতে লাগিল; শুষ্ক ওষ্ঠ ভিজিয়া উঠিল, উদরের উষ্ণতা নাক, কাণ ও চক্ষু দিয়া বাহির হইল, মাথাধরা ছাড়িয়া গেল, গাত্র শীতল হইল, উদরের অম্লভাব সারিয়া গেল, নিরানন্দভাব দূর হইল, এবং সকলেরই অসুখ সারিয়া স্বাভাবিক অবস্থা দাঁড়াইল। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর পক্ষে যেমন কুইনিন্ ইহাদের এই সাদা জিনিস তেমনি উপকারী—এই জিনিসটা আর কিছুই নয়, লবণ। আসামদেশের অনেক স্থানে মাটীর ভিতর-হইতে আপনি লবণ উঠে।

(ক্রমশঃ।)

তুমি কি বড়লোক হইতে চাও?

(মার্কিণমুলুকে শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী মহাত্মা হোরেস্ ম্যানের উপদেশ।)

চাও; ভাল কথা। তুমি মহামনাঃ ও মহাশয় হইবে বলিয়াই ঈশ্বর তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই, যদি তোমার বিদ্যালয়ে কোনও খোঁড়া ছেলে থাকে, তুমি তাহাকে কখনও জানিতে দিও না যে, তুমি তাহার খোঁড়া-পা দেখিয়াছ। যদি কোনও ছেঁড়া-কাপড়-পরা গরীব ছেলে থাকে, তাহার কাছে কখনও ছেঁড়া কাপড়ের কথা তুলিও না। খোঁড়া ছেলেটিকে খেলায় এমন কোনও কাজ করিতে দিও যাহাতে তাহার দৌড়িবার দরকার হইবে না। যে ছেলের ক্ষুধা পাইয়াছে, তাহাকে তুমি তোমার খাবারহইতে ভাগ দিও। যে ছেলেটি বোকা, তাহাকে তুমি পারিলে পড়া বলিয়া দিও। যে ছেলেটি খুব চালাক, তাহার বুদ্ধি দেখিয়া তুমি হিংসা করিও না; কারণ কোনও ছেলে যদি তাহার স্বাভাবিক শক্তির গর্ব্ব করে, আর আর কোনও ছেলে যদি তাহার সেই ক্ষমতা দেখিয়া হিংসা করে, তাহা হইলে দুইটী অন্যায় হয়, অথচ আগের অপেক্ষা কাহারও শক্তি বাড়িয়া যায় না। যদি কোনও বয়সে বড় ও বলবান ছেলে তোমার কোন অনিষ্ট করে আর তাহার জন্য তোমার কাছে আসিয়া আপশোষ করে, তুমি তাহাকে মাফ করিও, আর যাহাতে সে সাজা না পায় তাহার জন্য শিক্ষক মহাশয়ের কাছে গিয়া মিনতিও করিও। বড় ঘুসির অপেক্ষা শিষ্ট ব্যবহার যে কত ভাল তাহা সব ছেলেরই শিষ্ট ব্যবহার করিয়া দেখান উচিত।

সমুদ্রের ডাকমুন্সি।

এক্ষণে আমাদের দেশে যাঁহাদিগকে পোষ্ট-মাষ্টার বলে, সেকালে তাঁহাদিগকে "ডাকমুন্সি" বলিত। তখন জেলার কালেক্টর-সাহেব ছিলেন "পোষ্ট মাষ্টার", তিনি কেবল নামসহি করিতেন। কিন্তু যে বাঙ্গালিবাবু পোষ্ট-আপিসের কাজ করিতেন, তাঁহাকে বলা যাইত "ডাকমুন্সি"। আমাদের দেশে কেবল ডাঙ্গায় ডাকঘর আছে, কিন্তু ইউরোপে ও আমেরিকায় আজকাল সমুদ্রে—জাহাজেও ডাকঘর হইয়াছে।

জাহাজে যে ডাকঘর হইয়াছে, ইহার গোড়ায় আমেরিকার

লোকদের বুদ্ধি। লণ্ডনহইতে আমেরিকার নিউইয়র্ক-বন্দরে ও নিউইয়র্কহইতে লণ্ডনে জাহাজে করিয়া চিঠি-পত্র ইত্যাদি আনা-নেওয়া হয়। এইসকল জাহাজে পোষ্ট-আপিস আছে। এক-একটি জাহাজে চারিজন করিয়া ডাকমুন্সি থাকে—দুইজন ইংরেজ, দুইজন মার্কিণ। নিউইয়র্কহইতে জাহাজ ছাড়িলে মার্কিণদেশীয় এবং লণ্ডনহইতে জাহাজ ছাড়িলে ইংরেজ ডাকমুন্সিরা ডাকঘরের সমস্ত কাজ করেন। ইঁহারা ডাকঘরের "বাবু"; ইঁহাদের সাহায্যের জন্য দপ্তরি বা চাপরাশি নাই। জাহাজের খালাসিরা ইঁহাদের দপ্তরি, চাপরাশি ও মুটিয়া সকলই। তাহারাই বড় বড় বস্তা বহিয়া ও টানিয়া ইঁহাদের কাছে আনে ও খুলিয়া দেয়। জর্ম্মনিহইতেও নিউইয়র্ক-বন্দরে জাহাজ যায়, আসে। ইহার কোন কোন জাহাজেও পোষ্ট-আপিস হইয়াছে। এই সকল পোষ্ট-আপিসের ডাকমুন্সি-বাবুরা কতক জর্ম্মণ ও কতক মার্কিণ। কোন কোন জাহাজের ডাকঘরে কাজ বড় বেশি, কোন কোন জাহাজে তত বেশি নয়। কিন্তু সকল জাহাজের ডাকঘরেই কাজের ধারা-ধরণ একই প্রকার। মনে কর বন্দর-হইতে জাহাজ ছাড়িল, ছাড়িবার একটু আগে চিঠি-পত্র, খবরের কাগজ, বই, পার্স্লে ইত্যাদি ভরা গাড়ি গাড়ি থলিয়া বা বস্তা জাহাজে আসিয়া পড়িল। মনে কর, সৌদাম্পটনে আসিল ১৫০০ বস্তা, আবার কুইন্স-টৌনে পাওয়া গেল ২০০০ বস্তা। একবার—১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে,—"মাজেষ্টিক্"-নামক জাহাজ ইংলণ্ড ও অন্যান্য বন্দরহইতে ৪৫৬৮খানি বস্তা নিউইয়র্কে চালান হয়। ভাবিয়া দেখ, ব্যাপারখানা কি!

বস্তাগুলি যখন জাহাজে তোলা হয়, তখন একজন ডাকমুন্সি চালান হাতে করিয়া জাহাজে উঠিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকেন, এবং এক-একটী বস্তার নাম ও নম্বর ইত্যাদি চালানের সহিত মিলাইয়া দেখেন, দেখা হইলে তবে ভিতরে লইয়া যাইতে দেন। ভিতরে লইয়া গিয়া লোকেরা এক নির্দ্দিষ্ট-স্থানে বস্তাগুলি কাঁড়ি করিয়া রাখে। যে বস্তাগুলি জাহাজেই খুলিয়া চিঠি, পার্সেল ইত্যাদি বাছাই করিতে হইবে, সেগুলি নীচেকার এক কুঠরীতে লইয়া গিয়া রাখা হয়, এ কুঠরীর নাম বস্তা খুলিবার ঘর। যে-সকল বস্তা, যেমন পাওয়া গিয়াছে, তেমনি নিউইয়র্কে পঁহুছাইয়া দিতে হইবে, সেগুলি, কাটা কাটা কিনা, তদারক করিয়া দেখিয়া অন্য কুঠরীতে চালান দেওয়া হয়। এইসকল আদত বস্তার কতক নিউইয়র্কে, কতক ফিলাডেল্‌ফিয়া, কতক শিকাগো, ইত্যাদি যুক্তরাজ্যের নানা নগরে, কতক কানাডা এবং মেক্সিকো-পর্য্যন্ত যায়। যে দেশহইতে চালান হয়, সেই দেশের মফস্বলস্থ নানা স্থানের ডাকঘরহইতে এইসকল বস্তা সেই দেশের বড় ডাকঘরে আইসে, এবং বড় ডাকঘরের লোকেরা জাহাজে তুলিয়া দেয়। পথে যে যে বন্দরে জাহাজ লাগে, বা যে যে বন্দরের পাশ দিয়া জাহাজ যায়, অনেক বস্তা সেই সেই বন্দরে দিয়া যাইতে হয়। বন্দরহইতে ছোট ছোট ষ্টীমারে করিয়া লোক আসিয়া বস্তাগুলি লইয়া যায়।

বন্দরহইতে জাহাজ ছাড়িলেই জাহাজস্থ ডাকঘরের কাজ আরম্ভ হয়। কোন্ কোন্ বস্তা কোথায় কোথায় যাইবে, তাহা ঠিক করিয়া বস্তাগুলি ঠিক ঠিক স্থানে রাখা হয়। জাহাজের ডেকের অর্থাৎ পাটাতনের নীচে দুইটি বড় কুঠরী আছে। এই দুইটি কুঠরীতে টেবিল আছে, সেই টেবিলের উপর বস্তা রাখিয়া, ডাকমুন্সিরা সেগুলি খুলিয়া,

কেহ চিঠি, কেহ বা খবরের কাগজ ও বই, এইরূপে সকল জিনিস বাহির করিয়া, বাছাই করেন। এই কার্য্যকে ইংরেজিতে sorting বলে, আমাদের দেশের ডাকঘরের পিয়াদা ও চাপরাশিরা "সাট" করা বলে। আমাদের বড় বড় ডাকঘরে এবং রেলগাড়ির ডাকঘরেও সাট করা হয়। জাহাজের ডাকঘরে খোপ-খোপওয়ালা আলমারি আছে। খোপের মাথায় নানা ডাকঘরের নামের টিকিট মারা আছে। ডাকমুন্সিরা বাছাই করিয়া, যেখানা যে খোপের, সেই খোপে রাখিয়া দেন। সমস্ত বাছাই হইয়া গেলে, ভিন্ন ভিন্ন খোপের চিঠি ভিন্ন ভিন্ন বন্দরের ডাকঘরের নাম-লেখা থলিয়ায় রাখিয়া দেওয়া হয়। সচরাচর দুইটী কুঠরীর একটীতে খবরের কাগজ, বই, পাসেল ইত্যাদি এবং অন্য কুঠরীতে চিঠি, রেজিষ্টারি চিঠি ইত্যাদি বাছাই করা ও দেখা-শুনা হয়। রেজিষ্টারি চিঠি ইত্যাদির বিষয়ে বড় সাবধান হওয়া আবশ্যক। ডাকমুন্সিরা সেগুলির নম্বর, কোন্ ডাকঘরহইতে আসিল, ও কোথায় যাইবে, এসকল খাতায় টুকিয়া রাখেন। এইগুলি অবশেষে "রেজিষ্টারি" থলিয়ায় রাখিয়া শক্ত তালা-চাবি আঁটিয়া দেওয়া হয়।

নিউইয়র্ক-সহরে, আমাদিগের কলিকাতা-সহরের ন্যায় অনেক ছোট-বড় ডাকঘর আছে। সুতরাং সহরের ভিন্ন ভিন্ন ডাকঘরের এলাকার চিঠি ইত্যাদি বাছিয়া বাছিয়া ভিন্ন ভিন্ন থলিয়ায় রাখিতে হয়। কাজেই নিউইয়র্ক-সহরের কোন্ গলি, কোন্ পাড়া, কোন্ ডাকঘরের এলাকায়, ডাকমুন্সিদিগের তাহা জানিয়া রাখা আবশ্যক, তাঁহারা তাহা জানেনও। জাহাজের ডাকঘরের "বাবুদের" হাতে এমন অনেক চিঠি পড়ে, যে সকল চিঠির "শিরোনামা" পড়িয়া কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারেন, আমাদের বুঝিবার সাধ্য নাই। মনে কর, পল্লীগ্রামহইতে তোমার নামে একখানি চিঠি আসিল, চিঠির শিরোনামায় লেখা আছে—

পরম কল্যাণবর

শ্রীমান্ রাধানাথ ঘোষ,

কল্যাণবরেষু।

এই পত্র কলিকাতা-সহরের কেলেজিরা স্ত্রিতে

রিপুদমন কলেজের ছাত্র উক্ত

শ্রীমানের নিকট পৌছে।

এই "কেলেজিরা স্ত্রিত" কোথায় এবং "রিপুদমন কলেজ" কোন্ কলেজ, তাহা আমাদের ডাকঘরের বাবুরা জানেন। সকল দেশের পোষ্ট-আপিসের লোকদের হাতে প্রতিদিন এইপ্রকার শিরোনামালেখা দুই-একখানি চিঠি পড়ে।

যতদিন না জাহাজ নিউইয়র্ক-বন্দরের ঘাটে লাগে, ততদিন চিঠি-পত্রাদি বাছাই হইতেই থাকে। জাহাজে বিস্তর চড়নদার থাকে। তাহারা জাহাজে বসিয়া বসিয়া চিঠি লেখে। সেসকল জাহাজের ডাকঘরে দেয়। ডাকমুন্সিরা সেসকল সাঁট করেন। এইরূপ করিতে করিতে জাহাজ যখন নিউইয়র্ক-সহরে আসিয়া পঁহুছে, তখনও অনেক চিঠি-পত্রাদি থাকে, যাহা বাছাই করা হয় নাই। সেগুলি আর বাছাই করা হয় না। একটা স্বতন্ত্র থলিয়ায় পুরিয়া নিউইয়র্ক-সহরের বড় ডাকঘরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।
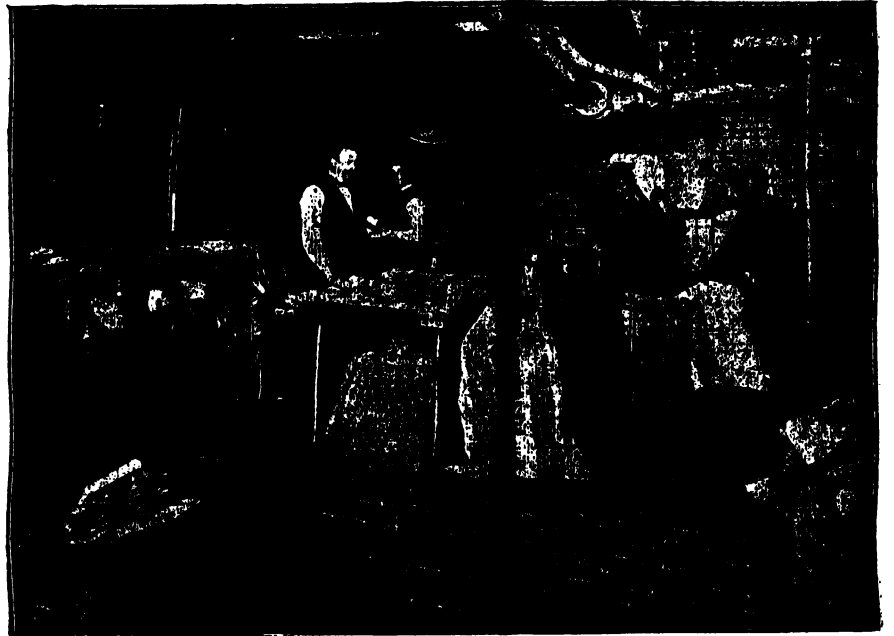
ডাকের জাহাজে, আগেই বলিয়াছি, অনেক আরোহী থাকে। তাহাদের কাহারও প্লেগ, বসন্ত বা ওলাউঠা ইত্যাদি কোন মারাত্মক পীড়া হইতে পারে। এইপ্রকার রোগীকে ডাঙ্গায় নামিতে দিলে সহরে সেই রোগ ছড়াইয়া পড়িবে। এইজন্য বন্দরের ঘাটহইতে একটু দূরে, একটা দ্বীপে জাহাজ লাগান হয়। নিউইয়র্কহইতে ডাক্তারেরা গিয়া তদারক করেন। ইতিমধ্যে নিউইয়র্কের বড় ডাকঘরের কর্ম্মচারীরা "পোষ্টমাষ্টার জেনারেল" নামে ষ্টিমার লইয়া গিয়া বড় জাহাজের ডাকঘরের কর্ম্মচারীদিগের নিকটহইতে চিঠি-পত্রাদি বোঝাই থলিয়া ও বস্তাসকল বুঝিয়া লয়েন। এইবার জাহাজের ডাকঘরের "বাবুরা" যথার্থই বাবু—ডাঙ্গায় নামিয়া তাঁহারা সহরে বেড়াইয়া বেড়ান, আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন—অনেকে আপন আপন বাড়ী চলিয়া যান।

ইউরোপহইতে আমেরিকায়, বিশেষতঃ ইংলণ্ডহইতে নিউইয়র্কে বিস্তর চিঠি যায়। কিন্তু নিউইয়র্কহইতে ইংলণ্ডে আইসে অনেক কম। এই কারণে নিউইয়র্কে গমনকালে জাহাজের ডাকঘরের

কর্ম্মচারীদিগকে বড় বেশী খাটিতে হয়। দিনে এগারঘণ্টা। কলিকাতার ডাকঘরের অনেক বাবুকেও প্রায় এইপ্রকার হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিতে হয়। কিন্তু তাঁহারা পালা করিয়া খাটেন। জাহাজে পালা নাই। নিউইয়র্কহইতে ইংলণ্ডে যাইতে চিঠি-পত্রাদি অনেক কম হয়, সুতরাং নয়ঘণ্টার বেশী খাটিতে হয় না। আবার জাহাজের ডাকঘরের কর্ম্মচারীরা জাহাজে প্রথমশ্রেণীর ঘরে থাকিতে ও প্রথমশ্রেণীর খাওয়া পান। ইহা শুনিয়া আমাদের রেলগাড়ির ডাকঘরের বাবুদের হয়ত "রসনা রসযুক্ত" হইবে। আবার জাহাজে যে বড়ঘরে আহারাদি হয়, সে ঘর খুব বড়; সেখানে লাইব্রেরী আছে—যখন হাতে কাজ না থাকে, ডাকমুন্সিরা তখন এই ঘরে বসিয়া বই পড়েন,—আমাদের "অবকাশপ্রাপ্ত" অনেক বাবুর মত তাস পিটেন না।

নিউইয়র্কে পঁহুছিলে ডাকমুন্সিরা চারিদিনের ছুটি পান। পরে যত দিন কোন জাহাজে যাইবার "হুকুম" না পান, ততদিন এক-একবার বড় ডাকঘরে "হাজরি" দিতে হয়। একই জাহাজে তাঁহাদিগকে সমস্ত বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যাওয়া-আসা করিতে হয় না। প্রতিবারে ভিন্ন ভিন্ন জাহাজে আমেরিকায় যাইতে ও আমেরিকাহইতে ইংলণ্ডে আসিতে হয়। ইহাতে ডাকমুন্সিদের আমোদ ও অভিজ্ঞতা দুইই লাভ হয়। জর্ম্মনি ও আমেরিকার মধ্যে যে ডাকের জাহাজ চলে, তাহাতেও এই ব্যবস্থা। ইহাতে কর্ম্মচারীরা নূতন নূতন স্থান দেখিতে পান।

এ ত হইল, ডাকমুন্সিদের সুখের কথা। এখন দুঃখের কথা বলি। পথে ঝড়-তুফান হইলে বড় কষ্ট। অনেক কর্ম্মচারী প্রাণও হারাইয়াছেন। একবার এক জাহাজ চড়ায় ঠেকিয়া মারা যায় যায় হইল। ঝড়ে জাহাজের কল্-কব্‌জা অনেক ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। জাহাজস্থ সকল লোক প্রাণ হাতে করিয়া হায়-হুতাশ করিতে লাগিল। খালাসিরা প্রাণপণে জল সেঁচিতে লাগিল। ডাকঘরেও জল। প্রধান ডাকমুন্সি দিবারাত্র চৌকি দিতে লাগিলেন। ছয়দিন পরে বন্দরহইতে এক ধুঁয়ার জাহাজ আসিয়া, সকলকে বাঁচাইল। একখানি চিঠিও নষ্ট হইল না। এই জাহাজে ছয়শতবস্তা বোঝাই চিঠিপত্রাদি ছিল।

এইপ্রকার দুর্ঘটনা হয়, কিন্তু খুব কম। বিপদে পড়িলে, ডাকঘরের কর্ম্মচারীরা প্রাণ দিয়াও, চিঠিপত্রাদি রক্ষা করেন। অনেকবার এ প্রকার ঘটনাও ঘটিয়াছে। বিপদে পড়িলে হাল ছাড়িয়া দিতে নাই, সাহসে বুক বাঁধিয়া প্রাণপণে কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিতে হয়।

আমি জানি, আমাদের দেশেও সেকালে কোন কোন ডাকওয়ালা (কাছাড়হইতে মণিপুরে যাইবার পথে) বাঘের হাতে প্রাণ হারাইয়াছে। একজন ডাকওয়ালা চিঠির থলিয়া হাতে করিয়া পথে মরিয়া পড়িয়াছিল, শেষে জানা গেল, তাহাকে সাপে কামড়াইয়াছিল। আমাদের রেলগাড়ির ডাকবাবুদিগকেও রাত্রি জাগিয়া খাটিতে হয়।

প্রভাত-প্রার্থনা।

কত ক্ষুদ্র ও মহৎ—কত কটু ও মধুর কার্য্য ও কর্ত্তব্য বুকে করিয়া দিবা ফিরিয়া আসিয়াছে। পিতঃ, বল দাও, যেন আমরা সেই সমস্ত কর্ম্ম ও করণীয় প্রফুল্ল-মুখে ও প্রসন্ন-চিত্তে—সুপ্রচুর শ্রম ও সুমধুর স্ফূর্ত্তির সহিত সমাধা করিতে পারি,—তুমি আজ আমাদিগকে প্রকৃত মানুষের মত আচরণ করিতে সাহায্য কর। এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা সকলেই আজ উৎফুল্ল-ভাবে আপন আপন কর্ত্তব্য-সাধন করিতে যাই, এবং ক্লান্ত-কলেবরে, সন্তুষ্ট-চিত্তে ও অক্ষুণ্ণ-সম্মানে স্ব স্ব বিরাম-শয্যায় আসিয়া আশ্রয় লই; আর তখন তুমি আমাদের সকলেরই নয়ন-পল্লব সুপ্তি-সুখে মুদ্রিত করিয়া দিও,—আমেন্।

ফুট্‌বল

কাপ্তেনদিগকে সঙ্কেত

ক্রিকেট্‌-খেলায় কাপ্তেনের পদ ও কাজ যত শক্ত ফুট্‌বল্‌-খেলায় তত শক্ত না হইলেও দলের সফলতা সর্ব্বদাই কিছু-পরিমাণে অবশ্য কাপ্তেনের উপরই নির্ভর করে। কাপ্তেনের যে বেশ ভাল বিচারশক্তি থাকা চাই, তাহা বলাই বাহুল্য, কারণ যুদ্ধে যেমন সৈন্যাধ্যক্ষের বিচার-পটুতার উপরই কোন সেনাদলের সফলতা অধিক-পরিমাণে নির্ভর করে, তেমনই ফুট্‌বল্‌-খেলায়ও কোন দলের সফলতা সেই দলের কাপ্তেনের বিচার-নিপুণতার উপরই বেশি-পরিমাণে নির্ভর করে। বিশেষতঃ খেলাটির সঙ্গীন সময়ে কাপ্তেনের যদি বেশ ভাল বিচারশক্তি থাকে, তাহাহইলে বড়ই উপকারে লাগে, এবং তাঁহার যদি বিচারশক্তির অভাব থাকে, তাহাহইলে তাঁহার দলের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠে। তাঁহার দলের লোকদের তাঁহার এমনভাবে চালান উচিত যেন তাহারা বিপক্ষদলের 'কোটে' গিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ এবং খেলোয়াড়মাত্রেরই বড় সাধের ধন "গোলটি" করিয়া তাঁহার দলকে জয়ী করিতে পারে। এদিকে আবার, তাঁহার দলের লোকগুলিকে তাঁহার এমনভাবে রাখা চাই যেন বিপক্ষদল আসিয়া তাঁহার 'কোট' আক্রমণ করিলে তাহারা 'গোল' বাচাইতে পারে। গায়ের জোর থাকিলে কিম্বা তাড়াতাড়ি ছুটিতে পারিলেই যে জেতা যায়, তা' নয়। কিন্তু বেশ মতলব স্থির করিয়া আক্রমণ করা উচিত, আর ফাঁক পাইলেই বেশ বিচার করিয়া কাজ করিলেই জয়ী হওয়া যায়।

ভাল বিচারশক্তির সঙ্গে সঙ্গে কাপ্তেনের আর একটী গুণও থাকা চাই, কারণ দলের সফলতা দুই চারিজন ভাল খেলোয়াড়ের উপরই নির্ভর করে না, সব খেলোয়াড়ই যদি বেশ মিলিয়া-মিশিয়া এক-মন্ত্রণায় কাজ করে তবেই দল জিতিতে পারে। খুব ভাল "টীম"ও যদি একতার সঙ্গে না খেলে তাহা হইলে হারিয়া যাইবে। কিন্তু দলকে একতার সঙ্গে খেলান বিশেষ করিয়া কাপ্তেনের উপরই নির্ভর করে, আর এই কাজ করিতে হইলে কাপ্তেনের বেশ ধৈর্য্য ও স্ফূর্ত্তি থাকা চাই। যে বালকের ঐ দুইটী গুণ নাই, তাহাকে কাপ্তেন করাই উচিত নয়। খেলার সময়ে কাপ্তেনের চেঁচান কিম্বা অনাবশ্যক হুকুম-চালান উচিত নয়। যদি কোন খেলোয়াড় কোন ভুল করে, কাপ্তেনের তাহাকে তাহা আস্তে আস্তে বলিয়া দেওয়াই উচিত, আর যদি সে একা থাকে তাহা হইলে তাহার কি করা উচিত ছিল, তাহাও বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বড় খেলায় স্নায়বিক দুর্ব্বলতার দরুণ অনেক ভুল হয়। যে খেলোয়াড়ের বুক খেলিবার সময় ভয়ে ও উদ্বেগে দুপ্‌ দুপ্‌ করিতে থাকে, তাহাকে ভরসা দেওয়াই উচিত, বকা উচিত নয়। কাপ্তেনের ফুট্‌বল্‌ খেলার আইন-কানুনগুলি ভাল করিয়া জানা উচিত। তাঁহার দল যাহাতে নিয়মভঙ্গ না করিয়া বেশ ভদ্রলোকের মত খেলে তাহার জন্য তাঁহার যতদুর সাধ্য চেষ্টা করা উচিত। দুঃখের বিষয়, পৃথিবীর সব দেশেই এমন কোন কোন লোক ও বালক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা এমন কি খেলাতেও, জিতিবার আগ্রহে সৎ কি অসৎ কি উপায়ে জিতিতেছে তাহা বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখে না। কাপ্তেনেরই তাঁহার দলের আদর্শ হওয়া উচিত। তাঁহার দলকে তাঁহার স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, অসৎ উপায়ে জেতার চেয়ে হারিয়া যাওয়া হাজারগুণে ভাল, আর রেফ্রিকে ঠকাইয়া জেতা একেবারে জঘন্য কাজ। এই রকম করিয়া সে তাহার টীমের উপর প্রচুর প্রভাব-বিস্তার করিতে পারে। কাপ্তেন যেন রেফ্রির সঙ্গে ঝগড়া করার সম্বন্ধে খুবই সাবধান হন,—না তিনি নিজে ঝগড়া করিবেন, না তাঁহার দলের কাউকে ঝগড়া করিতে দিবেন; রেফ্রির নিষ্পত্তিই তাঁহাদের সর্ব্বদা শিরোধার্য্য করা উচিত। যাঁহারা নানারকম খেলা ভালবাসেন তাঁহারা কোন দলকে মাঠে রেফ্রির সঙ্গে তর্ক করিতে দেখিলে বড়ই অপমানবোধ করিয়া থাকেন।

তোমার দল যদি তোমাকে তাহাদের কাপ্তেন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি ঐ পদটি খুবই সম্মানের ও দায়িত্বের বিবেচনা করিও। যদি তুমি উপযুক্ত মনোভাব লইয়া তোমার কর্ত্তব্যগুলি কর, তাহা হইলে উহা তোমার বেশ শিক্ষার বিষয় হইবে। কারণ ঐ কাজে তোমাকে তোমার বিচার-শক্তি, সহিষ্ণুতা ও আত্ম-সংযমের প্রয়োগ ও অভ্যাস করিতে হইবে, এইরূপে তুমি কি করিয়া মনুষ্যগণের অধিনায়ক হইতে হয় সেসম্বন্ধে প্রাথমিক-শিক্ষা পাইবে।

১ম বর্ষ] এপ্রিল, ১৯১২। [৪র্থ সংখ্যা।

কনানার বল্লম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কনানা অমনি বলিয়া ফেলিলেন, "আল্লার নাম করিয়া বলিতেছি, আমি যাইব।" কিন্তু ব্যাপারখানা যে কি, এখনও ভাল করিয়া বুঝেন নাই।

কনানা চিঠিখানি হাতে করিয়া লইয়া বুকের কাপড়ের ভিতর লুকাইতে লাগিলেন, আহত সিপাহী জলভরা করঙ্কটী সাগ্রহে হাতে লইয়া চুমুকে চুমুকে জল খাইতে আরম্ভ করিল, কয়েক ঢোক খাইলে পর করঙ্কটী তাহার হাতহইতে মাটীতে পড়িয়া গেল। সিপাহীর দেহহইতে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

কনানা স্পন্দরহিত অবস্থায় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। চিঠিখানি এক হাতে বুকের কাছে ধরিয়াই আছেন। তাঁহার চক্ষুদুইটী মৃত সিপাহীর মুখপ্রতি চাহিয়া আছে।

তিনি কথা দিয়াছেন, চিঠিখানি লইয়া মক্কায় মহান্ কালিফের কাছে যাইবেন। যেমন তেমন কথা দেন নাই, আল্লার নামে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। যাহাকে কথা দিয়াছেন, তাহার জীবনশূন্য দেহ তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। এ প্রতিজ্ঞার আর অন্যথা হইতে পারে না। এই প্রতিজ্ঞা-রক্ষা করিতেই হইবে, যে কার্য্য করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন, তাহা যত দিন না করা হয়, তত দিন অন্য চিন্তা মনে স্থান দিতে পারেন না। কনানা রাগভরে বলিয়া উঠিলেন, "পিপাসার্ত্ত লোককে এককরঙ্ক জল দিয়া কি এই পুরস্কারলাভ হইল?" অমনি আবার মনে পড়িল, আমি যে লোকদিগের সন্ধানে বাহির হইয়াছি, তাহারাও ত আপাততঃ দক্ষিণ-মুখেই গিয়াছে, অতএব এই উভয় কার্য্যের জন্য আমাকে একই দিকে যাইতে হইবে, কাজেই কালবিলম্ব করা হইবে না।

তিনি মাটীহইতে পাঁচনীগাছটা তুলিয়া লইলেন। এবং দক্ষিণ-অভিমুখী হইয়া মুমূর্ষু সিপাহীর কথাগুলি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে কথাকয়টী যেন তাঁহার কোমল হৃদয়ে গাঁথিয়া গেল। ভাবিয়া দেখিলেন, যে কার্য্যে হাত দিয়াছেন, তাহা আল্লার কার্য্য, আর আরব-দেশের মঙ্গলার্থক। এই চিন্তায় উৎসাহিত হইয়া কনানা যাত্রা করিলেন।

সেই দস্যুদল যে পথে গিয়াছে, সে পথ বাহির করিতে বেশী কষ্ট হইল না। কোন লোকের দল অব্যবহিত পূর্ব্বে মরুভূমিদিয়া গেলে বেদুইন-আরবেরা মনুষ্যের পদচিহ্ন দেখিয়া সেই লোকেরা আরব কি না, তাহা চিনিতে পারে। এমন কি উটের পদচিহ্ন দেখিয়া সেই উট পরিচিত কি না, তাহাও বলিতে পারে, এবং উটের পৃষ্ঠে বোঝা ছিল কি না, এবং সেই বোঝায় কি মাল ছিল, ইহাপর্য্যন্ত বুঝিয়া লইতে, এবং সেই উট সবল কি ক্লান্ত, দ্রুতগতি কি মন্দগতি, তাহা-পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া লইতে পারে। ইহা না পারা বেদুইনের পক্ষে অতি লজ্জার বিষয়।

কনানা মনুষ্যের ও উটের পদচিহ্ন-লক্ষ্য করিয়া দ্রুতপদে দক্ষিণ-অভিমুখে চলিলেন। চলিতে চলিতে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া না পড়িলে আর বিশ্রাম করেন না। বিশ্রাম করিয়া নিজেকে একটু সবল-বোধ করিলেই আবার পথ চলিতে আরম্ভ করেন। কখন কেবল বালুকারাশির উপরদিয়া, কখনও পাহাড় পার হইয়া, কখনও গ্রামের, কখনও বা খর্জ্জুর-বনের ভিতরদিয়া তাঁহাকে পথ চলিতে হইল। কিন্তু লক্ষ্য কেবল মক্কার দিকে।

সকলের আগে শাদা উট।

জগদ্বিখ্যাত মক্কা-সহরের যে ফটকদিয়া কাবাশরিফে যাইতে হয়, সেই ফটকে দুইজন লোক দাঁড়াইয়া আছেন।

তাঁহারা কোন আবশ্যক বিষয়ে একমনে কথা কহিতেছেন, সুতরাং অন্য কোন কিছুতে দৃক্‌পাত নাই। এমন সময়ে একটু দূরে কোন উষ্ট্রচালক চেঁচাইয়া উঠিল।

এই সময়ে আরবদেশের লোকেরা মনে মনে জানিত যে, কোনপ্রকার বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। তাই চিরপ্রচলিত রীতিবিরুদ্ধ কিছু ঘটিতে দেখিলে লোকেরা চমকিয়া উঠিত।

উষ্ট্রচালক স্বাভাবিক চীৎকার করিতেই থাকিল। প্রথম বক্তা কহিলেন—"ইহারা মাল-বোঝাই উটসকল মোয়াবেদি-ফটকে রাখিয়া সহরে আসিতেছে।"

এই দুইজনের মধ্যে যে জনের বয়স অধিক, তাঁহার মুখাবয়বে আন্তরিক দুশ্চিন্তার লক্ষণ দেখা গেল। তিনি কহিলেন, "হয় শত্রু তাড়া করিয়াছে, না হয় কোনপ্রকার প্রয়োজনীয় সংবাদ আছে, তাই ইহারা এত রৌদ্রেও মরুভূমিদিয়া এত তাড়াতাড়ি আসিয়াছে।"

ভাবগতিক দেখিয়া বিলক্ষণ বোধ হইল যে, এই দুইজন লোক মক্কা-সহরে অতি উচ্চ-পদস্থ। ইহাঁদের কাছে বিস্তর কৃষ্ণকায় দাস বা গোলাম দাঁড়াইয়া আছে। কাহাকেও ইহাঁদের নিতান্ত নিকটে আসিতে দেয় না। তবু অনেকে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির কাপড়ের থোপ-স্পর্শ করিবার জন্য ব্যস্ত। অনেকে ফটকদিয়া গমনাগমনকালে, হাঁটু পাতিয়া, মাটীতে কপাল ঠেকাইয়া ইহাঁদিগকে প্রণাম করিতেছে। আগতপ্রায় কারাভানের অপেক্ষায় এই দুই ব্যক্তি ফটকে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বড় কারাভানের সর্ব্বাগ্রে একটা উট থাকে। কোন প্রধান নগরে গমনকালে সেই উটের অগ্রে অগ্রে একজন লোক যায়। এ দেশের নগরের রাস্তা আমাদের পুরাতন দিল্লীর রাস্তার ন্যায় অতি সরু। তাই একজন লোক সকলের আগে থাকিয়া, কোন কিছু বলিয়া চেঁচাইয়া পথিকদিগকে সাবধান করিয়া দেয়। আরব-দেশীয় সহরের রাস্তায় দুই ধারে ফুটপাথ নাই।

দুইজন লোকই চমকিয়া উঠিলেন, এবং এক জন অপর জনের মুখপ্রতি তাকাইলেন। একজন বলিয়া উঠিলেন—

"এমন সময়ে ফটকে কারাভান, সে কি?" এক্ষণে বেলা তিনটা হইবে; সচরাচর কারাভান অর্থাৎ আগন্তুক লোকেরা হয় রাত্রিকালে, না হয় প্রাতঃকালে সহরের ফটকে আসিয়া থাকে।

একদল উষ্ট্র, একটার পরে একটা, হেলিতে দুলিতে সঙ্কীর্ণ পথ বহিয়া ফটকের দিকে আসিতেছে দেখিয়া উক্ত দুইজন প্রধান ব্যক্তির কনিষ্ঠ জন বলিয়া উঠিলেন, "এই যে আসিয়া পড়িল!"

এই কথার উত্তরে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি কহিলেন, "সকলের আগে একটা শাদা উট আসিতেছে।" এই বলিয়া উভয়েই পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অগ্রবর্ত্তী উষ্ট্রটা আর সকল উষ্ট্রহইতে খুব বড়, এবং এইটার রং একটু শাদাটে; লোম কাটিবার আগে শাদা মেষের যে রং, সেই রং। কারাভানের দলপতি এই উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বসিয়াছিলেন, নিতান্ত নিশ্চিন্ত ভাব, অপথ বালুসমুদ্রে যে ভাব, নগরের সঙ্কীর্ণ পথেও সেই ভাব। লোকটা কি তবে নিদ্রিত?

হয়ত এই দলপতি (ইঁহাকে আরব-দেশে "শেখ" বলে) বাস্তবিকই নিদ্রিত, অজ্ঞাতসারে হাতে বল্লম ধরিয়া আছেন, এক পাশে দমেশকীয় মুক্ত তরবারি ঝুলিতেছে।

মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার তন্দ্রা ভাঙ্গিল, কারণ কোঁকাইতে কোঁকাইতে ও বিকট ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করিতে করিতে বালুকাসমুদ্রের জাহাজ-স্বরূপ উষ্ট্রগুলি গজেন্দ্রগমনে কাবার দরবারে পাড়ি জমাইতে আসিতেছিল।

খেলাময় একটী বালক আগত লোকদিগকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "এরা হাজি।" "হাজি" মানে যাত্রী। এই বালক কাবা-শরিফে অনেক যাত্রী আসিতে দেখিয়াছে। সুতরাং ইহারা যে যাত্রী নহে ভাবগতিক দেখিয়া তাহার ইহা বুঝিয়া লওয়া উচিত ছিল। বৎসরের কোন কোন সময়ে এই নগর লোকারণ্যবৎ হয়। শত শত, সহস্র সহস্র হাজি সহরের সঙ্কীর্ণ পথদিয়া গমনাগমন করে। কিন্তু ইহারা মরুদেশের বেদুইন; কোন বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে মক্কায় আসিয়াছে, কাবাশরিফে ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে, কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর-চুম্বন করিতে, জমজমের পবিত্র জল-পান করিতে আইসে নাই।

শাদা উষ্ট্রের চালকের কাঁধে একগাছা দড়ি ও সেই দড়ি উষ্ট্রের লাগামের সঙ্গে বাঁধা ছিল। চালক সেই দড়ি ধরিয়া টান দিয়া উচ্চৈঃস্বরে কি যেন বলিল।

ধীরে ধীরে, উচ্চকায় উষ্ট্রটী গজেন্দ্রগমনেই চলিতে লাগিল; চালকের কথা যেন গায়ে মাখিল না। কেবল ক্লান্তিব্যঞ্জক কাতর ঘড়ঘড়শব্দমাত্র করিল। সর্দ্দার নিজে তাহার পৃষ্ঠে রহিয়াছেন, তবু উষ্ট্র একটু জোরে চলিতে চেষ্টা করিল না।

আমেরিকার আদিমনিবাসীদের পক্ষে শ্বেতমহিষ যেমন, সিংহলীদের পক্ষে শ্বেতহস্তী যেমন আদরণীয়, আরবদিগের পক্ষে শ্বেত-উষ্ট্র তেমনি আদরের ধন। ভাব-গতিক দেখিয়া বোধ হইল, এই শ্বেতউষ্ট্রটী যেন তাহা বুঝে।

উষ্ট্রটী যেন জানিয়া-শুনিয়া মুখ ফিরাইল, শিথিল পাতাগুলিতে চক্ষু প্রায় ঢাকা পড়িল, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যে সকল ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত ও নিজের অপেক্ষা ইতর উষ্ট্র ধৈর্য্যসহকারে, বহু কষ্টে দীর্ঘ পথ চলিয়া পুণ্যভূমি মক্কানগরে আসিয়া পঁহুছিয়াছে, সেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

অনেকক্ষণ এইরূপ করিলে পর, চালক আবার কি বলিল, তাহাতে বৃদ্ধ উষ্ট্র ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইয়া আনিল। কাজটা যেন মনের মত হইল না, তাই রজ্জুধারী চালকের প্রতি বিরক্তিজনক কটাক্ষপাত করিল।

এই বৃদ্ধ উষ্ট্র চালকের জন্মের বহুপূর্ব্বে মক্কার দরবারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, হয়ত চালক বৃদ্ধ হইয়া মরিয়া গেলে পরেও এই উষ্ট্র মক্কায় আসিবে, এবং বহু উষ্ট্রকে পথ দেখাইয়া আনিতে থাকিবে।

যদি মানুষের মত কথা কহিতে পারিত, তবে এই বৃদ্ধ উষ্ট্র হয়ত চালককে বলিত, "তুমি ব্যস্ত বটে, কিন্তু আমি ব্যস্ত নই।" ভাবভঙ্গীদ্বারা এই ভাবপ্রকাশ করিয়া উষ্ট্রটী কৃষ্ণবর্ণ পর্দ্দা-আবৃত কাবার দিকে তাকাইল, তাকাইয়া যেন দেখিতে লাগিল, শেষবারে যখন আসিয়াছিল, কাবা ঠিক সেইরূপ আছে, কিম্বা কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

এই কাবা মুসলমানদের মহাপবিত্র স্থান, আর যত পুণ্য-মন্দির আছে, সে সকলের অপেক্ষা অধিক ভক্তিশ্রদ্ধার ভাজন। কিন্তু এই মন্দিরের পাশে যে দুই-তিনটী খর্জ্জুর-বৃক্ষ জন্মিয়াছিল, বৃদ্ধ উষ্ট্রের কোমল ও সতৃষ্ণ দৃষ্টি সেই দিকেই ছিল। এখানে আর কোনপ্রকার বৃক্ষ-লতা ছিল না। কাজেই উষ্ট্রটী যখন বুঝিতে পারিল যে, গলা বাড়াইয়া খর্জ্জুর-বৃক্ষ ধরিতে পারা যাইবে না, তখন অগত্যা মাথা নোওাইল, এবং আবার শ্রান্তিব্যঞ্জক ঘড়ঘড়শব্দ করিয়া, হাঁটুর উপর, পরে জানুর উপর মাথা রাখিল। পরে এক দীর্ঘ-নিশ্বাস-ত্যাগ করিয়া আবার মাথা তুলিল, চালকের মাথার অনেক উপরে তুলিল, এবং কাতর দৃষ্টিপাত করিয়া যেন বলিল, "বটে, আমি তোমায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিলাম, কি বল?"

অনন্তর বৃদ্ধ উষ্ট্র অন্য দিকে মাথা ফিরাইল। এই পাশদিয়া বিস্তর লোক যাইতেছিল, কিন্তু একজন বড় তাড়াতাড়ি চলিতেছিল; বৃদ্ধ উষ্ট্র মুখদিয়া তাহারই কাপড়-স্পর্শ করিল, বোধ হইল, সেই লোকটী যেন তাহার পরিচিত।

এই লোকটী বেদুইন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু পাগড়ির কাপড়ের দুই খোঁট মুখের উপর পড়িয়াছিল, তাই কেহই তাহার মুখ দেখিতে পাইতেছিল না। এই লোকটীও বৃদ্ধ উষ্ট্রকে চিনিতে পারিল, তাই উষ্ট্রটীর নাকে হাত বুলাইয়া চলিয়া গেল। এই চমৎকার ঘটনা কাহারও চক্ষুতে পড়িল না; লোকটী মুহূর্ত্তমধ্যে পথিকদিগের দৃষ্টির অগোচর হইল।

একটী বালক আগে আগে চলিয়া, লোকটীকে বরাবর ফটকের দিকে লইয়া গেল, ফটকে পঁহুছিয়া থামিল, এবং যে দুইজন লোক তথায় দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তাঁহাকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, "ঐ উনি।"

বেদুইন মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন, পরে ত্রস্তভাবে অগ্রসর

হইয়া, ভক্তিভাজন সৌম্য-মূর্ত্তি-ব্যক্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, পরে উঠিয়া তাঁহার হস্তে ছোট একতাড়া কাগজ দিলেন। বলিলেন, "ইহাতে যে সংবাদ আছে, তাহা কালিফের জন্য।"

মহান্ কালিফ অমনি মোহর ভাঙ্গিয়া তাড়া খুলিয়া, চিঠি-পাঠ করিলেন; পরে পত্রবাহকের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তা তুমি কে, বল দেখি?"

"আমার নাম কনানা, আমি বেনি-সৈয়দ-জাতীয় শেখের পুত্র।" কনানা এই কথা বলিতে বলিতে মুখের উপরহইতে কাপড়ের খোট সরাইয়া ফেলিলেন।

তাঁহার মুখখানি দেখিতে পাইয়া কালিফ কহিলেন, "তাই ত, তুমি যে নিতান্ত ছেলেমানুষ, এখনও গোঁপ দেখা দেয় নাই। এই চিঠির ভিতরে কি খবর আছে, তা কিছু জান?"

মৃত্যুকালে যে যে কথা কহিয়া সেই আহত সিপাহী তাঁহার হাতে চিঠি দিয়াছিল, কনানা তাহা বলিলেন। কথাগুলি সমস্ত পথ তাঁহার মনে জাগিতেছিল।

কালিফ বলিলেন, "বটে! সে ধড়ে প্রাণ থাকিতে কেমন করিয়া এমন দরকারি চিঠি দিয়া তোমাকে একা এখানে পাঠাইল?"

"হোরেব-পর্ব্বতের তলভূমি-হইতে এই চিঠি লইয়া আমি একাই এত পথ আসিয়াছি।" এই কথা বলিতে বলিতে কনানা একটু গর্ব্বিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কালিফ শুনিয়া আশ্চর্য্য মানিলেন।

অনন্তর কি অবস্থায় চিঠিখানি তাঁহার হাতে আসিয়াছিল, এবং পথে তিনসপ্তাহকাল কত কষ্ট, কত বিপদ্ ঘটিয়াছিল, সে সকল কনানা সংক্ষেপে বলিলেন। শেষে কহিলেন, "এইরূপে এই চিঠি বুকে করিয়া এতদূর আসিয়াছি।"

কালিফ কহিলেন, "বেশ বেশ; সাবাস, সাবাস! মরুভূমির সিংহের পুত্রই বটে। ঈশ্বর করুন, আরবমাত্রেই যেন তোমার মত সাহসী হয়, তাহা হইলে হিরাক্লিউস্ নিজে পৃথিবীর সমস্ত সৈন্যসামন্ত লইয়া আসিলেও আরবজাতিকে মরুভূমিহইতে এক পদও হটাইতে পারিবে না। আরবজাতিকে এক পদও নড়িতে হইবে না। মহম্মদের দাড়ির দিব্য, কাহাকেও নড়িতে হইবে না। শুন, বৎস! পরে তোমার সঙ্গে আমার আরও কথা হবে। এখানে দাঁড়াইয়া সে সব কথা কহিতে নাই। আমার একজন দাসের সঙ্গে তুমি আমার বাটীতে যাও। আমি একটু পরেই আসিতেছি যাও, ঈশ্বর তোমার সঙ্গী।"

একজন দাসকে কনানাকে লইয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া, কালিফ উমর অমনি সঙ্গী লোকটীর দিকে ফিরিয়া চিঠিখানি দেখাইলেন।

৬

কালিফের সহিত কনানার কথা।

কৃষ্ণাঙ্গ দাসের সঙ্গে কনানা ফটকের বাহির হইয়া মক্কাসহরের পথদিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিলেন। প্রথমবার এই নগরে আসিলে নগরের আশ্চর্য্য ব্যাপারসকল দেখিয়া, লোকে স্বভাবতঃ কত কি ভাবে, কিন্তু কনানার মন সেপ্রকার ভাবনায় আকুল হইল না।

নগরের পথগুলি, আমাদের বারাণসী-নগরের রাস্তার মত, অতি সঙ্কীর্ণ। নগরের পথে সিপাহী, সওদাগর, বেদুইন ও সহর-নিবাসী সকলপ্রকার আরব দেখিতে পাওয়া যায়। লোকের যেসকল জিনিষ না হইলে নয়, সেসকল এবং বিলাসীদের উপভোগ্য নানাদ্রব্য নগরের রাস্তায় রাস্তায় বিক্রীত হইতেছে। ভিস্তিরা জলের "মশক" পৃষ্ঠে করিয়া চলিয়াছে; বারকোশে নানাপ্রকার ফল লইয়া ফিরিওয়ালারা চীৎকার করিতেছে; বোঝা পীঠে করিয়া গাধা চলিয়াছে, বোঝাগুলি এত বড় যে, বহনকারী গাধাকে প্রায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না; পর্ব্বতাকার বোঝা পৃষ্ঠে করিয়া উষ্ট্রেরা অবহেলে হেলিয়া-দুলিয়া চলিয়াছে; ভারী ভিড়, বালক ও বয়স্ক লোকেরা ঠেলাঠেলি করিয়া পথ চলিতেছে।

কনানার সঙ্গী অসভ্য কৃষ্ণকায় দাসকে দেখিয়া সকলেই পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল, মহান্ কালিফের দাসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাওয়াতে কনানাকে মানুষ ঠেলিয়া পথ চলিতে হইল না।

এই বেদুইন-বালকের এই প্রথমবার "নগর" দেখা হইল। ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তাঁহাকে পুণ্য-মক্কা-নগরের বালিপেটা রাস্তায় চলিতে হয় নাই।

"নামাজ" পড়িতে শিখিয়া অবধি কনানা দিনের মধ্যে তিনবার কাবার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আজি ফটকদিয়া ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে সেই কৃষ্ণপর্দ্দাযুক্ত কাবা বেইতল্লা বা ঈশ্বরের গৃহের প্রতি সভক্তি দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়াই চলিয়া গেলেন।

তিনি কৃষ্ণাঙ্গ দাসের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, পথের উভয়-পার্শ্বস্থ বাটীসকলের দিকেও বড় একটা দৃষ্টিপাত করিলেন না।

তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করা হইল। তিনি
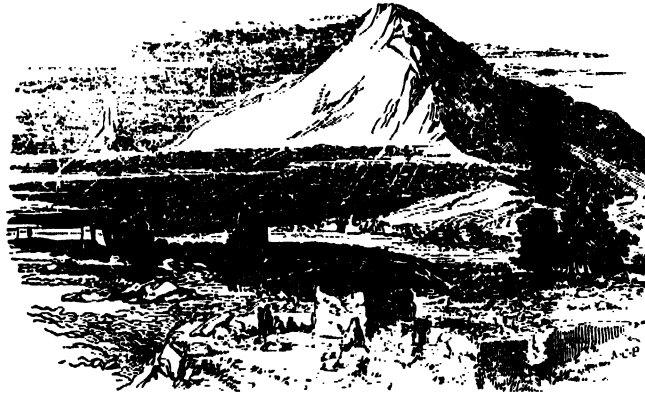
অতি যত্নে নানা কষ্ট সহিয়া নানা বিপদের মধ্যদিয়া যে কাগজের তাড়া বুকে করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা পঁহুছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব যে কার্য্যসাধন করিবার মানসে তিনি বেনি-সৈয়দের শস্য-চৌকি দেওয়া কাজ ফেলিয়া এত পথ আসিয়াছেন, এক্ষণে অবাধে সে কার্য্য-সাধনের চেষ্টা করিতে পারিবেন।

যে দাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যাইতেছিলেন, ভাবিলেন, যদি ডাহিনে বা বামে সরিয়া পড়ি, এ কিছু বলিবে না ত ?

রসিদ বরকত ভ্রাতাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। পিতার মুখে এই কথা শুনিয়াই কনানা বাহির হইয়াছিলেন, এক্ষণে বোধ হইল, সে যেন অনেকদিনের কথা। তদবধি তাঁহাকে বহুকষ্ট-ভোগ করিতে হইয়াছে। অনেক সময়ে তাঁহার প্রাণ যায় যায় হইয়াছে। মাচায় বসিয়া পাখী-তাড়ান এক্ষণে যেন তাঁহার পক্ষে স্বপ্নের কথা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কারণ, এক্ষণে তাঁহার জীবনের বিস্তর অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। পিতার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন, তাহা রক্ষা করিবার বাসনা ক্রমশঃ প্রবলা হইয়া উঠিয়াছে। কাজটা যে কত বড় দুঃসাধ্য, এক্ষণে তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন; তাই পিতা যে বলিয়াছিলেন, "রসিদ বরকত আগুন আর তুই পতঙ্গ; রসিদ বরকত ঘূর্ণা-বাতাস, তুই একগাছা নলমাত্র।" এই উক্তির অর্থ কনানা এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন। তথাপি আপনার বর্ত্তমান অবস্থার দায়িত্ব ভাবিয়া আশায় বুক বাঁধিলেন।

আর যে একটী কাজের ভার তাঁহাকে লইতে হইয়াছিল, কনানা অনেক বিপদ্-অতিক্রম করিয়া সে কার্য্যটীও উদ্ধার করিয়াছেন। আর কাবার ত্রিসীমানার মধ্যেই মক্কার কালিফ তাঁহাকে সাহসী বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

এক্ষণে অপর কার্য্যটী উদ্ধারকরণার্থ কনানা ব্যস্ত। কালিফের সঙ্গে আবার দেখা করিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না। তাই কনানা ভাবিলেন, পাশ কাটাইয়া কোন গলিতে ঢুকিয়া এই কৃষ্ণকায় দাসের হাত এড়াইতে পারিলে, একবার দেখি, কি করিতে পারি।

এই প্রথমবার কনানা আশে-পাশে তাকাইলেন। তথাপি পাশ কাটাইবার সুযোগ ঘটিয়া উঠিল না। কিন্তু সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সেই দাস এক প্রকাণ্ড ফটকে ঢুকিয়া পাথরে বাঁধান এক উঠান পার হইয়া চলিল, খাগড়ার একটা চিক্ তুলিয়া পাথরের এক প্রকোষ্ঠে গেল, এবং কনানাকে এক কুঠরীতে গিয়া, কালিফের আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে বলিল। আর সরিয়া পড়া হইল না। "নসিবে" যা আছে, তাই ঘটিবে, ভাবিয়া কনানা ধৈর্য্য ধরিয়া একখানি থলিয়ায় বসিয়া রহিলেন। বেদুইনেরা বাল্যকাল হইতে "নসিব" মানিতে শিখে। এই কক্ষে ভাল ভাল ফর্শ-বিছানা, তাকিয়া ও পারস্যদেশের রাজাদের বাটীহইতে আনীত গালিচা-দুলিচা ছিল। কিন্তু মরুভূমিতে যেপ্রকার সামান্য আসনে বসিয়া আসিয়াছেন, কনানা সেই প্রকার আসনেই বসিলেন। মাচায় যেমন করিতেন, তেমনি পাঁচনী পাশে রাখিয়া হাঁটুতে মুখ রাখিয়া বসিয়া রহিলেন। এইটী উমরের কাছারী-বাটী; মধ্যে মধ্যে বাটীর জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কনানার ধ্যানভঙ্গ হইতে লাগিল।

কি করিলে কি হইবে, কেমন করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে, কনানা এই চিন্তায় এমন মগ্ন হইলেন যে, কোথায় রহিয়াছেন, তাহা ভুলিয়া গেলেন। এমন সময়ে খাগড়ার চিকে নাড়া পড়াতে একপ্রকার শব্দ হইল। ধ্যানভঙ্গ হইলে কনানা চক্ষু মেলিয়া দেখেন, মহান্ কালিফ আসিতেছেন।

কালিফ আসিয়া যতক্ষণ না ফর্শ-বিছানায় বসিলেন, কনানা ততক্ষণ সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হইয়া রহিলেন। অনন্তর কনানা উঠিয়া পাঁচনীতে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বৃদ্ধ কালিফ তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কনানার বোধ হইল, কালিফের সুতীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী চক্ষু যেন তাঁহার হৃদয়ের গুহ্যদেশপর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতেছে।

মুসলমান-ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ উন্নতি অবনতির নির্ভর কালিফ উমরের উপর; মহম্মদকে যাহারা পয়গম্বর বলিয়া মানে, কালিফের মুখের কথাই তাহাদের পক্ষে শাস্ত্র। রাখাল-বালকের সঙ্গে কথা কহিবার অবকাশ কালিফের নাই, তথাপি তিনি অনেকক্ষণ বসিয়া নীরবে কনানাকে দেখিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে, কেমন করিয়া সেই চিঠি তিনি পাইলেন, কেমন করিয়া এত পথ চলিয়া একাকী মক্কায় আসিলেন, এই বিষয়ে দুই-এক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন মাত্র।

কনানার কথা শেষ হইলে কালিফ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে কাজ করিয়াছ, অনেক সাহসী বীরপুরুষেরও এ কাজে হাত দিতে সাহসে কুলায় না। কি পুরস্কার চাও, বল।"

(ক্রমশঃ।)

ফুট্‌বল

সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ফুট্‌বল্-খেলার মত আর কোন খেলাই সম্ভবতঃ জগৎশুদ্ধ লোকের প্রিয় হইয়া উঠে নাই। এই খেলা ভারতবর্ষেও যে দিন দিন বেশি প্রিয় হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই জন্য এই খেলার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ "বালকের" পাঠকদের আশা করি, পড়িতে ভাল লাগিবে। কোন্ দেশে কোন্ সময়ে এই খেলা প্রথমে আরম্ভ হয়, তাহা বলা একেবারে অসম্ভব। অনেক লোকের এই ধারণা ছিল যে, ইংলণ্ডেই এই খেলার সূত্রপাত হয়, কিন্তু এখন অনেকের মত এই যে, ফুট্‌বলখেলার মত কোন খেলা প্রাচীন গ্রীস ও রোমে খেলা হইত, আবার আজকাল অনেকে বলিতেছেন যে, চীনদেশেই প্রথমে ফুট্‌বল-খেলা আরম্ভ হয়।

যে দেশেই এই খেলা প্রথমে আরম্ভ হউক না কেন, ইহা অনেক দিনের খেলা, আর অনেক দেশেই এই খেলা কোন-না-কোন রকমে খেলা হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে প্রথম প্রথম এই খেলা যে বড় বিপদ্‌জনক ছিল, তাহার প্রমাণ আইন করিয়া এই খেলা সেখানে বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা হয়। ১৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা তৃতীয়-এড্‌ওয়ার্ড এই খেলা বন্ধ করিয়া দেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি যে আইন করিয়াছিলেন সেই আইনে উহার ফুটবলনামই পাওয়া যায়। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজারাও এই খেলা উঠাইয়া দিবার জন্য আইন-কানুন করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ সকল চেষ্টা সত্ত্বেও এই খেলার চমৎকার উন্নতি হইয়াছে। আজকাল ইংলণ্ডের সব জায়গায় সকল রকমের লোকে উহা খেলিয়া থাকে।

এই খেলার বড়ই পরিবর্ত্তন ও বিকাশ হইয়াছে। কোন্ অবস্থায় এই খেলার এই রকম পরিবর্ত্তন ও বিকাশ হইয়াছে তাহা জানিতে অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বোধ হয়, এখন যেমন, সে কালেও তেমনই দুই "গোলের" মধ্যে জোর করিয়া বল্‌টি ঢুকানই এই খেলার আসল কাজ ছিল। তখন গাছ, পাথর কিম্বা অন্য কোন সুবিধাজনক জিনিসকে "গোল" করা হইত, এখনও যেমন পাড়াগাঁয়ে দেখিতে পাওয়া যায়, ছেলেরা দুইটী পাথর লইয়া "গোল" করিয়াছে। তখন রাস্তায়, মাঠে কিম্বা কোন খোলা জায়গায় এই খেলা হইত, আর শুনা যায়, দুইদলের গোলের মধ্যে সময়ে সময়ে কয়েকমাইলের ব্যবধান থাকিত। সম্ভবতঃ তোমরা অনেকে জান যে, এখন এই খেলায় দুইটি আলাহিদা ভাগ হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম "রাগ্‌বী," দ্বিতীয় "য়্যাসোসিয়েশন্"। প্রথম রকমের ফুট্‌বল-খেলায় খেলোয়াড়-দের হাত দিয়া বল্ ধরিতে এবং হাতে করিয়া বল্ লইয়া যাইতে দেওয়া হয়, দ্বিতীয় রকমে কিন্তু এক "গোল-কীপার্"কে ছাড়া আর কাহাকেও বলে হাত দিতে দেওয়া হয় না, "গোল-কীপার্"ও বল লইয়া যাওয়ার সম্বন্ধে কড়া আইনের অধীন।

অনেকের অনুমান এই, প্রাকৃতিক কারণে এই খেলাটি এখন এত বদ্‌লিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের রাগ্‌বীস্কুলের মত যেখানে বড় মাঠ আছে, সেখানে বল্ লইয়া ছুটা আর যে ছেলে বল লইয়া ছুটিতেছে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া দেওয়া প্রভৃতি করিলেও বিপদের ভয় নাই। কিন্তু অনেক স্কুলে প্রাচীর-ঘেরা সান-বাঁধান খেলিবার স্থান ছিল, সেখানে ছেলেদের ধাক্কাধুক্কি কিম্বা হাত-কাড়াকাড়ি করিতে দিলে কোন ছেলে পড়িয়া গেলে তাহার ভারি লাগিত, সেইজন্য সেখানে হাতে করিয়া বল্ লইয়া যাইতে ও বিপক্ষকে ধরিতে দেওয়া হইত না। প্রথমে যতগুলি ইচ্ছা ছেলে লইয়া এই খেলা হইত। তাহারা দুইদলে ভাগ হইয়া যাইত। তখন নিয়ম অল্পই ছিল, আর যাহারা ইচ্ছা করিত খেলিতে পারিত। এখন খেলাটিকে ভাল করিয়া নিয়মের অধীন করা হইয়াছে, আর এখন ইহা বেশ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খেলা হয়।

বাঙ্গালীর ছেলেরা য়্যাসোসিয়েশন্ ফুট্‌বলই খেলিতে ভালবাসে। এই য়্যাসোসিয়েশন-ফুট্‌বল খেলিবার মাঠ সচরাচর ১২০ গজ লম্বা এবং ৮০ গজ চৌড়া হয়। গোলের খুঁটি দুইটির মধ্যে ৮ গজ ব্যবধান থাকে, আর ঐ খুঁটী দুইটীর আটফিট্ উপরে একটা কাঠ আড়াআড়ি জোড়া থাকে। গোলের খুঁটীদুইটীর পিছনে একখানা জাল থাকে, তাহারই ভিতরে বল ঢুকাইতে হয়। প্রত্যেক দলে এগারজন করিয়া খেলোয়াড় থাকে,—পাঁচজন ফর্‌ওয়ার্ড, তিনজন হাফ্-ব্যাক্, দুইজন ব্যাক্ ও একজন গোল-কীপার্। আমরা পরে অন্য অন্য প্রবন্ধে এক-একজন খেলোয়াড়ের কথা বিশদ-ভাবে বলিব।

ছেলেদের চোট্ লাগিতে পারে এই ভয়ে অনেকে ফুট্‌বল খেলিতে বারণ করিয়া থাকেন। এ কথা সত্য যে, কখন কখন কোন কোন খেলোয়াড় গুরুতরভাবে আহত হয়, কিন্তু আঘাত আমাদের সকল কাজেই লাগিবার সম্ভাবনা আছে, এবং ফুট্‌বল-খেলায় লোকে যতটা বিপদের ভয় করেন, বাস্তবিক ততটা বিপদ্ নাই। ফুট্‌বল খেলিয়া আমরা যে অনেক বিষয়ে মূল্যবান্ শিক্ষা-লাভ করি, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। যদি এই খেলাটি উপযুক্ত মনোভাব লইয়া সুশৃঙ্খলার সঙ্গে খেলা হয়, তাহা হইলে ছেলেরা যে কেবল শ্রমসহিষ্ণু হয়, তাহা নয়, তাহারা আপনাকে আপনারা সংযত করিতে এবং নিজের দলের মঙ্গলের জন্য আপনার স্বার্থবলি দিতেও শিখে। ইহাতে ছেলেরা নির্ভীক হয়, এবং শীঘ্র

Photograph by De Luca & Co.

"মোহন-বাগান "ফুট্‌বল-টীম"। ইঁহারা ১৯১১ সালে বড় "শিল্ড"-খানি পাইয়াছেন।

শীঘ্র ইতিকর্ত্তব্য-স্থির করিতেও অভ্যস্ত হয়। অনেকে এই শ্রেণীর খেলাগুলির দ্বারা যে শিক্ষা পাওয়া যায় তাহা এমনই মূল্যবান্ মনে করেন যে, কাহাকেও কোন দায়িত্বের কাজ দিতে হইলে যে ছেলে স্কুলে কেবল পড়া-শুনা লইয়া ছিল তাহাকে না দিয়া যে ছেলে খেলায় ভাল ছিল, তাহাকেই দিয়া থাকেন। কারণ যাহাকে লোকজন চালাইয়া চলিতে হইবে, তাহার ফুট্‌বল বা অন্য কোন খেলায় যে শিক্ষালাভ হয়, তাহা লাভ করা একান্ত আবশ্যক। তা'ছাড়া ছেলেদের নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ ব্যায়াম করা বড়ই আবশ্যক। এখনকার স্কুল ও কলেজের অনেক ছেলে অতিরিক্ত পড়িয়া শরীর মাটী করিতেছে এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য স্বাস্থ্য হারাইতেছে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

বাঙ্গালাদেশে ফুট্‌বল-খেলার দিন দিন খুব উন্নতি হইতেছে দেখিয়া আমরা বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আর বছরে মোহন-বাগান-ক্লাবের জয়ে লোকে অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ ও উল্লাস-প্রকাশ করিয়াছে, ইহাতে এই খেলাটি এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার আরও সুবিধা হইয়াছে। বাঙ্গালী "টীমের" জয়ে তাঁহাদের ইংরাজ-প্রতিপক্ষেরা যত আনন্দ-প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইবেন এত আর কেহই হইবেন না এবং বন্ধুভাবে এই দুই প্রতিপক্ষদল একত্র খেলা করিলে যত এই দুই জাতির মধ্যে সদ্ভাব বাড়িবে, এত আর কিছুতেই বাড়িবে না। ফুট্‌বলের মত খেলা ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর লোককে যে ভাবে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলে, আর কিছুই তাহা তেমন ভাবে পারে না। যাহারা প্রকৃত খেলোয়াড় তাহারা তাহাদের অপেক্ষা ভাল দলের কাছে হারিয়া গেলে খুসীই হয়। ফুট্‌বল ও ক্রিকেট-খেলোয়াড়দের মধ্যে যে রকম সম্প্রীতি দেখা যায় তাহাই প্রমাণ করে যে, সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারহইতে মানুষকে মুক্ত করিবার পক্ষে এই খেলাগুলি অমূল্য বস্তু। অতএব বাঙ্গলায় ফুট্‌বল-খেলা দীর্ঘজীবী হউক।

ওকালতি।

প্রিয়বৎসগণ,

তোমাদের সম্পাদক মহাশয় আমাকে একটী হুকুম করিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি চান যেন আমি ওকালতি-সম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু লিখিয়া পাঠাই। তোমরা বড় হইলে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কোন্ কাজ মনোনীত করিবে তাহা যেন তোমরা উপযুক্ত রূপে বিবেচনা করিয়া ঠিক করিতে পার, এইজন্য মাসে মাসে ভিন্ন ভিন্ন কাজ-কর্ম্মসম্বন্ধে তোমাদিগকে অনেক আবশ্যক পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। ওকালতি-সম্বন্ধে আমার কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই এই গুরুতর দায়িত্ব-গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের দেশের লোকের ওকালতির দিকে বিশেষ একটা টান আছে, আর এইজন্য অনেকেই উকীল হইতে চাহে। ইহার কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ—ইহা স্বাধীন ব্যবসা। ইহাতে কাহারও অধীনে কাজ করিতে হয় না। মানুষ স্বভাবতঃ স্বাধীনতাপ্রিয়, কাজেই স্বাধীন ব্যবসা ভালবাসে। দ্বিতীয়তঃ—ভাল উকীল কিম্বা ব্যারিষ্টার হইতে পারিলে অনেক টাকা-উপার্জ্জন করিতে পারে। লোকে অর্থ ভালবাসে, সুতরাং যে ব্যবসায়ে গেলে অনেক টাকা-উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, লোকে সেই ব্যবসা মনোনীত করিতে চাহে। তৃতীয়তঃ—উকীল-ব্যারিষ্টারেরা প্রায়ই দেশের মধ্যে নেতা বলিয়া পরিগণিত। বড়লাট ও ছোটলাটের সভায়, মিউনিসিপ্যালিটিতে, ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডে উকীলব্যারিষ্টারেরাই প্রায় সভ্য হইয়া থাকেন। দেশের মধ্যে কোন সাধারণ-বিষয়ের আলোচনা হইলে তাঁহারাই অধিকাংশ সময়ে মত দেন ও তাঁহাদের কথা লোকে ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ ও তাঁহাদিগকে নেতা বলিয়া স্বীকার করে। দেশের আইন-কানুন-তৈয়ারি করিবার সময় গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করেন। চতুর্থতঃ—ভাল উকীল কি ব্যারিষ্টার লোকের প্রকৃত উপকার করিতে পারে। দুর্দ্দান্ত জমীদারের হাতহইতে কত নিরীহ প্রজাকে উকীল-ব্যারিষ্টারে বাঁচাইয়াছে; উকীল-ব্যারিষ্টারের গুণে কত লোক ফাঁসি কিম্বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরহইতে রক্ষা পাইয়াছে। সময়ে সময়ে এমন কঠিন মকদ্দমা উপস্থিত হয় যে, জজেরা পর্য্যন্ত উকীল-ব্যারিষ্টারের উপর অনেকটা নির্ভর করেন। ভাল উকীল কি ব্যারিষ্টারকে জজেরা এতদূর পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেন যে, তাঁহাদের কথায় তাঁহারা কোন সন্দেহ করেন না।

উপরে যাহা বলিলাম তাহাহইতে তোমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, ওকালতি একটী অতি মহৎ ও উৎকৃষ্ট ব্যবসা ও একজন ভাল উকীল কি ব্যারিষ্টারকে দেশের একটী উজ্জ্বল রত্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু এই ওকালতিতেও কতকগুলি বিশেষ পরীক্ষা আছে, আর সে সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান হওয়া আবশ্যক। এই ব্যবসা মনোনীত করিবার পূর্ব্বে তোমাদের সেই পরীক্ষাগুলি যে কি, তাহা বিশেষ করিয়া অবগত হওয়া উচিত। যদি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পার, তাহা হইলে কি জানি তোমরা মনুষ্যত্বহীন হইয়া পশুর অধমও হইতে পার। সেইজন্য এই ব্যবসা মনোনীত করিবে কি না সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে, এই ব্যবসায়ে কি কি পরীক্ষা আছে তাহা জানিতে পারিলে তোমাদের বিশেষ উপকার হইতে পারে।

উকীলের সর্ব্বপ্রথম চিন্তা এই যে, তাহার হাতে যে মকদ্দমাটী

আসিয়াছে তাহাতে সে কি করিয়া জয়লাভ করিতে পারিবে। কেননা যে পরিমাণে মকদ্দমায় জয়লাভ করিতে পারিবে সেই পরিমাণে তাহার পসার দিন দিন বাড়িতে থাকিবে। "হেরো" (অর্থাৎ যে হারিয়া যায়) উকীলকে কেহ মকদ্দমা দিতে চাহে না। যাহার মকদ্দমা (এক কথায় ইহাকে "মক্কেল" বলে) সে উকীলের কাছে আসিয়া তাহার মকদ্দমার আমূল বৃত্তান্ত বলে। উকীল মকদ্দমার সমস্ত বিষয় শুনিয়া যদি বুঝিতে পারে যে, তাহার মক্কেল তাহার কাছে যে ভাবে মকদ্দমাটী বিবৃত করিল, সেইভাবে মকদ্দমা বিচারকের সম্মুখে লইয়া গেলে জয়লাভের আশা বড় কম কিম্বা একেবারেই হারিয়া যাইতে হইবে, তখন সে মক্কেলকে বলিতে আরম্ভ করে—"দেখ, ও ভাবে মকদ্দমা করিলে চলিবে না; মকদ্দমাটী এইভাবে করিতে হইবে। আর যদি এইভাবে মকদ্দমা করিতে না পার, তাহা হইলে মকদ্দমায় হার হইবে।" মক্কেল তখন অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উকীলকে বলে—"যে ভাবে মকদ্দমা করিলে আমার জয়লাভ হইবার সম্ভাবনা, সেইভাবে মকদ্দমাটী ঠিক করিয়া দিউন, আর তাহার জন্য কি কি প্রমাণ-সংগ্রহ করিতে হইবে আমাকে বলিয়া দিলে আমি সেইভাবে প্রমাণ-সংগ্রহ করিব।" তখন উকীল মকদ্দমায় জিতিবার জন্য সত্যকে মিথ্যা করিয়া আর মিথ্যাকে সত্য বলিয়া দাঁড় করাইবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করে।

একটী গল্প বলি শুন। গল্পটী সত্য। এক সময়ে আমি একটী সরকারী উকীলের সেরেস্তায় বসিয়াছিলাম। একটী বড় ফৌজদারী মকদ্দমা চলিতেছিল। পুলিশের লোকে প্রতিদিন আসিয়া সরকারী উকীল মহাশয়কে মকদ্দমা বুঝাইয়া দিত। একদিন সরকারী উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই বিষয়টী প্রমাণিত করিবার জন্য তোমার কয় জন সাক্ষী আছে?" পুলিশের লোক বলিল, "এ বিষয়টী প্রমাণিত করিবার আবশ্যকতা হইবে তাহা আমি বুঝি নাই, এ সম্বন্ধে প্রমাণ দিবার জন্য আমার কোন সাক্ষী নাই।" সরকারী উকীল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আমি কাল এই বিষয়টী প্রমাণিত করিবার জন্য নিদানপক্ষে দুইটী সাক্ষী চাই, নতুবা তুমি মকদ্দমা ভাল করিয়া তদারক কর নাই বলিয়া তোমার নামে তোমার উপরওয়ালাদের কাছে রিপোর্ট করিব।" বলা বাহুল্য তৎপরদিবসে বেলা ১০টার পূর্ব্বেই পুলিশ দুইটী সাক্ষী-সংগ্রহ করিয়া উকীল মহাশয়ের কাছে হাজির করিয়া দিল ও জজ-সাহেবের কাছে তাহারা হলপ করিয়া জোবানবন্দী করিল।

শিলংএর একটী হ্রদ।

এইটী দৃষ্টান্তস্বরূপে তোমাদিগকে বলিলাম। কিন্তু এই প্রকারের কাজ আদালতে প্রতিদিন যে কত হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই।

আর একটী পরীক্ষার বিষয় বলি শুন। মক্কেলেরা অনেক সময় উকীলের কাছে তাহাদের সমস্ত সাক্ষী আনিয়া বলে—"মহাশয়, আমার সাক্ষীগুলি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লউন। ইহারা যে সাক্ষী দিবে তাহা একবার শুনুন। আর যদি দরকার হয়, তবে কি বলিতে হইবে তাহা শিখাইয়া দিউন।" আমার বলিতে লজ্জা হয় যে, এমন অনেক উকীল আছেন যাঁহারা এ কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হন না। অনেক সময়ে উকীলেরা নিজে এই কাজ না করিয়া তাঁহাদের মুহুরীদের কিম্বা মোক্তারদের উপর এই ভার দেন, কিন্তু কি ভাবে সাক্ষীর এজাহার করাইতে হইবে তাহা বলিয়া দেন।

তোমরা বোধ হয় জান যে, নিম্ন-আদালতে যে মকদ্দমা হইয়া যায়, অনেক সময়ে লোকে নিম্ন-আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল করে। আপীলে কোন ফল হইবে কি না জানিবার জন্য লোকে উকীলের কাছে আসিয়া মকদ্দমার কাগজপত্রাদি দেখায় ও উকীলের পরামর্শ-জিজ্ঞাসা করে। আপীল করিলে কোন ফল হইবে না—এই কথা বলিলে পাছে মক্কেল কাগজপত্র লইয়া অন্য উকীলের কাছে চলিয়া যায়, এই ভয়ে অনেক সময়ে উকীলেরা, যদিও মনে মনে বেশ জানেন যে সেই মকদ্দমায় আপীল করিলে কোনই সুফল হইবে না তথাপি টাকার লোভে, মক্কেলকে মিথ্যা করিয়া বলেন যে, আপীল করিলে তাহার বিশেষ সুফল হইবার

সম্ভাবনা। সামান্য টাকা পাইবার আশায় কত উকীল যে প্রতিদিন এইরূপে আপনার বিবেককে বলি দিতেছে তাহা বলা যায় না।

আজকাল আদালতে উকীল-ব্যারিষ্টারের সংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে, অনেকে মকদ্দমা পাইবার জন্য ঘুষপর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হন না। অনেক উকীলের এমন শোচনীয় অবস্থা যে, কিছু রোজগার করিয়া না আনিতে পারিলে তাহাদের সংসার-চালান কঠিন। আদালতে একপ্রকারের লোক ঘুরিয়া বেড়ায় যাহাদিগকে ইংরাজীতে টাউট (দালাল) বলে। ইহারা আদালতে ঘুরিয়া বেড়ায় ও উকীল-ব্যারিষ্টারের জন্য মকদ্দমা-সংগ্রহ করে এবং যে উকীল কি ব্যারিষ্টারের কাছে গেলে বেশি কমিশন পাইবে তাহার কাছে মক্কেলকে লইয়া যায়। আমি এমন অনেক ঘটনা জানি যেখানে প্রতি টাকায় উকীল বাবু মাত্র চারি আনা পান, আর দালাল নিজে বারো আনা লয়। আর কোন কোন স্থলে দালাল সমস্ত টাকাটাই আত্মসাৎ-করে, আর উকীলবাবু বিনা পয়সায় মকদ্দমাটী করিয়া দেন। তাঁহার আশা এই যে, এই ভাবে মকদ্দমা করিতে করিতে তিনি ক্রমশঃ একজন পাকা উকীল হইয়া দাঁড়াইবেন। ভারতবর্ষে বোধ হয় এমন কোন আদালত নাই যেখানে এই সকল দালাল দেখিতে পাওয়া যায় না। গভর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে তাড়াইবার জন্য দণ্ডবিধান করিয়াছেন, কিন্তু ইহারা জোঁকের মত আদালতে লাগিয়া থাকে। অনেক সময়ে ইহারা এমন ছদ্মবেশে থাকে যে, ইহাদিগকে লোকে সহজে চিনিতে পারে না। অনেক উকীল-ব্যারিষ্টার এই দালালদিগের তোসামোদ করে ও মকদ্দমা পাইবার জন্য তাহাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। একজন শিক্ষিত লোকের জন্য ইহার অপেক্ষা জঘন্য জীবন আর কি হইতে পারে?

আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। উপরে যাহা বলিলাম তাহাহইতে তোমরা বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, ওকালতি এমন উন্নত, উৎকৃষ্ট ও স্বাধীন ব্যবসা হইলেও লোকে ইহাকে কেমন জঘন্য ব্যবসা করিয়া তুলিতে পারে।

আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, উকীল-ব্যারিষ্টার হইলেই এই সকল ঘৃণিত কার্য্য করিতে হয়। এমন উকীল ও ব্যারিষ্টার আছেন, যাঁহারা এ সকল কলুষিত কার্য্যে কখন হস্তক্ষেপ করেন না ও বিষবৎ পরিহার করিয়া থাকেন; তবে বড় দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ উকীল ও ব্যারিষ্টারের সংখ্যা বিরল।

তবে এ সম্বন্ধে তোমাকে কি পরামর্শ দিব? যদি জীবনে সত্যের মর্য্যাদা-রক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিষয় জ্ঞান কর, যদি টাকার লোভে এই সকল জঘন্য ব্যাপারে কখন লিপ্ত হইবে না এইরূপ শপথ করিতে পার, যদি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য তাহাই করিবে ইহা জীবনের মূলমন্ত্র করিতে পার, তবে আমি অম্লান বলিতেছি যে, লেখা পড়া শিখিয়া ওকালতি ব্যবসা মনোনীত করিতে পার, কেননা তদ্দ্বারা তোমার নিজের, তোমার পরিবারের ও তোমার দেশের অনেক উপকার করিতে পারিবে। কিন্তু যদি সামান্য টাকার লোভে বিবেককে বলি দিতে হয়, সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করিতে হয়, ঠকাইয়া দরিদ্রের অর্থ আত্মসাৎ করিতে হয়, তবে আমি এই পরামর্শ দি, বরং ধর্ম্মপথে থাকিয়া দরিদ্রের জীবনযাপন কর, তথাপি সংসারে বিপুল অর্থ-উপার্জ্জন করিবে বলিয়া বিবেককে জলাঞ্জলি দিও না। প্রকৃত সুখ ও শান্তি টাকায় দিতে পারে না, কিন্তু যে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে খাঁটি ও সকল বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছাপালন করে, সেই প্রকৃত সুখী।

ঈশ্বর তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন ও তোমাদের জীবনের কার্য্য মনোনীত করিতে তোমাদিগকে জ্ঞান ও শক্তিদান করুন, ইহাই আমার হৃদয়ের একান্ত বাসনা। ইতি—

তোমাদের শুভানুকাঙ্ক্ষী জনৈক ভূতপূর্ব্ব-উকীল।

উচ্চৈঃশ্রবা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ছাগলের বাচ্চাই বল, আর হাতীর বাচ্চাই বল, বা মানুষের বাচ্চাই বল, সকল বাচ্চার পক্ষে গুরুজনের কথার বশ (স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে কথার বশ হওয়াকে আজ্ঞাবহতা বলে) হওয়া সকল গুণের অপেক্ষা ভাল গুণ। এখন কেবল পশুদিগের বিষয় বলি। বাচ্চারা যদি মায়ের কথার বশে চলে, মায়ে ঠেকিয়া ও ঠকিয়া যাহা শিখিয়াছে, না ঠেকিয়া ও না ঠকিয়া, তাহা শিখিতে পায়। সাহস ভাল; খুব দৌড়িতে পারা, আর শারীরিক বলও খুব ভাল; কিন্তু বাচ্চার হাজার দৌড়িবার শক্তি, সাহস ও শারীরিক বল থাকিলেও, মায়ের এই সকল গুণ বাচ্চার অপেক্ষা অনেক বেশী; আর কেবল মায়ের কথার বশে চলিলেই বাচ্চারা মায়ের ঐ সকল গুণের দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। বুদ্ধি খুব ভাল জিনিস; লোকে কথায় বলে, বুদ্ধিবল, বড় বল। কিন্তু আর কোন পশু-সমাজে হউক, না হউক, লুসাইদেশের বন্য ছাগলের বাচ্চাদের মধ্যে নিতান্ত বুদ্ধিমান একগুঁয়ে বাচ্চার অপেক্ষা কথার বাধ্য নিতান্ত বোকা বাচ্চাও

ছাগলেরা ঘণ্টাদুই ক্রমাগত লবণ চাটিল, চাটিয়া যখন প্রাণ তৃপ্ত

হইল, তখন ঠাকুর-মা পাহাড়ের দিকে মুখ করিয়া ফিরিয়া চলিল। এই তলভূমির ঘাস অতি চমৎকার, খুব কচি ও ঘন, এবং অপর্য্যাপ্ত। বাচ্চাগুলি ত এই কচি ঘাস কপাকপ্ উড়াইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু এই উপত্যকায় শালবন, মধ্যে মধ্যে বেতবনও আছে, সুতরাং বিপদ্‌ও আছে। ঠাকুর-মা এবং দীর্ঘভুজা উভয়েই সকলকে লইয়া আপনাদের পাহাড়ের উপরকার চরাণী-স্থানে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত,—কারণ সেখানে ভয়ের কারণ তত ছিল না। ঠাকুর-মা সেই দিকে চলিল, আর সকলেই অনিচ্ছা-সত্বেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে উদ্যত ছিল, কিন্তু তাহার আদরের ধন দশরথ কচি, নধর ঘাস ছাড়িয়া যাইতে চাহিল না, ফলে সে গেল না। মায়েরও তাহাকে ফেলিয়া যাইতে মন সরিল না, এমন সময়ে দশরথ ডাকিয়া উঠিল, ঠাকুর-মা অমনি ফিরিল। সে যে নিতান্ত যাইতে "নারাজ," তাহা নয়; কিন্তু যাই যাই করিয়া দেরি করাতে মাকে খানিক দাঁড়াইতে হইল, তাই দেখিয়া আর সকলেও ফিরিল। এই করিতে করিতে সন্ধ্যা, পরে রাত্রি হইল, সকলে শালবনে শুইয়া রহিল।

মানুষের মত বনের পশুরাও অল্প-বিস্তর চালাকী জানে। চিতাবাঘ বিলক্ষণ চালাক। শিকার করিতে যখন বাহির হয়, তখন ঠিক বকের মত "গণিয়া গণিয়া" পা ফেলে, শব্দমাত্র হয় না। ছাগলেরা শুইয়া শুইয়া জাগর কাটিতেছে, এমন সময়ে নদীর তীরদিয়া একটা চিতাবাঘ নিঃশব্দে খুব কাছে আসিয়া পড়িল। এমন সময়ে দৈবাৎ একখানা বড় আল্গা পাথরের উপর লাফ দিয়া পড়াতে পাথরখানা গড়াইয়া জলে পড়িল। পাথর জলে পড়াতে অতিসামান্য একটু শব্দ হইল। কিন্তু সে শব্দ দীর্ঘভুজার কাণে গেল। সে অমনি উঠিল, উঠিয়া নাক বাঁকাইয়া একপ্রকার শব্দ করিয়া শৃঙ্গীকে জাগাইয়া এই অন্ধকার রাত্রে টিকড়ের অন্য পাশে সাবেক চরাণী-স্থানের দিকে দৌড়িল। আর ছাগলগুলিও দীর্ঘভুজার ডাক শুনিয়া উঠিয়া পড়িল বটে, কিন্তু তাহাদের উঠিতে করিতে চিতাবাঘ আসিয়া পড়িল। ঠাকুর-মাও লম্ফ দিয়া উঠিল, দশরথকেও লম্ফ দিতে ইসারা করিল। মনে রাখিও, বাঘেরাও শিকারের উপর লাফ দিয়া পড়িবার আগে লক্ষ্য ঠিক করে। ঠাকুর-মাও প্রাণ বাঁচাইবার জন্য টিকড়ের দিকে ছুটিল, চিতাবাঘের হাতও এড়াইল—কিন্তু গুণবান পুত্র দশরথ ভাবিল, তাহার মা যে দিকে দিয়াছে, সে দিকে গেলে ভাল হইবে না। তাই মাকে ডাকিল, মাও নিজ প্রাণের মায়া ছাড়িয়া, ডাক শুনিয়া নামিয়া আসিল। যেই লাফ দিয়া নামিল, অমনি চিতাবাঘ বেচারাকে ঘাড় কামড়াইয়া ধরিয়া এক আছাড়ে মারিয়া ফেলিল। এটাকে ফেলিয়া চিতা-বাঘ একটার পরে আর একটা ছাগলকে লক্ষ্য করিয়া ধরিতে গেল। কিন্তু এই দুইটাই ঠিক সময়ে লাফ দিয়া উঠিয়া একবার ডাইন দিকে, আবার বাম দিকে তাড়াতাড়ি পড়াতে বাঁচিয়া গেল। সকলের পিছনে বেচারা হাঁটু-ভাঙ্গা-দ টিকড়ের দিকে যাইতেছিল, চিতা-বাঘ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া যেই লম্ফ দিল, সে যদি অমনি লাফ দিয়া ডাহিনে কি বামে বেঁকে বেঁকে দৌড়িতে পারিত, বাঁচিয়া যাইত। বাল্যকালহইতে স্বভাবদোষে, বা কু-অভ্যাসের দরুণ সে সম্মুখের পাদুইখানির "মাথা খাইয়া" বসিয়াছে, এখন কি দিয়া লম্ফ দিবে, কি দিয়া বা দৌড়িবে। দেখিতে না দেখিতে চিতাবাঘ তাহাকে মারিয়া ফেলিল।
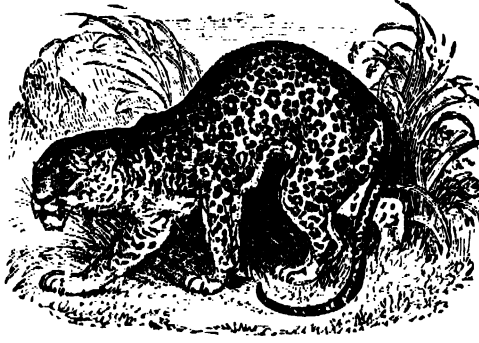
একটা বড় ছাগলের দেখাদেখি, সে যে দিকে গেল, তাহারই পিছনে পিছনে আর সকল ছাগল লাফাইয়া লাফাইয়া টিকড়ের দিকে উঠিতে লাগিল। অনেক দূর উঠিলে পর, আর কোন ভয় নাই জানিয়া দীর্ঘভুজা একটু কম বেগে চলিল। তখন সঙ্গী ছাগলেরা কাছে আসিয়া দেখিতে পাইল যে, এত ঠাকুর-মা নয়, দীর্ঘভুজা; এই ত সকলকে পথ দেখাইয়া আনিয়াছে। ঠাকুর-মাকে না দেখিতে পাইয়া বুঝিতে পারিল, সে বেচারী বাঘের হাতে মারা গিয়াছে।

সকলে একত্র হইলে, একবার পিছনদিকে তাকাইল, এমন সময়ে একটা ছাগলের ডাক একটু একটু শুনিতে পাইল। শুনিবামাত্র সকলে কাণখাড়া করিয়া দাঁড়াইল। দেশের মুরুব্বি লোকেরা বলেন, এক ডাকে উত্তর দিতে নাই। এই ছাগলেরাও তাই করিল, অমনি উত্তর দিল না, হয়ত কোন শত্রু তাহাদিগকে ভুলাইবার জন্য ওরূপ ডাক ডাকিয়াছে কিন্তু ঐ ডাক আবার শুনিতে পাওয়া গেল। তখন সকলেই বুঝিতে পারিল যে, এ তাহাদের দলস্থ একজনের ডাক। দীর্ঘভুজা তাই অমনি একপ্রকার ডাকিয়া উত্তর দিল।

দীর্ঘবাহুর স্বর শুনিতে পাইয়া, দশরথ তাড়াতাড়ি চলিল, এবং কোন্ দিকে সকলে আছে, জানিবার জন্য আর দুই-একবার ডাকিয়া দলস্থ সকলের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেচারা এখন মাতৃহীন।

দীর্ঘবাহু নিজে জানিত না যে, তাহার মা মারা গিয়াছে—দলস্থ আর কেহও জানিত না। বেলা ক্রমেই পড়িয়া আসিল। বার বার ডাকিয়াও দশরথ মাকে দেখিতে পাইল না; এ দিকে তাহার দুধের তৃষ্ণা বাড়িয়া উঠিল—নধর কচি ঘাসে ত এ তৃষ্ণা মিটে না। মাকে না দেখিয়া বেচারা অস্থির হইল। আরও কাতর স্বরে বার বার ডাকিতে লাগিল। রাত্রি হইল, এখন কাহার বুকে হেলান দিয়া আরামে শুইবে? আবার ক্ষুধায় পেট জ্বলিতে লাগিল। কাহারও গায়ে হেলান দিয়া না শুইলে শীতে ঘুম হইবে না, বরং

কষ্ট হইবে। এই মাতৃহীন বাচ্চাটীর দুঃখ কেহ দেখিয়াও দেখিল না; কিন্তু দীর্ঘভুজা এক্ষণে এই দলের একপ্রকার রাণী; সে দশরথের কাতর মা-মা-ডাক শুনিয়া বারকতক উত্তর দিল। দীর্ঘভুজা শুইয়াছিল, বাচ্চা শৃঙ্গী কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছিল, এমন সময়ে অকস্মাৎ দশরথ আসিয়া, পূর্ব্বশত্রু শৃঙ্গীর পাশে শুইয়া পড়িল।

সকালবেলা দীর্ঘভুজা দশরথকে কতকটা আপন বাচ্চার মত দেখিতে ও ভাবিতে লাগিল। শৃঙ্গীর পাশে সমস্ত রাত্রি থাকাতে দশরথের গায়ের গন্ধ শৃঙ্গীর গায়ের গন্ধের মত কতকটা হইয়াছিল, ইহাতে তাহার প্রতি দীর্ঘভুজার কতকটা "টান" হইল। একটু পরে শৃঙ্গী গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া মায়ের দুধ খাইতে আরম্ভ করিল, ক্ষুধায় কাতর বেচারা দশরথও গিয়া অন্য পাশে দাঁড়াইয়া দীর্ঘভুজার দুধ খাইতে লাগিল। কাজেই এক-সময়ে যে শৃঙ্গীর শত্রু ছিল, সে এক্ষণে তাহার সহোদর ভাই না হউক,মায়ের দুধের ভাগীদার হইল। কিন্তু শৃঙ্গী বা তাহার মা কোন আপত্তি করিল না, সুতরাং দশরথ দীর্ঘভুজার "পোষ্যপুত্র" হইল।

৭

এই দলে দীর্ঘভুজার মত বিচক্ষণ ছাগল আর একটাও ছিল না। কোন্ পাহাড়ের বা কোন্ টিলার কোথায় কি আছে, এখন সে সমস্তই সে জানিয়া লইয়াছে। অল্পদিনের মধ্যে পালস্থ সকল ছাগলেই বুঝিতে পারিল যে, এখনহইতে দীর্ঘভুজাই দলের "রাণী" হইল। সকলে দশরথ ও শৃঙ্গীকে তাহারই বাচ্চা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। অনেক বিষয়ে ভাবগতিক দেখিয়া বোধ হইত, ইহারা যেন ভাই ভাই। কিন্তু "ধর্ম্ম-মাতার" প্রতি দশরথের একটুও কৃতজ্ঞ ভাব ছিল না, সুযোগ পাইলেই সাবেক "আখোজ" মিটাইতে চেষ্টা পায়; তায় আবার এক্ষণে একই মায়ের দুধ খাইতে হয় বলিয়া দশরথ শৃঙ্গীকে প্রতিদ্বন্দ্বী বা ভাগীদার মনে করিয়া ঈর্ষ্যা করিতে লাগিল; বলিতে কি, এক দিন সে শৃঙ্গীকে বেদখল করিতে চেষ্টা পাইল। কিন্তু শৃঙ্গী এক্ষণে পূর্ব্বের অপেক্ষাও "আপন গণ্ডা" ভাল বুঝে ও রক্ষা করিতে ভাল পারে। শৃঙ্গীকে বেদখল করিতে গিয়া দশরথের এই লাভ হইল যে, বিলক্ষণ "উত্তম-মধ্যম"—গোটা-কতক ভাল রকমের গুঁতা-গাঁতা খাইতে হইল। আর কে গর্ভজাত এবং কে পোষ্যপুত্র, তাহা স্থির হইল।

হস্তীপ্রপাত, শিলং।

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে দশরথ ও শৃঙ্গী একসঙ্গেই রহিল, একসঙ্গেই চরিল। দশরথ হৃষ্টপুষ্ট, কিন্তু সদাই বিরসবদন; শিং-দুইটা দেখিতে দেখিতে বড় হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু মোটা ও গোড়ার দিক্‌হইতে খানিকটা নিতান্ত লোমশ; আর আমাদের শৃঙ্গী!—ইহাকে আর শৃঙ্গী বলা ভাল দেখায় না। ছাগজাতীয় সকলেই ত শৃঙ্গী। আমাদের শৃঙ্গীর শৃঙ্গ এক্ষণে অনেক বড় হইয়াছে, আর বেশ তীক্ষ্ণ, কান-দুইটীও বড় আর মায়ের মত সদাই কান খাড়া। এই কারণে আমরা উহাকে উচ্চৈঃশ্রবা বলিব; কয়েক-বৎসর পরে আইজল-পাহাড়েও সে এই নাম পাইয়াছিল; তদবধি সে উচ্চৈঃশ্রবা বলিয়াই বিদিত।

গ্রীষ্মকাল গেল। উচ্চৈঃশ্রবা এবং দশরথ দুইজনই বুদ্ধিতে ও আকারে অনেকটা বাড়িয়া উঠিল। লংলে-পাহাড়ের ছাগসমাজে থাকিতে গেলে যে সকল নিয়ম-পালন করিয়া চলিতে হয়, দুইজনেই সে সকল বেশ শিখিল। কিছু দেখিলে কিরূপে ডাকিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিতে হয়, এবং বিপদ্ আসন্ন দেখিয়া কিরূপ ডাক ডাকিয়া সকলকে প্রাণরক্ষার্থ পলাইতে বলা হয়, তাহা শিখিয়া অভ্যাস করা হইয়াছে। কোন্ পথে কোথায় যাইতে হয়, তাহাও দুইজনেই বিলক্ষণ জানে লবণ খাইবার ইচ্ছা হইলে, দুইজনে মিলিয়া যায় এবং যখন ইচ্ছা হয়, নিকটস্থ "লবণের কুয়া"-হইতে লবণ খাইয়া আইসে।

শত্রু আসিয়া আক্রমণ করিলে যেরূপে আঁকাবাঁকাভাবে লাফাইয়া লাফাইয়া গেলে শত্রু ধরিতে পারে না, উহারা দুইজনে সেরূপ লাফাইতে বেশ পারে। পাহাড়ের ঢালুর অনেকস্থানে কেবল পাথর, সেরূপ স্থানে লাফ দিয়া, খুরে ভর রাখিয়া পড়া যায় না; পড়িবার সময়ে সম্মুখের পায়ের হাঁটুর উপর পড়িতে হয়। উচ্চৈঃশ্রবা আর দশরথ দুইজনেই এইপ্রকারে লাফাইয়া চক্‌চকে

পাথরের উপরদিয়া উঠিতে পারে। এসকল বিষয়ে উচ্চৈঃশ্রবার মাকেও ছেলের কাছে হারি মানিতে হয়। ফলে বাচ্চা-দুইটী এখন "সাবালক" হইয়াছে, ভরণপোষণের জন্য উহাদিগকে আর অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয় না; উহারা এখন ঘাস খাইয়াই থাকিতে পারে। তাই দীর্ঘভুজা দুধ ছাড়াইয়া দিল। বেশি দিন দুই-দুইটা বাচ্চাকে দুধ দিয়া দীর্ঘভুজা কাহিল ও দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। এদেশে বর্ষার পরেই শীতের আরম্ভ। যাহারা দুর্ব্বল, শীতকালে তাহাদের কষ্ট হয়। তাই দীর্ঘভুজা দুধ বন্ধ করিয়া দিয়া নিজের শরীরটা একটু সবল করিয়া লইতে চাহিল। বাচ্চা-দুইটা পার্য্যমাণে দুধ ছাড়িত না, কিন্তু একে ত দুধ নিতান্ত কমিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আবার উহাদের শিং বড় হইয়াছে, দুধ খাইবার সময় ঢুঁ মারিলে মাকে বড় লাগে। এই সকল কারণে দীর্ঘভুজা মায়া-মমতা না করিয়া একবারে দুধ বন্ধ করিল। বর্ষার শেষে, উত্তর সীমানার পাহাড়হইতে শীত সঙ্গে করিয়া হাতীর দল আসিবার আগেই দশরথ ও উচ্চৈঃশ্রবা আপন-আপন অন্নের যোগাড় করিয়া লইতে সমর্থ ও অভ্যস্ত হইল।

(ক্রমশঃ।)

কয়লার খনির ছোকরা-মজুর

ডারহাম-প্রদেশের এক কয়লা-গাঁয়ে ভোর ছ'টা বাজিয়াছে। নানা খনিহইতে "ভোঁ" বাজিতেছে। একটি কুটীরে এক কয়লার খনির "পুটার" (ছোক্‌রা-মজুর) দৈনন্দিন কাজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। পোষাক পরিয়া তাহার এক কাঁধে খাবারের থলিয়া ঝুলাইয়া লইল, পকেটে একটা বোতল রাখিল, কোমরবন্ধে একগাছা চাবুক গুঁজিল এবং তাহার বাপ-মাকে "সুপ্রভাত" জানাইয়া খনির দিকে চলিল।

যেরকম নোঙ্‌রা গেঁয়ো পথ ধরিয়া সে চলিল, সে রকম নোঙ্‌রা রাস্তা সেই জেলায় বিস্তর দেখা যায়। দূরে উঁচু উঁচু চিম্‌নীগুলা ভক্‌ ভক্‌ করিয়া ভয়ানকবেগে ধূম-উদ্গার করিতেছে। খনির কাছাকাছি হইলে সারিসারি "করোগেটের" ছাদ-ওয়ালা "চালা," দুই-একটি পাকা বাড়ী, বড় বড় চাকা, কপিকল, কল-কব্জা, কয়লার গুঁড়ার ঢিবি, শ্লেট ও মাটী দেখিতে পাওয়া যায়।

ছোক্‌রা-মজুর খনিতে পঁহুছিয়া, খনি-মুখস্থিত বাতিঘরে গিয়া চীৎকার করিয়া নিজের নম্বর বলিলে তাহাকে তাহার বাতিটী দেওয়া হইল। এই জেলার খনকেরা তিনরকমের বাতি-ব্যবহার করিয়া থাকে,—"বৈদ্যুতিক," "গ্লেনি" ও "ডেভি"। শেষোক্ত বাতিটিই খনকেরা বেশি পছন্দ করে এবং সাধারণের নিকটও অধিকতর পরিচিত। বিজুলী-বাতি কার্য্যতঃ কেবল "মর্টন"-কয়লা-খনিতেই ব্যবহৃত হয়; উহার আলো খুব উজ্জ্বল, অন্য দুইটী সেকেলে বাতির চেয়ে ঢের ভাল, কিন্তু বড় ভারী, ওজনে প্রায় ৴১॥০ দেড় সের; আর ঐ বাতি-ব্যবহার করার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, যেখানে হানিকর বাষ্প কিম্বা বদ্‌-হাওয়া থাকে সেখানেও বেশ জ্বলে, এমন কি যেখানে মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না—দম্‌ বন্ধ হইয়া মরিয়া যায়, সেখানেও এই বিজুলী-বাতি জ্বলে। এইজন্য কয়লা-খনির ডিপুটী, সর্দ্দার, অন্য অন্য কর্ম্মচারী—যাহারা খনির হাওয়া-চলাচলের জন্য দায়ী তাহারা এই বাতিটি ভালবাসে না।

ডেভি-বাতি পুরাণো-ধরণের, কিন্তু এখনও এই বাতিটির সবচেয়ে ভাল ও নিরাপদ্‌ বলিয়া খ্যাতি আছে। কিন্তু সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, ইহার আলো বড় মিট্‌মিটে। উহার দুইটা তারের জালের নল আছে, সেদুটির ভিতর আলো থাকে, বদহাওয়ার জায়গায় গেলেই ঐ বাতি নিবিয়া যায়।

বাতি লইয়া ছোক্‌রা-মজুর নিশানা-ঘরে গেল। সেখানে সে একটি ধাতুময় চাক্তির নিশানা লইল, তাহাদের সর্দ্দারেরা তাহাই দেখিয়া তাহাদের রোজকার কাজের হিসাব করে। চৌদ্দ-বছরহইতে কুড়িবছরের পর্য্যন্ত আরও অনেক ছোক্‌রা সেই নিশানা-ঘরের ভিতরে ও কাছে রহিয়াছে। তাহারা তাহাদের নিজের নিজের বাতি ও নিশানা লইয়া কখন তাহাদের খনিতে নামিবার পালা আসিবে তাহার অপেক্ষায় রহিল।

"পুটার" (ছোক্‌রা-মজুর।)

"বালকের" প্রিয় পাঠকগণ, তোমরাও তাহাদের সঙ্গে খনির ভিতর নামিবার হুকুম পাইয়াছ, আমরা এই রকম ধরিয়া লইতেছি। তাহা হইলে এখন তোমাদের যাহার যে কাপড়-পরা আছে তাহার উপর একটা চটের মত মোটা কাপড় জড়াইয়া তাহাদের সঙ্গে নীচে নামিবার জন্য তৈয়ার হইতে হইবে।

যে ঝুড়িতে করিয়া তোমাদিগকে নীচে নামিতে হইবে তাহা কলকলে করিয়া একগাছি দড়িতে বাঁধা ও খনির মুখে ঝুলান আছে। কয়লার টবগুলি নীচে নামাইবার ও উপরে তুলিবার জন্য ঐ ঝুড়িগুলি ব্যবহৃত হয়। দুইটা ঝুড়ি অনবরত নামিতেছে, উঠিতেছে। তোমরা সকলে মিনিটে সাতশো-ফিটের হিসাবে সেই ঝুড়িদিয়া নামিতে লাগিলে। হঠাৎ নীচে একটা শব্দ শুনা গেল, তাহার পর তোমাদের পাশদিয়া একটা আলো খনিকূপের (shaft) পাশহইতে প্রতিবিম্বিত হইয়া চমকিয়া গেল। ব্যাপার কি? ব্যাপার আর কিছু নয়, আর একটা মানুষ-ভরা ঝুড়ি উপরে উঠিতেছে, আর তোমরা তখন অর্দ্ধেক পথ নীচে নামিয়াছ। পরে তোমাদের অবতরণের বেগ কমিয়া আসিতে লাগিল, এবং বেগ একেবারে কমিয়া গেলে তোমরা খনিকূপের তলায় নামিলে।

এখন ছোক্‌রা-মজুরের প্রথম কাজ হইতেছে, আস্তাবলে যাওয়া, উহা খনি-কূপের কাছেই। সেই আস্তাবলে গিয়া ছোক্‌রা-মজুর খোপে খোপে গিয়া নিজের টাট্টুটির নাম দেখিতে লাগিল। আপনার টাট্টুটিকে পাইয়া তাহাকে সাজ পরাইতে লাগিল। ভূগর্ভে সর্ব্বদা জীব বাস করিতেছে দেখিয়া আগন্তুকেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন; কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ঘোড়াগুলি একেবারে "ঘিয়ে-ভাজা" হইয়া নাই—বেশ মোটাসোটা, মোলায়েম, চক্‌চকে ও ডলাই-মলাই করা; আর খনির উত্তাপ উপরের চেয়ে বেশী বলিয়া তাহাদের সেখানকার আব-হাওয়া বেশ সহিয়া গিয়াছে, তাহারা বেশ ভালই আছে। এ বেচারারা যখন ছোট ছিল, তখন ইহাদের খনির মধ্যে আনা হইয়াছিল; আর এখন ইহারা আমরণ এখানে বন্দী হইয়া আছে।

টাট্টুদের সাজ-পরান হইলে একদল ছোক্‌রা-মজুর খনির ভিতরে চলিল। তাহারা "রাহীদের রাস্তা" (travelling way) দিয়া চলিল। ঐ রাস্তা "বাঁধা-রাস্তার" (set way) সঙ্গে রুজুরুজুভাবে চলিয়া গিয়াছে, মাঝে একটা কয়লার প্রাচীর আছে। তোমরা আপাততঃ এই ছোক্‌রা-মজুরদের ছাড়িয়া, মনে কর, একজন "সেতোর" সঙ্গে খনির কাজ-কর্ম্ম ও কল-কারখানা দেখিতে চলিলে; পরে আবার তোমাদের ছোক্‌রা-মজুরদের সঙ্গে দেখা হইবে। খনি-কূপের তলাহইতে দুইটি রাস্তা-দিয়া খনির মধ্যে ঢুকা যায়, "বাঁধা-রাস্তা" ও "রাহী-রাস্তা"। মনে কর, এই প্রবন্ধের অনুরোধে নিয়ম-ভঙ্গ করিয়া তোমাদের "বাঁধা-রাস্তা" দিয়া খনির মধ্যে ঢুকিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে।

এই রাস্তায় "রেল"-পাতা আছে, সেই রেলের উপরদিয়া কয়লার ছোট ছোট গাড়ীগুলি খনি-কূপহইতে যেখানে কয়লা কাটা হইতেছে সেখান পর্য্যন্ত যায়। তোমরা এই পথ ধরিয়া চল।

তোমাদের ডেভি-বাতির আলোতে তোমরা প্রথমে দেখিবে যে, দুইরেলের মাঝদিয়া একগাছা ইস্পাতের দড়ি গিয়াছে। তোমরা পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিলে,—"এটা কি হয়?" পথপ্রদর্শক উত্তর দিল,—"ওটা কয়লার গাড়ী টানিবার জন্য"। সে কি? অর্থাৎ ঐ ইস্পাতের দড়ির সাহায্যে কয়লা-বোঝাই একপ্রস্থ ঠেলা-গাড়ী খাদহইতে খনি-কূপে টানিয়া আনা হয়।

"রাণ্-রাইডার।"

তোমরা জিজ্ঞাসা করিলে,—"একপ্রস্থে কতগুলি গাড়ী থাকে?"

উত্তর হইল,—"এই খনিতে একপ্রস্থে ষাটটি গাড়ী থাকে। অনেক সময়ে ওর চেয়েও বেশী গাড়ী থাকে। যত বেশী মজুরে কাজ করে, তত বেশী গাড়ী যোতা হয়।"

তোমরা দেখিতে পাইলে যে, ইস্পাতের দড়িগাছা ভয়ঙ্কর বেগে ছুটিতেছে, এত জোরে ছুটিতেছে যে কোন্ দিকে যাইতেছে তাহা ঠিক করা একেবারে অসম্ভব। তোমাদের কৌতূহল-দূর করিবার জন্য সেতো আলগোছে দড়িগাছার উপর পা রাখিল, যেদিকে তাহার পা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাহাহইতে তোমরা বুঝিতে পারিলে যে, কোন্ দিকে দড়িগাছা ছুটিতেছে।

মুহূর্ত্তেক পরে সে তোমাদের সাবধান করিয়া দিবার জন্য বলিয়া উঠিল,—"দেখ্‌বেন, একটা পুরো প্রস্থ গাড়ী আস্‌ছে!"

দূরহইতে "ঘট্‌ঘট্ ঘটাস্ ঘটাস্" করিয়া একটা গোলমেলে আওয়াজ আসিতেছে, তোমরা শুনিতে পাইলে। কি করিয়া তোমরা গাড়ীগুলির ধাক্কা সাম্‌লাইবে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে

না করিতে তোমাদের কয়লার দিকের একটা গর্ত্তের মধ্যে টানিয়া লওয়া হইল। এগুলিকে "আশ্রয়" বলা হয়, এবং উহা "বাঁধা-রাস্তা"-হইতে বরাবর ৩০ গজ তফাতে। তাহার পর, এমন আওয়াজ হইতে লাগিল যে, কালা হইয়া যাইতে হয়। আর সেই ভয়ানক অন্ধকারে সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিলে ভয়ে বুক কাঁপিয়া উঠে। তাহার পর, ট্রেণের মত জোরে, একপ্রস্থ গাড়ী সট্‌ সট্‌ করিয়া চলিয়া গেল। সেই সময়ে তোমরা সব্বের শেষ ট্রলিখানার পিছনে ও দড়ির উপর একটা ছোক্‌রা মোরিয়া হইয়া ঝুলিয়া চলিয়াছে দেখিতে পাইলে। উহাকে "রাণ্‌ রাইডার" বলে। সেইরকমভাবে যাইতে যাইতে যদি সে কোন গোলযোগ দেখে—মনে কর, যদি কোন ট্রলি "আউট লাইন" হইয়াছে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহার মাথার উপরে যে তার আছে তাহা ছুঁইয়া সে "থাম" বলিতে ইসারা করে! আর যে লোক কল চালাইতেছে, সে তখনই কল থামায়। তোমরা সেই গর্ত্তহইতে বাহির হইয়া আবার খাদের দিকে চলিতে আরম্ভ করিলে, বেশী দূর যাইতে না যাইতে তোমরা দেখিতে পাইলে যে, ইস্পাতের দড়িগাছার বেগ কমিতে লাগিল এবং পরে একেবারে থামিয়া গেল।

তোমরা সেতোকে জিজ্ঞাসা করিলে,—"এখন কি হচ্চে?" তাহার উত্তরে তোমরা শুনিলে একপ্রস্থ গাড়ী খনি-কূপে পঁহুছিয়াছে। কিন্তু যেই "রাণ্‌-রাইডার" খালি ট্রলির প্রস্থে সেই ইস্পাতের দড়ি লাগাইয়া দিবে, অমনই আবার সেই গাড়ীগুলি চলিতে আরম্ভ করিবে। এই কথা যতক্ষণ তোমাদের বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে, ততক্ষণে আবার দড়ি জোরে জোরে নড়িতে লাগিল, তোমাদের আবার খালি গাড়িগুলির ধাক্কা খাইবার ভয়ে গর্ত্তে গিয়া আশ্রয় লইতে হইল। তাহার পর, অল্প দূর গিয়া তোমরা প্রথম "ওয়ে-এণ্ডসে" পঁহুছিলে। সেখানে কয়েকজন খনক, টাটু-ওয়ালা ছোক্‌রা-মজুর, আর গাড়োয়ান কাজ করিয়া থাকে, সেই জায়গাকে ইংরাজ-খনকেরা "ওয়ে-এণ্ডস্‌" (পথপ্রান্ত) বলে।

বাঁধা-রাস্তা ছাড়িয়া যে ছেলেটি "সুইচ্‌"গুলি তদারক করে তাহাকে পাশ কাটাইয়া তোমরা গাড়োয়ানদের কাছে আসিলে। এখানহইতে ডবল্‌ লাইন আরম্ভ হইয়াছে, একজোড়া লাইনদিয়া বোঝাই গাড়ীগুলি যায় এবং আর একজোড়া দিয়া খালি গাড়ীগুলি। খনির এই অংশটিকে "ল্যাণ্ডিং" অর্থাৎ ঘাট বলে। কিন্তু চলিতে চলিতে তোমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইলে যে, ডবল লাইন আবার সিংগল্‌ হইয়া গিয়াছে। তোমরা তিন-চারবার কয়লার দিকে আশ্রয় লইয়া "ফ্ল্যাটে" পঁহুছিলে। এখানে এইদিককার ভারপ্রাপ্ত "ডিপুটী" যতক্ষণ না আসিল ততক্ষণ তোমাদের তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইল।

যে সিন্দুকে (kist) তাহার হা'ল-হাতিয়ার থাকে, তোমাদের সেই সিন্দুকের উপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে হইল, কারণ ডিপুটী আসিয়া তোমাদের বাতিগুলি না পরীক্ষা করিলে, তোমরা আর এক পাও এগাইতে পারিতেছ না।

সেখানে বসিয়া বসিয়া তোমরা দেখিতে পাইলে টাটু্‌ওয়ালা ছোক্‌রা-মজুরেরা গাড়ী-বোঝাই করিয়া লইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, আবার খালিগাড়ী লইয়া ভিতরে চলিয়া যাইতেছে।
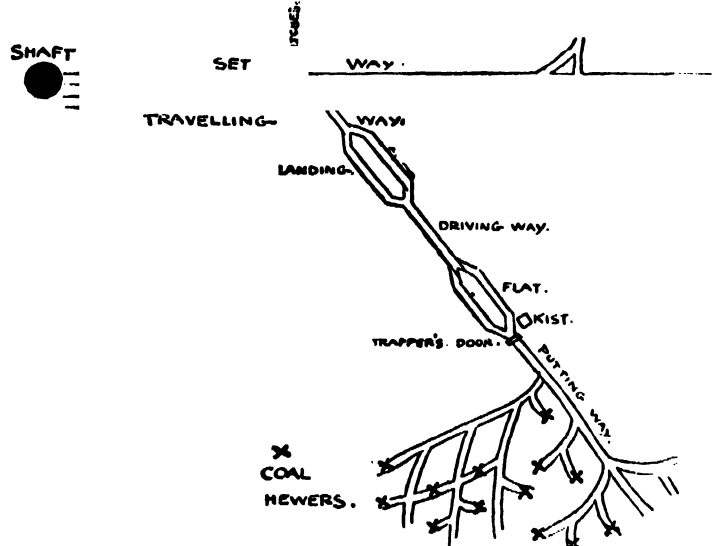
এইবার কেবল একজন ছোক্‌রা-মজুর "ফ্লাটে" আসিয়া কি করে দেখ। ঐ দেখ সে আসিয়া বোঝাই গাড়ী-খানাহইতে ঘোড়া খুলিয়া আবার একটা খালি গাড়ীতে যুতিল এবং গোঁজে ঝুলান নিশানার তাড়াহইতে একটি নিশানা লইয়া খালি গাড়ীর ভিতর রাখিল, তাহার পর ভিতরে চলিয়া গেল। ছোক্‌রা-মজুর ও কয়লা-খনকেরা এই নিশানা-ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রত্যেকের আলা'দা আলা'দা নম্বর থাকে। সেই টব্‌ যখন উপরে উঠে, তখন সেই নিশানা তাহাহইতে তুলিয়া লওয়া হয়। আগেই বলিয়াছি, এই রকমে প্রত্যেক মজুরের কাজের হিসাব পাওয়া যায়।

তোমরা যতক্ষণ ছোক্‌রা-মজুরদের কাজ দেখিতেছিলে, ততক্ষণে ডিপুটী পঁহুছিল। নিজের অংশের হাওয়া-চলাচল দেখা, ছোক্‌রা-মজুরদের কাজে ব্যস্ত রাখা আর কয়লা-খনকদের তক্তা-যোগান ডিপুটীর কাজ। কয়লা-খনকদের একঘণ্টা আগে সকালে ডিপুটী খাদে নামে, আর যেখানে কাজ হইতেছে ঘুরিয়া দেখে সেখানে কোন জায়গায় দূষিত বায়ু আছে কি না; তাহার পর সে তাহার নিজের "সিন্দুকে" ফিরিয়া আসিয়া মজুরদের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। মজুরেরা আসিয়া পঁহুছিলে তাহাদের বাতী-পরীক্ষা করিয়া সে তাহাদের আলা'দা আলা'দা জায়গায় পাঠাইয়া দেয়।

এইবার একজন "পুটার" অর্থাৎ ছোক্‌রা-মজুর বোঝাই গাড়ী লইয়া ঘড়-ঘড়-আওয়াজ করিতে করিতে আসিলেই ডিপুটীর কাজের অন্ধিসন্ধি বুঝিতে পারা যাইবে। আজ ফি ছোক্‌রা-মজুরকে চার-জন করিয়া কয়লা-খনকের কয়লা তুলিতে হইতেছে। আজকের

দিনের কাজ আরম্ভ করিবার সময়েই ডিপুটী কি ছোক্‌রাকে কোন্ কোন্ খনকের কয়লা তুলিতে হইবে তাহা বলিয়া দিয়াছে।

এইবার যে ছোক্‌রাটি আসিয়া বোঝাই গাড়ীহইতে ঘোড়া খুলিল, তাহাকে ডিপুটী জিজ্ঞাসা করিল, "টম্, তুমি কোন্ লোকটার কাছে গিয়েছিলে?"

ছোক্‌রাটি আর একখানি খালি ট্রলীতে ঘোড়া যুতিতে যুতিতে বলিল,—"জোন্‌স"।

"তা'হ'লে, এ'বার তুমি কা'র কাছে যাচ্ছ?"

(ক্রমশঃ।)

সাহেব ও সিংহ।

রোদেসিয়ায় গুইলো বলিয়া একটি ছোট সহর আছে। তাহার কাছাকাছি জায়গায় সিংহ চরিয়া বেড়ায়, তাহার জন্য সেখানকার বাসিন্দাদের সময় সময় বড়ই বেগ পাইতে হয়। হিউস্‌ডেন্ বলিয়া একজন সাহেব একবার সেলুকুই বলিয়া একটি জায়গাহইতে বাইসিকলে যাইতেছিলেন, পথে তিনি সিংহের হাতে পড়িলেন।

ব্রাড্‌লী বলিয়া আর এক সাহেবের কুঠীহইতে যখন তিনি আর কয়ক্রোশমাত্র দূরে, তখন রাস্তা ক্রমশঃ খারাব হইয়া আসিতেছে, তাছাড়া আঁধারও হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া তিনি দুচাকার গাড়ী-(বাইসিকল) হইতে নামিলেন। ঠিক সেই সময়ে তিনি পিছনে একটা শব্দ শুনিয়া চম্‌কিয়া উঠিলেন; ফিরিয়া দেখেন, একটা প্রকাণ্ড সিংহ তাঁহার পিছনে পিছনে গুঁড়ি মারিয়া আসিতেছে। তাঁহার হাতে কোন হাতিয়ার ছিল না, তাই তিনি কোন একটা গাছে উঠিবার জন্য সুবিধামত গাছ খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সিংহের হাঁক শুনিয়া তিনি কিছুক্ষণ ভয়ে এক জায়গায় কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কাজ আটকাইলে বুদ্ধি যোগায়। কোন গাছে উঠিবার তাড়াতাড়ি সুবিধা করিতে না পারায় সাহেব তাঁহার দু'চাকার গাড়ী-(বাইসিকল) খানি মাথায় করিয়া চলিতে লাগিলেন। সিংহ এ আবার কি একটা জীব ভাবিয়া ভয়ে ও অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইতে লাগিল।

তবুও কিন্তু সে সাহেবের সঙ্গ ছাড়িল না, তফাতে থাকিয়া তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতে লাগিল। এক ক্রোশ পথ সে ঐ সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে চলিল, মাঝে মাঝে হুঙ্কারও করিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহাকে আক্রমণ করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। তাহার পর, সাহেব যখন কুঠীর খুব কাছে পঁহুছিলেন, তখন সিংহটা তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সাহেব যদি সাহস না করিতেন আর প্রাণপণ শক্তিতে দু'চাকার গাড়ী-(বাইসিকল) খানি মাথায় করিয়া না চলিতেন, তাহা হইলে সিংহটা নিশ্চয়ই তাঁহাকে খাইয়া ফেলিত। বিপদের সময়ে বিহ্বল না হইয়া স্থির বুদ্ধিতে কাজ করিলে অনেক বিপদহইতে উদ্ধার হওয়া যায়।

জর্জ্জ ওয়াশিংটনের কএকটি উপদেশ।

সকলের সঙ্গেই ভদ্র-ব্যবহার করিও, কিন্তু অল্প লোকের সঙ্গেই আত্মীয়তা করিও। আর যাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করিবে, তাহাদের আগে ভাল করিয়া পরখ করিয়া তাহার পর, তাহাদের কাছে মনের কথা ভাঙিবে। প্রকৃত বন্ধুতা খড়ের আগুন নয় যে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, আবার দেখিতে না দেখিতে নিবিয়া যাইবে, আস্তে আস্তে গাঢ় হয়। তোমার বিপদের সময়েও যে লোক তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে না, তাহার বন্ধুতাই আসল—তাহার বন্ধুতাই খাঁটী। সকলেরই দুঃখে "আহা" বলিও, অবস্থামত দান করিও। দান অল্প হউক বা বেশি হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না, বিধবার সিকিপয়সার কথা মনে রাখিও। যাহারা ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তাহারা সকলেই যে দানের আসল পাত্র বা পাত্রী, তা' নয়। তবু পাছে যে যথার্থ দানের পাত্র সে বঞ্চিত হয়, তাই যাচকমাত্রেরই সম্বন্ধে খোঁজ-খবর লইবে। ভাল পোষাক পরিলেই ভদ্রলোক হওয়া যায় না; অনেক সাপ দেখিতে বড় সুন্দর, তবুও "ছোব্‌লায়"! যাহারা বিবেচক ও জ্ঞানী তাঁহারা সাদা-সিধা সাফ্ পোষাক-পরা লোকেরই প্রশংসা ও খাতির করিয়া থাকেন।

বালক

১ম বর্ষ।] মে, ১৯১২। [৫ম সংখ্যা।

কনানার বল্লম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কনানা অসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিলেন, "আমি কেবল কালিফ উমরের আশীর্ব্বাদ চাই।"

"বৎস, তা ত তুমি পাইবেই; আর কি চাও—উট, মেষ, মোহর; যা তোমার ইচ্ছা, বল?"

"হে আর্য্য, উট-মেষে আমার প্রয়োজন নাই, আমি আপনার আশীর্ব্বাদের ভিখারী, তাই দিয়া আমায় বিদায় করুন।"

কালিফ উত্তর করিলেন, "তুমি ত বড় আশ্চর্য্য ছেলে! যা'কে লোকে 'মরুভূমির সিংহ' বলে, তুমি, দেখিতেছি, অনেকটা তারই মত, আবার কোন কোন বিষয়ে, তা'র মত নও। বৎস, আমার দ্বারা তোমার কি উপকার হইতে পারে, প্রাণ খুলিয়া বল।"

কনানা প্রণত হইয়া কহিলেন, "পিতঃ, আশীর্ব্বাদ করিয়া আমায় বিদায় করুন। এছাড়া আর যদি কিছু দেন, এখন হাত পাতিয়া লইব বটে, কিন্তু আপনকার সদর দরজায় রাখিয়া যাইব।"

বালকের এইপ্রকার দৃঢ়ভাব দেখিয়া কালিফ ঈষৎ হাসিলেন। বলিলেন, "তোমার জন্য যদিও আমার কিছু করিবার না থাকে, আমার জন্য তোমার করিবার কিছু আছে। কাহ্লেদ আমাদের প্রধান সেনাপতি, তিনিই পয়গম্বরের হইয়া সমস্ত যুদ্ধ করেন। ত্রিশহাজার সৈন্য লইয়া তিনি শীঘ্রই বাশ্‌রায় পঁহুছিবেন। তথা-হইতে তাঁহাকে পারস্যদেশে যাইতে হইবে, কিন্তু এই চিঠি তাঁহার হাতে দিতে হইবে। ইহাতে তাঁহাকে আমি আবার সুরিয়াদেশে যাইবার জন্য আজ্ঞা দিয়াছি। এখানহইতে বাশ্‌রা তিন-সপ্তাহের পথ। অদ্য রাত্রে এক সিপাহিকে সংবাদ দিবার জন্য পাঠাইতেছি; এদিকে নানা স্থানের মুসলমানদিগকে কাহ্লেদের সাহায্য করিতে বলিয়া দিলাম। এই সিপাহিদের সঙ্গে যদি তুমি যাও, ত বড় ভাল হয়, কারণ তুমি গেলে সকল কথা তাঁহাকে মুখে বলিতে পারিবে।"

কনানা বলিলেন, "পথ বড় কঠিন। মক্কাহইতে বাশ্‌রাপর্য্যন্ত বালি বড় বেশি গভীর এবং জল নাই।"

এই কথা শুনিয়া কালিফ একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বেদুইন-বালকের মুখপ্রতি দৃষ্টি করিলেন। অনন্তর বলিলেন, "কঠিন পথ তোমার পক্ষে কঠিন হইবে না; তুমি আমার আদরের পাত্র, উটে চড়িয়া যাইবে।"

কনানা বলিলেন, "পথে বিপদ্ আছে। বাশ্‌রার আশে পাশে ডাকাইত ও শত্রু বালির মত অগণ্য। আরব-দেশের পূর্ব্ব-সীমানার লোকদের বিষয়ে অনেক কথা শুনিয়াছি।"

কালিফ আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "তুমি 'মরুভূমির সিংহের' পুত্র হইয়া বিপদের ভয় করিতেছ?"

কনানা উত্তর করিলেন, "ধর্ম্মাবতার, আমি নিজে ভয় করি না। আপনার সিপাহীদের বিপদ্ ঘটিবে, তাই এত কথা কহিলাম। বাশ্‌রার বালুময় অঞ্চলে পঁহুছিবার আগেই, আমি যে পত্র আনিয়াছি, সেই পত্রবাহক পাঁচজনের যে দশা হইয়াছে, ইহাদেরও সেই দশা ঘটিবে। মনে করিবেন না যে, আমি ভয় করি বলিয়া ও সব কথা বলিয়াছি। তা যদি মনে করিয়া থাকেন, তবে এই সকল চিঠি আমার হাতে দিতে আজ্ঞা হউক। আপনকার আশীর্ব্বাদে এবং আল্লার কৃপায় আমি চিঠিগুলি কাহ্লেদের নিকট পঁহুছাইয়া দিব—সমস্ত নদীতে অগ্নি প্রবাহিত এবং আরবদেশের অর্দ্ধেক লোক প্রতিবাদী হইলেও, আমায় বাধা দিতে পারিবে না।"

কালিফ কহিলেন, "তুমি ছেলেমানুস, এখনও গোঁপ দেখা

দেয় নাই—আমার মত প্রাচীনের সঙ্গে তোমার কি তামাসা করা ভাল দেখায়?"

"ধর্ম্মাবতার, দাড়ি-গোঁপ দেখা না দিলেও আমি ত এই চিঠি আনিয়া আপনাকে দিয়াছি—এ কার্য্যে যে ঈশ্বর আমার সাহায্য করিয়াছেন, তিনিই আমার সঙ্গী হইবেন।"

"লোকজন সঙ্গে না লইয়া একাই যাইতে চাও কি?"

কনানা উত্তর করিলেন, "যে খড়্গ তুলিতে পারিব না, এমন ভারী খড়্গ আমাকে দেওয়া, আর আমার সঙ্গে সিপাহী-সান্ত্রী দেওয়া সমান কথা।"

কালিফ কহিলেন, "বৎস, মহম্মদের দাড়ির দিব্য করিয়া বলিতেছি, তোমার কথায় জ্ঞান ও বোকামী দুইই প্রকাশ পায়, তবে, এক কাজ কর; আসল চিঠি লইয়া তুমি এক পথে যাইবে, আর ঐ সকল কাগজপত্রের নকল লইয়া অন্য পথ ধরিয়া আমার সিপাহীরা যাইবে। ঈশ্বর যেন তোমায় সুবোধের মত কথা কহিতে শক্তি দেন, এই প্রার্থনা করি। তবে, রওয়ানা হইবে কখন্?"

কনানা অমনি বলিয়া ফেলিলেন, "এই মুহূর্ত্তে।"

কালিফ শুনিয়া কহিলেন, "বেশ কথা। ক'টা উট ও কয়জন চাকর তোমার সঙ্গে দিতে হইবে?"

কনানা বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, আজ যে কারাভান সহরে পঁহুছিয়াছে, সেই কারাভানের সঙ্গে খানিক পথ আমাকে আসিতে হইয়াছিল। সেই কারাভানের আগে আগে একটা শাদা উট আসিতে দেখিয়াছিলাম। সমভূমিময় দেশে এমন দ্রুতগামী ও সহিষ্ণু উট কখনও চখে পড়ে নাই। যে লোকটী ঐ উট চালাইয়া আনিতেছিল, উট তাহাকে বেশ চিনে, এবং তাহার কথাও মানে। আমি এই শাদা উট ও এই লোকটীকে চাই—আর খুব দ্রুতগামী একটা উট ও দুই-সপ্তাহের খোরাক চাই; আর কিছু চাই না।"

কালিফ মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "বল কি, কুড়িদিনের বেশী বই কম লাগিবে না যে!"

কনানা বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, পিঠে ভারী বোঝা চাপাইলে আল্গা বালিতে উটের পা বসিয়া পড়িবে, আবার ভারী বোঝা দেখিলে চোর-ডাকাইতের লোভ হইবে; তাই অল্প জিনিষ-পত্র চাই। আরও বলি, অন্য লোকের সেখানে পঁহুছিতে যদি তিন-সপ্তাহ লাগে, আমি দুই-সপ্তাহের মধ্যে আপনকার চিঠি পঁহুছাইয়া দিতে পারিব।" এই শেষ-কথা-কয়টীতে কনানার অতি সরল ভাব প্রকাশ পাইল।

কালিফ তৎক্ষণাৎ একজন কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া কহিলেন, "মোয়াবেদী-ফটকে গিয়া বল, যে কারাভান আসিয়াছে, সেই কারাভানের শাদা উটটী ও সেই উটের চালককে উমর দেখিতে চান; অন্য উট ও অন্য চালক হইলে চলিবে না। আর এব্নল হোসেনকে আমার কৃষ্ণবর্ণ উটের পৃষ্ঠে দুই উটের চৌদ্দ-দিনের খোরাক বোঝাই দিতে বল। শীঘ্র ঐ সকল আয়োজন কর, আধঘণ্টা পরে রওয়ানা হইতে হইবে।" অনন্তর একজন ভৃত্যকে বলিলেন, "গৃহের ভাল ভাল সামগ্রী এই 'মরুভূমির সিংহের' পুত্রকে পান ও আহার করিতে দেও।"

এই বলিয়া কালিফ অন্য কক্ষে গিয়া চিঠি লিখিতে বসিলেন। ভৃত্য প্রচুর খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিতে গেল। কর্ম্মচারী কালিফের আজ্ঞানুযায়ী কর্ম্ম করিতে চলিয়া গেল।

কনানা আবার বসিয়া, হাঁটুর উপরে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। দেখিলে বোধ হইবে, যেন নিদ্রা যাইতেছেন।

অতি মৃদুভাবে তিনি একটী কথা কহিলেন। হোরেবপর্ব্বতের তলদেশে রাগভরে যে কথা বলিয়াছিলেন, সেই কথা; কেবল স্বর ভিন্ন। "পিপাসিত ব্যক্তিকে এক-করঙ্ক জল দিয়া এই পুরস্কার পাইলাম। লা ইলাহা ইল্ আল্লা।" চাকর খাদ্য-সামগ্রী আনিয়া তাঁহার কাছে রাখিল, কিন্তু তিনি দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে কালিফ আবার আসিলেন, কনানা অমনি তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "শাদা উটে চড়িলে এ পোষাকে মানাইবে না। এ যে রাখালের বেশ। ইহার উপরে পরিবার জন্য একটা চোগা চাই। আর একখানা চাদর চাই। চাদরদিয়া আমায় মুখ ঢাকিতে হইবে। নহিলে মক্কার লোকেরা বলিবে যে, একটী বালক মহান্ কালিফের পত্রবাহক হইয়া যাইতেছে।"

অবিলম্বে এ সকল যোগাইয়া দেওয়া হইল। শাদা উট, চালক ও কৃষ্ণবর্ণ উট ফটকে দাঁড়াইয়া রহিল। সকলই প্রস্তুত; কনানা ছাগলের চামড়ার জামার উপরে সুন্দর চোগা পরিয়া ও চাদর দিয়া দাড়ি-গোঁপ-শূন্য মুখ ঢাকিয়া, প্রণত হইয়া কালিফের আশীর্ব্বাদ-গ্রহণ করিলেন।

কনানা উঠিয়া দাঁড়াইলে কালিফ প্রথমে তাঁহার হাতে চিঠি-পত্রগুলি দিলেন, কনানা সসম্ভ্রমে লইয়া সেগুলি বুকের কাপড়ের ভিতরে রাখিলেন। অনন্তর কালিফ একথলিয়া মোহর দিলেন, কনানা মুহূর্ত্তমাত্র সে থলিয়া হাতে রাখিয়া বিরক্তিসহ ঘরের মেঝিয়াতে ফেলিয়া দিলেন, বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, মক্কাসহরে যত মোহর আছে, সে সকলের অপেক্ষাও আমি বেশি দামী পুরস্কার পাইয়াছি।"

কালিফ শুনিয়া একটু হাসিলেন। বলিলেন, "যে তাল যার কানে ভাল লাগে, সে সেই তালে নাচুক। বৎস, তোমার ভাবী উন্নতির পথ মুক্ত দেখিতে পাইতেছি। তোমার হাতে আমি আরও কাজের ভার দিব। তোমার 'নসিব' ভাল। তুমি অনেক বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে, অবশেষে, যে সকল প্রধান যোদ্ধা আল্লা ও আরবদেশের জন্য তরোয়াল চালাইয়াছে, তাহাদের নামের তালিকায় কনানার নাম লিখিত হইবে। এখন এস, ঈশ্বর তোমার সঙ্গী।"

পল্লীগ্রামের খেয়ানৌকা।

লোভনীয় পুরস্কার বটে

কনানা যখন কালিফের ফটক-দিয়া বাহির হইয়া আইসেন, তখন কতকগুলি লোক তথায় দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল লোক, শাদা উষ্ট্রে চড়িয়া কনানার গমন দেখিবার প্রতীক্ষায় এবং কালিফের কাছারিতে কি হইতেছিল, যতটা সম্ভব, জানিবার আশায় এইখানে আসিয়াছিল।

কোন বিষয় সবিশেষ কিছু ইহারা জানিতে পাইল না। তথাপি যতটুকু জানিতে পাওয়া গেল, তাহাই কয়েকজন লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইল। তাহারা ফটকে থাকিয়া উমরের মুখাবৃত পত্রবাহককে উষ্ট্রে উঠিতে দেখিতে পাইল। চালক সেই উষ্ট্রে স্থিত ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞার প্রতীক্ষায় দৃষ্টি করিল। ঐ কয়জন লোক শুনিবার জন্য অতি আগ্রহসহকারে গলা বাড়াইল। তিনি কিন্তু কেবল একটী কথা বলিলেন। তাহা এই, "তেইফ"। মক্কাহইতে অল্প দূরে, পূর্ব্বদিকে, এই নামে একটা নগর আছে।

আবার মক্কার সেই পথে উষ্ট্রচালকের স্বর শুনিতে পাওয়া গেল। কিন্তু সন্ধ্যা হয় হয় হওয়াতে নগরের পথে বেশি লোকের গমনাগমন হইতেছিল না। কাজেই উষ্ট্র-চালককে বেশি চেঁচাইতে হইল না। খানিকদূর গেলে আর লোকের কোলাহল শুনিতেই পাওয়া গেল না; কনানাও চিরতরে মক্কাহইতে যাত্রা করিলেন।

কনানার উষ্ট্র যখন সমভূমিতে আসিয়া পড়িল, তখন রাত্রি; আশ-পাশের পাহাড়হইতে স্নিগ্ধ শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কনানাকে যেন বিশেষ ব্যস্ত বলিয়া বোধ হইল।

উপত্যকা-ভূমি নীরব, নিস্তব্ধ। অন্ধকারে যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, কনানার সম্মুখে আর কোন পথিক ছিল না; কেবল যে পাচজন অশ্বারোহী কনানার শাদা উটে চড়িয়া যাত্রা করিবার একটু পরে মক্কাহইতে রওয়ানা হইয়াছিল, তাহারাই ধীরে ধীরে তেইফ-নগরের দিকে চলিতেছিল।

এই লোকেরা একটু দূরে কনানার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। কনানা বার বার পশ্চাদ্দৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। কনানা অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহারাও ধীরে ধীরে আসিতেছিল, তাই তাহাদিগকে গতিশীলা ছায়াবৎ বোধ হইতে লাগিল। তাহারা বেশী নিকটবর্ত্তীও হইল না, বা বেশী দূরে পড়িয়া দৃষ্টিপথের বহির্ভূতও হইল না।

সম্মুখের দিকে নত হইয়া তিনি উষ্ট্র-চালককে মৃদুভাবে কহিলেন, "তোমার চলন দেখিয়া বোধ হয়, ক্লান্ত হইয়াছ। কৃষ্ণবর্ণ উটটা তোমার জন্যে আনিয়াছি। ঐটাতে চড়িয়া আমার পিছনে পিছনে আইস।"

চালক কহিল, "হুজুর, শাদা উটটা মোটেই কথা শুনে না। ও যদি আমায় চিনিত, অবাধে আমার সঙ্গে সঙ্গে পথ চলিত। ও চেনা চালক চায়।"

কনানা কহিলেন, "বাজে কথায় কাজ নাই—যা বলি, কর। শুন, এই কালো উট যেমন দ্রুতগামী, মক্কাসহরে এমন আর একটাও নাই। কালিফ এটাকে খুব ভালবাসেন। তুমি এইটায় চড়িয়া চল, আর আমি শাদা উট চালাইব। যদি আমায় পিছনে ফেলিতে পার, তাহা হইলে জানিব রসিদ বরকতের চখে এই মরুভূমির ধূলা ছড়াইয়া দিয়া শাদা উটটা তুমি দখল করিতে পারিবে।" এই লোকটী পিছন ফিরিয়া উমরের এই পত্রবাহকের দিকে তাকাইল। কনানা আবার জোরের সহিত বলিলেন, "চড়, চড়"। এই কথা শুনিয়া সে অমনি কালো উষ্ট্রের পৃষ্ঠে চড়িল, কিন্তু একটু থত-মত খাইল, অথচ অপরিচিত, অবাধ্য শাদা উট-চালনার দায় এড়াইল বলিয়া সন্তুষ্টও হইল।

কনানার কথা শুনিয়াই শাদা উট চলিল। কাল উটও পিছনে পিছনে ছুটিল, চালককে একটী কথাও কহিতে হইল না। কনানা যতক্ষণ স্থগিত হইয়া চালকের সহিত কথা কহিতেছিলেন, ততক্ষণ অশ্বারোহী লোকেরা তাঁহাকে ফেলিয়া অগ্রে যাইতে পারিত, আর কনানারও ইচ্ছা তাই; কিন্তু তাহারাও সেই সময়ে থামিয়াছিল, সুতরাং কনানার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না। এখনও তাহারা এত দূরে যে, ছায়াবৎ বোধ হইতে লাগিল

কনানা উষ্ট্রকে বলিলেন, "পা চালাইয়া চল।" এই কথা শুনিয়া বাস্তবিকই শাদা উট দীর্ঘ পাগুলি আরও একটু ঘন-ঘন ফেলিতে আরম্ভ করিল,—খোৎ-খোৎ করিয়া সচরাচর যেমন আপত্তি-প্রকাশ করে, সেরূপ কিছু করিল না। ঘন-ঘন প্রকাণ্ড পাগুলি ফেলাতে ও তোলাতে বিস্তর ধূলি উড়িতে লাগিল। বেদুইন-বালক কনানা মাথা নোওাইয়া পথের প্রতি চক্ষুদুটী স্থির রাখিয়া একমনে বসিয়া রহিলেন, সুতরাং পশ্চাৎদিকে অতি সামান্য শব্দ হইলেও তাঁহার শ্রবণ-পথ এড়াইতে পারিল না। তাঁহার মাথায় চাদর ছিল, তাহা কাঁধের উপর উড়িতে পড়িতে লাগিল।

কালো উট একবার একটু পিছাইয়া পড়িল, কিন্তু একটু জোরে চলিয়া আবার সমান সমান চলিতে লাগিল। চালক বিলক্ষণ জানিত যে, প্রথমে জোরে চালাইলে শেষে উট ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। সে ভাবিল, আর খানিক পথ গেলেই শাদা উট আপনি হাইল ছাড়িয়া দিয়া বসিবে, আপাততঃ ওটার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে পারিলেই হইল।

ঘোড়ার পায়ের শব্দ ক্রমেই স্পষ্ট, এবং নিকটতর বোধ হইতে লাগিল; উমরের পত্রবাহক কনানা বুঝিতে পারিলেন যে, অশ্বারোহীরা খরবেগে চলিয়া অনেকটা কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

"জোরে, আরও জোরে" কনানা যেই এই কথা বলিলেন, শাদা উট অমনি এমন জোরে ছুটিল, যেন দৌড়িল। দেখিতে না দেখিতে শাদা উট অশ্বারোহীদিগকে অনেক পশ্চাতে ফেলিল।

কৃষ্ণবর্ণ উট যেন বুঝিতে পারিয়া সাদা উটের সমান সমান চলিতে বিশেষ চেষ্টা করিল। এই উটের চালক ভাবিল, কি আশ্চর্য্য! শাদা উট ত চালকের বড়ই কথা শুনে, আর উটটা এমন ছুলিতেছে, অথচ লোকটা উটের পিঠে অবহেলে বসিয়া আছে। সে আরও দেখিতে পাইল যে, কনানা অতি সাবধানে গন্তব্য পথ দেখিয়া লইতেছেন, এবং এমন করিয়া উটকে চালাইতেছেন যে, অল্প পরিশ্রমে অধিক কাজ হইতেছে।

গদি নাই, লাগাম নাই, এমন উটে চাপিয়া বেনি-সৈয়দের চরাণী-মাঠে রাত্রিকালে কনানাকে কতবার ঘুমন্ত ছাগ-মেষকে চৌকি দিতে হইত; তাহা করিয়া উট চালাইবার বিষয়ে তাঁহার যে শিক্ষা-লাভ হইয়াছিল, স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, সেই শিক্ষা এই-প্রকার কাজে লাগিবে।

ক্রমে ঘোড়ার পদশব্দ অস্পষ্ট হইতে লাগিল। অশ্বারোহীরা ক্রমেই অধিক পিছনে পড়িতে লাগিল। কনানার শ্রবণশক্তি বড় তীক্ষ্ণ। অশ্বারোহীরা যে অশ্বগণকে দ্রুত চলিবার জন্য ডাক-হাঁক করিতেছিল, কনানা এক-একবার তাহা শুনিতে পাইলেন।

বেদুইন-বালক কনানা অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "উহারা খুব জোরে হাঁকাইতেছে, কিন্তু আমার লাগাইল ধরিতে পারিবে না।"

কনানা আপন উষ্ট্রকে আবার বলিলেন, "আরও জোরে;" এই কথা শুনিয়া শাদা উট এমন জোরে চলিতে আরম্ভ করিল যে, বেচারার সুন্দর বাঁকা গলা সোজা হইয়া গেল, দেখিয়া বোধ হইল যেন, বালুকাসমুদ্রের উপর-দিয়া শাদা উট উড়িয়া চলিয়াছে।

কালো উটটা একটু পিছে পড়িল বটে, কিন্তু চালক যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, চাবুক মারিল, অবশেষে শাদা উটের লাগাইল ধরিল।

এখন আর অশ্বের পদশব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না, কাজেই কনানাকে কান পাতিয়া চালকদের অস্পষ্ট স্বর শুনিতে হইল।

"উহারা বড় জোরে ঘোড়া চালাইয়া আসিতেছে, তা হউক, আমরা আরও জোরে চালাইতে পারি", কনানা মনে মনে এই-রূপ ভাবিতেছেন, আর দেখিতেছেন, শাদা বালুকাময়ী মরুভূমিস্থ সামান্য গাছ-পালা-সকল যেন দুই-পাশদিয়া তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া বেগে যাইতেছে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ও দেখিতে দেখিতে কনানা এক অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন—ছাড়াতে আরামবোধ হইল।

দ্রুতগামী উষ্ট্রের পায়ে বিস্তর বালি উঠিতে, ও উড়িয়া মরুভূমিস্থ গাছপালায় শুষ্ক পাতায় শিলাবৃষ্টির মত পড়িয়া একপ্রকার মধুর শব্দ হইতে লাগিল। কনানা ক্রমাগত এইরূপ দ্রুত উষ্ট্র চালাইতে থাকিলেন; কখনও ছোট ছোট পাহাড়ের উপরদিয়া, কখনও বা বালুকাময়ী সমভূমিদিয়া যাইতে হইল; মক্কা-নগরহইতে একরাত্রি চলিয়া আসিলে পথিকদিগের বিশ্রামের একটী স্থান পাওয়া যায়, এখানে একটা ইন্দারা ও খানকতক মাটীর ঘর আছে,—কনানা এস্থানও ছাড়াইয়া চলিলেন, বিশ্রাম করিবার কোন কথাই নাই। কালো উট একটু পিছনে বটে, কিন্তু শাদা উটের লাগাইল ধরিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

চালকের অনেক চেষ্টাতে কালো উট যেই শাদা উটের কাছে আসিয়া পড়ে, কনানা অমনি বলেন, "আরও জোরে," এই কথা শুনিবামাত্র শাদা উট কালোটাকে ছাড়াইয়া আগে যায়। এটা কি আর থামিবে না?

এখন পিছন-দিকে আর ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। এমন সময়ে, তেইফহইতে যে সকল লোকজন যাত্রা করিয়াছিল, অনেক দূরে সেই কারাভান দেখিতে পাওয়া গেল। তাহারা বায়ুবেগে শাদা উষ্ট্রের কাছে আসিয়া পড়িল। পরস্পর কেবল মরুদেশে প্রচলিত সাঙ্কেতিক "শালামাক্কি" হইল, অনন্তর তাহারা ইহাদিগকে ফেলিয়া পশ্চিম-মুখে চলিয়া গেল। অন্ধকার-প্রযুক্ত আর দেখিতে পাওয়া গেল না।

যখন আর দেখিতে পাওয়া গেল না, তখন শাদা উট অকস্মাৎ নিজ-গতি ফিরাইল। তেইফের পাহাড়িয়া উত্তরমুখী পথ ছাড়িয়া, পূর্ব্ব-মুখে বরাবর মরুভূমি ভাঙ্গিয়া চলিল।

কালো উটের চালক ভাবিল, তাই ত, এমন হইল কেন? শাদা উটের শোয়ারী ত পথ ভুলিবার লোক নহেন!

সে পিছনে পিছনে নিজের উট চালাইল। অবশেষে, মক্কা-হইতে পারস্য-দেশে যাইতে হইলে দুইরাত্রি পথ চলিয়া যেখানে বিশ্রাম করিতে হয়, সেই ইন্দারার নিকটে আসিয়া পঁহুছিল।

এইখানে থামিতে হইলে কাল উট ও সেই উটের চালকের বড় আনন্দ হইত। কিন্তু শাদা উট দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেই লাগিল, রাত্রিকালে অতি দ্রুত চলাতে বোধ হইল, উটটা যেন রক্তমাংস-বিশিষ্ট প্রাণী নহে, অশরীরী কোন কিছু।

অনেক চেষ্টা করিয়া, কতকটা নিকটে আসিয়া কালো উটের চালক কনানাকে বলিল, "হুজুর এ ত তেইফের পথ নহে।"

"তা জানি," বলিয়া কনানা উট চালাইতেই থাকিলেন।

যখন পূর্ব্ব-আকাশ একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তখন নিতান্ত নিরাশ হইয়া, কালো উটের চালক আবার কনানাকে কহিল "হুজুর, উটটাকে মারিয়া ফেলিতে চান না কি?"

কনানা কহিলেন, "একরাত্রেই মরিবে না, হে; যদি নিজের প্রাণ বাঁচাইতে চাও, ত চলিয়া আইস।"

ঊষার ক্রোড়স্থিত সূর্য্যালোকে পূর্ব্বদিক রক্তবর্ণে রঞ্জিত হই-য়াছে। শাদা উট সেই দিকে মুখ করিয়া আরও দ্রুতপদে চলিল। কিন্তু কালো উট এতটা পথ যথাসাধ্য জোরে চলিয়া আসিয়াছে, তাই বেশী জোরে আর চলিতে পারে না। বেচারা ক্রমেই শাদা উটের বেশী পিছনে পড়িতে লাগিল। চালক ঢের চেষ্টা পাইল, তবু কালিফের আদরের ধন কৃষ্ণবর্ণ উট হারিয়া গেল। শাদা উট পূর্ব্ব-মুখেই চলিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ।)

কয়লার খনির ছোক্‌রা-মজুর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

"ডা'ন্‌দিক্‌কার তেস্‌রা লোকটির কাছে।"

"ও স্মিথের কাছে ; তা' হ'লে দাঁড়াও একটু, তার কতকগুলো চারফিট্‌-গোঁজ দরকার হ'বে।" এই বলিয়া ডিপুটী তাহার গাড়ীতে কতকগুলি তক্তা ফেলিয়া দিলে, সে চলিয়া গেল।

তাহার পর, অন্য অন্য ছোক্‌রারাও ফ্ল্যাটে আসিতে লাগিল, আর ডিপুটী আলা'দা আলা'দা খনককে তাহাদের দিয়া তক্তা পাঠাইতে লাগিল। এইরকমভাবে, আহারের সময়টুকুছাড়া, আর সকল সময়েই অনবরত কাজ চলিতে থাকে।

আহার করিবার জন্য কেহ বাহিরে যাইতে পায় না। একবার একজন ছোক্‌রা কি খনক নীচে নামিলে, সে জানে এখন অনেক ঘণ্টা তাহাকে হাড়ভাঙ্গা মেহনৎ করিতে হইবে।

তোমরা হয়ত ছোক্‌রা-মজুরেরা কত রোজগার করে তাহা জানিতে চাহিতেছ। সচরাচর ছোক্‌রা-মজুরেরা প্রায় খনকদের মতই রোজগার করে। খনকেরা সাতশিলিং অর্থাৎ বারো-আনা করিয়া শিলিং ধরিলে সাতবারং চুরাশী-আনা—৫।০ পাঁচটাকা চার-আনা করিয়া রোজ পায়, তা' ছাড়া কতকগুলি ছোট ছোট ছোক্‌রা বড়দিনের সময়ে কিছু কিছু বক্‌শিশ্‌ বা উপহারও পাইয়া থাকে।

খনকদের মধ্যে একটি অনেককেলে বেশ আমুদে পদ্ধতি আছে। বড়দিনের কাছাকাছি তাহারা নিজের নিজের ছোক্‌রা-মজুরদের কোন একটি ছোট উপহার দিয়া থাকে। সেই উপহারগুলি হরেকরকমের হইয়া থাকে। কেহ একটা আপেলের ভিতর একটা শিলিং পুরিয়া দেয়, কেহ একটা জন্তুর ভিতর কোন উপঢৌকন দেয়, কেহ তাহার স্ত্রীর তৈয়ারী একটি পিটুলীর পুতুল দেয়—এইরকম। এই উপহার-দ্রব্যগুলিতে বড় কারুগিরি দেখা যায় এবং এগুলি লইয়া নানা তামাসা হয়।

খনির ছোক্‌রারা এই উপহারগুলির বড়ই প্রত্যাশা করিয়া থাকে। যে খনক কোনরকম ইতরামি করে, কিম্বা অন্য খনকেরা যখন ছোক্‌রাদের উপহার দেয়, তখন হাত গুটাইয়া থাকে, তাহাকে পরে বড় কর্ম্মভোগ করিতে হয়। হয়ত সে দেখিবে, কে তাহার কাপড়-চোপড় চুরি করিয়াছে কিম্বা লুকাইয়া রাখিয়াছে। সময়ে সময়ে ছোক্‌রারা যে খনককে দেখিতে পারে না, তাহার কাপড়-চোপড় লইয়া একটা খালি গাড়ীতে রাখিয়া যেন কিছুই জানে না এই রকম ভাণ করিয়া খনির ভিতর ঢুকিয়া যায়। ফলে সেই অভাগ্য খনককে খনির আঁটা-সাঁটা কুর্ত্তা, পায়জামা, মোজা ও জুতা পরিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতে হয়। তাহার সহখনকেরা তাহার প্রতি একটুও সহানুভূতি দেখাইবে না, কারণ খনির সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বেশ সৌহৃদ্য ও সম্প্রীতি আছে, কেহ কোন রকম ইতরামি করিলেই খনির সব লোকেই তাহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠে।

ডারহাম-প্রদেশে পুটারেরা সচরাচর দিনে প্রায় দশঘণ্টা করিয়া আর খনকদের বড় বেশী মেহনৎ করিতে হয় বলিয়া তাহারা সাতঘণ্টা কি সাড়েছয়ঘণ্টা করিয়া কাজ করে। ইহাদের কাজ দিনের ও রাত্রের "শিফ্‌টে" বিভক্ত, আর সময়-নির্দ্ধারণ-পদ্ধতি বড় বিস্তীর্ণ।
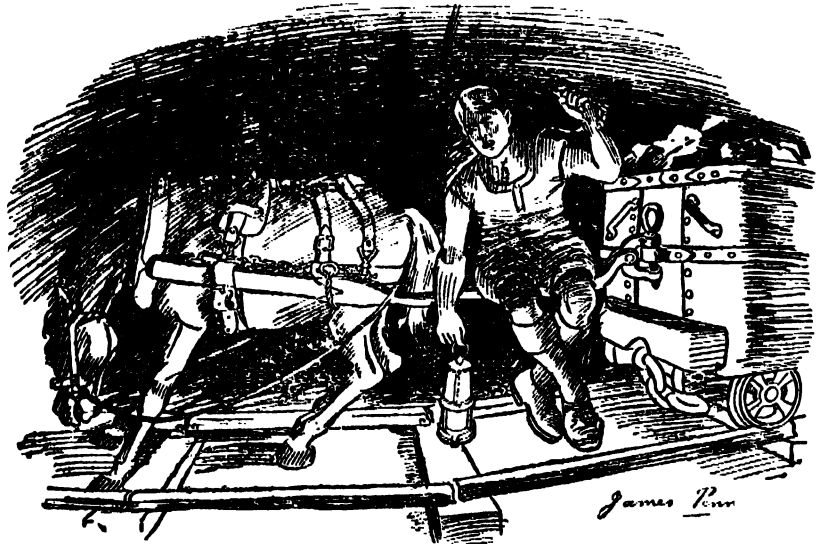
"পুটার" কয়লা-বোঝাই গাড়ী লইয়া চলিয়াছে।

কোন ছেলে কয়লার খনিতে কাজ করিতে ঢুকিলে, তাহাকে প্রথমে "ট্র্যাপারের" কাজ দেওয়া হয়। যেখানে কয়লা খোঁড়া হইতেছে, সেইখানকার যে দরজাদিয়া পুটারেরা বোঝা লইয়া আনাগোনা করে, সেই দরজাটি চৌকী দেওয়াই ট্র্যাপারের কাজ।

ঐ দরজাগুলি দিয়া খাদের মধ্যে বায়ু-চলাচল হয়। এই দরজাগুলি যদি এক মিনিটের বেশী খুলিয়া রাখা যায়, তাহাহইলে হাওয়ার স্রোত বদ্‌লাইয়া যাইবে, আর তাহাহইলে সম্ভবতঃ যে খনক দূরে কাজ করিতেছে সে দমবন্ধ হইয়া মারা পড়িবে। সুতরাং তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ, ট্র্যাপারের ঝুঁকী বড় কম নয়।

ট্রাপারের কাজহইতে খনি-বালক ক্রমশঃ চালকের পদে উন্নীত হয়। চালকের কাজ অনেকটা পুটারের কাজের মতই। কারণ সেও টাট্টু-ব্যবহার করে আর কয়লার গাড়ীর "লিমারের" বা কম্পাসের উপর বসিয়া যায়। পুটারের কাছে টব্‌গুলি আনা আর সেগুলি বোঝাই হইলে আবার লইয়া যাওয়া তাহার কাজ। কাজেই সে পুটারের অনেকটা সহকারীর মত। নিয়ম-মত দুইজন চালক ছয়জন পুটারকে সাহায্য করে, আর ছয়জন পুটারে চব্বিশজন খনকের কয়লা সরায়। চালকেরা ভরা টবগুলি "ল্যাণ্ডিং"এ আনে, সেখানহইতে "বাঁধা রাস্তা" আরম্ভ হইয়াছে, সেখানহইতে টবগুলি একপ্রস্থে খনিকূপে লইয়া যাওয়া হয়। আবার সেখানহইতে দুইটী করিয়া টব ঝুড়িতে বসাইয়া উপরে জানান দেওয়া হয়, তখন কল চলিতে সুরু হয়, আর ঝুড়িগুলি উপরে উঠিয়া যায়।

এখন তোমরা কিছুক্ষণের জন্য ডিপুটীর "সিন্দুক" ছাড়িয়া একজন ছোক্‌রা-মজুরের সঙ্গে যেখানে কয়লা-কাটা হইতেছে, সেইখানে খনকের কাজ দেখিবে চল। যাইতে যাইতে তোমরা দেখিতে পাইবে সুড়ঙ্গ ক্রমশঃ নীচু ও সরু হইয়া গিয়াছে। অনেক জায়গায় গাড়ী চলিবার জায়গারও টানাটানি পড়িয়াছে। আর পুটারের পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য তোমাদের অনেকবার আলা'দা আলা'দা খনকদের জন্য যে সমস্ত আলা'দা আলা'দা গলি গিয়াছে, সেই সমস্ত গলির বাঁকে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

খনক।

তোমরা ইহাও দেখিতে পাইবে যে, সেই সব রাস্তায় রেলগুলি যেমন-তেমন করিয়া পাতা হইয়াছে, গাড়ীগুলি ঠিক লাইনের উপরে রাখিতে পুটারদের সময়ে সময়ে বড় বেগ পাইতে হয়, কারণ গাড়ীগুলি প্রায়ই বেচাল হইয়া পড়ে। সেই লাইনগুলি এমন করিয়া পাতা হইয়াছে যে, যখন কোন দিক্‌কার কয়লা ফুরাইয়া যাইবে, তখন যেন আবার লাইনগুলি তুলিয়া ফেলিয়া অন্যদিকে পাতা যায়। পাকারাস্তা ও রাহীরাস্তা খুব যত্ন করিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে, এবং পথগুলি দেখিবার জন্য লোকও আছে।

অবশেষে যেখানে একজন খনক কয়লা কাটিতেছে সেখানে তোমরা পঁহুছিলে। সে একটা টুলের উপর বসিয়া আছে, সজোরে গাঁথিদিয়া কয়লা কাটিতেছে। এখানকার আব-হাওয়া বড় কষ্টদায়ক। অল্পক্ষণ পরে তাহার পুটার আসিল, ভরা টবটী বাহির করিয়া দিয়া ও খালি টবটী টানিয়া লইয়া খনক মাতালের মত টলিতে টলিতে দাঁড়াইল, হাঁতড়াইয়া গাড়ীর নিকটস্থ একটি গোঁজ-হইতে তাহার একটি নিশানা লইয়া টবের হুকে ঝুলাইয়া দিল, তাহার পর একটু বিশ্রাম করিতে লাগিল। কয়লার খাদের এক-এক জায়গার হাওয়া এমনই বদ্ যে, খনকের কাজ বাস্তবিকই বড় কষ্টকর হইয়া উঠে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও খনকেরা বেশ স্ফূর্ত্তিবাজ লোক, দিনান্তে যখন তাহাদের কাজ চুকিয়া যায়, তখন কোথাও যদি কোন আমোদ-আহ্লাদ হইতে দেখে, তাহাতে স্ফূর্ত্তির সহিত যোগ দেয়। তাহারা বিশেষ করিয়া ফুটবল খেলিতে ভালবাসে।

খনকেরা যদি দেখে যে, খাদের হাওয়া একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিতেছে, তাহাহইলে তাহাদের ডেপুটীর কাছে গিয়া বলে, আর সে যদি পারে তাহাহইলে উত্তম বায়ু-চলাচলের বন্দোবস্ত করিয়া দেয়। কিন্তু খনকেরা জানে যে, তাহাদের কাজের উপরই তাহাদের "রোজী" নির্ভর করিতেছে, তাই তাহারা বড়-একটা আপত্তি করে না, কেহ আপত্তি করিলে তাহার জায়গায় অন্যলোক পাইতে কোনই কষ্ট হয় না। মানুষের শরীরে যে কত কষ্ট সয়, এক-একজন খনক তাহার মূর্ত্তিমান প্রমাণ, ষাট-বছর বয়সের বুড়াও খনন-কার্য্য ছাড়ে না। অধিকাংশ খনকেরই গায়ের রং ফেঁকাশে হইয়া যায়। কিন্তু এদিকে তাহাদের ধাতু খুব কড়া। দোষ হয় তাহাদের চোকের, কিছুদিন ডেভি-বাতির মিট্‌মিটে আলোতে কাজ করিলেই চোক খারাব হইয়া যায়।

খনির ভিতর আহার করিবার কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। খনকেরা রুটী কিম্বা অন্য কিছু খাবার বাঁধিয়া লইয়া খনির মধ্যে নামে, আর যখন ফুরসুৎ পায়, আহার করে।

কয়লা-খনির উপরে ও নীচে আরও অনেক কাজ আছে। তাহার মধ্যে যে লোক্‌টি "ওয়াইন্‌ডিং এঞ্জিনের" কাজ করে তাহার কথা না বলিলে চলিবে না। তাহার কাজ যেমন দরকারী, তেমনি দায়িত্ব-পূর্ণ। রোজ তিনজন লোক ওয়াইনডিং-এঞ্জিনের কাজ করে। প্রথম লোক ভোর ছ'টায় আসিয়া কাজ ধরে, দ্বিতীয় লোক বেলা একটার সময় আসিয়া তাহাকে অব্যাহতি দেয়, আর তৃতীয় লোক রাত ন'টার সময়ে আসিয়া ভোর ছ'টায় ছুটি পায়।

এই লোকেরাই সময় হইলে ভেঁা বাজায় আর ঝুড়ি নামাইবার

উঠাইবার কল চালায়। ইহারা কলহইতে খনি-কূপের মুখ বেশ দেখিতে পায়। ঝুড়িহইতে উপরের লোকেরা টব নামাইয়া লইলে, সে নীচেহইতে "অনসেটারের" জানান পাইবার অপেক্ষায় থাকে। যে লোক খনি-কূপের তলায় থাকিয়া ঝুড়ির উপর টব্ চাপাইয়া জানান দেয় তাহাকে "অনসেটার" বলে।
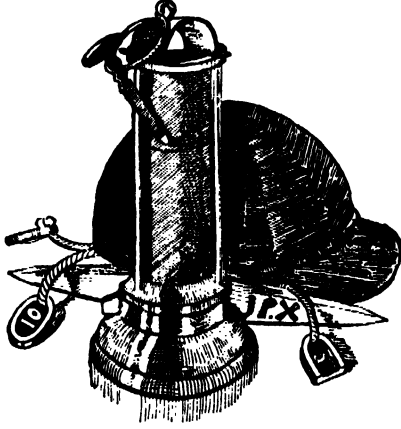
ডেভি বাতি, মজুরদের টুপি ও নিশানা।

তোমরা দেখিতে পাইলে কয়লার খনির মজুরেরা কত মেহনৎ করিয়া তবে দু'পয়সার মুখ দেখিতে পায়। কিন্তু—

"খনিগর্ভে মণি রহে, মুকুতা সাগরে ;
কে তাহা কুড়া'য়ে পায় পথে বা প্রান্তরে ?"

কেউই না। যত্ন না করিলে এ জগতে কেউই রত্ন পায় না। আবার একের মেহনতের ফল অনেকে ভোগ করিয়া থাকে। কয়লার খনির মজুরেরা অত কষ্ট করিয়া যে কয়লা তুলে, সেই কয়লায় কত লোকের কত রকমে উপকার হইয়া থাকে। তবুও কতকগুলি ইতর-স্বভাব লোকের এমনই বদ্-অভ্যাস আছে যে, তাহারা ঐ মজুরদের "মজুর" বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে। সেই অহঙ্কারী "বাবুদের" বুঝা উচিত যে, শ্রমজীবী "চাষাভুষো" কুলি-মজুরেরা মেহনৎ না করিলে তাহাদের দক্ষিণহস্তের ব্যাপার একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে, সুতরাং তাহাদের ঐ শ্রমজীবীদের "ছোটলোক" না ভাবিয়া তাহাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা ও তাহাদের উচিতমত শ্রদ্ধা করাই কর্ত্তব্য।

আর একটি কথা এই, তোমরা দেখিয়াছ কয়লা-খনির মজুরেরা অত পরিশ্রম করে, তবুও তাহারা মুখ "গোম্‌রা" করিয়া থাকে না। যখন কাজ-কর্ম্ম চুকিয়া যায়, তখন কোনকিছু আমোদ-আহ্লাদ হইতে দেখিলে স্ফূর্ত্তির সহিত যোগ দেয়। পরিশ্রম মানুষকে নিরানন্দ করে না, কুড়েমীই যত "অহিতের জড়"। জোন-মজুর মেহনৎ করিয়া আসিয়া "বুগ্‌ড়ী চা'লের" ভাত যত পরিতোষের সহিত খায়, বাবুরা ঘরে বসিয়া "মিহি দাদ্‌খানি"ও তত পরিতোষের সঙ্গে কখন খাইতে পান না।

ফুট্‌বল।

"রেফি"-গিরি।

সাধারণ ফুট্‌বল-ম্যাচে মনের মত রেফ্রি পাওয়া প্রায়ই বড় মুস্কিল হয়। খারাব রেফ্রি খেলাটি যে মাটী করিয়া দেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। রেফ্রির উপর দুইদলেরই খেলোয়াড়দের যদি বিশ্বাস না থাকে, তাহাহইলে খেলার সময় গোলমাল ও মন-কষাকষি এড়ান দায় হইয়া উঠে। যে সমস্ত পরামর্শ পাইলে ছেলেরা চেষ্টা ও অভ্যাসের গুণে পাকা রেফ্রি হইয়া উঠিতে পারে, সেই সমস্ত পরামর্শ দেওয়াই এই প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য। রেফ্রিগিরি শিখিবার সবচেয়ে ভাল উপায় হইতেছে, যখন কোন পাকা রেফ্রি কোন ম্যাচে রেফ্রি হইবেন, তখন তাঁহার কাজগুলি ভাল করিয়া দেখা। এইরকম করিলে রেফ্রিগিরিতে যত পাকা হওয়া যায়, বইহইতে ফুট্‌বল-খেলার আইন-কানুনগুলি মুখস্থ করিলে সম্ভবতঃ তত হওয়া যায় না। তবুও নীচে যে ক'টি কথা বলিয়াছি, সেক'টি কথা মনে রাখা দরকার।

রেফ্রির যে "একচোকো" হইলে চলে না, তাহা বলাই বাহুল্য। যখন খেলা দেখিতেছিলে, রেফ্রি হও নাই, তখন যদি কোন দলের উপর তোমার "টান" পড়িয়া থাকে, যখন রেফ্রি হইবে তখন সে দলের উপর আর সে টান দেখাইবে না। দুইদলই নিয়ম মানিয়া চলিতেছে কি না তাহা দেখা, আর কোন দলের দিকে না ঝুঁকিয়া যথার্থ বিচার করাই রেফ্রির কর্ত্তব্য। একচোকো না-হওয়া-ছাড়া রেফ্রির খেলার নিয়মগুলি ভাল করিয়া জানা, চোকের তেজ আর ভাল শরীর থাকা দরকার। সকলের উপর তাঁহার থাকা চাই—বাইশজন ছেলেকে চালাইবার শক্তি আর আপনার মনের উপর প্রভুত্ব। যে রেফ্রি সবচেয়ে ভাল, তিনিও অনেক সময়ে ভুল করিয়া থাকেন, তা'ছাড়া রেফ্রির নিষ্পত্তিসম্বন্ধে দুইদলেরই খেলোয়াড়দের আর যাহারা খেলা দেখিতেছে তাহাদের মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু তা' বলিয়া কোন দলের চীৎকার শুনিয়া

রেফ্রির রায়-বদলান উচিত নহে, আপনার রায়ই বজায় রাখা উচিত।

খেলাতে যেন অভদ্রতা ও বিশৃঙ্খলা না হয়, সেদিকে রেফ্রির দৃষ্টি রাখা চাই, কারণ খেলাটি যাহাতে ভদ্র ও ন্যায়সঙ্গতভাবে হয়, তাহার জন্য তিনিই দায়ী। যদি তিনি দেখেন, কোন খেলোয়াড়ের অন্যায় ব্যবহারে হাঙ্গাম বাধিবার সম্ভাবনা, তাহাহইলে তাঁহার তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়া বিপক্ষ-দলকে একটি "ফ্রি কিক্" দেওয়া উচিত। কিম্বা তেমন তেমন দেখিলে সেই খেলোয়াড়কে তিনি মাঠের বাহির করিয়া দিয়া তাহার মন্দ ব্যবহারের কথা ফুট্‌বল-সমিতিকে জানাইয়া দিবেন। ইংলণ্ডে একজন রেফ্রি এক খেলোয়াড়কে মাঠের বাহিরে যাইতে হুকুম করেন, তাহাতে সেই খেলোয়াড় রাগে রেফ্রিকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেয়। তাহার জন্য তখনই খেলা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, আর ফুট্‌বল-সমিতি আর কখনও সেই খেলোয়াড়কে তাহাদের নিয়মাধীনে ম্যাচ্ খেলিতে দেন নাই। খেলোয়াড় বা যাহারা খেলা দেখিতেছে তাহারা যদি রেফ্রির উপর চটিয়া যায় তাহাহইলে তাঁহাকে সময়ে সময়ে কি বিপদে পড়িতে হয়, তাহা তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ, কিন্তু তবুও তাঁহার কিছু ভয় না করিয়া সাহসের সহিত তাঁহার কর্ত্তব্য করা উচিত।

দুর্য্যোগের দরুণ কিম্বা অন্য কোন কারণে রেফ্রিদের সময়ে সময়ে বড় বিচিত্র ব্যাপার দেখিতে হয়। একবার বিলাতে এক ফুট্‌বল-ম্যাচের সময়ে মাঠের উপরদিয়া ঝড় বহিতে আরম্ভ হইল। এক সিপাহী খেলা দেখিতেছিল, সে একদলের "গোল-কীপারের" উপর সদয় হইয়া তাহাকে তাহার জামাটি খুলিয়া পরিতে দিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, গোল-কীপার ভুলিয়া গিয়াছিল যে, সিপাহীদের জামার পিছনে কোমরবন্ধ আট্‌কাইবার জন্য "হুক" থাকে। ঐ গোল-কীপার "গোলের" খুঁটিতে ঠেসান দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময়ে, বিপক্ষদল আসিয়া সেই গোলের উপর চড়াও হইল। গোল-কীপার বল্‌টি রুখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সিপাহীর সেই জামার হুক গোলের জালে আট্‌কাইয়া যাওয়াতে, সে তাহা ছাড়াইতে না ছাড়াইতে, তাহার প্রতিপক্ষেরা বল্‌টি গোলে ঢুকাইয়া দিল।

রেফ্রিগিরিসম্বন্ধে আমার শেষ কথা এই, মনে রাখিও, রেফ্রি-গিরি করা সোজা কাজ নয়। পাকা রেফ্রি হইতে হইলে অনেক দিন ধরিয়া মন দিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। এইরকম ভাল রেফ্রিরই খুব অভাব আছে। তাই আমি আশা করি, এই ছোট প্রবন্ধটির কোন কোন পাঠক ইহা পড়িয়া ঐরকম রেফ্রি হইবার জন্যই যত্ন করিবে, তাহাহইলে তাহারা বাংলার ফুটবল-খেলোয়াড়দের যথার্থ সহায় হইয়া উঠিতে পারিবে।

উচ্চৈঃশ্রবা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সেই যে দুই-বৎসর-বয়সের একটা পাঁঠার বিষয় বলিয়াছিলাম, গত গ্রীষ্মকালে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এই পালের মধ্যে তাহার একবয়সী পাঁঠা আর ছিল না, আর সে নিজেকে দ্বিতীয় ভীম মনে করিত, তাই একাই যেখানে সেখানে যাইত, অবশেষে মটুমটুর হাতে প্রাণ হারাইতে হইল; তাহার চামড়া নষ্ট হয় নাই, মটুমটুর ঘরে তোলা আছে, শীতকালে চট্টগ্রামে চালান হইবে। বর্ষার শেষে উত্তরে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে আরম্ভ হইলেই ধাড়ীরা বাচ্চাদিগকে দুধ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। এখন বেশ শীত পড়িয়াছে, রাত্রে এত শিশির পড়ে যে, সকালবেলা উলুবন, কাওলাবন শাদা হইয়া থাকে; তাহার উপর সকালবেলার সূর্য্যকিরণ পড়িলে বড়ই সুন্দর দেখায়।

দুধ না পাওয়াতে বাচ্চারা ঘাস ও লতাপাতা খাইয়াই থাকে। ধাড়ীগুলিরও এক্ষণে শ্রী ফিরিয়াছে। তাহারা বিলক্ষণ মোটাসোটা হইয়া উঠিয়াছে। বাচ্চাদের আর বড় একটা দেখিতে শুনিতে হয় না বলিয়া তাহাদের মন আর আর বিষয় ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছে। শীতের শেষে, বসন্তের আরম্ভে অনেক বন্য পশুর সমাজে "লগ্নসার" উপস্থিত হয়। এ সমাজে ঘটক বা ঘটকী নাই—এসমাজে "কন্যা হয় কন্যাকর্ত্তা, বরকর্ত্তা বর।" এই সামাজিক নিয়ম অনুসারে "কন্যারা" বরের অন্বেষণে, যেখানে যেখানে গেলে নির্ব্বন্ধমতে বর পাওয়া যাইবে, পাহাড়ের এমন নানাস্থানে যাওয়া-আসা করিতে লাগিল।

গ্রীষ্মকালে পাহাড়ের ঢালুতে চরিবার সময়ে এই ধাড়ীরা অতি দূরে, দুই-একটা প্রকাণ্ড পাঁঠা দেখিতে পাইয়াছে, ছাগ-সমাজের রীতি-অনুযায়ী ইসারাদ্বারা কে কি, বা কাহারা কি, সে পরিচয়েরও আদান-প্রদান হইয়াছে। কিন্তু কেহ কাহারও সঙ্গে মিশিতে চায় নাই, যে যার দূরে দূরেই রহিয়াছে। একদিন অকস্মাৎ দুইটা হৃষ্টপুষ্ট ছাগ দেখা দিল, কিন্তু একটু দূরে। ইসারায় পরস্পরের পরিচয় দেওয়া-লওয়া হইল; পরিচয় পাইয়া ধাড়ীরা সরিয়া গেল না। পাঁঠাদের দিকে চলিল। পাঁঠারাও অগ্রসর হইয়া আসিল। অপরিচিত ছাগ-দুইটা কাছে আসিলে, তাহাদের প্রকাণ্ড

দেহ, বীরের ন্যায় ভাবভঙ্গী, বড় বড় শৃঙ্গ দেখিয়া, সকলেই বুঝিতে পারিল, ইহারা কাহারা। তাহারা "সগর্ব্ব পাদবিক্ষেপে," অগ্রসর হইল। তাহাদের "পদভরে" যেন "ধরা" কাঁপিতে লাগিল। দীর্ঘভুজা ও তাহার দলস্থ সকলের প্রগল্ভতা ঐ ত্বইটাকে দেখিয়া পলাইতে পথ পাইল না—এখন লজ্জাশীলতা আসিয়া সকলকে পাইয়া বসিল। আগন্তুকদিগকে দেখিয়া উহারা ফিরিল। ফিরিয়া পলাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আগন্তুকেরা অনেক তাড়া-হুড়া করিল, অবশেষে দীর্ঘভুজার দলকে ধরিয়া ফেলিল—এবং সকলে উহাদিগকে দলে গ্রহণ করিল। এইবার ঐ দুই-জনের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল—এ ব্যাপারে বিবাদ হইয়াই থাকে। পূর্ব্বে পাঁঠা-দুইটার পরস্পর বেশ ভাব ছিল, একটা অপরটার সঙ্গী ছিল। কিন্তু বন্ধুতা আর প্রেমের প্রতিযোগিতা এক-প্রাণে একই সময়ে তিষ্ঠিতে পায় না। দুই পাঁঠায় অল্প-বাক্যব্যয়ের পরেই, তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল; শিঙ্গে শিঙ্গে এমন ঠকাঠকি হইল যে, শিঙ্গের চটা উঠিয়া ছিটকিয়া পড়িতে লাগিল। বার-কতক ঢুঁসা-ঢুঁসির পর, যেটা আকারে একটু ছোট, এবং হালকা বা পাতলা, সেটা পিছে হটিয়া পড়িল। অনন্তর এক লাফে উঠিয়া, পলাইয়া যাইতে লাগিল। অন্যটা পিছনে পিছনে আধ-ক্রোশ পথ গেল, কিন্তু যেটা পলাইতেছিল, সেটা আর লড়িতে ঘাড় পাতিল না। তাই বিজয়ী পাঁঠা ফিরিল, আরও সগর্ব্ব পাদ-বিক্ষেপে ধাড়ীদের দলে আসিল। কেহ বাধা দিল না; পলাইল না। কাজেই সে দলের কর্ত্তা, "কুলীন" জামাইবাবু হইল।

উচ্চৈঃশ্রবা আর দশরথকে কেহ গ্রাহ্য করিল না। প্রকাণ্ডকায় পাঁঠা এক্ষণে দলপতি, দলের চালক; উচ্চৈঃশ্রবা আর দশরথ তাহার ভয়ে অস্থির। তাই উহারা ভাবিল, আমাদিগকে যখন কেহ ডাকি-য়াও জিজ্ঞাসা করে না, তখন এই সংসারের আমোদ-আহ্লাদের সময় আমাদের একটু সরিয়া যাওয়াই ভাল। তাহারা সরিয়া গেল।

বসন্তকালের আরম্ভহইতে কিছু দিন এই পাঁঠাটাই দলস্থ সকলকে চালাইয়া লইয়া বেড়াইল। সে আকারে বড়, দেখিতে সুন্দর; ধাড়ীগুলিকে যথেষ্ট ভালও বাসে। সে আবার দীর্ঘভুজারই মত চারিচক্ষু, অতি সতর্ক। কিন্তু পুংজাতীয় স্বার্থপরতাবর্জ্জিত নহে; ভাল ঘাস, ভাল লতাপাতা দেখিতে পাইলে, সে আগে খায়। মাদী ও বাচ্চাগুলি প্রসাদ পায়। পাঁঠাটা ছাগলগুলিকে পাহাড়তলির সমানজমিতে লইয়া যায় না, কারণ সে সকল স্থানের ঘাস, কলা-বন, বাঁশবন হাতীরা খাইয়া, দলিয়া, ভাঙ্গিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে উহাদিগকে পাহাড়ের ঢালুতে, যেখানে উলুঘাস দেখা দিয়াছে, লতায় ও গাছে নূতন পাতা বাহির হইয়াছে, সেইখানে লইয়া যায়। এরূপস্থলে শত্রু আসিলে দূরে থাকিতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

৯

দেখিতে দেখিতে গ্রীষ্মকাল আসিল। মাঝে মাঝে ঝড়বৃষ্টি হয়, বাজ পড়ে। বহুকালহইতে যে নিয়ম চলিয়া আসিতেছে, সেই নিয়ম-অনুসারে পাঁঠাকে পাঁঠীদের দল ছাড়িয়া পুনরায় পাঁঠাদের দলে যাইতে হইল। কয়েক-দিন ধরিয়া পাঁঠীরা পাঁঠাকে যেন পর পর ভাবিতে লাগিল। আর উহার সঙ্গে এখানে সেখানে যাইতে যেন পাঁঠীদের মন সরে না। পাঁঠা পথ দেখাইয়া যায়, খানিক দূর গিয়া পাঁঠীদের পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, পাঁঠীরা তাহার পানে ফিরি-য়াও চাহে না। অন্য অন্য দিন, পাঁঠীরা না গেলে পাঁঠা তাহাদের কাছে ফিরিয়া আসিত, কিন্তু একদিন, পাঁঠীদের পথ চাহিয়া খানিকক্ষণ থাকিবার পর যেন বিরক্ত হইয়া একদিকে চলিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিল না। এখন দীর্ঘভুজা তাহাদের "রাণী," বসন্তকাল যত দিন না আসিবে, দীর্ঘভুজাই সকলকে চালাইয়া লইয়া বেড়াইবে।

ভরা বর্ষাকালে, যখন ঝর্ণা, খাল, বিল, নদী, সকলই জলে পরি-পূর্ণ, তখন, অর্থাৎ আষাঢ়মাসে মাদীদের বাচ্চা হইল। দীর্ঘভুজার একটী বাচ্চা হইল; এ আসাতে উচ্চৈঃশ্রবা একেবারে বেদখল হইল। নূতন বাচ্চাটাই তাহার মায়ের যথাসর্ব্বস্ব হইল। আর মাদীগুলির দুইটা করিয়া বাচ্চা হইল। বাচ্চাটাকে দেখিতে শুনিতে হয় বলিয়া, দীর্ঘভুজার পালের আর সকলকে দেখা-শুনার কার্য্যে একটু ত্রুটি হইতে লাগিল। এক দিন সে বাচ্চাকে দুধ দিতেছে, আর তাহার লেজনাড়া একমনে দেখিতেছে, এমন সময়ে পালের আর একটা মাদী বিপদ্ দেখিয়া, চীৎকার করিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিল। এই ডাক শুনিয়া নেড়ীনামে একটা ছাগীছাড়া সকলে দাঁড়াইল। এমন সময়ে বন্দুকের শব্দ হইল, আর নেড়ী পড়িয়া গেল। দীর্ঘভুজাও কাতর শব্দ করিয়া পড়িল। কিন্তু অমনি আবার দাঁড়াইল, নিজের কষ্টযন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া বাচ্চাটীর জন্য এদিক-ওদিক তাকাইয়া, আর সকলের পিছনে পিছনে লুকাইয়া টিকড়ের দিকে চলিল। আবার বন্দুকের শব্দ হইল, এইবার দীর্ঘ-

ভুজা শত্রুকে একটু দেখিতে পাইল। সেই যে লোকটা একবার ইহাদের দুইটা বাচ্চাকে আর একটু হইলে ধরিয়া ফেলিত, এ সেই শিকারী। শিকারী অনেকটা দূরে থাকিলেও বন্দুকের গোলা দীর্ঘভুজার নাকের কাছদিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। দীর্ঘভুজা অমনি হটিয়া, অন্যমুখে চলিল, এবং দলস্থ আর সকলকে ছাড়িয়া, কয়েক লাফে টিকড় ডিঙ্গাইয়া, বাচ্চাকে চেঁচাইয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিল। বেচারীকে বড় লাগিয়াছিল, রহিয়া রহিয়া কোঁকাইতেও ছিল। কিন্তু সে একটা পাথুরিয়া স্থানদিয়া লুকাইয়া নীচের দিকে চলিল। সম্মুখে উচ্চ জমি, এই উচ্চ স্থানের পাশদিয়া, সে পাহাড়ের ঢালু ধরিয়া গেল, মটুমটু তাহাকে দেখিতে পাইল না। শিকারীও খুব দৌড়িয়া আসিতেছিল, কিন্তু আসাই সার হইল, দীর্ঘভুজাকে আর দেখিতে পাইল না। মাটীতে রক্তের দাগ দেখিয়া, শিকারীর খুব আনন্দ হইয়াছিল বটে, কিন্তু খানিক দূর গিয়া আর রক্তের দাগ দেখিতে পাইলনা, কাজেই আপন অদৃষ্টের চৌদ্দ-পুরুষান্ত করিতে করিতে, যে ছাগলটা তাহার প্রথমগুলি খাইয়া মরিয়া গিয়াছিল, সেইটার দিকে চলিল।

দীর্ঘভুজা ও তাহার বাচ্চা অনেক দূর চলিয়া গেল; মা পথ দেখাইয়া দেখাইয়া চলিল বটে, কিন্তু বাচ্চা আগে, মা পিছনে পিছনে চলিল। সে বেশ জানিত যে, উপরের দিকে কিছু দূর যাইতে পারিলেই আর কোন ভাবনা নাই। জংলে-পাহাড়ের উপরকার কোন টিকড়ে যাইতেই হইবে, কিন্তু এমন পথে যাইতে হইবে, শিকারী যেন দেখিতে না পায়। সে টিকড়ের আড়াল ধরিয়া, পাহাড়ের ঢালু বহিয়া বহিয়া উঠিতে লাগিল। এদিকে ঘায়ের যন্ত্রণায় বেচারীর প্রাণ ছট্‌-ফট্‌ করিতেছে। খানিকদূর গিয়া, একটা টিকড়ে উঠিয়া যেখানে বিপদ্‌ ঘটিয়াছিল, সেই দিকে তাকাইল; কিন্তু শিকারী বা দলস্থ ছাগল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। সে বেশ বুঝিতে পারিল যে, বন্দুকের গুলি লাগিয়া যে ঘা হইয়াছে, তাহা অতি মারাত্মক। তাই ভাবিল, যতক্ষণ শরীর বহে, চলিয়া যাই; থামিয়া থাকা ভাল নয়। তাই সে আবার পাহাড় বহিয়া দৌড়িয়া উপরদিকে যাইতে লাগিল, বাচ্চাটা কখনও মায়ের আগে, কখনও বা পিছনে থাকে। যাইতে যাইতে শালবন ছাড়াইয়া, আরও উপরে অনেক দূর উঠিল।

আর একটা টিকড় ছাড়াইয়া উঠিল। উঠিয়া দেখে, খুব নিকটে একটা ঝর্ণার জল এক গর্ত্তে পড়িয়া একটা চৌবাচ্ছার মত হইয়াছে। সে ত্রস্তভাবে সেই চৌবাচ্ছার দিকে চলিল। কোমরে ভারী বেদনা, দুইপাশে রক্তের দাগ। সে ভাবিল, জল লাগিলে রক্ত বন্ধ ও বেদনা কম হইবে। তাই তাড়াতাড়ি গিয়া, ঘা জলে দিয়া একপাশে শুইয়া পড়িল।

এইপ্রকার স্থানে গুলি লাগিলে কোন প্রাণী দুই-তিন ঘণ্টা অতি কষ্টে বাঁচিয়া থাকে, পরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

দীর্ঘভুজা ত জলে শুইয়া পড়িল, আর তাহার বাচ্চা?—সে নীরবে মায়ের দিকে তাকাইয়া রহিল। ব্যাপারখানা কি, কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে পথ চলিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছে, তাহার নিতান্ত ক্ষুধাও পাইয়াছে—ঘুমও পাইয়াছে। কিন্তু কে দুধ দিবে?—মা ত জলে পড়িয়া নড়েও না, চড়েও না!

সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। পরে কি হইবে, তাহাও জানে না। কিন্তু আমরা জানি। অনেকক্ষণ কষ্টভোগ, পরে মৃত্যু; তারপরে যাহা হইবে, শকুনীরা জানে। বন্দুকের গুলি যদি বাচ্চাটাকেও লাগিত, ভাল হইত। এখন মা নাই, সে জীয়ন্তে মরা।

(ক্রমশঃ।)

গৃহপালিত জন্তুদের প্রতি ব্যবহার

কয়েকটি নিয়ম।

১। সখের জন্য হউক, বা কাজের জন্য হউক যে কারণেই যিনি যে জন্তু রাখুন না কেন, সেই জন্তুর সুখ ও স্বাস্থ্যের জন্য যাহা যাহা দরকার, তাহা যদি তিনি তাহাকে না দিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই জন্তুটিকে রাখিবার কোনই অধিকার নাই। সদয় ব্যবহার কর, ভাল থাকিবার স্থান দাও, নিয়মমত খাইতে দাও, পরিষ্কার জলপান করাও, বিশ্রাম করিবার সময় দাও, সব জন্তুই সুখী ও সুস্থ থাকিবে, নতুবা নহে।

২। সব জন্তুরই প্রতি ধীর-ব্যবহার করা উচিত; ধীর-ব্যবহার

করিলে যে শাসন করা যায় না, তাহা নয়। কোন জন্তু হয়ত বাস্তবিকই কোন কিছুর দরুণ কষ্ট পাইতেছে, কি কারণে সে কষ্ট পাইতেছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া লোকে অনেক সময়ে মনে করে যে, সে একগুঁয়েমি করিতেছে বা বদ্-মেজাজ দেখাইতেছে।

কোন জন্তুকে শাসন করিবার আগে যদি কেহ তাহার কি হইয়াছে খোঁজ করিয়া দেখে, তাহাহইলে সে সম্ভবতঃ দেখিতে পাইবে যে, তাহাকে শাসন করিবার কোন কারণ নাই।

যে কোন কারণেই কোন জন্তু ভয় পাউক না কেন, সেই কারণ-দূর করিতে তোমার যত্ন করা উচিত। জন্তুরা অনেক সময়ে এমন অনেক জিনিস দেখিয়া ভয় পায়, যাহা সহজে মানুষের নজরে পড়ে না। সে সময়ে তাহাদের শাসন করিলে তাহাদের ভয় আরও বাড়িয়া যায়। মিষ্ট-কথায় আদর করিলে তাহারা যত শীঘ্র সুস্থির হয়, এত শীঘ্র আর কিছুতেই হয় না।

সদয় ব্যবহার করিলে সব জন্তুই রক্ষকের উপর বিশ্বাস করে; আর যে জন্তু রক্ষকের উপর বিশ্বাস করে, সে জন্তুকে চালান রক্ষকের পক্ষে কষ্টকর হয় না।

তুমি যদি চাও যে, তোমার ঘোড়া ভাল করিয়া কাজ করিবে, তাহা-হইলে সাজ পরিয়া তাহার মেজাজ যাহাতে খারাব না হয়, সে বিষয়ে সবিশেষ যত্ন লইও। তাহার চোকে "ঠুলি" দিও না। খালি চোকে ঘোড়া ভাল দেখিতে পায়; আর ঠুলি না পরিলে তাহাকে দেখায়ও ভাল।

৩। সব জন্তুরই রোদ দরকার হয়। তাই, যদি সম্ভব হয়, তাহাদের বাসস্থানগুলি দক্ষিণ কি পশ্চিম-মুখো করিও, কিন্তু তাহারা ছায়ায় থাকিতে ইচ্ছা করিলে তাহারও যেন সুবিধা পায়।

আস্তাবল, গোহাল, খোঁপ, খাঁচা প্রভৃতিতে যেন জল-নিকাশ হইবার জন্য বেশ ভালরকম নর্দ্দমার বন্দোবস্ত এবং আলো যাইবার ও হাওয়া চলাচলের সুবিধা থাকে; অথচ সেগুলিতে যেন ঝড়-ঝাপটা না লাগিতে পারে, এই রকম বন্দোবস্ত করিবে।

আস্তাবল, গোহাল, খাঁচা, কুকুরের বাক্স প্রভৃতি সর্ব্বদা বেশ পরিষ্কার ঝরঝরে করিয়া রাখিবে।

ব্যাক্ ও হাফ-ব্যাক্।

ফুটবল খেলিবার মরসুমের আরম্ভে কাপ্তেন যতদূর সম্ভব আলা'দা আলা'দা অবস্থানের খেলোয়াড়দের পছন্দ করিয়া লইবেন, তাহা হইলে তাহারা ম্যাচে খেলিবার আগে এ উহার যোগে খেলিবার যতদূর সম্ভব সুবিধা পায়। "ফুলব্যাক্"দের পছন্দ করিবার সময়ে, কি রকমের ছেলেরা ঐ অবস্থানে খেলিবার সবচেয়ে উপযুক্ত, কাপ্তেনের তাহাই প্রথমে দেখা উচিত। সংক্ষেপে বলি, "ব্যাক্"দের বেশী ভারী হওয়া দরকার নয়, আর কিছু হউক বা না হউক তাহাদের নেহাইত-পক্ষে চট্‌পটে হওয়া দরকার। আমাদের মনে রাখা উচিত, বিপক্ষ-ফরওয়ার্ডেরা যদি ফুলব্যাকদের হাত এড়াইয়া যায়, তাহা হইলে "গোল" বাঁচাইতে "গোল-কীপার" ছাড়া আর কেহই থাকে না; সেই জন্য সঙ্গীন সময়ে ফুলব্যাক্‌দের চট্‌পটে হওয়া খুবই দরকার। ফুলব্যাক্‌দের পছন্দ করা হইলে, ম্যাচ খেলিবার আগে তাহারা যতবার সুবিধা পাইবে ততবার একসঙ্গে খেলিবে। তাহাদের বুঝা উচিত যে, তাহাদের নিজেদের কোন "কেরামতির" উপর তাহাদের জয় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে না, বরং তাহারা যে উপায়ে দুইজনে দুইজনের সঙ্গে মিলিতে পারিবে, সেই উপায়টির উপরই নির্ভর করে। বিপক্ষদল যখন গোলের কাছে "বল" লইয়া আসিয়াছে, তখন, বলটি গোলের কাছহইতে সরাইয়া দেওয়া, আর তাহার পর উহা নিজেদের লোকদের কাছে চালান করা ব্যাকের প্রথম কর্ত্তব্য। ইহা দুইরকমে করা যাইতে পারে। হয় সে জোর করিয়া একটা "কিক্" মারিয়া বল্‌টি বেশ দূরে ছুড়িয়া ফেলিতে পারে, নয় সে বিপক্ষ-ফরওয়ার্ডকে ঠেকাইয়া বল্‌টি একটু "ড্রিবল" করিয়া হাফ্ ব্যাকের কাছে "পাস্" করিয়া দিতে পারে। যাহারা খেলা দেখিতেছে, তাহারা স্বভাবতঃ লম্বা গোছের কিক্ করিতে দেখি-

লেই খুশী হইয়া বাহবা দেয়, কিন্তু প্রতিপক্ষ-ফরওয়ার্ডকে ঠেকাইয়া বল্‌টি একটু ড্রিবল করিয়া লইয়া গেলেই অনেক সময়ে ভাল হয়, তাহাতে হাফ্‌ব্যাক্‌ ফাঁক পাইয়া বল্‌টি প্রতিপক্ষদের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে পারে। গোলের কাছে বিপক্ষেরা বল্‌ লইয়া আসিলে দুই ব্যাকেরই এ উহাকে সাহায্য করা উচিত। একজন ব্যাক্‌ তখন গোলের কাছে গিয়া দাঁড়াইবে এবং আর একজন বল্‌টা কাড়িয়া লইতে যাইবে। বলে কিক্‌ না করিয়া ব্যাকেরা অবশ্যই অনেক সময়ে ঢুঁ মারিয়া বল্‌টিকে দূরে ছুড়িবার চেষ্টা করিবে। সব ব্যাকেরই এইটি ভাল করিয়া করিতে শেখা উচিত। বল্‌টি ভূঁয়ে পড়িতে দিয়া তাহার পর কিক্‌ করার চেয়ে ঢুঁ মারিয়া বল্‌টি হাফ্‌ব্যাকের কাছে পাস করাই অনেক সময়ে ঢের ভাল।

হাফ্‌ব্যাক্‌দের সম্বন্ধে কথা এই, যে অবস্থানে তাহাদের দাঁড়াইতে হয়, সে অবস্থানে তাহাদের সর্ব্বদাই সত্যই বড় ব্যস্ত হইয়া থাকিতে হয়। খেলার অবস্থা যখন যে রকমেই হউক না কেন, তাহাদের নড়িতে হইবে। যখন প্রতিপক্ষেরা আসিয়া আক্রমণ করে, তখন তাহাদের বাধা দিতে হইবে; যখন তাহাদের নিজেদের খেলোয়াড়েরা বিপক্ষদের উপর চড়াও হইবে, তখন তাহাদের কাছে যত বার পারিবে বল্‌ পাস করিয়া দিয়া সাহায্য করিতে হইবে। কখন কখন হয়ত কোন হাফ্‌ব্যাকের গোলের মধ্যে বল্‌ ঢুকাইবার সুবিধা হইবে, কিন্তু সচরাচর সে তাহার নিজের জায়গা ছাড়িয়া মাঠে এদিকে ওদিকে ছুটিয়া বেড়াইবে না। আরও একটি কথা মনে রাখা ভাল। বল্‌টি কোন হাফ্‌ব্যাক্‌ বেশীক্ষণ নিজের কাছে রাখিবে না, তাহার দলের পক্ষে যাহাতে সুবিধা হয় তাহাই চট্‌ করিয়া করিয়া ফেলিবে। অনেক খেলোয়াড় নিজে কোন "কারদানি" দেখাইবার অভিপ্রায়ে বল্‌টি অনেকক্ষণ নিজের কাছে রাখে, তাহাতে দল বিপদে পড়ে। ফরওয়ার্ডই হউক বা ব্যাকই হউক, স্বার্থপরতা সকল খেলোয়াড়-দেরই একটা মারাত্মক দোষ।

সত্যবাদিতা

এই কাগজের কোন পাঠকই স্বীকার করিবে না যে, সে মিথ্যাবাদী। যদি আমি তোমাদের মিথ্যাবাদী বলিয়া দোষ দিই, তাহা হইলে তোমরা নিশ্চয়ই রাগিয়া "বালক"-খানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিবে, আর হয়ত বলিবে যে, যে লোকটা এই প্রবন্ধটা লিখিয়াছে সে একটা আহাম্মক-লোক, ভদ্রলোক নয়। মিথ্যাকথা বলা যে অন্যায়, তাহা সকলেই জানে। একবার একজন শিক্ষক এক ছোট-ছেলে-দের শ্রেণীতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"ক'রকমের পাপ আছে?" ছেলেরা জবাব দিল,—"দু'রকমের পাপ আছে,—ভাল পাপ, আর খারাপ পাপ!" শুনিয়া শিক্ষকমহাশয় অবশ্য একটু থতমত খাইয়া গেলেন। তাহার পর, যখন তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন,— "সবচেয়ে খারাব পাপ কি?" তাহারা উত্তর করিল,—"মিথ্যে কতা।" মিথ্যা কথা যে বলা উচিত নয়, তাহা আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি, কিন্তু সত্যবাদিতা কাহাকে বলে তাহা, এস, আমরা একবার ভাবিয়া দেখি। সত্য সত্য মিথ্যাকথা মুখদিয়া বাহির না করিলেও কেহ মিথ্যুক হইতে পারে কি না, তাহাও দেখা যাউক।

মনে কর, কোন ছেলের বাপ তাঁহার ছেলেকে সঙ্গে নিয়া কোন একটি বক্তৃতা শুনিতে যাইবেন, এই রকম কথা হইয়াছিল, শেষ-মুহূর্ত্তে কোন কারণে বাধা পাইয়া বাবা বক্তৃতা শুনিতে যাইতে পারিলেন না। ছেলেও একা যাইতে চায় না, বাবা ছেলেকে বুঝাইয়া-শুঝাইয়া পাঠাইয়া দিলেন। ছেলে সেই বক্তৃতা শুনিতে না গিয়া কোন এক বন্ধুর কাছে গিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিয়া সময় কাটাইল, বাড়ী ফিরিবার পথে কএক মুহূর্ত্তের জন্য অন্য একটি বক্তৃতা শুনিয়া ঠিক সময়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলে?" ছেলে জবাব দিল,—"হাঁ।" বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে বক্তা ছিলেন?" ছেলে উত্তর দিল,—"আমি তাঁর নাম জানি না।" বাবা জিজ্ঞাসা করি-লেন,—"তাঁর বক্তৃতা কেমন হয়েছিল, ভাল?" ছেলে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে, হাঁ!"—ইত্যাদি, ইত্যাদি—ছেলে এমন একটি কথা বলিল না যাহা নিছক মিথ্যা, কিন্তু সে তাহার বাবার মনে এই ধারণা জন্মাইল যে, যে বক্তৃতা সে শুনিতে যাইবে বলিয়াছিল, সেই বক্তৃতাই শুনিতে গিয়াছিল। এই ছেলেটা তাহার বাবাকে যাহা বলিয়াছিল তাহা মিথ্যা না হইলেও, সে মিথ্যাই বলিয়াছিল।

আরও একটি উদাহরণ দিই। ট্রামের কণ্ডাক্টার একজন লোকের কাছে ভাড়া লইতে ভুলিয়া গেল। দ্বিতীয়বার যখন সে সেই লোকটার কাছে আসিল, তখন সে সেই বেঞ্চের সকলকেই উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এখানে কারুর টিকিট্‌ বাকি নাই?" অন্য সকলে মাথা নাড়িয়া জানাইল,—"নাই।" সে লোকটার টিকিট্‌ কাটিতে সত্য সত্যই বাকী ছিল, সে হাঁ কি না কিছুই না বলিয়া সাম্‌নের দিকে চাহিয়া চুপ্‌ করিয়া রহিল। কণ্ডাক্টার সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল। লোকটা বিনা-পয়সায় ট্রামে চড়িয়া চলিল; কিন্তু সে মুখে "আমিও টিকিট্‌ করেছি" একথা না বলিলেও, চুপ্‌ করিয়া ছিল বলিয়া মিথ্যুকই হইল।

তাহা হইলে মিথ্যা তিনরকমে বলা যায়। প্রথম নিছক মিথ্যা

কথা বলিয়া, দ্বিতীয় আধা-সত্য বলিয়া অন্যের মনে ভুল ধারণা জন্মাইয়া, তৃতীয় কোন কথাই না বলিয়া যাহা ঘটে নাই তাহা ঘটিয়াছে এই রকম বুঝিতে দিয়া।

প্রথমরকমের মিথ্যা যে বলা ভাল, একথা কেহই বলিবে না। এমন কি আমাদের "দ্বিতীয় ভাগেও" আমরা পড়িয়া থাকি,—"মিথ্যা কথা কদাচিৎ বলিও না।" যাহারা এইরকম সরপোট মিথ্যা কথা বলে, তাহাদের আমরা সকলেই ঘৃণা করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কয়জন লোক আছে, যাহারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় রকমে মিথ্যা বলে না? আদালতের সাক্ষীরা এই বলিয়া দিব্য করে যে, তাহারা সত্য বলিবে, সমস্ত সত্য বলিবে, সত্য বই মিথ্যা বলিবে না। তাহা না হইলে সে ইচ্ছা করিলে হাকিমের মনে অন্য ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারে। আমরা বিদ্যালয়ে কতবার এইরকমে মিথ্যা কথা বলিয়া থাকি। ছেলেদের বিদ্যালয়ের কোন একটি জায়গায় যাইতে বারণ। একটি ছেলে ক্লাসহইতে বাহির হইয়া সোজা সেই জায়গায় গিয়া হাজির হইল। সে যখন ফিরিয়া আসিল, মাষ্টার-মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কোথায় গিয়েছিলে?" সে জবাব দিল,—(যে জায়গায় যাইতে মানা সেই জায়গার) "দরজাপর্য্যন্ত"। মাষ্টার-মহাশয় বুঝিলেন, সে দরজাপর্য্যন্ত গিয়াছিল তাহার বেশী যায় নাই, তাই তাহাকে কিছু বলিলেন না। ছেলেটা বুঝিতে পারিল যে, মাষ্টারমহাশয় উহাই বুঝিয়াছেন, তবুও সে আর কিছুই না বলিয়া আপনার জায়গায় গিয়া বসিল। তোমরা যদি তাহাকে বল যে, সে মিথ্যা কথা বলিয়াছে, তাহা হইলে সে হয়ত রাগিয়া গিয়া বলিবে, "আমি কোন্ কথাটি মিথ্যা বলিয়াছি, দেখাইয়া দাও।" তবুও আমরা বলিতে বাধ্য যে, সে যাহা বলিয়াছে তাহা মিথ্যা, কারণ সে সব কথা বলে নাই।

কিম্বা মনে কর, শিক্ষক-মহাশয় শ্রেণীর ছেলেদের কতকগুলি আঁক কষিতে দিয়া বলিলেন যে, যা'র আঁক হইয়া যাইবে, সে বাড়ী যাইতে পারিবে। একটা ছেলে পাশের ছেলের দেখিয়া আঁকগুলি কষিয়া মাষ্টার-মহাশয়কে দেখাইল, মাষ্টার-মহাশয় তাহাকে তখনই ছুটী দিলেন। তোমরা যদি বল যে, সে মিথ্যা বলিয়াছে, সে হয়ত উত্তর দিবে, মাষ্টার-মহাশয় তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, তাই সে নিজেও কোন কথা বলে নাই। কিন্তু সে মিথ্যা আচরণ করিয়াছে। সত্য সত্য মিথ্যা বলিলে যেমন সে মিথ্যুক হইত, এস্থলে মিথ্যা কথা মুখে না বলিয়াও তেমনই সে মিথ্যুক হইয়াছে।

কিম্বা ধর, একটি ছেলে ধূমপাননিবারণী সভার সভ্য হইয়াছে। সে যখনই সুবিধা পায় তখনই তামাক কি চুরুট খায়, কিন্তু ঐ সভার সভ্যদের সঙ্গে মিশিতে তাহার ভাল লাগে, তা'ছাড়া ঐ সভার "ব্যাজ" (সভ্য-নিদর্শন) খানি যেমন সস্তা তেমনই সুন্দর, সেইজন্য সে সেই সভার সভ্য হইয়া রোজ সেই ব্যাজ পরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। লোকে তাহার সেই ব্যাজ দেখিয়া মনে করে যে, সে তামাক খায় না; সেই ছেলেটাও জানে যে, সে লোকের মনে এই-রকম ধারণা জন্মাইতেছে। এই রকম করিয়া সে সবচেয়ে অন্ত্যজ মিথ্যুক হয়। যতক্ষণ সে সেই ব্যাজ পরিয়া থাকে, ততক্ষণই

সে মিথ্যা আচরণ করে প্রতিদিনে বারোঘণ্টা,—সপ্তাহে প্রতিদিন!

একসমুদ্র জল হউক বা একফোঁটা জল হউক, জল,—ভিজা। তেমনই কোন তুচ্ছ বিষয়ে মিথ্যা কথা কই বা কোন গুরুতর বিষয়ে মিথ্যা কথা কই, মিথ্যা বলাই অন্যায় এবং মিথ্যা-কথার সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যাকথার সাজাও থাকে। একটি ছেলে যত-গুলি মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে, তাহার প্রত্যেকটি কেবল যে তাহার চরিত্রে এক একটি করিয়া কাল দাগ রাখিয়া যায়, তাহা নয়, তাহার অপেক্ষাও তাহার অনিষ্ট এই হয় যে, পরবারে মিথ্যা কথা বলা তাহার পক্ষে আরও সহজ হইয়া উঠে। বেশির ভাগ ছেলে ভয়ে মিথ্যা কথা বলে। তাই বলি, যদি সত্যবাদী হইতে চাও, কাহাকেও বা কিছুই ভয় করিও না, বরং তোমার চরিত্র কলঙ্কিত করিতেই সর্ব্বদা ভয় পাইও। অনুচ্চারিত মিথ্যা বলিয়া, খুব বাহাদুরী করি-য়াছ ভাবিয়া কখনও হাসিও না;—চেষ্টা করিয়া মনে রাখিও যে, মিথ্যা সর্ব্বদাই অন্যায় এবং মিথ্যা বলিয়া কেহ নিজের চরিত্র বিমল রাখিতে পারে না।

হাঙ্গর সমুদ্রের বাঘ

জাহাজের খালাসিরা হাঙ্গরকে সমুদ্রের বাঘ বলে। বর্ষাকালে কলিকাতার গঙ্গায় জেলেরা কখন কখন দুই-একটা ছোট হাঙ্গর মারে। এইপ্রকার হাঙ্গরেরা যেন পথ ভুলিয়া গঙ্গায় এত দূর আইসে। কিন্তু মহাসমুদ্রে যে সকল হাঙ্গর থাকে, সেগুলি অতি প্রকাণ্ড পঁচিশ-ছাব্বিশ-হাত লম্বা বড় বড় তিমির সমান।

জোয়ারের সময় যতদূরপর্য্যন্ত জল ফিরে, কেবল ততদূরপর্য্যন্ত দুই-একটা হাঙ্গর যায়। তবে সমুদ্রের নিকটস্থ অঞ্চলে, কলিকাতার দক্ষিণে সুন্দর-বনের আবাদী জমিতে বানের জলের সঙ্গে হাঙ্গর থাকে।

সেকালের মরা হাঙ্গরের দেহ বরফময় স্থানে অনেক পাওয়া গিয়াছে। সে সকল বিলাতের যাদুঘরে আনিয়া রাখা হইয়াছে। আমাদের যাদুঘরেও আছে। এ সকল হাঙ্গর অতি ভয়ঙ্কর ছিল। হাঙ্গরের বার-সারি দাঁত। এক এক সারিতে ত্রিশ ত্রিশটা ত্রিকোণ-মুখ তীক্ষ্ণ দাঁত। কালিফর্ণিয়া-দেশের দক্ষিণ-অংশে হাঙ্গরের প্রকাণ্ড দাঁত পাওয়া গিয়াছে, এই দাঁত যে হাঙ্গরের, সে হাঙ্গর কম হইলেও সত্তর-আশী-হাত লম্বা ছিল। ফলে এক-কালে এই-প্রকার প্রকাণ্ড হাঙ্গরেরা দলে দলে, আমাদের খয়রুল্লা-মাছের মত দক্ষিণ-কালিফর্ণিয়ার সমুদ্র-কূলে বেড়াইত।

প্রেসিডেন্ট স্পোর্টিস।

আটলান্টিক-সমুদ্রের হাঙ্গর চৌদ্দ-পনের-হাত লম্বা—এগুলি আমাদের সুন্দরবনের বাঘের মত সাহসী ও মানুষকে মোটেই ভয় করে না। এই হাঙ্গরে তিমিপর্য্যন্ত ধরিয়া খায়।

একবার কোন জাহাজের খালাসিরা একটা প্রকাণ্ড ভেটকী-মাছ কাছিতে বাঁধিয়া জাহাজের উপরহইতে জলে ফেলিয়া দিল। একটা ছোট হাঙ্গর দেখিতে পাইয়া মাছটা ধরিতে আসিল। খালাসিরা হাঙ্গরকে আসিতে দেখিয়া, মাছটা টানিয়া, জাহাজের গায়ে ঝুলাইয়া দিল। হাঙ্গর তবু আসিল; আসিয়া যেই মাছটাকে কামড়াইল, একগাছা লগার ডগায় তরোয়ালের মত তীক্ষ্ণ ছুরি বাঁধা ছিল। একজন খালাসি সেই ছুরিদিয়া হাঙ্গরের মুখে খোঁচা মারিল। খোঁচা খাইয়া হাঙ্গরটা মাছ ছাড়িয়া একটু পিছাইল। কিন্তু আবার আসিল। আবার খালাসি ছুরিদিয়া চক্ষুতে খোঁচা মারিল। এইরূপ অনেকবার হইল। অবশেষে মাছ ত কোথায় গেল, কিন্তু প্রতিশোধ লইবার জন্য হাঙ্গর জাহাজের গা ধরিয়া চলিল। শেষে যখন অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখন ডুবিয়া গেল।

হাঙ্গরের খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই—যা পায়, তাই খায়। শিকারীরা হাঙ্গরের পেটে পুরাতন জুতা, জাহাজের পচা কাছি, বিস্কুটের টিন, আচারের বোতল প্রভৃতি—কত কি পাইয়াছেন। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, আহারের বিষয়ে আমাদের সুন্দর-বনের বাঘ হাঙ্গরের অপেক্ষা ভদ্র। কোন শিকারী বাঘ মারিয়া তাহার পেটে পুরাতন জুতা বা আচারের বোতল পান নাই!

হাঙ্গরের ঘ্রাণশক্তিও অতি প্রবল। আসাম-পাহাড়ের বাঘেরা যেমন গন্ধ ধরিয়া ধরিয়া বন্য ছাগলদলের অনুসরণ করিয়া বিশ-ত্রিশ-ক্রোশ-পথ যায়, হাঙ্গরেরাও তেমনি গন্ধ ধরিয়া ধরিয়া জাহাজের পিছনে পিছনে শত শত ক্রোশ যায়।

বসন্তকালের আরম্ভে অনেক লোক সুন্দরবনে মৌচাক খুঁজিয়া বেড়ায়, পাইলে মৌচাক ভাঙ্গিয়া মধু আনে। কলিকাতা-সহরে যে লোকে "চাই মধু, চাই মধু" বলিয়া মধু-বিক্রয় করে, সে মধু সুন্দরবনের। এই শিকারীদের প্রধান শত্রু বাঘ— অনেকে বাঘের হাতে মারাও পড়ে। তেমনি জাহাজের খালাসিদের প্রধান শত্রু হাঙ্গর। কার্য্যের অনুরোধে ইহাদিগকে জলে নামিতে হয়—অনেকে হাঙ্গরের উদরস্থ হইয়া থাকে। তাই খালাসিরা হাঙ্গরকে দুই-চক্ষুর বিষ দেখে।

একবার একটা প্রকাণ্ড হাঙ্গর এক জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে দেড়শত-ক্রোশ-পথ গেল। জাহাজ-হইতে খালাসিরা এটা-ওটা ফেলিয়া দেয়, তাই খায়। অবশেষে যখন আর হাঙ্গর সঙ্গ ছাড়ে না, তখন খালাসিরা বিরক্ত হইল।

অবশেষে খালাসিরা বড় এক টুকরা লোহা শিকলে বাঁধিয়া আগুনে দিয়া লাল করিল, এবং জাহাজহইতে নামাইয়া দিল—জল-হইতে তিন-চারি হাত উপরে ধরিল। হাঙ্গর ভাবিল, এ অতি সুখাদ্য জিনিস হইবে। তাই হাঁ করিয়া, লাফ দিয়া, ধরিল। যেই ধরা, অমনি গিলিয়া ফেলা। হাঙ্গর ভয়ানক লাফালাফি করিতে লাগিল। তাহার মুখহইতে নির্গত ফেনায় সমুদ্র ফেনাময় হইল। দীর্ঘ লাঙ্গুলদিয়া সমুদ্রের জল যেন মন্থন করিতে লাগিল। জাহাজখানি ছোট হইলে ডুবিয়া যাইত। তাহার পর, কুড়ি-মিনিট ছট্-ফট্ করিয়া মরিয়া গেল। খালাসিরা শিকল ধরিয়া টানিয়া মরা হাঙ্গর জাহাজে তুলিল।

মথুরায় যমুনার ঘাটে কচ্ছপ যেমন, কোন কোন সমুদ্রে ছোট-বড় হাঙ্গর তেমনি জলে বেড়াইয়া বেড়ায়, ও বালুচরে পড়িয়া থাকে।

অনেক ছেলে যেমন পুকুরে বেঙ্‌ বা সাপ দেখিলে ঢিল মারে, অনেক দ্বীপের লোকেরা তেমনি হাঙ্গর দেখিলেই মারিতে যায়। তাহারা বিস্তর হাঙ্গর মারে—অনেকে প্রাণও হারায়।

তোমরা যেমন বড়শীদিয়া মাছ ধর, অনেক দ্বীপের লোকে তেমনি বড়শীদিয়া হাঙ্গর ধরে। একবার কয়েকজন খালাসি জাহাজের ডিঙ্গিতে চড়িয়া, হাঙ্গর ধরিবার জন্য বড়শী ফেলিল—তোমাদের বড়শী সুতাদিয়া বাঁধা, তাহাদের বড়শী শক্ত শিকলে বা তারে বাঁধা। তোমরা ছিপ হাতে ধরিয়া রাখ, তাহারা শিকল ডিঙ্গির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিল। একটু পরে এক প্রকাণ্ড হাঙ্গর "চারে" আসিল। হাঙ্গর আমাদের রুই-মির্গালের মত চারে আসিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় না, আসামাত্রই "টোপ" গিলিয়া ফেলে। এ হাঙ্গরও তাই করিল। বড় মাছ গাঁথিলে তোমরা যেমন ছিপ জলে ফেলিয়া দেও, এই খালাসিরা তাহা করিলে ভাল হইত। তাহারা শিকল নৌকার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। এখন হাঙ্গর নৌকা টানিয়া লইয়া চলিল—নৌকা ডুবু ডুবু হইল। একটু দূরে একখানি ছোট ধুঁয়ার জাহাজ যাইতেছিল। কাপ্তেন খালাসিদিগের বিপদ্‌ বুঝিতে পারিয়া জাহাজ লইয়া আসিলেন। খালাসিদিগকে সেই জাহাজে তুলিয়া লইলেন। ডিঙ্গি ডুবিয়া গেল।

যাহারা ছোট নৌকায় চড়িয়া হাঙ্গর-শিকার করিতে যায়, তাহাদের প্রায় এই দুর্দ্দশা হয়।

হাঙ্গরের দাঁত অতি তীক্ষ্ণ—যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি শক্ত। আজ-কাল ছোট-বড় প্রায় সকল জাহাজই লোহার পাতদিয়া তৈয়ার হয়; তাই হাঙ্গরে কিছু করিতে পারে না। কিন্তু কাষ্ঠের—এমন কি, আমাদের শাল বা নাগেশ্বর-কাষ্ঠের তক্তাও হাঙ্গরে কামড়াইয়া ভাঙ্গিতে পারে। অষ্ট্রেলিয়া-দেশে আমাদের আসামের নাগেশ্বর-বৃক্ষ আছে। নাগেশ্বরের তক্তাদিয়া লোকে ছোট ছোট জাহাজ বা গাধাবোট তৈয়ার করে। দুই-তিন বুরুল পুরু তক্তাদিয়া একজনে একখানি নৌকা তৈয়ার করিয়াছিল। একবার এক হাঙ্গর এই নৌকার গলুইর কাছে এমন কামড়াইয়া ধরিয়াছিল যে, তক্তা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হইয়া গিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের দেশে কেবল সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী নদীতে ও খালে বর্ষাকালে হাঙ্গর দেখা দেয়। কিন্তু আমাদের সকল নদীতেই কুম্ভীর আছে। পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রে আমরা বিস্তর কুমীর দেখিয়াছি। কুমীরে অনেক মানুষ ও গো-মেষাদি নষ্ট করে। তাই বলি, আমাদের দেশে কুমীরই জলের বাঘ।

প্রেসিডেন্সী স্পোর্টস্‌।

বালকা

১ম বর্ষ] জুন, ১৯১২। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

কনানার বল্লম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যত দূরে গেল, ততই ছোট দেখাইতে লাগিল। ধবল বালুকা-সমুদ্রের উপরদিয়া, হেলিতে দুলিতে, শাদা উটটী একই ভাবে চলিতে লাগিল। চলনে পথশ্রান্তির লক্ষণ নাই, যেন এখনই পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে

মরুসমুদ্র-ভেদ করিয়া সূর্য্য যেই পূর্ব্ব-আকাশে দেখা দিল, শাদা উট অমনি থামিল, একটু এদিক-ওদিক করিয়া শুইয়া পড়িল।

যেই উট শুইয়া পড়িল, কনানা অমনি নামিলেন। উটের গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিতে করিতে বলিলেন, "মক্কাহইতে আড়াই দিনের পথ আসা গেল। এত পথ আসিতে পারিবে, মনেও ভাবি নাই। মন্দিরের প্রাঙ্গণে তুমি আমায় চিনিতে পারিয়াছিলে। আজ তুমি মনঃপ্রাণে আমার উপকার করিয়াছ। কাল আমাদের বিচ্ছেদ হইবে। কিজন্যে সে বিচ্ছেদ হইবে, এবং কত দিন দেখা-শুনা হইবে না, আল্লাই জানেন। কিন্তু আবার দেখা হইলে, তুমি আমায় নিশ্চয় চিনিতে পারিবে। বাস্তবিক তখন তুমি আমায় দেখিয়া আদর করিবে।"

অনন্তর, নিজের জন্য কালিফের লোকেরা তাঁহাকে যে খাদ্য-সামগ্রী দিয়াছিল, কনানা সজলনয়নে সাদরে তাহা উটকে দিলেন।

অনন্তর, জলাভাবে, বালিদিয়া "উজু" করিয়া তিনি মক্কার দিকে মুখ করিয়া নেমাজ পড়িতে লাগিলেন।

কালিফের মুখাবৃত পত্রবাহক কনানা একমনে প্রাতঃকালীন উপাসনায় রত, এমন সময়ে কালো উট আসিয়া পঁহুছিল।

বেনি-সৈয়দের অন্বেষণ।

কৃষ্ণ উটের চালক আবরণে আবৃত কনানার মুখ দেখিবার এবং কোথায় যাইতে হইবে, তাহা জানিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু কালিফের পত্রবাহকের মুখও দেখিতে পাইল না। কোথায় যাইতে হইবে, তাহাও জানিতে পারিল না।

উষ্ট্রচালক যৎসামান্য খাদ্য প্রস্তুত করিল, আগুন জ্বালিয়া কিছু পাক করিতে হইল না। আহার হইয়া গেলে চালক কথা আরম্ভ করিল,—তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল, কনানা যেন অন্যায়পূর্ব্বক তাহার প্রতি সন্দেহ করিয়া সমস্ত গোপন করিতেছেন, তাই জিজ্ঞাসিল,

"হুজুর আমাদিগকে তেইফপর্য্যন্ত যাইতে হইবে, এই কথা বলিয়া আমাকে কেন ভুলাইতেছেন? আপনি কি মনে করেন যে, মহান্ কালিফের কার্য্যের অনুরোধে আমি এই শাদা চালাইয়া যাইতে কাতর হইব?"

"ঐ কথা শুনিবার জন্য তুমি ছাড়া আরও অনেকে কাণ পাতিয়াছিল, মনে নাই?"

"আমরা যখন আসি, তখন ফটকে কেবল জন-কতক ভিখারী ছিল বৈত নয়। আপনি কি মনে করেন যে, ওমর ও আমাদের নবীর পত্রবাহকের প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিব?"

কনানা কহিলেন, "আমার বিশ্বাস এই, ইশ্মায়েল-বংশীয় সকলেই আপন আপন কার্য্য-সাধন করিবে। কিন্তু আমার কথার সঙ্গে এ বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। আজ রাত্রে এখান-হইতে যাত্রা করিবার আগেই আমি তোমার গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিব। যাদের তুমি ভিখারী মনে করিয়াছিলে, তারা ভিখারী নয়। মক্কার পথে তিনদিন আমি রসিদ বরকতের কারাভানের সঙ্গ ধরিয়া গিয়াছি। সে নিজে অতি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক লোক। কালিফের হুকুমে, দায়ে পড়িয়া সে আমাকে শাদা উট ও সেই উটের চালককে দিতে বাধ্য হইয়াছিল। তখনই বুঝিতে পারিয়া-

ছিলাম, সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, বা আর কোনপ্রকারে ঐ উট হাত করিতে চেষ্টা করিবেই করিবে। রসিদ বরকতের চাকরেরা ফকিরের বেশে মুখ ঢাকিয়া কালিফের বাড়ীর ফটকের আড়ালে বসিয়াছিল, আমি তিনদিন উহাদের সঙ্গে পথ চলিয়া এসব দেখিয়াছি। উহাদের পা ঢাকা ছিল না, তাই পা দেখিয়া আমি উহাদিগকে চিনিয়া ফেলিয়াছিলাম; কিন্তু উহারা তোমাকে ঠকাইয়াছিল। তাই আমি উহাদিগকে বলিয়াছিলাম, "যাও, তোমাদের মনিবকে গিয়া বল যে, তাঁহার শাদা উট তেইফে চলিল।"

উষ্ট্রচালক সসম্ভ্রমে উত্তর করিল, "হুজুর, শেখ বরকত বিশ্বাসঘাতক ও দুঃসাহসী হইলেও কালিফের আজ্ঞাবহ বটে। সে কালিফের হুকুম পাইবামাত্র এই সুন্দর উট, আর আপনকার এই গোলামকে আল্লার কাজের ও আরবদেশের উপকারের জন্য আপনাকে অকাতরে দিয়াছে। সে যে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, আমার ত এমন বোধ হয় না।"

এই সময়ে পূর্ব্বদিকে, অনেক দূরে, বালুকাসমুদ্রে ছায়ার মত কৃষ্ণবর্ণ একটা কি যেন দেখা দিল, তাই কনানা উষ্ট্রচালকের কথার উত্তর দিলেন না, কিন্তু মুখাবরণের ভিতরদিয়া একমনে সেইটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেই কালো ছায়াটা ক্রমে বড় হইল, অবশেষে দেখা গেল, এক সুদীর্ঘ কারাভান আসিতেছে।

ঐ কারাভানের উটগুলি দীর্ঘপথ চলিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। উটগুলি মাটীর দিকে মুখ করিয়া অতি কষ্টে টানিয়া টানিয়া পা ফেলিয়া বালুকা-সমুদ্র-দিয়া আসিতে লাগিল। কনানা রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই পথিকদিগের সমভূমিস্থ বিশ্রামস্থান ও ইন্দারা ছাড়াইয়া আসিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে চলাতে অনেক বেলায় এই কারাভান তথায় পঁহুছিয়াছিল।

কারাভান আরও কাছে আসিয়া পড়িলে কনানা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে, উটগুলির পৃষ্ঠে কোন বাণিজ্য-দ্রব্য নাই, কেবল আবশ্যক খাদ্য সামগ্রীর থলিয়া—তাহাও প্রায় খালি হইয়া আসিয়াছে, আর চালকেরা আরবদেশের পূর্ব্ব-সীমান্ত-প্রদেশের অসভ্য লোক।

কনানার উষ্ট্রচালক জিজ্ঞাসিল, "হুজুর, ওরা কি আমাদের দেখিতে পাইয়াছে?"

কনানা বলিলেন, "কেন, ওদের কি চক্ষু নাই?" উহাদের বিলক্ষণ চক্ষু ছিল। দূরহইতে উহারা শাদা ও কালো উট, এবং দুইজন বৈ লোক নয়, ইহা দেখিতে পাওয়াতে উহাদের লোভ জন্মিয়াছিল।

উট-দুইটী লুঠিয়া লওয়াই উহাদের উদ্দেশ্য; কারণ কারাভানের অধিকাংশ লোক পথে রাখিয়া, কুড়ি-পঁচিশ-জন লোক অকস্মাৎ প্রকৃত পথ ছাড়িয়া কনানা যেখানে, বরাবর সেইদিকে আসিতে লাগিল।

কনানার উষ্ট্রচালক অনুচ্চস্বরে কহিল, "হুজুর, আমাদের এখন না পলাইলেই নয়।"

কনানা কহিলেন, "উহারা যদি আমাদের পিছনদিকে থাকিত সহজে পলাইতে পারিতাম। কিন্তু উহারা যেদিকহইতে আসিতেছে, আমাদিগকে সেইদিকেই যাইতে হইবে।" এই বলিয়া আগতপ্রায় কারাভান দেখাইয়া দিয়া আবার বলিলেন, "না, ফিরিব না; উহারা ত মানুষ, শয়তান সম্মুখে পড়িলেও পলাইতাম না।"

উষ্ট্র-চালক অস্পষ্টস্বরে কহিল, "আল্লার মর্জ্জি, আমাদের বোধ হয়, এ যাত্রায় রক্ষা নাই।"

যা আছে "নসিবে," তাই হইবে, বলিয়া বেদুইনেরা যেমন হতাশ হইয়া পড়ে, এই বেদুইন-উষ্ট্রচালক তেমনি নিরাশ হইল।

তাহার দেহ যেন অবশ হইয়া আসিল, হাত-দুইখানি হাঁটুর উপরে নামিয়া পড়িল।

কনানা উত্তর করিলেন না, কিন্তু কোরাণের এই পদ আওড়াইলেন, "তোমার মঙ্গলের তরে যাহা কিছু ঘটে, ঈশ্বরহইতেই ঘটিয়া থাকে।" অনন্তর উঠিয়া, যেখানে শাদা উষ্ট্র শুইয়াছিল, সেইখানে ধীরে ধীরে গেলেন।

কালিফের কর্ম্মচারী যে সাংঘাতিক বল্লম ও তরোয়াল উটের পৃষ্ঠস্থ গদির একধারে রাখিয়াছিলেন, সেই দুই অস্ত্র ও গদি উটের পিঠেই রহিয়াছে।

সেই গদিতে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া কনানা আগতপ্রায় কারাভানের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আর অন্যমনে দম্মেশকীয় তরোয়ালের হাতল ধরিলেন—হাত বাহির করাতে, বেদুইন-রাখালের মাংসল বাহু বাহির হইয়া পড়িল।

কারাভান ক্রমেই নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল—অবশেষে এত নিকটে আসিল যে, কারাভানের সর্দ্দার কনানার শাদা উটহইতে দশরশিমাত্র দূরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সে যতই অগ্রসর হইল, তাহার সলোভ চক্ষু-দুইটী ততই শাদা উষ্ট্রের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু ক্রমেই তরবারিধারী হস্ত ও বাহুর প্রতি চক্ষু ফিরিল। আর সে বুঝিতে পারিল যে, নিতান্ত কাছে গেলে ঐ তরবারির তীক্ষ্ণ ধার তাহাকে অনুভব করিতে হইবে। কিন্তু কাপড়ে আবৃত থাকাতে সে কনানার মুখ দেখিতে পাইল না। সে কেমন করিয়া জানিবে যে, এ হস্তে আর কখনও তরবারি চালিত হয় নাই।

কনানার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া অসভ্য আরব-সর্দ্দার বিলক্ষণ বুঝিতে পারিল, যাহার হাতে এই তরোয়াল, ভয় কাহাকে বলে, তাহা সে জানে না; আর এই লোকটা প্রাণ থাকিতে শাদা উট কাহাকেও আত্মসাৎ করিতে দিবে না। আর উহার প্রাণ লইতে গেলে আমাকেও প্রাণ দিতে হইবে।

তবু সে উটের লোভ-সংবরণ করিতে পারিল না। কিন্তু কনানার গম্ভীরভাব দেখিয়া তাঁহার প্রতি লোকটার ভয়-ভক্তি দুইই জন্মিল।

কাজেই সে উগ্রভাবে ধমক-ধামক না দিয়া, মরুভূমিতে আরবে আরবে দেখা হইলে যেরূপ "সেলামালূকি" হইয়া থাকে, তাই করিল।

কনানা প্রতি-"সেলাম" বলিয়া তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা যখন বাশ্‌রার মরুভূমিদিয়া আসিতেছিলে, তখন কি কাহ্লেদ ও তাঁহার লোকজনসকলকে অতি বেগে যাইতে দেখ নাই?"

অসভ্য সর্দ্দার সসম্ভ্রমে একটু পশ্চাৎ সরিল। এই সামান্য পশ্চাৎসরণদ্বারা বেদুইন-বালক কনানা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন যে, লোকটা ভয় খাইয়াছে। লোকটা উষ্ট্রে চড়িয়া এত পথ আসিয়া ক্লান্ত হইলেও শাদা উষ্ট্রের লোভে সম্মুখদিকে গলা বাড়াইয়াছিল। এক্ষণে ভাব দেখিয়া বোধ হইল, সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছে।

কনানা তাহার এই ভাবান্তর দেখিয়া "ঝোপ বুঝিয়া কোপ" মারিলেন। তিনি বক্ষঃস্থলহইতে কালিফের পত্র বাহির করিলেন। এই পত্রে মহম্মদের শিল-মোহর ছিল। মুসলমানমাত্রেই এই মোহর চিনে। কনানা এই চিঠি সর্দ্দারের সম্মুখে ধরিয়া কহিলেন,—

"শকুনীর ঠোঁট শাদা হইয়াছে,—যে হাড় খুঁটিয়া খাইতে আসিয়াছিল, তাহা শাদা হয় নাই। শৃগাল যে মাংস খাইবে বলিয়া আসিয়াছিল, তাহা যেমন তেমনি রহিয়াছে, বরং শৃগালেরই দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রসিদ বরকত দম্মেশকেও নাই, মক্কাতেও নাই। কাল সকালবেলা তিনি তেইফে পঁহুছিবেন। তুমি সেইখানে তাঁহার সঙ্গে দেখা কর, এই তাঁহার ইচ্ছা। তাঁহাকে বলিবে, 'মূর্খ আপন মূর্খতার ফল পাইয়াছে। নবী-সাহেবের মুখাবৃত পত্রবাহক পবিত্র উষ্ট্রে চড়িয়া রাত্রিকালের বায়ুসংযোগে উদয়াচলের দিকে যাইতেছেন; কারণ হিজাজে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। বাশ্‌রায় এই উষ্ট্রের গ্রীবা দৃষ্ট হইবে'।"

অসভ্যসর্দ্দারের মুখভঙ্গী একবারে বদলিয়া গেল। ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া উট চালাইল।

পথশ্রান্ত উট খোঁৎ-খোঁৎ-শব্দ করিয়া চলিল, সর্দ্দারের সঙ্গীরাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

কনানা ও তাঁহার সঙ্গীকে ফেলিয়া অসভ্য-দস্যুরা চলিয়া গেলে, কনানার উষ্ট্রচালক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করত কহিল, "হুজুর, দলবল লইয়া এই যে সর্দ্দার আসিয়াছিল, এ কে,—এবং আপনিই বা কে যে, আপনকার কথা শুনিয়া লোকটা ভয়ে এমন জড়সড় হইয়া গেল?"

কনানা একটু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "আমি তোমার প্রণাম লইবার যোগ্যপাত্র নই। উঠ, দাঁড়াও। আমি উহাদের বিষয়ে কখনও কিছু শুনি নাই, উহাদিগকে কখনও দেখিও নাই—এই আজি যা দেখিলাম।"

কনানা কাঁপিতে কাঁপিতে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিলেন, ফেলিয়া উষ্ট্রের গদির উপরে হেলান দিয়া পড়িলেন। ঐ দস্যুর সঙ্গে কনানা সগর্ব্বে কথা কহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বায়ু-কম্পিত নলের ন্যায় কাঁপিতে ও শিহরিতে লাগিল। পত্রখানি তিনি আবার বক্ষঃস্থলে যথাস্থানে রাখিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হাত কাঁপিতে লাগিল, তাই রাখিতে পারিলেন না।

উষ্ট্রচালক কহিল, "ও যে রসিদ বরকতের স্বজাতীয় লোক, এবং বাশ্‌রাহইতে আসিয়াছে, তা জানেন?"

কনানা একটু প্রগল্‌ভ ভাবে কহিলেন, "আমি কিছু জানি না। তুমি এত বড় হইয়াছ, মানুষ মারিতে এমন পটু, তবু ভীরু, কাপুরুষ রাখাল-বালকে যাহা বুঝে, তাহাও বুঝিতে পার না? ওদের আর রসিদ বরকতের বল্লমের বাট কি একই কাষ্ঠের নয়, এবং ওদের আর রসিদ বরকতের উষ্ট্রের গদি কি একই প্রকারের ও বাশ্‌রার গাঢ় রঙ্গে রঞ্জিত নহে? বাশ্‌রাহইতে না আসিলে, পথ চলিতে চলিতে উহাদের উষ্ট্রের মাথা মাটীমুখো হইবেই বা কেন? উহারা লড়াই করিবার জন্য রসিদ বরকতের উদ্দেশে ছুটিয়াছে। নহিলে এমন সময়ে মাল-বোঝাই একদল উট না লইয়া, গোটাকতক খালি উট লইয়া ত কেহ মক্কায় যায় না। যদি কাহাকেও পথে ধরিবার প্রত্যাশা না থাকিত, রসিদ বরকত অবিশ্রামে দিবারাত্র উট চালাইয়া আনিত কি?"

উষ্ট্র-চালক কহিল, "হুজুর, কিন্তু রসিদ বরকত এখন মক্কায়, তেইফে নহে ত!"

কনানা ভর্‌ৎসনার ভাবে কহিলেন, "হে বেদুইন, তোমার চোখ ও কাণ সঙ্গে ছিল না বুঝি! ভিখারীর বেশে যাহারা ফটকে বসিয়াছিল, তাহারা আমার রওয়ানা হওয়ার সংবাদ অবিলম্বে রসিদ বরকতকে গিয়া দিয়াছিল। আমরা মক্কার ফটকহইতে কিছু দূর আসিতে না আসিতেই চারিজন লোক সঙ্গে করিয়া রসিদ বরকত আমাদের পিছন ধরে। পথে শাদা উটের নাগাইল ধরিবার জন্য প্রাণপণে ছুটিয়াছিল, কিন্তু আমরা আগে চলিয়া আসি। আসিতে আসিতে রাত্রিকার কারাভানের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, তাহা-

পল্লী-পথ।
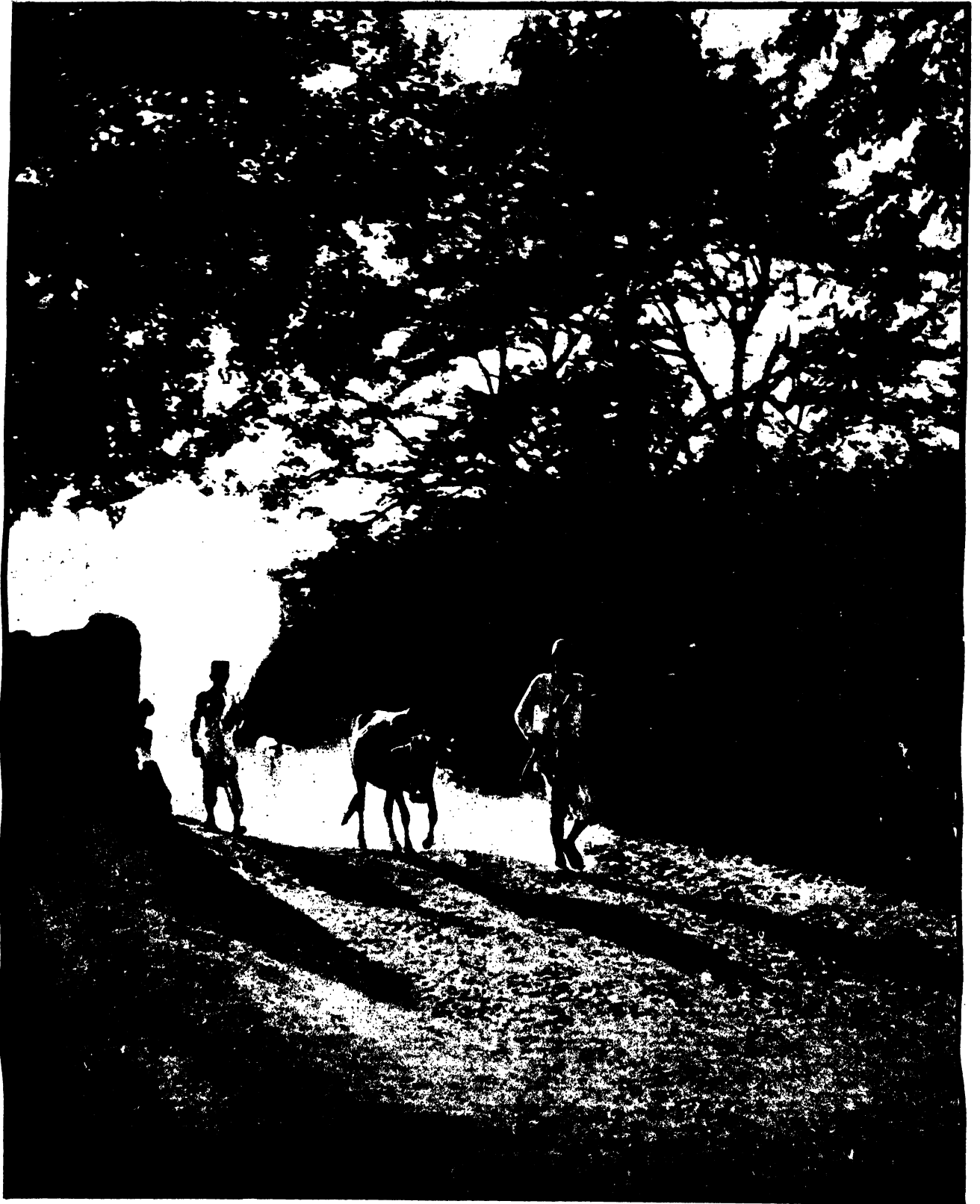
দিগকেও আমরা পিছনে ফেলিয়া আসি। রসিদকে ইন্দারার কাছে থামিতে হইয়াছিল, আর ঐ কারাভানেরও সেইখানে থামিবার কথা। কারাভানের লোকদের কাছে আমাদের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা অবশ্য বলিয়াছে, 'শাদা উট বায়ুগতিতে আমাদিগকে ছাড়াইয়া তেইফের দিকে ছুটিয়াছে।' বুঝিলে? আর একদিন না গেলে বরকত ঐ ইন্দারার কাছে পঁহুছিতে পারিবে না। আর সেখানে আসিয়া যখন আমাদের কথা শুনিবে, তখন আমরা তাহাদের হইতে পাঁচদিনের পথ আগে আসিয়া পড়িব। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমরা তাহার হাত এড়াইয়াছি; এবং ঐ কারাভানের হাতও এড়াইলাম। এই ঘটনাহইতে যদি কিছু শিক্ষালাভ করিতে চাও, তবে তাহা এই,—তরোয়াল বা বল্লম বিনাও মানুষে মানুষকে পরাজয় করিতে পারে। এখন ঘুমাও ত দেখি।"

কনানা নিজেই পথ দেখাইলেন। উটের গদি সরাইয়া রাখিলেন, এবং তাহার পিছনদিকের এক পা পিঠের সঙ্গে এমন করিয়া বাঁধিলেন যে, উটটার আর দাঁড়াইবার পথ রহিল না। পরে উটের গলার উপরে মাথা রাখিয়া একপাশে বালিতে শুইয়া পড়িলেন।

উষ্ট্র-চালকের শেষ কথা এই, "হুজুর, বীরত্বে বরকত কোথায় লাগে; আপনি তাহাকে ও তাহার সঙ্গীদিগকে পর্য্যন্ত হারাইয়া দিয়াছেন।"

সমস্ত দিন প্রখর রৌদ্র। কিন্তু আজ কনানা যেমন সুখে নিদ্রা গেলেন, সুশীতল চন্দ্রালোকে বা বেনি-সৈয়দের কালো তাম্বুতে শুইয়াও তাঁহার এমন গাঢ় নিদ্রা হয় নাই। কারণ আজ বড় সাধের শ্বেত উষ্ট্রের গলদেশ তাঁহার বালিশ।

বেলাবসানে কনানার ঘুম ভাঙ্গিল; এবং পুনরায় উট সাজাইয়া যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতে করিতে প্রায় সূর্য্যাস্ত হইল।

উষ্ট্রে উঠিবার সময় হইলে উষ্ট্রচালক শাদা উষ্ট্রের কাছে আসিল, এবং উষ্ট্রের পিঠে হাত রাখিয়া, উগ্রস্বভাব বেদুইন সবিনয়ে কহিল, "হুজুর, আজ রাত্রে এ বেচারাকে বেশি জোরে চালাইবেন না। এ যা বলি, অকাতরে তাই করে। অনেক পথ চলিয়া বেচারা ক্লান্ত হইয়াছে। চারিসপ্তাহ পরে আজি যা একটু বিশ্রাম করিতে পাইয়াছে। আপনি যদি আমাকে মারিয়া ফেলেন, ঘাড় পাতিয়া দিব, কিন্তু ইহার কষ্ট আমার প্রাণে সহে না।"

কনানা নীরবে একটু ভাবিলেন, অনন্তর গদিহইতে নিজ পাঁচনী বাহির করিয়া লইয়া কহিলেন—

"একে কেমন করিয়া চালাইতে হয়, তা তুমি আমার চেয়ে ভাল জান। তুমি এর পিঠে চড়, আমি কালো উটে চড়িব।"

কনানার এই কথা, আরবদেশের রীতি-অনুসারে, তামাসামাত্র। তাহার ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া কনানা পাঁচনী তুলিয়া উষ্ট্রের পৃষ্ঠস্থ গদি দেখাইয়া দিলেন। উষ্ট্র-চালক অগত্যা ভয়ে ভয়ে শাদা উটে চড়িল।

কনানা নিজে কালো উটে চড়িলেন।

শাদা উট যেই উঠিয়া দাঁড়াইল, এক অতি আশ্চর্য্য প্রলোভনে উষ্ট্র-চালককে প্রলোভিত করিল।

কালো উটের পৃষ্ঠে বল্লম বা তরোয়াল প্রভৃতি কোনপ্রকার অস্ত্র ছিল না। কালিফের পত্রবাহকের হাতে একগাছি পাঁচনীমাত্র। উষ্ট্র-চালক অন্যমনে দমস্কেশকীয় তরোয়ালের বাঁটে হাত দিল। দড়ি ধরিয়া মক্কার পথে শাদা উট চালানর অপেক্ষা তরোয়াল-চালনা যে তাহার ভাল লাগে, ইহা বেশ জানা গেল।

উষ্ট্র-চালক অমনি পিছনদিকে চাহিয়া দেখিল যে, কনানা তাহার দিকে চাহিয়া ব্যাপারখানা কি, দেখিতেছেন। অমনি তাহার হাতহইতে তরোয়ালের বাঁট সরিয়া গেল।

কনানা এই সকল দেখিয়া ভৎসনার ভাবে কহিলেন, "ভণ্ড রসিদহইতে আরম্ভ করিয়া, বিশ্বস্ত উষ্ট্রচালকপর্য্যন্ত, ইশ্মায়েলের সন্তানমাত্রেই আপন প্রকৃতি ভুলে না। রাখ, তরোয়াল হাতেই রাখ। কারণ আমাকে অবজ্ঞা করার অপেক্ষাও ভাল কাজে এই তরোয়ালের ব্যবহার হয় ত হইতে পারিবে। এইখানহইতে আমাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন পথে যাইতে হইবে। বলিয়াছিলাম ত আজ রাত্রে তোমার গন্তব্য পথ তোমায় দেখাইয়া দিব! তোমাকে উত্তরমুখে যাইতে হইবে, কম হইলেও দশরাত্রির পথ।

"আর আপনি কোন্‌মুখে যাইবেন, হুজুর?"

"তা আল্লাই দেখাইয়া দিবেন। লা ইলাহা ইল্ আল্লা।"

উষ্ট্র-চালক ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসিল, "আমাকে কি করিতে হইবে।"

"তুমি বেনি-সৈয়দদিগের অন্বেষণে যাও। মরুভূমির সিংহ বেনি-সৈয়দের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিবে, "আপনার কনানা দিব্য-পালন করিয়াছে। সে বরকতের উপর বল্লম চালায় নাই; কিন্তু আপনকার শাদা উট, ও সেই উটের পিঠে আপনকার জ্যেষ্ঠপুত্র ফিরিয়া আসিয়াছে। যাও, ঈশ্বর তোমার সঙ্গী।"

এই বলিয়া কনানা উষ্ট্র চালাইয়া দিলেন, শাদা উষ্ট্রস্থিত লোকটী ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে তবে?"

বেদুইন-বালক মুখের ও গায়ের কাপড় ফেলিয়া, মেষচর্ম্মের জামা গায়ে ও স্বদেশী পাগড়ি মাথায় দিয়া কহিলেন—

"আমি তোমার ভাই কনানা; যাঁ'কে সকলে বেনি-সৈয়দবংশের কাপুরুষ বলিত।

(ক্রমশঃ।)

উত্তরকেন্দ্র-আবিষ্কার

-:o:-

অনেক বালক একবার যদি একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তাহা হইলে হতাশ হইয়া পড়া-শুনা ছাড়িয়া দিতে চায়, কিন্তু নামজাদা নাটক-লেথক স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র লিথিয়া গিয়াছেন—

"যে মাটীতে পড়ে লোক উঠে তা'ই ধ'রে ;
বারেক নিরাশ হ'লে কে কোথায় মরে ?
তুফানে পতিত, কিন্তু ছাড়িব না হা'ল ;
আজিকে বিফল হনু, হ'তে পারে কাল।"

কথাগুলি খুবই ভাল কথা ; বাস্তবিকই যতদিন না কাজটি শেষ হয়, ততদিন কোন একটি কাজে মনঃ-প্রাণ-দিয়া লাগিয়া থাকিলে তাহার পুরস্কার যে আছেই, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কমাণ্ডার পিয়ারীর ১৯০৮ সালে উত্তরকেন্দ্র-আবিষ্কার। ঐ জায়গাটি আবিষ্কৃত করিবার জন্ম চারশোবছর ধরিয়া চেষ্টা হইতেছিল। ঐ আবিষ্কার-ব্যাপারে কত যে টাকা খরচ হইয়াছে—কত লোকের যে প্রাণ গিয়াছে, তাহা বলা যায় না। কমাণ্ডার পিয়ারী ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দহইতে ঐ কাজে লাগিয়াছিলেন। তাঁহাকেও অনেকবার, বড় কিছু করিতে না পারিয়া, ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই ঐ কাজ ছাড়েন নাই বলিয়াই শেষে তিনিই উত্তরকেন্দ্র-আবিষ্কারের গৌরবলাভ করিতে পারিয়াছেন। আগেকার প্রবন্ধে আমরা পিয়ারীর একটি অভিযানের কথা বলিয়াছি, এই প্রবন্ধে আমরা তাঁহার শেষ গৌরবময় অভিযানটির কথা যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

১৯০৮ সালের ৬ই জুলাই পিয়ারী তাঁহার সেই "রুজবেল্ট"-জাহাজে চড়িয়া নিউইয়র্ক ছাড়িলেন। তাঁহার স্বদেশীয়েরা তাঁহাকে মহাধূমধামে বিদায় দিলেন ; অন্য অন্য দেশের লোকেরাও তাঁহার সেই বিদায়গ্রহণের সময়ে অসাড় হইয়া রহিলেন না। ঐ অভিযানের ফলাফল জানিবার জন্য সব দেশেরই বৈজ্ঞানিক ও পর্য্যটকেরা বড়ই উৎসুক ছিলেন, কারণ একটিমাত্র জায়গা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্ম আর কোন লোকই পিয়ারীর মত তাঁহার জীবনের অতটা সময় দেন নাই এবং আর কেউই অতটা কষ্ট সহ্য করেন নাই বা বিপদের মুখে যান নাই ; তা' ছাড়া পিয়ারী যেমন পরে যা' হইবে তাহার জন্ম আগেহইতে ঠিকঠাক্ হইয়া থাকিতে ও বুদ্ধি খেলাইতে পারিয়াছেন, তেমন আর কেউই পারেন নাই।

১লা আগষ্ট "রুজবেল্ট" "ইয়র্ক"-অন্তরীপে পঁহুছিল। সেখানহইতে পিয়ারী তাঁহার উত্তরকেন্দ্রযাত্রার চিরসঙ্গী কএকজন এস্কিমোকে বাছিয়া লইলেন। তাহার পর, তিনি সভ্য-জগতের সঙ্গে কিছুদিনের জন্য সম্বন্ধ রহিত করিয়া পথহীন চিরতুষারময় রাজ্যে উত্তরকেন্দ্রটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চলিলেন। কুড়িবৎসরযাবৎ এই জমাট তুষারের রাশি বড়ই নিষ্ঠুরের মত যেন তাঁহাকে "না" বলিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে, কিন্তু এবার তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, এই তুষার-মরু আর তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না, এবারকার সাধনায় তাঁহার সিদ্ধিলাভ হইবেই হইবে।

"ইটা" বলিয়া একটি জায়গায় বাইশজন এস্কিমোকে, তাহাদের স্ত্রী-ছেলেপিলেদের, আর ত্ব'শচল্লিশটা কুকুর জাহাজে তুলিয়া লওয়া হইল। তাহার পর, সেই ছোট, কালো জাহাজখানি বরফে আটকান সরু সরু খালগুলি দিয়া দেড়শোক্রোশ পথ গিয়া কেন্দ্রযাত্রীদের শীতকালের আড্ডা "শেরিদন"-অন্তরীপে পঁহুছিল। "রুজবেল্ট"-জাহাজের আগে আর চারখানিমাত্র জাহাজ এই পথে অনেকটা আসিতে পারিয়াছিল, আর সেই চারখানি জাহাজের মধ্যে একখানি ফিরিবার সময় "ক্ষোয়া" গিয়াছিল। তাই যখন "রুজবেল্ট"-জাহাজ এই জায়গায় প্রায় শক্ত বরফের চাপগুলির ধাক্কাধুক্কি খাইতে খাইতে কখন তুষার-বৃষ্টি, কখন বা ঘন কুয়াসার মধ্যদিয়া যাইতেছিল, তখন জাহাজের আরোহীরা বড়ই উদ্বেগে দিন কাটাইতেছিল।

জাহাজ "শেরিদন"-অন্তরীপে পঁহুছিলে, দরকারী জিনিসগুলি তাড়াতাড়ি জাহাজহইতে নামাইয়া ফেলা হইল। কেন্দ্রাভিযান করিতে হইলে এটী প্রথমেই করা খুব দরকার। এটি করিলে, পরে জাহাজে যদি আগুন লাগে, কি জাহাজ ভাঙিয়া যায়, তাহাহইলেও কেন্দ্রাভিযানের কোনই ক্ষতি হয় না। জাহাজটি কোন কারণে নষ্ট হইলেও, কেন্দ্রাভিযানহইতে ফিরিয়া "ইটা"পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গিয়া অন্য জাহাজে দেশে ফিরা যায়।

বসন্ত আর গরমীকাল এই তুই ঋতুতেই কেন্দ্রের পথে যাওয়া যায়। কিন্তু কেন্দ্রযাত্রা করিবার আগে, পথে অনেক মাস অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল বলিয়া কেন্দ্রযাত্রীরা কুড়ের মত বসিয়া ছিলেন না, যতক্ষণ রৌদ্র থাকিত, ততক্ষণ তাঁহারা কোন-না-কোন কাজে লাগিয়া থাকিতেন। শিকারীর দলেরা হরিণ প্রভৃতি শিকার করিয়া আনিয়া মানুষ ও কুকুর তুই-এরই খোরাকের যোগাড় করিতেন। স্লেজে চড়িয়া ছোট ছোট অভিযান করিয়া কেবল যে, যে-সমস্ত ছোট ছোট জায়গা মানচিত্রে ছিল না—সেই সমস্ত জায়গা মানচিত্রে বসাইবার সুবিধা করা হইতেছিল, তা' নয়, যাঁহারা ইহার আগে কেন্দ্রের দিকে আসেন নাই, তাঁহাদের বড় অভিযানটি করিবার জন্য সহাইয়াও লওয়া হইতেছিল; সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা কি করিয়া কুকুরদের বাগাইতে ও এস্কিমোদের চালাইতে হয়, তাহাও শিখিতেছিলেন। তা' ছাড়া তাঁহারা অপঘাত ও তুষারহইতে আত্মরক্ষা করিতেও অভ্যস্ত হইতেছিলেন। তাহার পর, কেন্দ্রের

দিকে যাইবার জন্য শেষ আয়োজন হইতে লাগিল। দরকারী রসদ কাপড় ইত্যাদি শেরিদন-অন্তরীপহইতে কলম্বিয়া-অন্তরীপে চালান দেওয়া হইল। ঐ কলম্বিয়া-অন্তরীপ জাহাজহইতে নব্বই-মাইল উত্তর-পশ্চিমে, উহা মহাতীরের (গ্রাণ্ডল্যাণ্ডের) সর্ব্বোত্তর সীমা। ঐখানহইতে পিয়ারী সোজা কেন্দ্রীয় সমুদ্রের দিকে যাইতে মনস্থ করিলেন।

কলম্বিয়া-অন্তরীপ ও কেন্দ্রের মাঝপথে জমী কিম্বা সমতল বরফ নাই। যাঁহারা মনে করেন যে, তেলা বরফের উপরদিয়া পিয়ারী সড়্‌সড়্‌ করিয়া তাঁহার স্লেজ হাঁকাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সে ধারণা কিছুতেই ঠিক নয়। পিয়ারী বলিয়াছেন,—সেই তুষার-ভূমি এমনই অসমতল যে, কল্পনাই করা যায় না। কোথাও তুষার ৫০ফিট এক ঢিবির মত উঁচু হইয়া আছে, সেখানে স্লেজগুলি গায়ের জোরে সেই ঢিবির উপর তুলিতে কিম্বা ঢিবি কাটিয়া পথ করিয়া লইতে হয়। কিন্তু ঢিবির চেয়ে স্রোতের টানে ও বাতাসে বরফগুলি নড়িয়া যে নালাগুলি হয়, সেইগুলি পার হওয়া আরও কষ্টকর ও বিপদ্‌জনক। কখন্‌ যে সেই নালাগুলি হইবে, তা' কেউই বলিতে পারে না; আর সেগুলি কখনও ছোট ছোট ফাটলের মত, আবার কখনও বা পোয়াটাক-চওড়া নদীর মত হইয়া উঠে। কেন্দ্রাভিযানের সময়ে পিয়ারী এই নালাগুলির ভয়ে সর্ব্বদা অস্থির ছিলেন। যখন কেন্দ্রের দিকে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার ভয় হইতেছিল যে, হয়ত তিনি ঠিক সময়ে কেন্দ্রে পঁহুছিতে পারিবেন না; আবার যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন তাঁহার ভয় হইতেছিল যে, হয়ত এমন একটি চওড়া ফাঁক হইয়া যাইবে যে, তাঁহাদের নরলোকের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ চিরকালের জন্য ঘুচিয়া যাইবে। ফিরিবার সময়ে ঐ-রকম বড় একটি ফাটলের জন্য পিয়ারীর ফিরিতে বড় দেরী হইয়াছিল এবং তিনি অনাহারে মারা যাইতে যাইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে কেন্দ্রের দিকে শেষযাত্রা আরম্ভ করিবার সময় হইল। কলম্বিয়া-অন্তরীপহইতে একদল লোক কাপ্তেন বার্টলেটের তাঁবে আগবাড়াইয়া চলিলেন। কাপ্তেন বার্টলেট্ কেবল এই অভিযানে নয়, ইহার আগের অভিযানেও পিয়ারীর বড়ই সাহায্য করিয়াছিলেন। পিয়ারী যে অভিযান করিতে যাইতেছিলেন, তাহাতে একদল আগ-বাড়াইবার লোক এবং একদল পিছনে থাকিবার লোক থাকা বড়ই দরকার। আগবাড়ানর দল পথে নিশানা করিতে করিতে যায়, আর পিছনের লোক খাবার লইয়া যায়,—খাবার কম হইয়া গেলে আসল দলের যাহাতে খোরাক ঠিক থাকে, তাহার জন্য উপযুক্ত জায়গাহইতে তাহারা ফিরিয়া যায়। এই ভাবে আসল দল দুইদলহইতেই দরকারী সাহায্য পায়।

আগের দল চলিয়া যাইবার ছয়দিন পরে পিয়ারী যাত্রা করিলেন। ভয়ানক শীত পড়িয়াছিল, কিন্তু কেন্দ্রপথে শীতের কষ্ট সহ্য বরং ভাল, তবু গরমে বরফ গলিয়া যে ফাটল দেখা দেয়, তাহা ভাল নয়,—উহাতে বিপদ্‌ ও বিলম্ব দুই-ই হয়।

ভয়ানক হাওয়ার মধ্যদিয়া, ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ফাটলগুলা পার হইতে হইতে পিয়ারীর দল ক্রমশঃ উত্তরদিকে যাইতে লাগিল। কোথাও ক্ষুরধার এবড়োখেবড়ো বরফগুলা যাত্রীদের সেই এস্‌কিমোদেশীয় পুরুচামড়ার জুতাগুলি ফুঁড়িয়া পায়ে ফুটিতেছিল; কোথাও বরফের উপর তুষার জমিয়া কাদার মত হইয়াছিল, তাহাতে চাষাকে যেমন ক্ষেতের কাদা ভাঙিয়া কাজ করিতে হয়, তেমনই তাঁহাদেরও সেই তুষার-কর্দ্দম ভাঙিয়া পথ চলিতে হইতেছিল। তবুও তাঁহারা ক্রমে আগাইতেছিলেন। যতই তাঁহারা কেন্দ্রের কাছাকাছি হইতেছিলেন, ততই তাঁহাদের আশা বাড়িতেছিল। বড়ই অনিচ্ছায় একে একে পিছনের দলের লোকেরা ফিরিয়া যাইতেছিলেন আহা! আগে কেন্দ্রে পঁহুছিবার গৌরবলাভের আশায়, সকলেই সব কষ্ট সহিতেই রাজি ছিলেন। সকলের শেষে কাপ্তেন বার্টলেট্ বিদায় লইলেন। কাপ্তেনকে বিদায় দিতে পিয়ারীর বড় কষ্ট হইয়াছিল। কাপ্তেনও কেন্দ্রে পঁহুছিবার সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত হইয়া বড়ই মনের দুঃখে ফিরিয়া চলিলেন; কিন্তু তিনি কেন্দ্রের দিকে আগের চেয়ে সওয়া-ডিগ্রী বেশী গিয়াছিলেন। ব্রিটিশ-প্রজাদের মধ্যে তিনিই কেন্দ্রের সবচেয়ে কাছে গিয়াছেন, তা ছাড়া এই অভিযানে তিনি শেষের দলে একটি বড় উঁচু পদ পাইয়াছিলেন।

এখন পিয়ারীর সঙ্গে হেন্‌সন্‌ বলিয়া একজন বিশ্বাসী আমেরিকার আদিমনিবাসী আর চারজন এস্‌কিমো রহিল। তখন তাঁহারা কেন্দ্রহইতে ঠিক পঁয়ষট্টিক্রোশ দূরে ছিলেন। পাঁচটি যাত্রায় প্রাণপণ করিয়া ঐ পথটুকু পার হইতেই হইবে। এমন এমন সময় ঐ যাত্রাগুলি আরম্ভ করিতে হইবে যেন ঠিক দু'পুরবেলায় কেন্দ্রে

পঁহুছিয়া দ্রাঘিমাঘটিত একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পিয়ারী বলেন,—ঐ যাত্রাকে কেন্দ্রের দিকে ছুটিয়া যাওয়া বলা ঠিক নয়, কেননা কোন কাজ খেয়ালমত করা হয় নাই। বেশ ভাবিয়া-চিন্তিয়া, সকল বিষয়ের সাবধানে সুরাহা ও যতদূর সম্ভব আগেহইতে বন্দোবস্ত করিয়া তাহার পর, সময়ে সময়ে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায় এমন জোরে ঐ পথ চলা হইয়াছিল। সেই সঙ্গে কেন্দ্রযাত্রীরা এই একটি কথাও মনে রাখিয়াছিলেন যে, কুড়িঘণ্টা ধরিয়া বরাবর হাওয়া বহিলে এমন একটি ফাটল হইয়া যাইতে পারে, যাহা আর পার হওয়া যাইবে না এবং যাহার দরুণ পিয়ারীর সমস্ত মতলবই উলটিয়া যাইতে পারে, কিন্তু, এবার তাঁহার হৃদয় আশায় পূর্ণ হইয়া ছিল।

২রা এপ্রেলের "নির্ম্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল" প্রভাতে চল্লিশদিনের উপযুক্ত খাবার-দাবার ও জ্বালানী-কাঠ লইয়া পিয়ারী যাত্রা করিলেন। তাঁহারা প্রায় ঠিক উত্তরমুখে চলিলেন। দশঘণ্টা ধরিয়া নানারকম জায়গা দিয়া একনাগাড়ে চলিয়া তাঁহারা তের-চোদ্দ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া যেখানে পঁহুছিলেন, সেখানে আগে আর কোন মানুষ পা দেয় নাই। পরের যাত্রায়ও তাঁহারা ঐ রকমই সফল-মনোরথ হইলেন। যত এক-একটি করিয়া দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল, ততই পথিকদের মনে আশা হইতে লাগিল যে, এবার তাঁহারা উত্তর-মেরু খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন। জল-হাওয়া ও যাত্রা ক্রমশঃ ভাল হইয়া উঠিতে লাগিল। অল্প অল্প ঘুমাইয়া এবং অল্প-অল্প ক্ষণের জন্য জিরাইয়া পথিকেরা ক্রমশঃ আগাইয়া যাইতে লাগিলেন। ৪ঠা এপ্রেল পর্য্যন্ত এইভাবে চলিয়া তাঁহারা উননব্বইএর দ্রাঘিমার প্রায় ভিতরে ঢুকিলেন। সে জায়গা কেবল বরফ ও তুষারের পথশূন্য, বর্ণশূন্য ও শব্দশূন্য মরু।

৬ই এপ্রেলের দুপুরের আগে শেষযাত্রা শেষ হইল। পথিকেরা যতদূর সম্ভব ক্ষত-বিক্ষত ও ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তবুও তাঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন যে, এতদিনকার—তিনশতাব্দীর পুরস্কার আজ তাঁহারা পাইলেন। পিয়ারী তাঁহার রোজনামচায় লিখিয়াছেন, "কাজটা এত সহজ ও সাধারণ রকমের বোধ হইতে লাগিল যে, আমরা যে একটা মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছি, এ রকম মনে করিতে পারিতেছি না।" কএক ঘণ্টামাত্র পথ চলিয়া পথিকেরা উত্তর-গোলার্দ্ধহইতে দক্ষিণ-গোলার্দ্ধে গিয়া পড়েন। প্রথমে তাঁহারা উত্তরে যাইতেছিলেন, শেষে তাঁহারা দক্ষিণে যান; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সকল সময়েই তাঁহারা একদিকে মুখ করিয়াই চলিয়াছিলেন।

পৃথিবীর ঠিক শীর্ষস্থানটি পরীক্ষাপূর্ব্বক ঠিক করিয়া লইয়া পিয়ারী সেখানে পাঁচখানি নিশান গাড়িলেন। তাহার মধ্যে আমেরিকার জাতীয় রেশমী-নিশানখানি তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে পনরবছর আগে দিয়াছিলেন। সেখানি তিনি আগে যত বার এই মেরুপ্রদেশে আসিয়া শেষযাত্রা করিয়াছিলেন, তত বারই আপনার গায়ে জড়াইয়া লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু আর কোন বারই ইহা পুঁতিবার অবকাশ পান নাই, এইবার পাইলেন। যখন এই নিশানখানি খাড়া করা হয়, তখন তিনবার হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে করা হইয়াছিল। তাহার পর, পিয়ারী যাহা করিতে পারিয়াছেন তাহার একটি নিদর্শনপত্র সেখানে এক জায়গায় রাখিয়া আসেন।

ফিরিবার সময়ে পিয়ারীর বিশেষ কোন অসুবিধা বা বিপদ্ হয় নাই; তিনি প্রায় নির্ব্বিঘ্নে "রুজভেল্ট"-জাহাজের নিকটবর্ত্তী হন। কিন্তু তাঁহাদের আনন্দ একটি কারণে নিরানন্দে পরিণত হয়। তাঁহারা ফিরিয়া খবর পাইলেন যে, অধ্যাপক রস্ মারভিন্, পিয়ারীর সেক্রেটারী, ফিরিবার সময়ে বিগ্‌লীডনামক জায়গায় জলে ডুবিয়া মারা পড়িয়াছেন। যখন তিনি ডুবিয়া যান, তখন তাঁহার কাছে কোন স্বদেশী লোক ছিল না, কেবল কএকজন এস্কিমো ছিল। তিনি কেমন করিয়া ডুবিয়া গিয়াছেন তাহা জানা যায় নাই, কারণ কেহই তাঁহাকে ডুবিতে দেখে নাই। এস্কিমোরা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অনেকক্ষণ তাঁহার অপেক্ষা করিয়াছিল, পরে তাঁহার জামা জলে ভাসিতে দেখিয়া কি হইয়াছে বুঝিতে পারে, তখন এস্কিমোদের প্রথামত তাঁহার যাহা কিছু ছিল সব স্লেজহইতে ফেলিয়া দিয়া ভয়ে তাড়াতাড়ি জাহাজে চলিয়া আসে। তাঁহার সহযাত্রীরা গ্র্যাণ্ডলাণ্ডে তাঁহার উদ্দেশে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত করিয়া আসিয়াছেন, তাহার চূড়ায় একটি ফলকে তাঁহার নাম ও কি করিয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে তাহা লেখা আছে।

যে সময়ে তাঁহারা "রুজভেল্ট"-জাহাজে ফিরেন, সে সময়ে বসন্ত-কাল ছিল, যাত্রীরা গরমীকালের অপেক্ষায় রহিলেন। যত দিন না গরম পড়িল, ততদিন তাঁহারা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রভৃতি করিয়া আর "রুজভেল্ট"-জাহাজ মেরামত করিয়া কাটাইলেন। ১৮ই জুলাই তাঁহারা শেরিদন-অন্তরীপ ছাড়িলেন এবং ভাঙা বরফের ভিতর দিয়া পথ করিয়া ১৭ই আগষ্ট ইটায় পঁহুছিলেন। এইখানে পিয়ারী তাঁহার সেই বিশ্বস্ত এস্কিমোদের নিকট বিদায় লইলেন। এই বিদায় লইবার সময় তাঁহার বড় কষ্ট হইয়াছিল, কারণ আর তাঁহার তাহাদের সঙ্গে দেখা হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কেন্দ্রে বাস করিতে হইলে যে সব জিনিসের দরকার হয় তাহা তিনি তাঁহাদের প্রচুর পরিমাণে উপহার দেন, আর যাহারা তাঁহার স্লেজ চালাইয়াছিল তাহাদের তিনি এত টাকা দেন যে, তাহারা সেই দেশের এক একজন ধন-কুবের হইয়া উঠে।

২১শে সেপ্টেম্বর "রুজভেল্ট" সিডনীর ব্রেটন-অন্তরীপে পঁহুছে। সেখানে তাঁহার খুব সম্বর্দ্ধনা হয়। পিয়ারীর এই কাজ সহজ ও সাধারণ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিরুপম শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, ধৈর্য্য ও সাহসিকতাই পরিস্ফুট হইয়াছে। এই মহাবিকারের জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

দিল্লী-দরবার।

দিল্লীর পুরাণো নাম ইন্দ্রপ্রস্থ। মহাভারতহইতে জানিতে পারা যায় যে, পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরহইতে আসিয়া এই সহরটির পত্তন করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের পর ঐ গোষ্ঠীর তিরিশজন রাজা এখানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ইহার পর আরও অনেক রাজা এখানে রাজত্ব করেন। চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ায় রাজা ধব্ একটা পঞ্চাশফুট উঁচু লোহার মিনার (থাম) খাড়া করাইয়া তাঁহার স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন।

পরে কিছুকাল দিল্লীর অবস্থা বড় খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা অনঙ্গপাল আবার নূতন করিয়া এই সহরটির পত্তন করেন। তাহার পর, ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী দিল্লীর রাজা পৃথ্বিরাজকে থানেশ্বরের যুদ্ধে হারাইয়া দিয়া দিল্লী দখল করেন, আর তাঁহার সেনাপতি কুতুবুদ্দিনকে সেখানকার শাসন-কর্ত্তা করিয়া দেশে ফিরিয়া যান। সেই অবধি দিল্লী মুসলমানদের রাজধানী হইয়া পড়ে। কুতুবুদ্দীন দিল্লীতে অনেক কোটা, বালাখানা, গুম্বজ, মিনার ইত্যাদি তৈয়ার করাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কুতুব-মিনারটি পরে খুব প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে, সেটি এখনও দিল্লীতে রহিয়াছে। উহা এখনকার দিল্লীর দক্ষিণদিকে খাড়া আছে। দুঃখের বিষয়, ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে উহার চূড়াটি খসিয়া পড়িয়াছে। যে জায়গায় কুতুবমিনারটি রহিয়াছে, সে জায়গার জল-হাওয়া নাকি ভাল; দিল্লীর অনেক লোকে ওখানে হাওয়া-বদলাইতে গিয়া থাকে। যাহা হউক, ঐ জায়গাটির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখিলে মোহিত হইতে হয়। ফি বছর শ্রাবণমাসে ওখানে একটি ভারি মেলা বসে, ঐ মেলার নাম "ফুল ওয়ালুকি স্যার।" গিয়াসুদ্দিন তোগ্‌লক ঐ জায়গার দুইক্রোশ দূরে আর একটি নূতন দিল্লীর পত্তন করিয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন—"তোগ্‌লকাবাদ"; এখন তোগ্‌লকাবাদ বন হইয়া গিয়াছে। হিন্দুদের ইন্দ্রপ্রস্থও আর নাই—এখন কেহ দিল্লীতে গেলে কেবল তাহার "ভগ্নাবশেষ" দেখিতে পায়।

তোগ্‌লকবংশ তৈমুরলঙের অত্যাচারে উৎসন্ন গেলে পর, লোদীবংশ দিল্লীতে রাজত্ব করেন, লোদীবংশের শেষ বাদশা' ইব্রাহীমকে বাবর প্রথম পাণিপথের যুদ্ধে হারাইয়া দেন। বাবরের ছেলে হুমায়ুন দিল্লীতে রাজধানী-স্থাপন করেন। হুমায়ুনের নাতি সাজেহান পুরাণো দিল্লী মেরামত করিয়া তাহার নাম রাখেন—"সাজেহানাবাদ।" ঐ সাজেহানাবাদই এখনকার দিল্লী, দু'শো আটাত্তর-বৎসর আগে এই দিল্লীর পত্তন হইয়াছে। ইহার তিনদিক্ প্রাচীর-ঘেরা, ইহাতে বারটী ফটক, চারটী খিড়কী-দরজা ও চৌষট্টিটি থাম আছে। সহরের বাড়ীগুলির বেশীর ভাগই কোটা। বাজার খুব বড়। এই সহরের "সাহিমহল"-কেল্লা ও "জুম্মা-মস্‌জেদ্" দেখিবার জিনিস। কিন্তু সাজেহানের "খাসমহলের" শোভা-বর্ণনা করা যায় না। ঐ খাসমহলের একজায়গায় ফার্‌সীতে লেখা আছে—

"থাকে যদি স্বর্গ কোথা দুনিয়ায়,
তবে তা' হেথায়, হেথায়, হেথায়!"

দিল্লীতে দেখিবার জিনিস বিস্তর আছে। কুতুব-মিনার, সাহিমহল, জুম্মা-মস্‌জেদ্ ও খাসমহলের কথা বলিলাম। তা' ছাড়া বদ্রিমন্দির, ফিরোজশা'র থাম, হুমায়ুনের কবর, লাল-কেল্লা, দেওয়ানী খাস, মতিমস্‌জেদ্, জাহানারার কবর, চাঁদ্‌নী-চক, সুনহরি-মস্‌জেদ্ ও ঘণ্টাঘর প্রভৃতি আর কত কি আছে। নিষ্ঠুর আরঙ্গেব তাঁহার পিতা সাজেহানকে যখন কয়েদ করিয়া রাখেন, তখন তাঁহার মেয়ে জাহানারাও বাপের সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্য নিজের ইচ্ছায় তাঁহার সাথী হন। জাহানারার কবরটি দেখিলে এবং তাহার উপরে লেখা একটি শ্লোক পড়িলে চোকে জল আসে তাঁহার হুকুমে তাঁহার কবরের উপর ফার্‌সীতে যে সুন্দর "বয়েদ্"টি লেখা আছে, তাহার ভাব এই—আমার কবরের উপর সবুজ ঘাস-ছাড়া আর যেন কিছুই না থাকে, গরীবের কবর সাজাইবার জন্য ঐ সবুজ ঘাসই যথেষ্ট।

২

১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখটি ভারতবর্ষের লোকেরা চিরকাল মনে করিয়া রাখিবে, কারণ ঐ তারিখে দিল্লী-সহরে যে বিরাট দরবার হইয়াছিল, তাহাতে আমাদের রাজা পঞ্চমজর্জ্জ ও রাণী মেরী সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। ইহার আগে আর কোন ইংরাজ রাজা আমাদের দেশে আসিয়া কোন দরবার বা অভিষেক-গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং এই ঘটনা একদিকে যেমন আমাদের রাজার প্রজাদের উপর ভালবাসার পরিচয় দিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একটি নূতন রেখাপাত করিয়াছে। ইহার আগে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ও ১৯০৩ সালের ১লা জানুয়ারী পুণ্যবতী স্বর্গীয়া মহারাণী-ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার পুত্র স্বর্গীয় সম্রাট সপ্তম-এডোয়ার্ডের হইয়া তখনকার বড়লাট লর্ড লিটন ও লর্ড কার্জ্জন দিল্লীতে আরও দুইবার দরবার করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের দরবারে যে রকম জাঁক-জমক হইয়াছিল, এমন আর কখনও হয় নাই।

এবারকার দরবারের শোভার তুলনাই হয় না। শোভায় ও সৌন্দর্য্যে দিল্লী-সহর এবার বড় রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। যেন একটা নূতন যাদুনগরী, তাঁবুতে, ছাউনীতে, ফটকে, নহবৎখানায়, ফুলে, নিশানে সুসজ্জিত হইয়া হঠাৎ দেখা দিয়াছিল। ভারতের বড় বড় রাজা-রাজরাড়া সব একজায়গায় পাশাপাশি নানা রঙবিরঙের তাঁবু ফেলিয়াছেন। সে সবের জলুসে চোক ঝলসিয়া যাইবার মত হইয়াছিল! তাহার উপর রাত্রিতে সেই সব তাঁবুতে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়া দেওয়াতে তাহাদের শোভা শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল।

Phot & Hoffm

দিল্লী
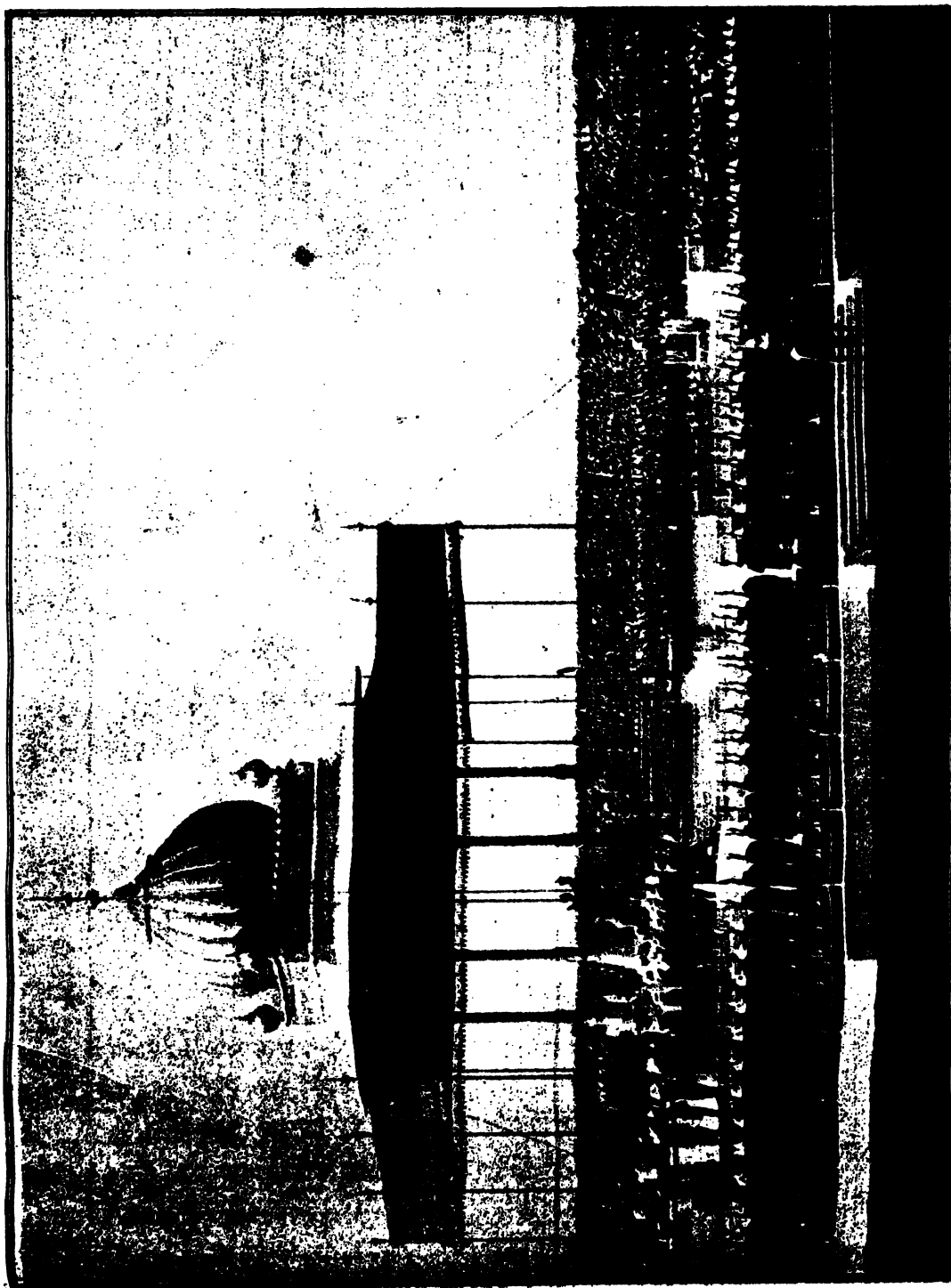
৭ই ডিসেম্বর আমাদের সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞী দিল্লীতে পঁহুছেন। তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য রাস্তার দুইধারের বাড়ীর ছাদে ও বারান্দায় এত লোকের গাদাগাদি ও ঠেসাঠেসি হইয়াছিল যে, প্রতি-মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল, ছাদ ও বারান্দা বুঝি ভাঙিয়া পড়ে! কলিকাতায় যেমন রাজাকে দেখিবার জন্য লোকে টিকিট্ কিনিয়া "গ্যালারীতে" বসিয়াছিল, দিল্লীতেও সেই রকম বন্দোবস্ত হইয়াছিল। সকলের "গ্যালারীতে" বসিয়া রাজাকে দেখিবার সুযোগ হয় নাই, তাই কত লাখ লাখ গরীবলোক যে শেষ রাত্রিতে উঠিয়া দিল্লীর সেই হাড়ভাঙা শীতে রাস্তার ধারে আসিয়া জমায়েৎ হইয়াছিল এবং লোকের ভীড়ে গাদাগাদি ঠেসাঠেসিতে যে কি ভয়ানক কষ্ট পাইতেছিল, তাহা বলিবার নয়; কিন্তু রাজা দেখিবার আগ্রহে তাহারা সে কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই মনে করে নাই।

এই রকমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া দর্শকেরা রাজা-রাণীকে দেখিবার জন্য, তাঁহার আগমন-পথের দিকে চাহিয়া, কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়াছিল। কখন্ রাজা আসেন, কখন্ রাজা আসেন সকলের মুখে এই এক কথা। নানা রঙবিরঙের উর্দ্দি-পরা ফৌজের দল বন্দুক হাতে করিয়া কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর তাহাদের সঙ্গীনগুলিতে রোদ লাগিয়া যেন বিদ্যুৎ চম্কাইতেছে। এমন সময়ে, হঠাৎ গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া একবার নয়, দুইবার নয়, একেবারে একশো-একবার তোপ দাগা হইল। তখন সকলেই বুঝিল, সম্রাট্ ষ্টেশনে পঁহুছিয়াছেন। আর অল্পক্ষণপরেই রাজা-রাণীকে দেখিয়া জীবন-সার্থক করিতে পারিবে ভাবিয়া দর্শকেরা স্ফূর্ত্তিতে চঞ্চল হইয়া উঠিল। ক্রমে একে একে লাল, কালো, জরদ্, ইত্যাদি নানারঙের পোষাক-পরা সিপাহীর দল কেউ বা ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া, কেউ বা পায়ে হাঁটিয়া আসিতে লাগিল। কোন কোন ফৌজের দলের সঙ্গে মিঠা আওয়াজে গোরাবাজনা বাজিতেছিল। এখন সকলেই বেশ বুঝিল, সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী আসিতেছেন। মিছিল চলিতে সুরু করিয়াছে। ক্রমে বড়লাটের দেহরক্ষীরা দেখা দিল। তাহাদের পিছনে দেশীয় রাজা-রাজড়ারা হাতীতে চড়িয়া দেখা দিলেন। তাঁহাদের পরে জমকালো পোষাক-পরা বড় বড় ইংরাজ সামরিক কর্ম্মচারী ঘোড়ায় চলিয়া চলিলেন। তাহার পর, রাজ-শকটে রাণীকে দেখা গেল। তাঁহার মাথার উপর একজন লোক ছাতা ধরিয়া আছে। সাম্রাজ্ঞীর গাড়ী যেমনি দেখা দিল, অমনি সুন্দর গোরা-বাজনায় তালে তালে "ঈশ্বর আমাদের রাজাকে রক্ষা করুন" এই ইংরাজী গানের গৎ বাজিতে লাগিল। রাস্তায় যে সব সিপাহী নিশান ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা নিশান মাটীতে নামাইয়া ভারত-রাজমহিষীর প্রতি সম্মান দেখাইল। ক্রমে সাম্রাজ্ঞীর গাড়ীও আগাইয়া গেল। তখন সকলে সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"কই, আমাদের রাজা কোথায়?" লোকেরা মনে করিতে লাগিল, বুঝি তিনি পিছনে আছেন; কিন্তু ক্রমে ক্রমে মিছিল শেষ হইয়া আসিল, সব রাজা-রাজড়াই চলিয়া গেলেন, ভারতেশ্বরকে আর দেখা গেল না। এই একদিন ছাড়া সম্রাট্ যতদিন দিল্লীতে ছিলেন, লোকে তাঁহাকে সাম্রাজ্ঞীর সহিত দেখিতে পাইয়াছিল এবং কত যে খুশী হইয়াছিল, তাহা কি করিয়া বুঝাইব!

দরবারের দিন আসিল। রাজারাণীর বসিবার জন্য যে একটি মণ্ডপ তৈয়ার হইয়াছিল, তাহা কলিকাতার মণ্ডপেরই মত, কিন্তু তাহার অপেক্ষা ঢের বড় ও সুন্দর। উহার মধ্যে চোদ্দহাজার স্ত্রীপুরুষ বসিয়াছিল। আলা'দা আলা'দা ভাগে আলা'দা আলা'দা দেশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা বসিয়াছিলেন। ঐ মণ্ডপের সম্মুখে কলিকাতার ইডেন-গার্ডেনের বাদ্য-গৃহের মত একটা গোল উঁচু ঘর। তাহার সব উপরের থাকে দুইখানি সিংহাসন পাতা রহিয়াছে। তাহার নীচে ও এপাশে ওপাশে চৌকী আছে। কএকহাত দূরে আর একটা ঐ-রকম গোল-ঘর রহিয়াছে, তাহার উপর দুইখানিমাত্র সিংহাসন পাতা আছে। মণ্ডপের সাম্‌নে আধাচাঁদের আকারে স্তূপ বা ঢিবি তৈয়ার করা হইয়াছে, সেখানে হাজার হাজার সাধারণ লোকে বসিবার জায়গা পাইয়াছে। সেই ঢিবির উপরকার লোকদের দূরহইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। দূরহইতে দেখ, সেখানে কেবল মেঘধনুর মত নানা-রঙের খেলা।

যাই গোরাবাজনায় ইংরাজজাতির জাতীয় সঙ্গীতটি বাজিয়া উঠিল, অমনি বড়লাটের গাড়ী আসিয়া সম্মুখের মণ্ডপের কাছে থামিল। বড়লাট ও লাটমহিষী সিংহাসনের নীচে দুইখানি চৌকিতে বসিলেন। একজন বালক-রাজকুমার বড়লাট-মহিষীর বাল-পরিচর হইবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন। স্নেহময়ী লাট-মহিষীর কাছে আসাতে তিনি সেই রাজকুমারকে বড় আদর করিয়া আপনার কাছে বসাইলেন। আবার ব্যাণ্ডে "গড্ সেভ দি কিঙ্" বাজিয়া উঠিল। এবার রাজা ও রাণী আসিলেন। এ দেশের অনেক রাজকুমার তাঁহাদের দুইজনের বাল-পরিচর হইয়া তাঁহাদের পিঠের ঝালরের আঁচল ধরিয়া আসিলেন। রাজা-রাণী সিংহাসনে বসিলে, রাজকুমারেরা সিঁড়ির ধাপে ধাপে বসিলেন। আজ রাজা-রাণী দু'জনেরই মাথায় মুকুট। তোমরা ছবিতে তাঁহাদের মুকুটপরা যে চেহারা দেখিয়াছ, সেই চেহারা। তাহার পর, দরবারের কাজ সুরু হইল। বড় বড় রাজারা রাজ-দম্পতিকে একে একে "কুর্ণিশ" (অভিবাদন) করিয়া আসিলেন। এক-একজন রাজা অভিবাদন করিয়া আসেন, আর হাততালি পড়ে।

রাজাদের সেলাম করা শেষ হইলে, সম্রাট্ দাঁড়াইয়া কি একটা লেখা পড়িতে লাগিলেন। সব লোকে দূরহইতে তাঁহার কথা শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তখনই ছাপান কাগজে পড়িতে পাওয়া গেল। সেই বক্তৃতায় ভারতবাসীদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট আন্তরিক প্রেম ও সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার পর, সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী সেই মণ্ডপহইতে নামিয়া অন্য মণ্ডপটিতে গেলেন। এইবার রাজা সাধারণ প্রজাদের দিকে মুখ করিয়া বসিলেন। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, তাঁহার ঘোষণা-বাণী ভেরী বাজাইয়া চারিদিকে জানান হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে,

রাজা উঠিবার যোগাড় করিলেন, রাজকুমারেরা আবার তাঁহাদের পিঠের ঝালরের আঁচল ধরিলেন। রাজা-রাণী আবার আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া গাড়ীতে চড়িলেন। তখন হাততালি ও হিপ্ হিপ্ হুররের ধুম পড়িয়া গেল। ব্যাণ্ডে আবার জাতীয় সঙ্গীত বাজিতে লাগিল—

God save our gracious King,
Long live our noble King,
God save the King.
Send him victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us,
God save the King.

রাজা-রাণীর গাড়ী দূরে চলিয়া গেলে, বড়লাট ও বড়লাট-মহিষীও উঠিলেন। তখনও আবার "God save the King" বাজিতে লাগিল।

এই রকম প্রজারঞ্জক রাজা ও স্নেহময়ী মাতৃস্বরূপিণী রাণীর প্রতি কাহাকেও জোর করিয়া ভক্তি দেখাইতে হয় না। আপনিই ভক্তি জন্মে। যিনি সকলের রাজা—রাজাদেরও রাজা, তিনিই এই রাজ-দম্পতীকে দীর্ঘকাল বাঁচাইয়া রাখুন, ইহাই আমাদের তাঁহার কাছে প্রার্থনা। আমাদের রাজা যেমন এই দেশের মঙ্গল-কামনা করিয়া এখানে আসিয়াছিলেন, রাজভক্ত প্রজাদেরও তেমনই তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া দেশের মঙ্গলার্থে কাজ করা উচিত। ভারতের উন্নতিতে তাঁহারই গৌরব, আর ভারত যদি হীনতার পাঁকে ডুবিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারই মুখ মলিন হয়। ছেলের বয়স হইলে, সে বুড়া হয়। তাই তোমাদেরও বলিতেছি, মনে রাখিও, আসল দেশভক্তি ও রাজভক্তিতে কোন তফাৎ নাই। যে রাজা তোমাদের এত ভালবাসেন, সে রাজার উপর যদি তোমরা অকৃত্রিম ভক্তি দেখাইতে চাও, তবে এখনহইতেই তাঁহার যোগ্য প্রজা হইবার চেষ্টা কর।

সংস্কৃতে যে প্রাণীকে "জ্যেষ্ঠী" বলে, বাঙ্গলাতে সেই প্রাণীকে টিকটিকী, গিরগিটী ইত্যাদি বলে। এই প্রাণী সরীসৃপ। টিকটিকী নানাজাতীয়, ছোট, বড় নানা আকারের ও নানা বর্ণের। ছোট-গুলিকে আমরা টিকটিকী বলি, আমাদের গো-সাপ, কৃকলাস ইত্যাদি ও টিকটিকী-জাতীয়। দেওয়ালে, বেড়ায়, চালে ও ছাদে, এবং ঘরের খুঁটির গায়ে যে সকল টিকটিকী বেড়ায়, মাছি, পোকা, মাকড়শা ইত্যাদি ধরিয়া খায়, সেগুলি ছোট ছোট এবং সে-গুলিকে পঞ্জিকা-কার জ্যেষ্ঠী বলিয়াছেন। কিন্তু টিকটিকী-জাতীয় বড় বড়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাণীও আছে—বনে, জঙ্গলে, পথে, ঘাটে হঠাৎ সম্মুখে পড়িলে গা শিহরিয়া উঠে। আমাদের বঙ্গদেশে টিকটিকী, গিরগিটী ও কৃকলাস দেখিতে পাই। আসামের বনে, আর বঙ্গ-দেশের সুন্দর-বনে বড় বড় গিরগিটী—আমাদের গো-সাপের মত বড় বড়—অনেক আছে। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া-দেশে খুব বড় বড় গিরগিটী আছে। শীতকালে আমাদের দেশীয় গিরগিটী ও গোসাপের মত সেগুলিও পাথরের উপর, বা গাছের ডালে বসিয়া রোদ পোহায়। আর এক-প্রকার গিরগিটী আছে, সেগুলির দেহের বর্ণ আবশ্যকমত বদলিয়া যায়। সেগুলিকে বহুরূপী বলে।

হিন্দু-শাস্ত্র-মতে টিকটিকী একপ্রকার অপবিত্র প্রাণী।

বাইবেল-শাস্ত্রের পুরাতন-নিয়মে টিকটিকী-জাতীয় প্রাণীরা মনুষ্যের পক্ষে অপবিত্র।

অষ্ট্রেলিয়া-দেশে একপ্রকার গিরগিটী লোকের দুই চক্ষুর বিষ। এগুলি প্রায়ই পাথুরিয়া স্থানে থাকে। অনেক অনিষ্টকর পোকা-মাকড় ধরিয়া খায়। অথচ লোকে এগুলিকে এত ঘৃণা করে যে, পাথুরিয়া বৃশ্চিক (বিছা) বলে। আমাদের দেশে মুসলমানেরা

গিরগিটী দেখিতে পাইলেই মারিয়া ফেলে বিলাতের লোকেরাও গিরগিটী দুই চক্ষে দেখিতে পারে না।

অষ্ট্রেলিয়ার প্রায় সকল গ্রীষ্মপ্রধান (গরম) অঞ্চলেই এক-প্রকার বড় বড় গিরগিটী আছে। এগুলিকে ইংরেজিতে "জেকো" বলে। এগুলি বড় চালাক, আমাদের টিকটিকী ও গিরগিটীর অপেক্ষাও অতি সহজে ও শীঘ্র শীঘ্র দেওয়াল ও ছাদ বহিয়া চলিয়া যায়; সহজে ধরা বা মারা যায় না। মাছির মত, জানালার শার্শির উপরদিয়া অবলীলাক্রমে দৌড়িয়া যায়। বোধ হয়, এই কারণেই এইজাতীয় টিকটিকীকে অষ্ট্রেলিয়ার লোকেরা পাথুরে বৃশ্চিক (বিছা) বলে।

এইপ্রকারে দেওয়ালে, ছাদে, পাথরের উপরদিয়া বেড়াইয়া পোকামাকড় ধরিয়া খাইতে হইবে বলিয়াই সৃষ্টিকর্ত্তা এই প্রাণীকে এক অদ্ভুত রকমের নখর দিয়াছেন। তাহা ছাড়া, ইহাদের পায়ের তলায়, আমাদের ওষ্ঠের মত, নরম আঠাল চামড়া আছে; আমরা যেমন ওষ্ঠদিয়া কোন জিনিস চুষি, ঐ গিরগিটী তেমনি পায়ের তলার ঐ চামড়াদিয়া, চলিবার সময়ে, দেওয়াল, ছাদ, বা আয়না চুষিয়া ধরে। তাই পড়িয়া যায় না। ঐ চামড়াকে চুষক চামড়া বলিব। মাছি, মশা ও ছোট টিকটিকীর পায়েও ঐপ্রকার চামড়া আছে, তাই সেগুলি যে ভাবে ইচ্ছা, সেই ভাবে দেওয়ালে বসিতে বা হাঁটিয়া ও দৌড়িয়া বেড়াইতে পারে।

ইহা ছাড়া, আবার এই গিরগিটীর পায়ের থাবা বিড়ালের থাবার মত, যাহা ইচ্ছা, তাহা "সাপটিয়া" ধরিতে পারে। এই-প্রকার থাবা আছে বলিয়া এই প্রাণী উচ্চ-নীচ অসমান পাহাড়িয়া স্থান পার হইয়া যাইতে, বা গাছ ও শৈলের গা বহিয়া উঠিতে পারে—এপ্রকার স্থলে চুষক চর্ম্মের দ্বারা কোন কাজ হয় না। এক আশ্চর্য্য এই, এই আশ্চর্য্য প্রাণীরা যখন পাথুরিয়া স্থানে বাস করে, তখন ইহাদের পায়ের তলায় চুষক চামড়া থাকে না—থাকিলেও দেখিতে পাওয়া যায় না; অথচ চারি পায়ের থাবা ও নখর বড়শীর মত বাঁকিয়া যায়, তাই অসমান জমী বা পাথুরিয়া স্থান আঁকড়িয়া ধরিয়া চলিতে পারে।

-দেশের যে বড় গিরগিটীকে "জেকো" বলে, সেগুলির রং মেটে কিন্তু উজ্জ্বল নহে, খুব নজর করিয়া না দেখিলে প্রায় চক্ষুতে পড়ে না। যে প্রাণীকে ধরিতে যায়, সে জেকো-গিরগিটীকে কচিৎ দেখিতে পায়। এই গিরগিটীকেও আমরা বহুরূপী বলিব, কারণ ইহারও গায়ের রং বারবার বদলিয়া যায়। আমরা আরও দেখিয়াছি, এইজাতীয় গিরগিটী গাছের ডালে থাকিলে গাছের পাতার মত হরিৎ বর্ণ হয়, আবার তলায় শুষ্ক পাতার উপরে বেড়াইলে শুষ্ক পাতার রং পায়। ইহার চলনও নিঃশব্দ—তাই সহজে ধরা যায় না। ইহার ডাক এক স্বতন্ত্র প্রকারের।

বহুরূপী যদি ভ্রূকুটি করিয়া দাঁড়ায় ও ঢেঁকির মত মাথা নামা-ইতে তুলিতে থাকে, দেখিলে সহুরে যুবকেরা ভয় পাইবে। এই সময়ে চক্ষু, নাক, মুখ রক্তবর্ণ হয়। যদি লাঙ্গূল ধর, লাঙ্গূলটী খসিয়া পড়িবে, বা তোমার হাতে থাকিয়া যাইবে, আর গিরগিটী পলাইবে। মানুষে স্পর্শ করিলে গৃহ-জ্যেষ্ঠীরও লাঙ্গূল খসিয়া পড়ে। লাঙ্গূল খসিয়া পড়িলে, বহুরূপী গিরগিটী দিনকতক দেখিতে অন্ত-রূপ—কতকটা ব্যাঙের মত হয়। দিনকতক পরে আবার লাঙ্গূল গজাইয়া উঠে, কিন্তু অতি নরম, একটু শাদাটে, সরু,—কোনপ্রকারেই পুরাতন লাঙ্গূলের মত নহে। দিনকতক পরে আবার সেইটার মত হয়। সেই কাল কাল দাগ।

এই গিরগিটী স্থানের বিচার করে না—মরুভূমি বল, পাথুরিয়া স্থানই বল, আর নিবিড় শালবনই বল, সকল স্থানেই থাকিতে পারে। গৃহস্থের বাড়ীতেও এই প্রাণীরা থাকে—যে বাড়ীতে একজোড়া গিরগিটী থাকে, সে বাড়ীতে পোকা, মাকড়, আরশুলা "কল্কে" পায় না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই বড় বড় গিরগিটী আমাদের টিকটিকীর জ্ঞাতি। *টিকটিকীরাও গৃহের পোকা-মাকড় নষ্ট করে।*

উচ্চৈঃশ্রবা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

১০

উচ্চৈঃশ্রবা এখন যুবক, পালের সকল ছাগলের অপেক্ষা লম্বা, শিংদুইটা খুব খাড়া ও তীক্ষ্ণ। দশরথও বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে, উচ্চৈঃশ্রবারই মত হৃষ্টপুষ্ট, কিন্তু তত লম্বা নহে; আর ইহার শিং খাট, মোটা, ভোঁতা আর উবড়ো-খাবড়ো, যেন ঘুণ ধরিয়াছে।

আবার বসন্তকাল দেখা দিল। আবার লাপ্তা-পাহাড়ে কাঞ্চন-ফুল ফুটিল। আবার সেই পাঁঠাটা ছাগলের দলে আসিল। এই পুনর্ম্মিলন হওয়াতে যে, পালস্থ যুবকদিগকে স্থানান্তর যাইতে হইবে, উচ্চৈঃশ্রবা তাহা কখনও ভাবেও নাই। আপনি যে, পুরুষ এবং যুবক, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল, এমন সময়ে প্রকাণ্ড পাঁঠাটা আসিয়া উপস্থিত হইল, এটার ঘাড় ষাঁড়ের মত, আর শিং-দুইটাও ভাগলপুরী পাঁঠার মত লম্বা। সে আসিয়াই উচ্চৈঃশ্রবাকে এমন এক তাড়া দিল যে, সে পলাইতে পথ পাইল না। উচ্চৈঃশ্রবা একাই বেদখল হইল না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে দশরথ ও তাহাদের এক-বয়সী আরও চারি-পাঁচটা পাঁঠাকে, ঐ আগন্তুক বড় পাঁঠাটা অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিয়া দিল। তাহারা দল বাঁধিয়া একদিকে চলিয়া গেল। বন্য ছাগসমাজের রীতিই এই।

ছাগেদের পুং-শাবকেরা "সাবালক" হইলেই পাল ছাড়িয়া, পরে সংসারে কিরূপে চলিতে হইবে তাহা শিখিবার জন্য, চলিয়া যায়—বালকেরা যেমন স্কুল ছাড়িয়া কলেজে ভর্ত্তি হয়। দল ছাড়িয়া গিয়া, পাঁচ-ছয়-জন সঙ্গী লইয়া, উচ্চৈঃশ্রবা প্রায় চারি-বৎসর এ বনে সে বনে; এ পাহাড়ে, সে পাহাড়ে বেড়াইয়া বেড়াইল। আজ-কাল পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, পিতৃমাতৃক দোষ-গুণ সন্তানে পাইয়া থাকে। কথা ঠিক। উচ্চৈঃশ্রবা মায়ের গুণ পাইয়াছিল, সেই গুণের গুণে সে এই যুবকদলের দলপতি হইল। এই তরুণবয়স্ক পাঁঠাগুলি আইজল-পাহাড়ের ও পাহাড়তলীর নানা চরাণী মাঠে, নানা টিলা-টিকড়ে বেড়াইয়া বেড়াইল। তাহাতে এই উপকার হইল যে, কোন্ স্থানে ভয় আছে, কোথায় নাই; বৎসরের কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে কিরূপ ঘাস পাওয়া যায়; কোন্ পথ ধরিয়া গেলে বিপদ্ ঘটিতে পারে, কোন্ পথ ধরিলে নিরাপদ্ টিকড়ে বা গুহায়, বা অধিত্যকায় যাওয়া যায়, এই সকল বেশ শিখিয়া ফেলিল। সুতরাং ভবিষ্যতে ইহারা বড় বড় পরিবারের কর্ত্তা ও রক্ষক হইবার যোগ্য হইয়া উঠিল। এইরূপ হওয়াই পাহাড়ী ছাগের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আজপর্য্যন্ত উচ্চৈঃশ্রবার একটীও সঙ্গিনী যুটে নাই। সে যে ইচ্ছা করিয়া কাহাকেও বিবাহ করে নাই; তা নয়। কিন্তু কতকগুলি ঘটনার সংযোগে একার্য্যে বাধা পড়িয়া আসিয়াছে, তাই কেবল একা উচ্চৈঃশ্রবা নহে, তাহার দলস্থ সকলেরই গৃহ শূন্য। ইহাতে একপ্রকার ভালই হইয়াছে। কারণ, বনে বনে ভ্রমণ করাতে, তাহার আশ্চর্য্য স্বাভাবিক শক্তিসকল বিলক্ষণ সবল হইয়া উঠিয়াছে। সংসারের বোঝা ঘাড়ে চাপিলে যেমন অনেক যুবকের লেখা-পড়া ভাল অথবা মূলেই হয় না, তেমনি প্রথমযৌবনে প্রণয়ফাঁদে পা দিয়া দলের কর্ত্তা হইয়া পড়িলে, পুং-ছাগদের আবশ্যক শিক্ষালাভ হয় না। বৎসরের পর বৎসর গেল, উচ্চৈঃশ্রবা দেখিতে মনোরম্য হইয়া উঠিল। দশরথ, যে এমন শীর্ণ, সেও ঢ্যাঙ্গা ও সবল হইয়া উঠিল—দেখিতে নিতান্ত মন্দ নয়। এখনও উচ্চৈঃশ্রবা তাহার দুই চথের বালি। সে দুই-একবার গায়ে পড়িয়া উচ্চৈঃশ্রবার সঙ্গে "দুই-এক-হাত লড়িয়াছে," এমন কি, বেচারাকে টিকড়ের উপরহইতে নীচে ফেলিয়া দিবার চেষ্টাও পাইয়াছে, কিন্তু পারে নাই। এই কারণে উচ্চৈঃশ্রবা বিলক্ষণ উত্তম-মধ্যম দিয়াছে। তাই এখন দশরথ উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখিলে দশহাত তফাতে থাকে। কিন্তু উচ্চৈঃশ্রবার রূপ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। সে যখন লাফাইয়া লাফাইয়া পাহাড়ের পাথুরিয়া ঢালু বহিয়া নামে বা টিকড়ে উঠে, তখন দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহার ভূমিতে পা পড়ে না, তাই বলিয়া সে যে ধরাকে সরাখানা দেখে, তাহা নয়; তাহার এমন অভ্যাস হইয়াছে, এবং সে এমন বেগে চলে, যেন উড়িয়া যায়। আর এইরূপে যখন নামে বা উঠে, তখন তাহার পা, ঘাড়, মাথা যেন চলনের তালে তালে নড়িতে ও দুলিতে থাকে। আবার এই সময়ে রৌদ্রে ঘাড়ের ও গায়ের লোম ঝকমক্ করিতে থাকে। সে ওজনে পাঁচ-ছয়-মণের কম নয়, শিংএ পাঁচ-বৎসরের পাঁচটা গোলাকার দাগ রহিয়াছে। কিন্তু দৌড়িবার সময় যেন সোলা। পড়িয়া মরিবার ভয় উহার নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উচ্চৈঃশ্রবার দলের কোনটারই আজও বিবাহ হয় নাই। সবগুলির শিং একরকম নহে, রকম রকম। কোন ছেলে বুদ্ধিমান কি বোকা, মুখ দেখিলেই যেমন বেশ জানা যায়, শিং দেখিয়া শৃঙ্গী পশুদেরও সেইপ্রকার পরিচয় অনেকটা পাওয়া যায়। এই দলস্থ কোন কোন পাঁঠার শিং বাঁকিয়া অর্দ্ধচন্দ্রের মত হইয়া আছে; কোনটার শিং খুব মোটা; কোন কোনটার খুবই সরু ও খাড়া। কিন্তু উচ্চৈঃশ্রবার শিং খাড়া ও তীক্ষ্ণ; পূর্ব্বেই বলিয়াছি ত, ভাগলপুরী ছাগলের শিংএর মত। এই শিংএ পাঁচ-বৎসরের পাঁচটা গোলাকার দাগ পড়িয়াছে—প্রথম বৎসরের দাগটা যখন পড়ে, তখন উচ্চৈঃশ্রবা বাচ্চামাত্র; ক্রমে শিং-দুইটা গজাইয়া উঠিলে, মারামারি ঢুঁসাঢুঁসি করিতে বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছিল

পরবৎসর শিং-দুইটী আর একটু লম্বা, আর একটু মোটা হয়; আর দুইবৎসরে আরও মোটা হইলেও খাড়াইতে বাড়ে কম; কিন্তু শেষ বা পঞ্চম বৎসরে ঘাস ও লতা-পাতা এত খাইতে পাইয়াছিল যে, তেমন প্রায় ঘটে না, এই বৎসর কোন পীড়া না হওয়াতে উচ্চৈঃশ্রবা

বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিয়াছিল। শিং-দুইটাও খুব বাড়িয়াছিল বটে, কিন্তু বেশি মোটা হওয়াতে খাড়াই বেশি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ফলে দলস্থ সকল ছাগলের শিংএর অপেক্ষা উচ্চৈঃশ্রবার শিং দীর্ঘ, মোটা, সবল ও সুন্দর।

উহার চক্ষু-দুইটীও বড় সুন্দর—ভ্রূ-দুইটী বিলক্ষণ পুরু ও উচ্চ। চক্ষুর নীচেকার পাতার নীচে গালের সলোম মাংসও বিলক্ষণ পুরু ও উচ্চ; এই দুই মাংসখণ্ডের মধ্যস্থলে যত্নের ধন চক্ষু-দুইটী রহিয়াছে। উচ্চৈঃশ্রবা যখন বাচ্চা ছিল, তখন উহার চক্ষু ঘন পিঙ্গলবর্ণ ছিল; যখন একবৎসরের, তখন পীতমিশ্রিত পিঙ্গলবর্ণ; এক্ষণে যৌবনকাল,—না, যৌবনের আরম্ভ, এখন উহার চক্ষু-দুইটী যেন সোনার দুইটী বর্ত্তুল—বিলক্ষণ পালিশ করা, অথবা যেন সোনালী রংএর দুইটী হীরা; দুইটীরই মধ্যস্থলে দীর্ঘাকার কৃষ্ণবর্ণ

মাণিক চক্‌মক্‌ করিতেছে—মাণিকের মত স্বচ্ছ ঐ দাগে এই সুন্দর বিশ্বের নানা পদার্থের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা মস্তিষ্কে নীত হইয়া দর্শনজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়।

প্রাণীমাত্রেরই পক্ষে সকল কার্য্যে আমিত্বের অনুভব বড়ই আনন্দের বিষয়। আবার "আমি" যখন সম্বন্ধকারকে "আমার" হয়, তখন আমার রূপ, আমার গুণ, আমার বল-বীর্য্য বড় আনন্দদায়ক হয়। আমোদার্থে যুদ্ধং দেহি বলিয়া, সঙ্গীদিগের সঙ্গে সখের যুদ্ধে সবল, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অঙ্গসকলের চালনা করিতে উচ্চৈঃশ্রবার বড়ই আমোদ হয়। পাহাড়ের অনেকস্থলে, প্রশস্ত-অপ্রশস্ত ঝর্ণা বহিয়া যায়। গভীর ঝর্ণার এক-তীরের উচ্চ পাথরে টপ্‌ করিয়া উঠিয়া, অপর-তীরস্থ পাথরের উপর উচ্চৈঃশ্রবা একলাফে গিয়া পড়ে। এক পাথরহইতে অপর পাথর কত দূর, তাহা ঠিক আন্দাজ করিয়া লয়, একটু উনিশ-বিশ হয় না। এই ভয়ঙ্কর লাফালাফি সে বড় ভালবাসে। চিতাবাঘ দেখিলে ইচ্ছা করিয়া কাছে যায়; এমন ভাণ করে, যেন আর পলাইবার শক্তি নাই। বাঘ যেই লম্ফদিয়া আসিবার উপক্রম করে, সে অমনি লম্ফদিয়া, বিদ্যুৎ-বেগে পাহাড়ের উব্‌ড়ো-খুব্‌ড়ো গা বহিয়া, আঁকা-বাঁকা-ভাবে দৌড়িয়া অদৃশ্য হয়। আবার বন্য কুকুরের পাল দেখিলে, ধরা দেয় দেয় করিয়া, পাহাড়ের গোড়ার দিকে ধায়; কুকুরেরা পিছনে তাড়া করিতে করিতে যায়, অবশেষে উচ্চৈঃশ্রবা হঠাৎ গা ঢাকা দেয়। কুকুরগুলি অবাক্‌ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এইপ্রকার দুঃসাহসের খেলায় উচ্চৈঃশ্রবার ভারী আমোদ হয়, আর ইহা সে বড়ই গৌরবের বিষয় মনে করে। আপনার বলবিক্রম ও বীরভাবে তাহার দেহের সৌন্দর্য্য বিশেষ প্রকাশ পায়; আর সে ইহা মনে মনে অনুভবও করিয়া থাকে। ইহার উপর, এখন উচ্চৈঃশ্রবার চেহারা বড়ই চমৎকার। যথেষ্ট বল ও শক্তির গুমরে মাতিয়া সে পাহাড়ের গায়ে, শৈলের উপরে, যেখানে সেখানে দৌড়িয়া ও ফড়িঙের মত লাফাইয়া বেড়ায়; তিন-চারি-হাত চওড়া ঝর্ণা বা ছড়া একলাফে ডিঙ্গাইয়া যায়; দায়ে পড়িয়া নহে, কেবল আমোদের জন্য সে এই করিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে, উপত্যকায় উপত্যকায়, নদীর ধারে, শাল-বনে, কাঞ্চন-গাছের তলায় কি যেন খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়ায়—তাহা যে কি, সে জানে না, মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারে না; কিন্তু দেখিলে, হাতে পাইলে, চিনিয়া ফেলিবে, আপনার বলিয়া আপনার করিয়া লইবে। আপনার দলস্থ সকল যুবককে লইয়া, সে দূরে গিয়া পড়িল, এইখানে গন্ধ শুঁকিয়া টের পাইল যে, একদিক্‌হইতে একদল ছাগল অন্যদিকে গিয়াছে। সেই গন্ধ ধরিয়া, সেই দলের অন্বেষণে সকলে চলিল। ক্রোশ-দেড়েক পথ গিয়া দেখিতে পাইল, দূরে একদল মাদী-ছাগল চরিতেছে। নিজ দল লইয়া উচ্চৈঃশ্রবা যেই কাছে গেল, ছাগীরা, উহাদিগকে দেখিতে পাইয়া, দৌড়িয়া পলাইবার চেষ্টা পাইল; যাইতে যাইতে কিন্তু এক-এক-বার উহাদের পানে ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। সম্মুখে খাড়া টিকড়, কাজেই আর যাইতে পারিল না, দাঁড়াইয়া গেল। দাঁড়াইয়া একটা অপরটার আড়ালে মুখ লুকাইতে লাগিল। পাঁঠারা নিকটে আসিয়া পড়িলে "কাঁচা-পাকা" দেখা প্রথমে হইল, পরে তাহাদিগকে আরও কাছে আসিতে দেওয়া হইল।

আসাম "বল্লালবর্জ্জিত" দেশ, সুতরাং বল্লালী কৌলীন্য-প্রথা বন্য ছাগ-সমাজে ত নাই, হস্তী, মহিষাদি অনেক পশুসমাজেও প্রচলিত নাই। তা যাউক, এখন ছাগসমাজের কথা হইতেছে। এ সমাজে যে পাঁঠাটা রূপে, বলে, সাহসে, বুদ্ধি-বিবেচনায়, সকলের শ্রেষ্ঠ, সেই কুলীন, মাদী-পালের সমস্ত ছাগী তাহার। যদি আর কোন পাঁঠা দাবীদার হয়, অমনি যুদ্ধং দেহি বলিয়া তাহার সহিত ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দেয়। এতকাল উচ্চৈঃশ্রবা সঙ্গীদের সঙ্গে সদ্ভাবে চরিয়া বেড়াইয়াছে, আজ সে ভ্রাতৃভাব পলাইয়া গেল। এক্ষণে ছাগসুন্দরীগণের দৃষ্টিগোচরে মহাপরাক্রমশালী উচ্চৈঃশ্রবা যেই "আয়, দে রণ" বলিয়া বুক ঠুকিয়া দাঁড়াইল, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, দলস্থ একটা পাঁঠাও তাহার দাবির বিরুদ্ধে কোন ভাবভঙ্গী করিল না, বা যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল না। কাজেই বিনা যুদ্ধে উচ্চৈঃশ্রবা ভরতপুরের কেল্লায় দখল পাইল। সঙ্গীরা উচ্চবাচ্য না করিয়া, বরং তাহার বাহাদুরী দেখিয়া, মনে মনে "তারিফ্‌" করিতে লাগিল।

লোকে বলে, জন্তুসমাজে রূপ এবং বলবিক্রম বড়ই আদরের জিনিস,—"ত্রিধাকুল লক্ষণং"-কথাটা ঠিক বটে; আর এই কারণেই উচ্চৈঃশ্রবা আপন দলে "মুখ্য-কুলীন"-রূপে মান্য, গণ্য, এবং আদৃত। কারণ এ দলে উহার মত বলশালী, সুঠাম, সাহসী পাঁঠা দুটী নাই। আর তাহার বলবিক্রম, আকারপ্রকার, সুতীক্ষ্ণ, সুডৌল শৃঙ্গ, এবং দীর্ঘ কর্ণ দেখিয়া, প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী ছাগীরা "আপনা ভুলিয়া" তাহার প্রেমে মজিল।

পরদিন, "বাসি বিয়ার" দিন দুইটা পাঁঠা দেখা দিল, খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক করিয়া, খুব কাছে আসিল। একটা পাঁঠা খুব বড়, উচ্চৈঃশ্রবারই মত হৃষ্টপুষ্ট, কিন্তু শিংদুইটা ছোট; অপরটা সেই দশরথ বা ?—বা কেন, দশরথই বটে। নূতনটা মাটীতে সম্মুখের পা ঠুকিয়া নাক-মুখ বাঁকাইয়া যেন যুদ্ধং দেহি বলিয়া অগ্রসর হইল, তাহার ভাব এই, আমি তোমার চেয়ে ভাল "কুলীন"; তোমাকে বাসর-ঘরহইতে তাড়াইয়া দিতে আসিয়াছি।

উহার আস্ফালন দেখিয়া রাগে উচ্চৈঃশ্রবার চক্ষু-দুইটা লাল হইল। সে সদর্পে ঘাড় বাঁকাইল। ক্রুদ্ধ ঘোড়ার মত থুৎনী তুলিল, নামাইল, মাথা নাড়িয়া শিং-দুইটা ডাহিনে বামে হেলাইল, কাণ-দুইটা নাড়াইল; এই সকল করিয়া যুদ্ধ দিতে অগ্রসর হইল। শত্রুও কুঁদিয়া আসিল। দুইটার মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হওয়াতে খটাস্‌ করিয়া শব্দ হইল। কিন্তু পাঁঠাটা একটু উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়াছিল, তাই কেহ সেটাকে হটাইতে পারিল না। বরং এটা একটু হটিল। (ক্রমশঃ।)

বালক

১ম বর্ষ।] জুলাই, ১৯১২। [৭ম সংখ্যা।

কনানার বল্লম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আল্লা ও আরবদেশের অনুরোধে।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাদা উটের গলায় চপেটাঘাত করিতে করিতে বলিল, "কনানা, এই যে আমাদের কনানা!" আদরের ধন সাদা উষ্ট্রের এই চপেটাঘাত ভাল লাগিল না, আপনার অসন্তোষ-প্রকাশ করিতে লাগিল, এক পদও অগ্রসর হইল না।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবার ডাকিল, "কনানা, কনানা, ও কনানা।" আর দেখিতে পাইল, কালো উট অনেকটা দূরে গিয়াছে, অন্ধকারে চক্ষুর অগোচর হয় হয় হইয়াছে। কিন্তু কনানা মেষচারণের পাঁচনী-দিয়া, উত্তরদিক্ দেখাইয়া দিলেন, একটী কথাও কহিলেন না।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিলেন, "আমাকে ছাড়িয়া এরূপে উহার চলিয়া যাওয়া ভাল হইল না। রাস্তায় কত ভয়-ভীতি আছে, অথচ উহার সঙ্গে পাঁচনী-ছাড়া আর কোন অস্ত্র নাই।"

সাদা উট বড় ধীরে ধীরে অনিচ্ছা-পূর্ব্বক পা ফেলিতেছিল, তাই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খুব জোরে উটকে মারিলেন; এদিকে, শাদা উটের ভাল করিয়া গন্তব্য পথ ধরিবার আগেই কৃষ্ণবর্ণ উট কনানাকে লইয়া রাত্রিকালের অন্ধকারে মিশাইয়া যাইতে লাগিল।

"পা চালাইয়া চল," বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবার সাদা উটকে প্রহার করিলেন, উটও আর একটু ঘন ঘন পা ফেলিতে লাগিল। কিন্তু এপ্রকার মার্-ধর্ ভাল না লাগাতে বড় বেশি অগ্রসর হইতে পারিল না।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চক্ষু অদৃশ্যমান কনিষ্ঠ ভ্রাতার দিকে। এখন আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। কেবল দেখিতে পাইলেন, কনানা বিস্তারিত হস্তে পাঁচনী ধরিয়া উত্তরদিক্ লক্ষ্য করিতেছেন। মুহূর্ত্ত-মধ্যে কনানা রজনীর অন্ধকারে একবারে অদৃশ্য হইলেন।

একঘণ্টাকাল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনানার অনুসরণ-চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিলেন যে, প্রথমেই প্রহার করাতে উট বিরক্ত হইয়াছে, কাজেই কনানার হাতে যেমন জোরে চলিয়াছে, তেমন জোরে চলিতে চাহে না।

কালো উটের লাগাইল ধরা অসাধ্য দেখিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিতান্ত নিরাশ হইয়া ক্ষান্ত হইলেন, এবং উত্তরমুখে উষ্ট্র চালাইয়া দিলেন

মক্কাহইতে পারস্যদেশে যাইবার যে প্রধান রাজপথ, কনানা সেই পথ ধরিয়া চলিলেন। বৎসরের মধ্যে কোন কোন সময়ে এই পথদিয়া অনবরত লোক গমনাগমন করে। কিন্তু, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে, গ্রীষ্মকালে এই মরুক্ষেত্রদিয়া লোক চলাচল করে না।

বর্ষাকালে এই মরুভূমির এখানে সেখানে নীচু স্থানে জল জমিয়া ডোবার মত হইয়া থাকে; পরে পথের ধারে ধারে, ঘাস গজাইয়া উঠে, কোন কোন তৃণক্ষেত্র দুইতিনক্রোশব্যাপী।

ক্রমে ক্রমে সেই সকল ঘাস মরিয়া যায়। কাজেই কনানার গমনপথে তৃণমাত্র ছিল না। আবার পাহাড়গুলির ঝর্ণা বা ইন্দারার আশপাশে যে সকল হরিদ্বর্ণ তৃণলতা থাকে, গ্রীষ্মপ্রযুক্ত সে সকল শুকাইয়া যায়।

একাকী পথ চলাতে এবং পথে লোকজন দেখিতে না পাওয়াতে কনানার উৎসাহ ভঙ্গ হইল না। কাহারও সঙ্গে, বিশেষতঃ যাহারা এই সময়ে মরুভূমিদিয়া চলে, এমন লোকের সঙ্গে, দেখা হয়, কনানার এরূপ ইচ্ছা ছিল না।

দূরে, অতি দূরে, লোকজনের ছায়া দেখিলেই কনানা পাশ

কাটাইয়া, একধারে গিয়া, উটকে শোয়াইয়া, খানিকক্ষণ থাকেন, লোকেরা চলিয়া গেলে, তবে পথ চলিতে আরম্ভ করেন।

কালো উট এখনও অক্লান্ত, বেদুইন-বালক কনানা বেশ জানিতেন যে, এই বেলা যতটা পারা যায়, জোরে চালাইয়া যাওয়া আবশ্যক। কিন্তু আল্লার অনুরোধে, আরবদেশের মঙ্গল-উদ্দেশ্যে তাঁহাকে এই উটে চড়িয়া মরুভূমি পার হইয়া আসিতে হইয়াছে, সুতরাং এই কার্য্য সিদ্ধ করিতে হইলে নিজের বা উটের প্রাণের মায়া করিলে চলিবে না। তাই কনানা স্থির করিলেন, যত শীঘ্র পারি, প্রাণপণে পথ চলিতে হইবে।

কারাভানের বিশ্রাম করিবার জন্য যে সকল স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, কনানা সে সকলের দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন না। কেবল এক-এক-রাত্রে দুই-দুইটা বিশ্রাম-স্থান ছাড়াইয়া গেলে, যখন উট নিতান্ত অপারগ হয়, তখন বিশ্রাম করেন।

তাও বলি, প্রতিদিন সকাল-বেলা, সূর্য্য উদয়াচল ছাড়াইয়া আকাশপথে অনেকটা অগ্রসর হইলে, তবে কনানা থামিয়া বিশ্রাম করেন; আবার, অপরাহ্নে কতকটা বেলা থাকিতে থাকিতে অস্তগামী সূর্য্যের ছায়া ধরিয়া যাত্রা আরম্ভ করেন।

ক্রমেই কালো উষ্ট্র কাতর হইয়া পড়িতে লাগিল। দ্বাদশ-রাত্রি পথ চলিবার পর কালিফের আদরের উষ্ট্র পূর্ব্ব-শ্রী হারাইয়া বসিল। ফকিরেরা চোরকে ভয় করে না, কনানারও ভয় নাই; দস্যুর কারাভান আসিতে দেখিলেও এখন আর কনানা ভয়ে সরিয়া যান না। কারণ কৃষ্ণউষ্ট্রের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, এখন আর এটাকে কেহ কাড়িয়া লইয়া যাইবে না।

বেদুইন-বালক যে কনানা, তিনিও ক্লান্ত ও শীর্ণ হইয়া পড়িলেন। কয়েক-দিন ধরিয়া পান করিবার জন্য জল পাওয়া যায় নাই—এই মরুভূমিতে এক-প্রকার দ্রাক্ষালতা জন্মে, এই লতার কাঁটা-ভরা পাতা চিবাইয়া রস খাইয়া কতকটা তৃষ্ণা-নিবারণ করিতে হইয়াছে। এই তপ্ত বালুকাময় মরুতে এই দ্রাক্ষা-ছাড়া আর কোনপ্রকার ঘাস বা লতা জন্মে না। বৎসরের এই সময়ে শিশির পড়ে না। কনানা বুঝিতে পারিলেন, জল না পাওয়া গেলে আর বেশিক্ষণ পথ চলিতে পারা যাইবে না।

রাত্রি প্রভাত হইল—যতদূর চক্ষু গেল, জল বা গাছপালা, বা কোন প্রাণী চখে পড়িল না। বেলা হইল—মনুষ্যের মুখ দেখিবার জন্য কনানা আগ্রহসহকারে এদিক্-ওদিক্ কাতর-দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আগে কিন্তু মানুষ আসিতে যাইতে দেখিলে কনানা ভয়ে সাবধান হইতেন।

পথের দুইধারে বালুকাময় মরুতে কেবল মানুষের ও পশুর অস্থি ছড়াইয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাইলেন। এই সকল দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি এখনও বাশ্‌রার পথেই আছেন।

আরবদেশের অগ্নিকুণ্ডবৎ সূর্য্য ধূসর-বর্ণ আকাশহইতে বাহির হইয়া, বারিশূন্য তপ্ত আকাশে উঠিল, পশ্চাতে ধূম্র-বর্ণ মেঘরাশি রহিল—কিন্তু এই মেঘমালাহইতে কখনও বৃষ্টিপাত হয় না।

কনানা প্রাতঃকালীন নামাজ পড়িবার জন্য একটু থামিলেন, নামাজ পড়া শেষ হইলে, তিনি নিজের জন্য এই প্রার্থনা করিলেন, "হে আল্লা, আমাদের জল দেও, জল দেও।"

যাত্রা করিবার পরহইতে প্রতিদিনই উত্তাপ অতিশয় প্রখর হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু আজ ভারী গরম, বালি এমন গরম হইয়াছে যে, ধান ফেলিয়া দিলে খই হয়।

কনানা আবার উষ্ট্রে চড়িয়া যাত্রা করিলেন;—একমনে সূর্য্য-কিরণে উজ্জ্বল বালুকারাশির প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিলেন, কোন জীবিত প্রাণী বা বৃক্ষলতা বা কোন কিছুর ছায়া পর্য্যন্ত চখে পড়িল না।

বহুদূরব্যাপিনী মরীচিকা দেখিতে পাওয়া গেল বটে, কিন্তু বালুকাময়ী মরুভূমি দেখিতে দেখিতে কনানার চক্ষু এমন হইয়াছে যে, মরীচিকা দেখিয়া আর ভুলিতে পারে না।

সুদূর আকাশে নগরসকল, নগরের অট্টালিকার সুন্দর সুন্দর গম্বুজ ও চূড়া দেখিতে পাওয়া গেল; তেমন নগর, অট্টালিকা ও গম্বুজ সমগ্র আরবদেশের কুত্রাপি নাই। ঘণ্টার শব্দ শুনিতে পাইলেন, সে শব্দ থামিলে যেন "মুয়েজ্জিনের" "ওয়াজ" শুনিতে পাইলেন। (নামাজের সময় হইলে মস্‌জিদে ওয়াজ-দ্বারা সকলকে জানান হয়)। আবার যেন ঘণ্টা বাজিল, "জল, জল; হে আল্লা, জল দেও"—কনানা অস্ফুটস্বরে এই প্রার্থনা করিলেন।

শ্রান্ত উষ্ট্রকে আর জোরে চালাইতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, ধীরে ধীরে চালাইলে বরং বেচারা কতকটা পথ চলিতে পারিবে, কিন্তু জোরে চালাইলে এখনই ধুপ্ করিয়া বালিতে পড়িয়া যাইবে। চলিতে চলিতে ক্লান্ত উষ্ট্রটার গলা ঝুলিয়া পড়াতে নাক প্রায় মাটীতে ঠেকিতে লাগিল। তবু সে পথ চলিতেই থাকিল—কিন্তু ধীরে ধীরে।

অনেকটা বেলা হইল, অন্যান্য দিন ইহার আগেই কনানা বিশ্রাম করিবার জন্য থামেন, কিন্তু আজ তিনি ও কৃষ্ণবর্ণ উট, উভয়েই যেন বিশ্রামের বিষয় ভুলিয়া গিয়াছেন। থামিলে জল পাওয়া যাইবে না, বেদুইন-বালক কনানা বিলক্ষণ জানেন যে, মরুভূমির বালিতে আজি পড়িয়া থাকিলে আর কখনও উঠিতে হইবে না।

উটও তা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই বেচারা ধীরে ধীরে আপনি চলিতে লাগিল, কনানাকে একটী কথাও বলিতে হইল না। বেচারার মাথাটী ঝুলিয়া পড়িয়াছে, নাকটা বালিতে ঠেকে ঠেকে হইয়াছে; সেও যেন মিনতি করিয়া বলিতেছে, "জল, জল; হে আল্লা, জল দেও।"

উটের চক্ষু-দুইটী মুদিত; পাগুলি বেচারা অতি কষ্টে টানিয়া টানিয়া তুলিতেছে, আর ফেলিতেছে। কনানা আর তাহাকে চালাইতেছেন না, যেদিকে ইচ্ছা, উট আপনি যাইতেছে, কখনও সেটা শৈলের উপর দিয়া যায়, কনানা বারণ করেন না; তিনি কেবল উটের পৃষ্ঠে দুলিতেছেন, শৈলের উপর একবার আর একটু হইলে পড়িয়া যাইতেন, এমন হইয়াছিল।

কনানাকেও অতি কষ্টে চক্ষু মেলিয়া রাখিতে হইল। মরুভূমিতে প্রতিফলিত সূর্য্যকিরণ এমন প্রখর যে, চক্ষু যেন ঝলসিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সাবধানে দেখিয়া না চলিলে প্রাণরক্ষা হইবে না।

তিনি এ বিপদ্‌কালে তন্দ্রা এড়াইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তন্দ্রাবেশে তাঁহার মাথা ঢুলিতে ঢুলিতে একবার এ কাঁধে, একবার ও কাঁধে পড়িতে লাগিল। তিনি এমন ক্লান্ত, ও তৃষ্ণায় এমন অবশাঙ্গ হইয়াছিলেন যে, কালিফের পত্র সঙ্গে না থাকিলে, উটের উপরহইতে নামিয়া পড়িয়া বালুসমুদ্রে অকাতরে ঝাঁপ দিয়া মরিতেন। পুনঃপুনঃ বুকে হাতদিয়া পত্রখানি স্পর্শ করত উৎসাহ সংগ্রহ করিতে এবং "আল্লার কৃপায় এ পত্র যথাস্থানে পঁহুছাইয়া দিবই দিব" এই কথা অস্ফুটস্বরে কহিতে লাগিলেন। এক একবার এইভাবে উত্তেজিত হইয়া, কনানা হাত দিয়া সূর্য্যের উত্তাপ হইতে চক্ষু আড়াল করিয়া, সম্মুখস্থ বালুকা-ক্ষেত্রের প্রতি একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু বালুকাভূমিতে যে সকল সামান্য তৃণ লতা জন্মিয়া থাকে, তাহা-ছাড়া আর কিছুই চখে পড়িল না।—কোন কিছুর ছায়াও না—কেবল দেখিলেন, শাদা বালুকা-ক্ষেত্র আকাশপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া ধূ ধূ করিতেছে।

তাঁহার মাথার উপর উত্তপ্ত আকাশ কৃষ্ণ-বর্ণ হইয়া আসিল। বাহন উষ্ট্রটীর যে জীবন আছে, এমন বোধ হইল না। বোধ হইল, তিনি যেন দেশের শস্যক্ষেত্রে মাচায় বসিয়া আছেন। সূর্য্যের কিরণ যেন মাথায় শীতল বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার দেহ যেন ঠাণ্ডা লাগিয়া থর্ থর্ করিতে লাগিল, অজ্ঞাতসারে পাগড়ির আঁচল-দিয়া মুখ ঢাকিলেন। বোধ হইল, এ যেন সেই হোরেব-পর্ব্বতের তলদেশ, আর উষাকাল, ঠাণ্ডা লাগিবে, আশ্চর্য্য কি! আবার যেন সেই পর্ব্বতীর নীলবর্ণ বন্য ফুল দেখিতে পাইলেন। আর সেই লতা-পাতাময় স্থানদিয়া যেন পর্ব্বতের ঝর্ণা মধুর তর্‌তর্-শব্দে বহিতেলাগিল।

তিনি চমকিয়া উঠিলেন। কেন এমন করিয়া উঠিলেন। ডাকাইত আসিতে দেখিয়া? তিনি জোরে গা-ঝাড়া দিলেন, তবে কি ঘুমাইতেছিলেন? তিনি দাঁড়াইবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না; পা-দুইখানি যেন কিছুতে আটকিয়া গিয়াছে।

অবশেষে তাঁহার মুদ্রিত চক্ষু-দুইটী আপনি মেলিয়া গেল, চেতনাও ফিরিয়া আসিল। উষ্ট্র মাটীতে পড়িয়া আছে—একটা জলশূন্য, শুষ্ক কূপের ধারে।

কনানা অতিকষ্টে দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া নীচের দিকে তাকাইলেন, কূপটা নিতান্ত শুষ্ক—যে বালিতে দাঁড়াইয়াছেন, সেই বালির মত শুষ্ক।

উষ্ট্রের দিকে চাহিয়া দেখেন, বেচারার চক্ষু মুদ্রিত, কূপের শানের উপর মাথাটী, আর গলাটী বালিতে।

কনানা বলিলেন, "তুমি আল্লা ও আরবদেশের জন্য প্রাণ দিলে! নবী যখন সগৌরবে আবার আসিবেন, তখন তোমাকে মনে করিবেন।"

যে থলিতে উটের খাদ্য ছিল, তাহা লইয়া, উটের সম্মুখে সমস্ত ঢালিয়া দিলেন। অনন্তর গদিটা খুলিয়া লইয়া একপাশে রাখিয়া দিলেন। এই যে বেচারা এত পথ কনানাকে বহিয়া আনিয়াছিল, তাহার উপকারার্থ তিনি, সুযোগ ও সুবিধা নাই তাই, ইহার বেশী আর কিছু করিতে পারিলেন না।

এমন সময়ে, অকস্মাৎ আকাশ-পানে চক্ষু পড়িল, দেখিতে পাইলেন, সূর্য্য অস্তগমন করিতেছে, সমস্ত দিন তিনি ঘুমাইয়াছেন, আর উট বেচারা হামাগুড়ি দিতে দিতে কূপের কাছে আসিয়াছে। এ নিদ্রা স্বাভাবিক নিদ্রা না হইলেও, ইহাতে করিয়া তাঁহার শ্রান্তি কতকটা দূর হইল। এবং ধড়্‌ফড়্ করিয়া জাগিয়া উঠিয়া, উটের জন্য এতটা শ্রম করাতে তাঁহার জিহ্বা আর ততটা নীরস বোধ হইল না। অমনি একমুষ্টি গোম লইয়া জোরে চিবাইতে লাগিলেন। এইরূপে, বালুকাসমুদ্রে জলাভাবে কণ্ঠ শুষ্ক হইলে, অনেক বেদুইন গোম চিবাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকে। এ কথা কনানার জানা ছিল।

গোম চিবাইতে চিবাইতে, গদিটাতে হেলান দিয়া, অস্তগামী সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া কনানা ক্ষণকাল রহিলেন। মনে নানা চিন্তা।

কনানা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "তের দিন! যাত্রাকালে বলিয়াছিলাম চৌদ্দ দিন লাগিবে, কিন্তু আমরা দুই-দুই-দিনে তিন-তিন-দিনেরও বেশী পথ চলিয়াছি। আজ না থামিলে বাশ্‌রা এই কূপহইতে একরাত্রির পথ থাকিত। হে আল্লা! মহম্মদ রসুল ইল্ আল্লা! আজিকার রাত্রিটা এ দাসকে বাঁচাইয়া রাখ।"

উট যেখানে ছিল, সেই খানেই পড়িয়া রহিয়াছে, দানা-ঘাস দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বেচারা স্পর্শ করে নাই, গলাও বাড়ায় নাই। সুতরাং উহার দ্বারা এখন আর উপকার হইতে পারে না। কনানা মুহূর্ত্ত-কাল বেচারার পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন, উহার স্পন্দরহিত মস্তকে কৃতজ্ঞতাসহ আপন হাত বুলাইলেন, অনন্তর পাচনী হাতে করিয়া যাত্রা করিলেন।

কনানা পথ চলিতে লাগিলেন, কখনও নিদ্রিত অবস্থায়, কখনও
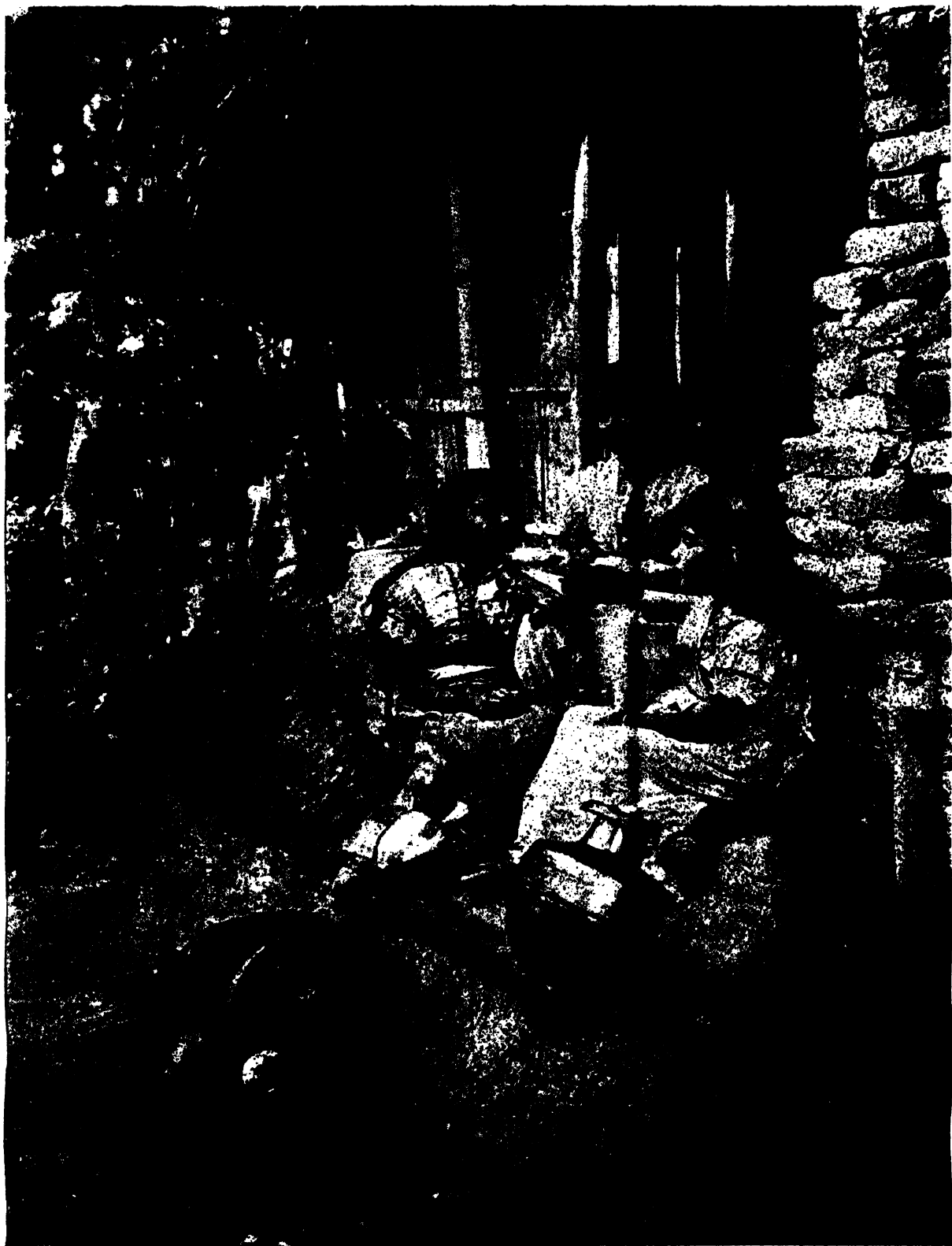
Photo by C. P. Last.

এক অন্ধবালিকা একটি গল্প বলিতেছে।

জাগ্রৎ অবস্থায়, কখনও ভাবেন, তিনি যেন বাশ্‌রার বালুকাময়ী মরুভূমিহইতে ঢের দূরে রহিয়াছেন, কখনও বোধ হয়, খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন,—এইরূপে ক্রমাগত পথ চলিতেই থাকিলেন।

কখন কখন মনে হইল, যেন একটুও ক্লান্ত হন নাই, ইচ্ছা খুব জোরে চলেন। কখন কখন আবার বোধ হইতে লাগিল, যেন পা আর চলে না। এক-এক-সময়ে তাঁহার বোধ হইল, যেন কারাভান্ অপেক্ষাও দ্রুত পথ চলিতেছেন, রাত্রি-প্রভাতের আগেই বাশ্‌রা-সহরে পঁহুছিতে পারিবেন। আবার মনে হইল, পা-দুই-খানি আর এ দেহের ভার বহিতে পারিবে না—কালো উটের ন্যায় তাঁহার ক্লান্ত দেহ পথে পড়িয়া থাকিবে, কেবল তাঁহার আত্মা-পুরুষ-মাত্র বাশ্‌রায় পঁহুছিবে।

মনে এরূপ চিন্তার যেই উদয় হয়, অমনি কালিফের পত্রখানি বুকে চাপিয়া ধরেন, আর মনে মনে বলেন, "আল্লার সাহায্যে আমি এ পত্র পঁহুছাইয়া দিবই দিব।" এইপ্রকারে তিনি যেন অমানুষিক শক্তিপ্রভাবে দ্রুতপদে অবিরত চলিতে লাগিলেন, নিজে কিন্তু টের পাইলেন না।

এমন সময়ে, বহু দূরে, পূর্ব্বদিকে অতি ক্ষুদ্র আলোক দেখিতে পাওয়া গেল। ক্রমে এই আলোক বড় হইয়া উঠিল, অবশেষে মেঘমালার উপরে অতি ঈষৎ চন্দ্রালোক দৃষ্ট হইল।

আরবদিগের পক্ষে এইটী একটী সুলক্ষণ, কনানা তাই আনন্দে উচ্চরব করিলেন।

অনন্তর বায়ু শীতলবোধ হইতে লাগিল। উষার আগমনের পূর্ব্বে যে অন্ধকার-রাশি দেখা যায়, সেই অন্ধকারে পৃথিবী ছাইল, আর আকাশে ক্ষীণকায় চন্দ্র থাকাতে মেদিনী আরও অদৃশ্য হইল।

পথে কোন লোকের সঙ্গে দেখা হইবার উপক্রম হইলে পূর্ব্বে কনানার ভয় হইত,—সে ভয় অনেক দিন কনানাকে ছাড়িয়া পলাইয়াছে। আগে ভয় হইত, শেষে ভাবিতেন, কাহারও সঙ্গে দেখা হইলে ভাল হইত। কিন্তু এখন আর এ বিষয়ে তাঁহার কোন খেয়ালই নাই। তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া পথ ঠিক করিয়া চলেন। কখন কখনও পায়ের দিকে, বালুকা-রাশির প্রতি দৃষ্টি করেন, কিন্তু সম্মুখে, মরুভূমির কোথায় কি, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করেন না।

অকস্মাৎ তাঁহার অন্যমনস্কতা ঘুচিল। সম্মুখে যেন ছায়ার মত কিছু চখে পড়িল। কনানা থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন, এবং কপালে চখের উপর হাত রাখিয়া একমনে সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

তিনি ভাবিলেন, "এ ত বালুকাভূমির গাছপালা নহে। এ যে ঢের উচ্চে। এ ত বাশ্‌রা-সহরও নয়। সহরের বাড়ী-ঘর ঢের উচ্চ। কারাভানও নয়। কারাভান হইলে নড়িত, চলিত। এ ছায়ার ত আগাগোড়া ঠাওর হয় না।" এই বলিয়া ডাহিনে বামে দৃষ্টি করিতে করিতে চলিলেন।

একটু পরে কহিলেন, "তাই ত, এ যে তাম্বু।" আন্তরিক ভাবনায় তাঁহার কপোল-দেশ কুঞ্চিত হইল। ভাবিলেন, "তবে কি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি! বাশ্‌রার এত কাছে কোন জাতীয় এত আরব এমন করিয়া তাম্বু খাটাইয়া থাকিবে না। যদি ফিরি, মরণ নিশ্চিত। আর যদি অগ্রসর হই—লা ইল্লা—হা—ইল্ আল্লা।" এই বলিয়া তিনি সাহসে বুক বাঁধিয়া আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন।

কিছু দূর অগ্রসর হইলে, প্রকাণ্ড শিবিরে রাত্রিকালে মানুষের যেপ্রকার অনুচ্চ কলরব হয়, সেইপ্রকার কলরব তিনি স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। কিন্তু থামিলেন না, অগ্রসর হইতেই লাগিলেন।

নিকটে আসিয়া, বেদুইন-শিবিরের কাছে কেহ আসিলে, যেপ্রকার অভিবাদন বা "সেলামালকি" করিতে হয়, কনানা শিবিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তেমনি অভিবাদন করিলেন।

শিবিরস্থ কেহ যেন ত্বরায় জাগিয়া উঠিয়া, অন্ধকারমধ্যে তাঁহার অভিবাদনের উত্তর দিল।

তখন কনানা কহিলেন, "আমি আপনার লোকজনহইতে এই মরুভূমিতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আমার কেহ নাই।"

কেহ উত্তর করিল, "তুমি যদি আল্লার ও আরবদেশের জন্য বল্লম ধরিতে পার, অজেয় কাহ্লেদের শিবিরে তোমার অনাদর হইবে না।"

কনানা অমনি বলিয়া উঠিলেন, "লা ইল্লাহা ইল্ আল্লা। তবে আমায় অবিলম্বে কাহ্লেদের তাম্বুতে লইয়া চল। আমি মহান্ কালিফের নিকটহইতে তাঁহার নামে পত্র লইয়া আসিয়াছি।"

সিপাহী তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। কনানার বোধ হইল, পায়ের নীচে মাটী যেন দুলিতেছে।

আধুনিক সৈনিকরীতি বা মুসলমানদিগের শিষ্টাচার-অনুসারে ভূমিকা না করিয়াই কাহ্লেদকে জাগান হইল। অবিলম্বে মশাল জ্বালান হইল। কনানা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অনন্তর সেনাপতি কাহ্লেদের হাতে অতি যত্নে রক্ষিত পত্রখানি সসম্ভ্রমে দিলেন।

অজেয় কাহ্লেদ পত্রখানি খুলিলেন, কিন্তু তাঁহার একটী কথাও পড়িবার আগেই বেদুইন-বালক অচেতন হইয়া তাম্বুর গালিচার উপর পড়িয়া গেল।

সিপাহী কনানাকে তুলিয়া বসাইল, কনানা একটু চেতনা পাইয়া কহিলেন, "এখানহইতে একরাত্রির পথ দক্ষিণ-পশ্চিম-দিকে একটা জলশূন্য কূপের ধারে আমার কালো উট পিপাসায় মর মর হইয়া পড়িয়া আছে;—আল্লার নামে, সে বেচারার জন্য কিছু জল পাঠাইয়া দেও। সে তেরদিনে আমাকে মক্কাহইতে এখানে আনিয়াছে।"

এই কথা বলিতে বলিতে কনানার চক্ষু নিস্তেজ হইয়া আসিল, মশালের আলো ক্রমে অনুজ্জ্বল বোধ হইল—কনানা বাক্‌রহিত ও অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

(ক্রমশঃ।)

খেল বীরের মত

'খেল্‌তে গেলে বীরের মত
খেলা করা চাই'—
এই কথাটী মনে রেখ,
ভুলোনাক, ভাই!
জয়-পরাজয়, লাভালাভ
ভেবোনাক মনে,
সত্য যাহা, ধরে তাহা
থাক প্রাণ-পণে।
খেলার ধারা যতই কঠোর
হোক্ না কেন, ভাই!
বীরের মত সকল সময়
খেলা করা চাই।

যেখানেই হোক্‌না খেলা,
খেল বীরের মত;
হোক্ না কেন হাজার হার,
সত্য কর ব্রত।
ঠকিয়ে লওয়া, ফাঁকি দেওয়া
তোমায় নাহি সাজে;
বীর যে, সে হাত দেয় না
এমন নীচ কাজে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আঘাত
কাপুরুষেই করে;
তুমি খেল্‌বে বীরের মত
সোজা পথ ধরে'।

জয়-পরাজয় যাই হোক্‌না,
খেল বীরের মত;
বীরের ধর্ম্ম ছেড়োনাক
ঘা খেলেও শত শত
আছাড় খাও, আঘাত পাও,
তাতে দুঃখ নাই,
নীচ চাতুরী, জুয়াচুরী
করনাক, ভাই!
'খেল্‌ছি যখন, খেল্‌তে তখন
হ'বে বীরের মত'—
এই কথাটী মনে তোমার
জাগুক অবিরত।

৪

দাঁড়িয়ে থাক, পড়েই যাও,
মনে রেখ, ভাই!
সব খেলাতেই বীরের মত
খেলা করা চাই।
ক্রিকেট, টেনিস্, হাডুডুডু,
হকি, ফুটবল,
যে খেলাই খেল,—রহ
সত্যে অবিচল।
সকল খেলার সার নিয়ম
রেখ এই মনে,—
'বীরের মত খেল্‌তে হ'বে,
খেলি যা'রি সনে।'

৫

সংসারের কষ্ট যবে
ঝর্‌বে অবিরল,
খেল্‌বে তখন বীরের মত
হৃদে পূরে বল।
নির্ভয়ে চলিয়া যাবে
সোজাসুজি পথে,
মিথ্যার আশ্রয় নাহি
লবে কোন মতে।
লাভালাভ যা'ই হোক
ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই,
বীরের মতন খেলা
খেলে যাওয়া চাই।

ফুট্‌বল।

শিক্ষানবীশদিগের প্রতি সঙ্কেত

এ কথা যদিও সম্ভবতঃ সত্য যে, বড় বড় ফুটবল-খেলোয়াড়দের কেহ শিখাইয়া ভাল খেলোয়াড় করিয়া তুলিতে পারে না, তাঁহারা জন্মাবধিই ঐ রকম একটী শক্তি লইয়া আসেন, তবুও অভ্যাসের গুণে লোকে যে অনেকটা কৃতকার্য্য হইতে পারে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বড় বড় ফুটবল-খেলোয়াড়েরা যখন খেলায় নানা কৌশল দেখাইতে থাকেন, তখন অনেকেই হয়ত মনে করিতে পারেন যে, তাঁহাদের ঐ খেলিবার কায়দাগুলি বুঝি তাঁহাদের প্রকৃতির সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে যদি তাঁহারা একটু ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, অনেক দিন ধরিয়া যত্নের সহিত অনবরত অভ্যাস করার ফলে তাঁহাদের খেলা অমন চমৎকার হইয়াছে। এমন অনেক ছেলে আছে, যাহারা বল্‌টাতে পাএর ঠোকর মারিয়া এদিক-ওদিক ছুড়িয়া ফেলিতে পারিলেই যথেষ্ট আমোদ-বোধ করিয়া থাকে। তাহাদের বড় খেলোয়াড় হইবার তেমন কোন উচ্চাভিলাষ নাই। এ দিকে আবার এমন অনেক ছেলে আছে, যাহারা ফুটবল-খেলায় ভাল খেলোয়াড় হইতে চায়, তাহারা এই খেলা যখন শিখিতে আরম্ভ করিবে, তখন নিম্নলিখিত কএকটি সঙ্কেত পাইলে উপকৃত হইতে পারে।

শিক্ষানবীশের পক্ষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থানে খেলিয়া খেলাটি অভ্যাস করা ভাল। সে কোন্ অবস্থানে খেলিবার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত তাহা বুঝিতে সম্ভবতঃ তাহার কিছু সময় লাগিবে। ধর, কোন একটী দশ-এগার-বছরের ছেলে যদি অন্য অন্য অবস্থানগুলিতেও খেলিবার চেষ্টা না করিয়া স্থির করে যে, সে ফরওয়ার্ডের অবস্থানে খেলিবে, তাহা হইলে সে ভুল করিবে। যদি সে বিভিন্ন অবস্থানে থাকিয়া খেলাটি অভ্যাস করিতে থাকে, তাহা হইলেই সে কোন্ অবস্থানটিতে খেলিতে সর্ব্বাপেক্ষা পারগ, তাহা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিবে।

আর একটি প্রয়োজনীয় কথা এই,—ছেলেদের দুই-পা-দিয়াই বলে "কিক্" করিতে অভ্যাস করা উচিত। অনেক খেলোয়াড় বাঁ-পা-দিয়া বল্ মারিতে পারে না বলিয়া অসুবিধা-ভোগ করিয়া থাকে। যদি আমরা যত্নের সহিত অভ্যাস করি, তাহা হইলে দুই-পা-দিয়া প্রায় সমানভাবে বলে পদাঘাত করিতে পারি। দুই পাএ বল্-মারা অভ্যাস করিলে, খেলিবার সময়ে যে আমাদের খুব সুবিধা হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

ফর্‌ওয়ার্ডের অবস্থানে খেলিতে ইচ্ছা করিলে, আমাদিগের "গোল"-লক্ষ্য করিয়া বল-বিক্ষেপ করা উচিত। "গোল"-লক্ষ্য করিয়া "শূট্" করিবার পূর্ব্বে, "গোল-কীপার" কোথায় দাঁড়াইয়া আছে তাহা একবার ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখা উচিত। একচোক-দিয়া বল্‌টির উপর নজর রাখিতে হইবে, এবং আর এক-চোক-দিয়া প্রতিপক্ষের দিকে দৃষ্টি করিতে হইবে। এই রকম করিলে, খুব সম্ভবতঃ "শূট্" করিয়া "গোল" করা যাইবে। তা' ছাড়া ফর্‌ওয়ার্ড এমনই ভাণ করিতে শিখিবে, যেন সে উদ্যত পাটি-দিয়াই বল্ মারিবে, কিন্তু পরে অপর পা-দিয়া বলে পদাঘাত করিবে; এই রকম করিলে, সে তাহার প্রতিপক্ষকে ঠকাইতে পারিবে। এইরূপে পা বদ্‌লিয়া এবং প্রতিপক্ষ কোথায় দাঁড়াইয়া আছে তাহা দেখিয়া যদি "শূট্" করা হয়, তাহা হইলে সফলকাম হইবার সম্ভাবনা থাকে। যদি দেখা যায় যে, "গোল-কীপার" ঝুঁকিয়া আছে, তাহা হইলে এমন উঁচু করিয়া "শূট্" করিতে হইবে, যেন বল্‌টি "গোলপোষ্টের" আড়ার একটু নীচে দিয়া চলিয়া যায়। আর যদি দেখা যায় যে, সে উঁচু বলের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, তাহা হইলে বল্‌টি নীচু করিয়া জোরে "শূট্" করিতে হইবে। এই সমস্ত ব্যাপারে অভ্যাস আবশ্যক হয় এবং অভ্যাসের গুণে খেলোয়াড় পাকা হইয়া উঠে। ফরওয়ার্ড যদি দেখে যে, সে দ্রুত ছুটিতে পারে না, তাহা হইলে তাহার দৌড়ান অভ্যাস করা উচিত, এবং যদি সে দেখে যে, সে বড় মোটা হইয়া পড়িতেছে এবং সেজন্য সে আর আগেকার মত চট্‌পটে থাকিতেছে না, তাহা হইলে তাহার খোরাকের দিকে তাহার সবিশেষ দৃষ্টি রাখা এবং নানারকম ব্যায়াম করিয়া শরীরটিকে ঐ খেলার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া রাখা উচিত। অনেক ছেলে আছে, তাহারা যখন "ম্যাচে" খেলে না, তখন বল্‌টি লক্ষ্যহীনভাবে এদিকে ওদিকে বিক্ষেপ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। কেবল আমোদের জন্য যদি ঐ রকম করা হয়, তাহা হইলে তাহা করা দোষের না হইতে পারে, কিন্তু যদি কেহ উৎকৃষ্ট খেলোয়াড় হইতে চাহে, তাহাহইলে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায়ে বল-বিক্ষেপ করাই তাহার কর্ত্তব্য। কোন একটী জোয়ান প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ছুটিতে কোন কোন ছেলে ভয় পায়। তাহাদের এই কথাটি মনে রাখা উচিত যে, যাহারা চোট্ লাগিবার ভয়ে সর্ব্বদাই অস্থির, তাহাদেরই চোট্ লাগে।

যে ছেলে নির্ভীকভাবে খেলা করে, সেই অক্ষতশরীরে ফিরিয়া আসে। অবিরাম অভ্যাসের গুণে ফুটবল-খেলায় কেহ পারদর্শী হইয়া উঠিলে, তাহার যেন মাথা না ঘুরিয়া যায়। অনেক "টীম" আত্মম্ভরিতা-দোষে মাটী হইয়া গিয়াছে, অনেক ভাল খেলোয়াড় অহঙ্কার করিয়া উচ্ছন্ন গিয়াছে। মনে রাখিও, তুমি ভাল খেল বটে, কিন্তু অনেকে তোমার চেয়েও ভাল খেলেন; তা'ছাড়া বিনীত হওয়া ভাল নয় কি?

বাঘে কুমীরে

বাঘ যে রক্তপিপাসু ও ঝগ্‌ড়াটে জানোয়ার,—অনেক সময়ে আপনাদের মধ্যেই খেয়োখেয়ি করে, তাহা সকলেই জানে; কিন্তু ভারতের নদ-নদীতে এমন একটি জানোয়ার আছে, যে বাঘের সঙ্গে বেশ এক হাত লড়িতে পারে। আমি বড় কুমীরের কথা বলিতেছি,

তাহারা প্রায়ই বাঘগুলার সঙ্গে ঝুটোপুটি লড়াই বাধাইয়া দিয়া শেষে তাহাদের জলে টানিয়া লইয়া ডুবাইয়া মারে। একবার আমি সৌভাগ্যক্রমে বাঘের সঙ্গে কুমীরের এইরকম একটি লড়াই দেখিতে পাইয়াছিলাম।

হরিণ-শিকার করিতে গিয়া ক্লান্ত হইয়া গোদাবরীর তটবর্ত্তী এক ছায়া-শীতল কুঞ্জে একটু বিশ্রাম করিতেছিলাম। বন্দুকটী আমার পাশে রাখিয়া, বোধ করি, আমি একটু ঘুমাইয়াও পড়িয়াছিলাম, হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। বিড়ালের আনন্দ হইলে সে যেমন একরকম অস্ফুট ঘড়ঘড়-শব্দ করিতে থাকে, এ শব্দও তেমনই, তবে বড়ই চড়া। চোক খুলিয়া দেখি, মস্ত একটা বাঘ—পুরা এগার-ফিট্ লম্বা—মাথা নীচু করিয়া, যেন শিকারের পাছু ধরিয়াছে এমনই ভাবে, একটা ডোবারদিকে যাইতেছে। ডোবায় পঁহুছিয়া সে একটা অতিকায় বিড়ালের মত চক্‌চক্ করিয়া জল খাইতে লাগিল। আমি যেন দেখিতে পাইলাম, ডোবার জল একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার পর, কি একটা নদীহইতে উঠিয়া জলপানরত বাঘের মাথায় ও কাঁধে ভয়ানক আঘাত করিল। ওটা আর কিছু নয়, একটা প্রকাণ্ড কুমীরের লেজ; সে বাঘের কাছহইতে দুইগজমাত্র তফাতে জলের মধ্যে ছিল। বাঘ ভয়ানক একটা হুঙ্কার করিয়া—সে হুঙ্কারে বনস্থলী কাঁপিয়া উঠিল—জলহইতে মুখ তুলিয়া লইল, কিন্তু কি হইয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারিবার আগেই প্রকাণ্ড একজোড়া দাঁতের পাটী হাঁ হইয়া কর্দ্দমাক্ত তীরে দেখা দিল এবং দেখিতে-না-দেখিতে জুড়িয়া গেল। কুমীরটার তাগ্ ফস্‌কাইয়া গিয়াছিল, সে বাঘের নাক কামড়াইয়া ধরিতে গিয়া তাহার বাঁ গাল ও তাহার ঘাড়ের টানিলে বাড়ে ও শক্ত চাম্‌ড়াটা কামড়াইয়া ধরিয়াছিল, সে যেমন-তেমন ধরা নয়, যেন সাঁড়াশীদিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিল।

তাহার পর, এক বিষম লড়াই বাধিয়া গেল। কুমীরটা বাঘটাকে জলের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, বাঘটা তাহার সেই শিরাময় পা ও থাবা তীরের বালির মধ্যে গভীরভাবে গাড়িয়া দিয়া বিপর্য্যয় শক্তিপ্রয়োগ করিয়া তাহাকে বাধা দিতে লাগিল। কিন্তু কুমীরটা বড়ই ভয়ানক, তাহার শরীরের ভার বাঘের চেয়ে কম নয়, তাহার উপর সে তাহার সেই কাঁটাওয়ালা প্রকাণ্ড লেজের ঝাপ্‌টা বারবার মারিয়া বাঘটাকে জখম করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল।

বাঘটা রাগে ও যন্ত্রণায় যে কি ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিল, তাহা বলিবার নয়। আমার এত কাছে সেই লড়াই চলিতেছিল যে, ভয়ে আমার স্নায়ুগুলি শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। বাঘটাকে সাহায্য করিবার জন্য আমি আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কুমীরের কাঁধের পিছনে গুলি করিতে না পারিলে গুলি করিয়া কোনই ফল হইবে না, এখন তাহার কোনই সুবিধা ছিল না, তাহার কাঁধটা জলের ভিতরে ছিল। কাজেই যখন তাহার কাঁধটা উপরে উঠিবে, তখনকার অপেক্ষায় থাকিয়া এখন দুই পক্ষের এই হিঁচ্‌ড়া-হিঁচ্‌ড়ি দেখাছাড়া আর কিছুই করিতে পারিলাম না। কখন বাঘটা একটু এলাইয়া পড়িতে লাগিল, কখন বা কুমীরটা একটু এলাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু কাহার জিত হইবে তাহা আগেহইতে ঠিক করা দায় হইল। একটু একটু করিয়া কুমীরটা বাঘটাকে জলহইতে খানিক টানিয়া লইয়া গেলে, বাঘটা বিপদ্ বুঝিয়া আবার নিজের
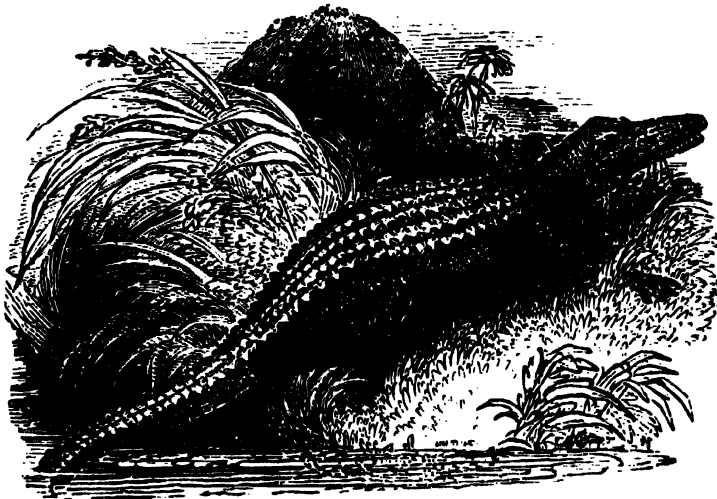
জায়গার ফিরিয়া যাইবার জন্য কুমীরটাকে প্রাণপণে টানিতে থাকে। তাহাতে বীভৎস সরীসৃপটা জলহইতে প্রায় তিনপো' উঠিয়া পড়ে, তখন সেও আবার আগেকার চেয়ে জোরে জোরে বাঘটাকে জলে টানিতে ও কাঁটাওয়ালা লেজদিয়া ঝাপ্টা মারিতে থাকে, তাহাতে বাঘ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যন্ত্রণায় অতিভয়ানকভাবে গাঁ গাঁ করিতে থাকে।

তিনচারবার ঐরকম ধস্তাধস্তি হইবার পরও বাঘ অনেকটা আপনার কোটেই রহিল। কিন্তু তাহার শত্রু আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না, মতলব বদলিয়া ফেলিল। সে বাঘকে ভাল করিয়া কামড়াইয়া ধরিবার জন্য চোয়াল মুহূর্ত্তেকের জন্য যাই আল্‌গা করিয়া দিল, অমনি বাঘও তাহার কাটা গাল ছাড়াইয়া লইল। বিদ্যুৎগতিতে কুমীরের অস্থিময় চোয়াল ও লোল জিবের মধ্যদিয়া বাঘের দাঁতগুলি কড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে কুমীরের লেজও গোদাবরীর জল ফেনময় করিয়া নিজের শক্তির পরিচয় দিল।

এইবার বাঘের পালা। যে কামড়াইতেছিল, সে এখন কামড় খাইতে লাগিল। বাঘটা জীয়ন্তে আর ছালছাড়া হইল না, তাহার শত্রুকে জলহইতে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিল এবং খানিকটা টানিয়া আনিতেও পারিল। যদিও তাহার রক্তক্ষয় হইতেছিল, তবুও সে বিপর্য্যয় একটা ঝাঁকড়া মারিয়া বাস্তবিকই প্রায় একফুট্ আগাইয়া আসিল। তাহার পর, প্রথমে এক-পা, তাহার পর আর এক-পা করিয়া সরীসৃপটাকে ক্রমে ক্রমে নদীতীরের ঢালু জায়গাহইতে কিছুদূর টানিয়া আনিল।

এই সময়ে আমার বাঘটাকে সাহায্য করিবার বড়ই আগ্রহ হইল। সুবিধাও শীঘ্রই পাইলাম। কুমীরটা তাহার সাম্‌নের ছোট ছোট পা-দুইটা বাড়াইয়া দিতে বাধ্য হওয়াতে তাহার কাঁধের সাদাভাগটুকু দেখা গেল। আমি দুইবার তাড়াতাড়ি সেইখানে গুলি করিলাম, ফলও সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল। তাহার সেই বড় কাঁটাওয়ালা লেজটা পাক খাইয়া বাতাসে ঝাপ্টা মারিল। সাম্‌নের পা-দুইটা যেন এলাইয়া পড়িল, তাহার পর, সে আর নড়িল চড়িল না। বাঘটা তাহার সেই প্রাণহীন দেহ তীরের ঢালু জায়গা-দিয়া জয়গৌরবে আরও উপরে টানিয়া আনিল।

হঠাৎ সে কুমীরটাকে হিঁচড়ান ছাড়িয়া দিয়া তাহার কামড় আল্‌গা করিয়া দিল। ক্ষণেকের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর, তাহার মুখ নামাইয়া ভূলুণ্ঠিত শত্রুকে দুইতিনবার শুঁকিল। পরে, বিস্ময়ে কিম্বা জয় হইয়াছে বলিয়া আনন্দে গোঁ গোঁ করিয়া, পিছন ফিরিয়া, জঙ্গলের বড় বড় ঘাসের মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইল। আমিও খুসী হইয়া তাহাকে যাইতে দিলাম।

অধ্যাপকের দুর্দ্দশা।

নিথর-নিসাড় সহরটা যবে
প'ড়্‌ছে ঢোলে ঘুমের কোলে,
সদর্পে তখন অধ্যাপক বীর
বাসার পানে যাচ্ছেন চোলে।
'বড় সভ্য আমি জ্ঞানী সমিতির
বক্তৃতা দিয়েছি রাশি রাশি,
স্রোতোমুখে তা'র বিপক্ষ-পক্ষ
তৃণের মত গেছে ভাসি';
দিয়েছে বাহবা সভ্যসকল,—
বক্তৃতা আজ হ'ল চরম,—
ভাবিয়ে এ সব শিক্ষক-ম'শা'র
মাথাটা বড় হ'ল গরম।
ঘুমের ঘোরে চোকের পাতা
জড়িয়ে নাহি আস্‌ছে আর,
বুদ্ধির গোড়ায় বেধেছে গোল,
মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হ'চ্ছেনা তাঁর।

পাগড়ীটা তুলে দাঁড়া'লেন তিনি
ঠাণ্ডা হাওয়া লাগা'তে চুলে,
পাথরের মত চোগাটা তাঁহার
শীঘ্র করিয়া দিলেন খুলে।
হইয়ে ক্লান্ত লভিতে বিশ্রাম
আলোক-স্তম্ভ দাঁড়িয়ে ধ'রে,
উষ্ণ কপোল করিতে ঠাণ্ডা
স্থাপিলা শীতল লৌহ 'পরে।
ম্রিয়মাণ হ'য়ে ক্ষণকাল তিনি
ছিলেন দাঁড়িয়ে স্তম্ভ-পার্শ্বে,
টানিয়া চোগাটা দিলেন গাত্রে
সহসা শৈত্য-প্রকোপ-স্পর্শে।
গলবন্ধ গলে দিলেন জড়া'য়ে,
এ কি, চিনিতে কি পার ওরে?
ছাড়ায়ে যাইতে করে টানাটানি
স্তম্ভ সাপটি' ধ'রেছে জোরে।

হ'লেন বন্দী, না পান সন্ধি,
বিফল ফন্দি, উদ্যম যত ;
নিহিত স্তম্ভে চুম্বক-শক্তি
ভাবিয়া বড়ই মর্ম্মাহত।
যেন বা নেহারি দুখের পশরা
নাচি'ছে শিখা বিদ্রূপ-ছলে,
সহসা তাঁহার ভাবুক মাথায়
সত্য তখন উঠিল জ্ব'লে।
বিশাল মানসে না রহিল ধাঁধা,
মৃত্যু ভীষণ আসিছে ধেয়ে ;
কি জানি কেমনে তড়িৎ-স্রোত
গেছে বিষম বিকৃত হ'য়ে।
স্তম্ভহইতে তড়িৎ বহিয়া
আঁকড়ি' যবে ধ'রেছে তাঁয়,
মেরুদণ্ড তাঁ'র গ'লে হ'য়ে যা'বে
তপ্ত-তরল তিমিরপ্রায় !
এ দেহ তাঁহার দারুখণ্ডসম
পুড়িয়া শীঘ্র হইবে ক্ষয়,
র'বে শেষে শুধু মনুষ্য-অঙ্গার,
ধ্বংসের মাঝে পাইবে লয়।
ভাবি' পরিণাম উঠিলা ফুকারি'
ভীত, চকিত, ভীষণ স্বরে,
নাহি কি কেহ নিকটে আমার,
নাহি কি রক্ষা করিতে মোরে ?
শুনি' পদশব্দ দেখিলা চাহিয়া
শান্তিরক্ষক এসেছে সেথা,
বলে, 'ধন্য ঈশ্বর! হে শান্তিরক্ষক,
পড়ে'ছি বড় বিপাকে হেথা।'
পাংশুবদনে বিপদ্-বার্ত্তা
রক্ত-উষ্ণীষে বলে বিস্তারি',
'এস হে ছুটিয়া, এস ঝটিতি,
রক্ষ রক্ষ মোরে কৃপা করি'।'
নেহারি স্তম্ভ, নেহারিয়া তায়
যূপকাষ্ঠবদ্ধ মহাশয়,
সান্ত্বনা-স্বরে কহিল রক্ষী,
'করিব রক্ষা নাহিক ভয়।
আলোক-স্তম্ভে নাহি কোন দোষ
পাইবে ত্রাণ তিষ্ঠ ক্ষণেক।'
এত বলি' খুলি' দিল তাঁর চোগা,
চাপিয়া হাসি কষ্টে অনেক।
সহসা তখন উঠিল জাগিয়া
সত্য তাঁহার মানস-পটে,
দিয়াছেন গায়ে চোগাটা তাঁহার
জড়ায়ে স্তম্ভ বোতাম এঁটে !
বোতাম তাঁহার ছিল যে লাগান
বড় শক্ত রকমে আঁটিয়া,
সুধু এ কারণ না হ'ন মুক্ত
কত বিফল চেষ্টা করিয়া।
সেই সে কারণ এ বিপদ্‌রাশি,
স্তম্ভেরে মিছা করেন দুষী ;
পাইয়া মুক্তি বাড়িল শক্তি,
বুঝিয়া ভ্রান্তি বড়ই খুসী !

উচ্চৈঃশ্রবা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

দুইটাই একটু হটিয়া দাঁড়াইল। একটা অপরটাকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে এবং দাঁড়াইবার জন্য ভাল জায়গা খুঁজিতে লাগিল। দুইটাই লম্বা পাথরের উপর রহিল, শেষে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ-শব্দ করিয়া, লড়িতে আরম্ভ করিল। শিংএর মরা-হাড়ের টুকরাসকল ছিট্‌কিয়া পড়িল, কারণ দুইটারই তরুণ বয়স। কিন্তু এবারে উচ্চৈঃশ্রবা বিলক্ষণ কায়দা করিয়া লইল। সে অমনি, বেশী না হটিয়া, সজোরে আবার ঢুঁ মারিল ; এবং নিজের বামদিকের শিংটা শত্রুর ডানদিকের শিংএ বাধাইয়া চাড় দিল, এমন সময়ে আর একটা পাঁঠা আসিয়া, উচ্চৈঃশ্রবার পাঁজরে ভয়ঙ্কর এক গুঁতা মারিল, তাহাতে সে ভ্যাবা-চ্যাগা খাইয়া গেল। যদি উচ্চৈঃশ্রবার শিং তাহার প্রথম শত্রুর শিংএ জড়াইয়া না যাইত, সে টিকড়ের উপরহইতে সটান নীচে পড়িয়া পঞ্চত্ব পাইত। ফলে কোন ছাগলেরই পিছনদিকের পায়ে এমন জোর নাই যে, শত্রু সজোরে মাথায় ঢুঁ মারিলে সেই ধাক্কা সামলাইয়া যাইতে পারে। উচ্চৈঃশ্রবা এই আঘাত সামলাইয়া লইয়া আবার দাঁড়াইল ; দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে, তাহার নূতন শত্রুকে টিকড়হইতে বরাবর নীচে পড়িতে দেখিতে পাইল। এ আর কেহ

নয়, সেই দশরথ! উচ্চৈঃশ্রবাকে ফেলিয়া দিবার জন্য এমন জোরে ঢুঁ মারিয়াছিল যে, নিজেকে হটিয়া পড়িতে হইয়াছিল, আর হটিতে গিয়া নিজেই পড়িয়া গেল।

নীচে জল ছিল। সেই জলে পড়িয়া যাওয়াতে যখন শব্দ হইল, তখন দলস্থ ছাগলেরা বুঝিতে পারিল যে, দশরথ উচ্চৈঃশ্রবাকে ফেলিয়া দিতে গিয়া আপনি পড়িয়া গিয়াছে। বন্য পাঁঠারা যখন লড়ে, একটার সঙ্গে একটাই লড়ে, দুই-তিনটা মিলিয়া একটাকে আক্রমণ করে না। বীরপ্রকৃতি মানুষেও ঐরূপে লড়ে। একজনের সঙ্গে একজনই লড়ে। ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে দশরথ উচ্চৈঃশ্রবার সঙ্গে পারিয়া উঠে নাই; এক্ষণে ন্যায়ের পথ ছাড়িয়া অন্যায়ের পথে যাওয়াতে প্রাণ হারাইল। বন্য ছাগল দেড়শতহাত নীচে, পাথরে টক্কর খাইতে খাইতে পড়িলে কি বাঁচে?

উচ্চৈঃশ্রবা এক্ষণে দ্বিগুণ উগ্রভাবে অন্য শত্রুকে আক্রমণ করিল। এক ঢুঁয়েই সেটা পিছাইয়া পড়িল, হারিয়া গেল। সেটা উঠিয়া চম্পট্ দিবার চেষ্টা পাইল। একবার দশরথ যেমন করিয়া, জব্দ করিবার মানসে, উচ্চৈঃশ্রবাকে উস্কাইয়াছিল, সে এক্ষণে তেমনি করিয়া পলায়মান শত্রুকে দুই-একবার লড়িবার জন্য উস্কাইল, কিন্তু সে উচ্চবাচ্য না করিয়া আপন পথে চলিয়া গেল।

১১

উচ্চৈঃশ্রবা মায়ের কতকগুলি মত-অনুসারে চলিতে ও সকলকে চালাইতে লাগিল। সে দলস্থ সকলকে বেশ বুঝাইয়া দিল যে, পাহাড়-তলির নিম্নভূমিতে থাকা ভাল নয়।

নিম্নভূমির বেত ও বাঁশবনে বিপদ্ বিস্তর। পাহাড়ের উপরে বা গায়ে থাকিলে নিরাপদে থাকা যায়, কারণ এরূপ স্থানে শত্রুর লুকাইয়া আসিবার যো নাই—যেদিক্‌দিয়াই আসুক, চখে পড়িবেই পড়িবে। সে এই টিকড়জমি খুঁজিয়া খুঁজিয়া দুই-তিনটা লবণের "কুয়া" পাইল। সুতরাং লবণ খাইবার আবশ্যকতা হইলে আর পাহাড়তলিতে যাইবার প্রয়োজন রহিল না। লবণের অন্বেষণে একবার শালবন ছাড়াইয়া ডহেরা জমিতে গিয়া দলস্থ দুইজনকে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। সে দলস্থ সকলকে বিলক্ষণ বুঝাইয়া দিয়াছে যে, পাহাড়ের গায়ে যে গর্ত্তপানা জায়গা আছে, সেখানে চরিতে নাই—সেখানে চরিতে থাকিলে কোন দিক্‌দিয়া শত্রু আসিতে থাকিলে দেখিতে পাওয়া যায় না; পাহাড়ের গায়ে বা উপরে সমান জায়গায় চরিবে, তাহা হইলে কোন দিক্‌দিয়া শত্রু উঠিতে থাকিলে দেখা যায়, অথচ তোমাদিগকে শত্রু দেখিতে পাইবে না। উচ্চৈঃশ্রবা সকলকে এক নূতন ফিকির শিখাইল। এই ফিকির "লুকাইয়া থাকা।" সেকালে লুসাই-শিকারীরা যখন তীর-ধনুক লইয়া শিকারে বাহির হইত, তখন অকস্মাৎ অদূরে শিকারীকে দেখিতে পাইলে পালস্থ ছাগলেরা প্রাণপণে দৌড়িয়া প্রাণ বাঁচাইত, এখন লুসাই-শিকারীরা পাস্ করিয়া বন্দুক পায়, এ সকল বন্দুকের পাল্লাও বিস্তর, সুতরাং দৌড়িলেও রক্ষা নাই। উচ্চৈঃশ্রবার ইহা বেশ জানা ছিল। এখন অদূরে শত্রুকে দেখিতে পাইলে, উচ্চৈঃশ্রবার শিক্ষামতে ছাগলেরা, যে যেখানে পারে, নীরবে শুইয়া পড়িয়া থাকে। এরূপ করিলে শিকারী ক্বচিৎ জানিতে ও দেখিতে পায়, ছাগলেরা কোথায় আছে। উচ্চৈঃশ্রবা আপনি এইরূপে কতবার রক্ষা পাইয়াছে।

কোন বংশে বা কোন জাতিতে বলবিক্রমে ও বুদ্ধিবিবেচনায় মহৎ লোকের জন্ম হইলে সেই বংশের বা সেই জাতির অনেক মঙ্গল হয়। উচ্চৈঃশ্রবা এইপ্রকার মহান্ ছাগ বটে। সে শিক্ষা দিয়া, ও দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, দলস্থ ছাগলগুলিকে একটু উন্নত করিয়া তুলিল। তাহার বিলক্ষণ বংশবৃদ্ধি হইল, লুসাই-অঞ্চলের প্রায় পর্ব্বতের সর্ব্বত্র তাহারা চরিয়া বেড়ায়। সেকালের বন্য ছাগলের অপেক্ষা ইহারা সবল ও বেশী চালাক-চতুর, তাই সগর-রাজার সন্তানদের মত উচ্চৈঃশ্রবার সন্তানের সংখ্যা বিস্তর বাড়িয়া গেল।

এইরূপে ছয়-সাতবৎসর গেল। এই ছয়-সাতবৎসরে উচ্চৈঃশ্রবার জ্ঞান-বুদ্ধির, শারীরিক বলবীর্য্যের কতক পরিবর্ত্তন ঘটিল। কিন্তু তাহার দেহটী তেমনি হৃষ্টপুষ্ট, তেমনি গোলগাল, তেমনি আঁটাসাঁটা আছে; পা-গুলি শিশুকালহইতেই ত নির্দ্দোষ, এখনও তেমনি নির্দ্দোষ, বাঁকেও নাই, দুর্ব্বলও হয় নাই; মাথাটী তেমনি রহিয়াছে; ঘাড়ের কেশর অনেক বাড়িয়াছে; নাকের ডগার উপরে যে পুঁই-পাতার আকার শাদা দাগ, তাহা শাদাই আছে; তাহার মহিষাসুরের মত লাল চক্ষুদুইটী আগেকার মতই ঝক্‌মক্ করে। কিন্তু শিং-দুইটী অনেক বদলিয়া গিয়াছে। যৌবনের আরম্ভে শিং-দুইটী বড়ই সুন্দর ছিল, এখন যেরূপ হইয়াছে, এমন আর কোন ছাগলের প্রায় দেখা যায় না।

পাঠক, মনে রাখিও, এক-এক বৎসরে শিং কতটা বাড়ে, শিংএর দাগ দেখিয়া, তাহা বেশ জানা যায়। এই দাগ গোলাকার। ছাগলেরা যে বৎসর যথেষ্ট খাইতে পায়, পীড়া, বা আর কোনপ্রকার কষ্ট না হয়, সে বৎসর শিং বিলক্ষণ বাড়ে। উচ্চৈঃশ্রবার যে অঞ্চলে বাস, একবৎসর সে অঞ্চলে একপ্রকার পীড়া হইয়া বিস্তর ছাগ, ধাড়ী ও বাচ্চা মরিয়া গিয়াছিল। উচ্চৈঃশ্রবারও ভারী পীড়া হইয়াছিল, সে মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছিল। সে স্বভাবতঃ সবল, ও তাহার দেহটী সুগঠিত, তাই কিছুকাল পীড়ায় কষ্টভোগ করিবার পর বাঁচিয়া উঠে। এই পীড়াতে তাহার শরীরের কোন অনিষ্ট হয় নাই। কিন্তু শিংদুইটী যতটা বাড়া উচিত ছিল, ততটা ত বাড়েই নাই—আবার যেটুকু বাড়িয়াছিল, সেটুকু অনেকটা সরু, বড় জোর দুই-আঙ্গুল বেড়। এইটী দুর্বৎসর বা দুঃখ-ভোগের চিহ্ন।

১২

মটুমটু আবার ফিরিয়া আসিল। এই পাহাড়ের অনেক লোকের মত সে প্রায় একস্থানে থাকে না। ঘর বাঁধিতে বেশী কষ্ট নাই; বনের বাঁশ, বেত, শালের খুঁটি কাটিয়া একদিনেই থাকিবার মত ঘর বাঁধা যায়। শিকারী মটুমটু আবার ফিরিয়া আসিয়া লংলের লাপ্তা-পাহাড়ে ঘর বাঁধিল।

এই পাহাড়ের কোথায় কি, সে সব তাহার বেশ জানা ছিল। আসিবার আগে একবার এই অঞ্চলে সে বড় দুইদল বন্য ছাগল দেখিতে পাইয়াছিল। তাই তাহার ফিরিয়া আসা। সে আসাতে ছাগলদেরই সর্ব্বনাশ; তবে কি না, তাহার পৌষমাস বটে!

দেখিতে পাইল। দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "বাঃ, কি চমৎকার শিং! ও শিং ত আমার।" দিনকতক পরে ঐ শিংএর জন্য বন্দুক কাঁধে করিয়া শিকারে বাহির হইল। কিন্তু সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়াইয়া ঘরে খালি হাতে ফিরিয়া আসিল। মাসকতক এইরূপ করিল, কিন্তু উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখিতে পাইল না। মটুমটুর যখন যৌবনকাল, তখনকার বন্যছাগেরা বেজায় বোকা ছিল, কিন্তু এক্ষণকার ছাগেরা বিলক্ষণ চালাক—তাহাদিগকে ঠেকিয়া ও ঠকিয়া অনেক শিখিতে হইয়াছে। শিকারী উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখিতে পায় নাই বটে, কিন্তু উচ্চৈঃশ্রবা তাহাকে কয়েকবার দেখিতে পাইয়াছে।

মটুমটু দূরহইতে উচ্চৈঃশ্রবাকে টিকড়ের উপর দেখিয়া, অতি

ভারত-সম্রাটের নেপালের অরণ্যে শার্দ্দূল-শিকার।

মটুমটুর বয়স এক্ষণে চল্লিশবৎসর হইবে। তাহার হাত-পায়ে বল বিলক্ষণ। কিন্তু চপের অনেকটা দোষ জন্মিয়াছে। যৌবনকালে রৌদ্রে শিকার করিয়া বেড়াইত, চপের যত্ন করিত না—দাঁত থাকিতে লোকে ত দাঁতের মর্য্যাদা বুঝে না। এক্ষণে চপের দোষ জন্মিলেও সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার লোক নয়। সকাল-বেলা ও বৈকাল-বেলা যখন সূর্য্যের তেজ কম, তখন সে একমনে চারিদিকে দেখে। এই করিতে করিতে একদিন সে আমাদের উচ্চৈঃশ্রবাকে

সাবধানে পাহাড়ের গা বহিয়া উঠিয়া যায়, কিন্তু গিয়া দেখে প্রকাণ্ড পাঁঠা সেখানে নাই—বেচারার উঠা-নামাই সার। উহাকে আসিতে দেখিলে উচ্চৈঃশ্রবা অনেকবার পলাইয়া যায় বটে, কিন্তু কখন কখন পলাইয়া না গিয়া, নিকটেই কোনস্থানে লুকাইয়া থাকে। এবং শত্রু কি করে, না করে, নিরীক্ষণ করিয়া দেখে।

এই সময়ে মটুমটুদের পুঞ্জিতে একজন লোক আসিল। সে নানা চা-বাগানে কাজ করিয়া খুব ঘোড়ায় চড়িতে শিখিয়াছে—দুইটা

দোঁ-আস্‌লা কুকুর সঙ্গে। লোকটীর নাম রাঙ্গাটী। সে ভাল শিকারী। পাহাড়ে শিকার করিতে গেলে ঘোড়ার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তাহার তিনটা কুকুর বড় কাজের। তাই সে বলিল, কুকুর লইয়া গেলে জঙ্গলী ছাগল-শিকার করিবার খুব সুবিধা হইবে।

মটুমটু নাক বাঁকাইয়া বলিল, "এ কাছাড়ের জঙ্গল নহে—লুসাই-পাহাড়ে ছাগলশিকার করিতে কত কাঠ-খড় লাগে, দু'দিন আমার সঙ্গে বেড়াইলে টের পাইবে।"

(ক্রমশঃ।)

:*:-

প্রজ্ঞা ও ভাগ্য।

(উপকথা।)

একদিন প্রজ্ঞা ও ভাগ্যে ভারি ঝগড়া বাধিয়া গেল।

দোঁহে বলে, আমি বড়, আর চোক মট্‌কায়,
দু'জনেরই কথা ক্রমে ঠেকে গিয়া মট্‌কায়।

শেষে ভাগ্য বলিল,—"কথা-কাটাকাটিতে দরকার কি? এস, একটা কাজ করি, তা' হ'লে আমাদের মধ্যে কে বড়—কা'র বেশী ক্ষমতা টের পাওয়া যা'বে। ঐ দেখ, ওখানে হলধর-চাষার ছেলে, গোপাল, ক্ষেতে লাঙল দিচ্ছে, যদি তুমি ওকে আমার সাহায্য না নিয়ে বড়লোক ক'রে দিতে পার, তা' হ'লে আমি স্বীকার ক'রব যে, তুমি আমার চেয়ে বড়, তোমার আমার চেয়ে ক্ষমতা বেশি।"

প্রজ্ঞা তখনই গোপালের মাথায় গিয়া ঢুকিলেন। তাহাতে গোপাল শীঘ্রই বুঝিতে পারিল যে, তাহার সঙ্গীরা যে দরের লোক, সে—সে দরের লোক নয়; আর সে অল্পদিনের মধ্যে রাজারও 'নেক-নজরে' পড়িল। রাজার একটি খুব সুন্দরী মেয়ে ছিল, গোপাল রাজবাড়ীতে আসিবার ছয়মাস আগে ঐ মেয়েটির মা মারা যান, মেয়েটি সেই অবধি আর একটিও কথা কয় নাই। ঐ মেয়েটিই রাজার একমাত্র সন্তান, তাই রাজা বড় মনের দুঃখে ছিলেন। তিনি তাঁহার রাজ্যের মধ্যে এই কথা ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, যে তাঁহার মেয়েকে কথা কওয়াইতে পারিবে, তাহারই সঙ্গে তিনি তাহার বিবাহ দিবেন। যখন গোপাল রাজবাড়ীতে আশ্রয় পাইল, তখন পর্য্যন্ত কেহই মেয়েটিকে কথা কওয়াইতে পারে নাই, মেয়েটি দিন দিন আরও বেশি বিমর্ষ হইয়া পড়িতেছিল। তাহার মায়ের একটি বিড়াল ছিল, তাহার সঙ্গে খেলা করা ছাড়া আর কোন আমোদ-প্রমোদই তাহার ভাল লাগিত না।

একদিন সকালে যে ঘরে সেই মেয়েটি বসিয়াছিল, গোপাল সেই ঘরে গেল, আর মেয়েটিকে যেন দেখিতে পায় নাই—এই রকম ভাণ করিয়া, বিড়ালটির দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল,—"ওগো বেরালটি, আমি জানি তুমি খুব শেয়না, সেইজন্যে আমি তোমার কাছে একটা পরামর্শ নিতে এয়েছি। এক রাত্রে, এক ভাস্কর—"

বিড়াল তাহাকে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ভাস্কর কে?"

গোপাল বলিল,—"আঃ কপাল! ভাস্কর কে, জান না? যা'রা পাথর খুদে পুতুল তৈরি করে, তা'দের ভাস্কর বলে। যা' হো'ক এক রাত্রে এক ভাস্কর, এক দর্জ্জি আর আমি, আমরা তিনজনে এক বনে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেম। নেকড়ে-বাঘের ভয়ে আমরা আগুণ জ্বেলেছিলেম, আর দুইজন ঘুমোচ্ছিলেম আর এক-একজন পালা করিয়া চৌকী দিচ্ছিলেম। প্রথমে ভাস্করের পালা প'ড়েছিল। সে একটা কাঠ খুদে একটি সুন্দরী মেয়ে তৈরি ক'রে সময় কাটালে। তা'রপর দর্জ্জী চৌকী দিতে লাগল, সে সেই কাঠের মেয়েটিকে দেখে, তার পোষাক তৈরী ক'রে সময়টুকু কাটিয়ে দিলে। আমার পালা এলে আমি মেয়েটিকে কথা কয়িয়ে সময় কাটালেম। কিন্তু সকালে আমরা তিনজনেই তা'কে দাবী কর্‌তে লাগলেম। ভাস্কর ব'ল্‌লে,—'আমি ও মেয়েকে গড়েছি, ও আমারই।' দর্জ্জী ব'ল্‌লে—'সে কি কথা, আমি ওর লজ্জা-নিবারণ ক'রেছি, ও আমারই।' আমি ব'ল্‌লেম,—'ও তোমাদের কারুরই নয়। তোমরা পুতুল ক'রেছ, পুতুলকে কাপড় প'রিয়েছ। আমি ওকে কথা কয়িয়ে প্রাণ দিয়েছি, ও আমারই।'—এখন তুমিই বিচার কর, সে মেয়েটি কা'র হওয়া উচিত?"

বিড়ালের বুদ্ধি খোলে শুধু মাছ চুরি করিবার সময়। এত আর মাছ চুরি করা নয়, কাজেই সে চুপ্ করিয়া রহিল। রাজকুমারী গোপালের উপকথা শুনিয়া এমনই মজিয়া গিয়াছিলেন যে, বলিয়া উঠিলেন,—"মেয়েটি অবিশ্যি তোমারই হওয়া উচিত, কারণ যে দু'টি দানের চেয়ে বড় দান আর হ'তে পারে না—প্রাণ আর কথা কইবার শক্তি—তা' তুমিই তা'কে দিয়েছ।"

গোপাল মুচ্‌কিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল,—"তোমাকেও কি আমি প্রাণ আর কথা কহিবার শক্তি দিলেম না? এ উপকথাটি আমি তোমার বিষয় নিয়েই তৈরি ক'রেছি। এখন তুমি কা'র?"

রাজকুমারী অবশ্য লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া রহিলেন। গোপাল তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল,—"এখন তোমার বাবা তাঁ'র কথা রাখ্‌লে হয়।"

একটা চাষার ছেলে রাজকুমারীকে বিবাহ করিবার অধিকার পাইয়াছে একথা শুনিয়া রাজা একেবারে 'তেলে-বেগুণে' জ্বলিয়া

গেলেন। তিনি গোপালকে বলিলেন,—"তুমি নীচ জাত, তোমার সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে দিলে এই রাজকুলে কালী পড়্‌বে। এই নাও, বাপু, তোমাকে একতোড়া টাকা দিচ্ছি, এই নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট হও।"

গোপাল ভারি রাগিয়া গেল, বলিল,—"আমি জান্‌তেম, রাজার মুখের কথাও যা', আর আইনও তা। রাজা যদি চান যে, প্রজারা তাঁ'র আইন মেনে চল্‌বে, তা' হ'লে তাঁর নিজেরও সে আইন মানা উচিত। ন্যায়মতে রাজকুমারী আমারই।

মহারাজ, কুমারীরে করি' মোরে দান,
আপনার ঘোষণার রাখুন সম্মান!"

রাজা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এ আর কিছু নয়, রাজদ্রোহ। কোই হ্যায়, এখনই এই আব্‌দেরে ছোঁড়াটাকে নিয়ে গিয়ে এর শরীরথেকে মুণ্ডটা আলা'দা ক'রে দে।"

গোপালকে যখন মশানে লইয়া যাওয়া হইতেছে, তখন ভাগ্য উড়িয়া গিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল। আর প্রজ্ঞার কাণে কাণে বলিল,—"কি দিদি, তুমিই না এই ছোঁড়াটাকে বড়লোক ক'র্‌তে চেয়েছিলে, এখন কি হ'ল?

এবে তুমি মানে মানে কর অন্তর্দ্ধান,
আমারে লইতে দাও তোমার ও' স্থান।"

ভাগ্য গোপালের উপর ভর করিতেই, দেখা গেল একজন রাজ-কর্ম্মচারী সাদা নিশান উড়াইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া টগ্‌বগ্ টগ্‌বগ্ করিয়া গোপালের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে। খবর কি? খবর ভাল, রাজা গোপালের কতলের হুকুম রদ্ করিয়াছেন।

গোপালের কতলের হুকুম হওয়া অবধি রাজকুমারী রাজাকে বলিতে লাগিলেন,—"আপনি কথা দিয়ে কথা ভাঙ্‌লেন এটা কি ভাল হ'ল বাবা? তা' ছাড়া, যিনি আবার আমাকে কথা কয়িয়েছেন, তাঁরই গলায় আমি মনে মনে মালা দিয়ে ফেলেছি। আপনি এখন যদি এক কাজ করেন, তা' হ'লে দুইদিক্‌ই বজায় থাকে। আপনি ওঁকে একজন আমীর ক'রে দিন্ না, তা' হ'লে আমাদের দু'জনের বিয়ে হ'লে কেউ কোন কথা বল্‌বার সুবিধা পা'বে না।"

রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন।

গোপালের বিবাহে প্রজ্ঞা উপস্থিত ছিল। কিন্তু প্রজ্ঞার ভাগ্যের উপর বড় হিংসা হইয়াছে, এখন ভাগ্য যদি ডা'ন-দিক্ দিয়া পথ চলে, প্রজ্ঞা তাহা হইলে বাঁ-দিক্ দিয়া চলে!

আজগবী সখ।

গত বৎসর কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় আমার নামটির পুচ্ছদেশে ইংরাজী বর্ণমালার দ্বিতীয় বর্ণটির পর প্রথম বর্ণটি বসাইয়া দিয়াছে। বাঙ্গলার জল-হাওয়ার গুণে এই দেশের মাটীতে যত কেরাণী জন্মায়, তত আর কিছুই জন্মায় না। আমি কেরাণীর বংশধর, কেরাণীগিরি-ছাড়া আর কি করিতে পারি? বাবা নাছোড়বান্দা, তাই, কি করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পাওয়া পর্য্যন্ত পড়া-শুনা করিয়াছি। পড়া-শুনা করিবার সময় জীবনের লক্ষ্য ঠিক করি নাই। এখন পড়া-শুনা ছাড়িয়া ভাবিতেছি, কি করিব? করিব আর কি, বাবা অষ্টপ্রহর কলম পিষিয়া আমাদের কোন রকমে অতি কষ্টে প্রতিপালন করিয়াছেন, আমি তাঁহার কুপুত্র কেরাণী-ছাড়া আর কি হইতে পারি? কেরাণীই হইব ভাবিয়া দিনকতক ধরিয়া ধরিয়া আবেদন-পত্র লিখিয়া আফিসে আফিসে ঘুরাঘুরি আরম্ভ করিলাম। সর্ব্বত্রই "নো ভেকান্সির" তাড়া খাইয়া এখন "নেই কাজ তো খই ভাজ" এই মহাজন-বাক্যের অনুসরণ করিতেছি, অর্থাৎ "ইণ্ডিয়ান পিনাল্ কোডের" পাতা উল্টাইতেছি, আর মাঝে মাঝে "উর্ব্বশী"-পত্রিকায় কবিতা পাঠাইয়া বামন হইয়া চাঁদে হাঁত দিবার চেষ্টা করিতেছি! এমন সময়ে, একদিন মাসিমার একখানা চিঠি পাইয়া আমার সুখ ও দুঃখ দুই-ই হইল।

মাসিমা বরাহনগরে একখানি বাগান-বাড়ীতে থাকেন। বয়স ষা'টের উপর হইয়াছে। মেসোমহাশয় অল্পদিন হইল ইহলোক-ত্যাগ করিয়াছেন। মাসিমার সন্তানাদি নাই। অতি অল্প বয়সে, বোধ করি তের কি চৌদ্দবৎসর বয়সে, তাঁহার একটি মেয়ে হয়, সে দু'দিনের বেশী এই পাপ-পৃথিবীতে প্রবাস করে নাই; তাহার পর, মাসিমার কি একটা শক্ত ব্যায়রাম হয়, সে ব্যায়রাম ভাল হইয়া গেলেও তাঁহার আর কখন সন্তান-সম্ভাবনা হয় নাই। সুতরাং এখন মাসিমা একাই চাকর-বাকর লইয়া মেসোর ভিটায় থাকেন,

মেসো বা মাসীর আমরা ছাড়া আর অন্য আত্মীয় নাই; আমার মা মাসীর সৎবহিন, বড় বনিবনাও নাই, তবে আমাকে মাসী বড় ভাল বাসিয়া থাকেন।

মেসো বড় হিসাবী লোক ছিলেন, অনেক টাকার কোম্পানীর কাগজ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারই সুদে মাসিমার বেশ স্বচ্ছলভাবে চলে। মাসিমা একালের মেয়েমানুষ নহেন, রাঁধিতে জানেন, তাই তাঁহাকে উড়ে বামুনের পাঁচন খাইতে হয় না, স্বপাক খান। এক বুড়া ঝী আছে, নাম সৈরবিনী (সৌরভিনী?), তাহার তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকিয়াছে, আমিত তাহাকে জন্মাবধি মাসিমার বাড়ীতেই দেখিতেছি। এক বুড়া সরকার আছে, নাম পতিতপাবন প্রামাণিক, সেও কুড়িপঁচিশবৎসর-যাবৎ রোজ ভোরবেলাই মাসিমার কাছে আসিয়া 'গিন্নিমা! আজ কি কি আন্‌তে হ'বে? বাজারে কচি শসা উঠেছে, রাঙা আলু উঠেছে,' ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া দু'পয়সা উপরির চেষ্টা করিতেছে। এক উড়ে মালী আছে, সেও যেন দুনিয়ায় মৌরুষী পাট্টা লইয়া আসিয়াছে, মাসিমার সঙ্গে প্রথম দেখা হইলে তৎক্ষণাৎ আধখানা শরীর মচ্‌কাইয়া যোড়হাতে "দণ্ডবত" করা, আর সুবিধা পাইলেই মাসিমার চোকে ধূলা দিয়া শাক-পাত, ফল-পাকড় আলমবাজারে গিয়া বেচিয়া আসা, তাহার অনেক দিনের কাজ। সে এমনই রক্ষণশীল যে, আজও "জগড়নাথ"-ছাড়া জগন্নাথ তাহার মুখদিয়া বাহির হইল না। সম্প্রতি মাসছয়-হইতে কুসুম বলিয়া একটা অল্পবয়সী ঝীও আসিয়া মাসিমার উপর ভর করিয়াছে। ছেলে-পিলে না হইলে মেয়েমানুষমাত্রেই বিড়ালটা, না হয় টিয়া-পাখীটা পুষিয়া থাকে, মাসিমা বড় ঝর্‌ঝরে লোক, তাঁহার সে ইচ্ছা হয় নাই, তাই ছয়মাসহইতে এই ঝীটাকে পুষিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার কাজের মধ্যে কাজ মাসিমার পাকা চুল তোলা (তাঁহার দাঁত তো একটিও পড়ে নাই; চুলও খুব অল্পই পাকিয়াছে—ধন্য সেকাল!) আর গা-হাত-পা একটু-আধটু টিপিয়া-টাপিয়া দেওয়া!—সে বড় মজাতেই আছে।

এইবার মাসিমার চিঠিটার কথা বলি। মাসখানেক ধরিয়া এক ছিঁচ্‌কে-চোর মাসিমার বাড়ীতে বড় উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। আজ এটা, কাল সেটা এই রকমই করিয়া সে দুই-একটা খুজরা-খাজরা জিনিস দুই-একদিন অন্তর সরাইতেছে। মাসিমা প্রথমে বড় গা করেন নাই। শেষে রূপার পিকদানীটা অন্তর্ধান করাতে মাসিমাকে একটু অস্থির হইতে হইয়াছে। মাসিমা জীবনে কখনও কাহারও অনিষ্ট করেন নাই, তাঁহার উপর এই অত্যাচার হইতেছে পড়িয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম। আর তিনি লিখিয়াছেন,—"আমার বিশ্বাস তুমিই এই চোরটাকে ধরিতে পারিবে, কারণ তোমার যদি তেমন বুদ্ধি না থাকিত, তাহাহইলে কি তিন-তিনটা পাশ করিতে পারিতে?" এ কথায় কোন্ বি-এ খুশী হয় না? তাই বলি, মাসিমার চিঠিখানা পাইয়া আমার সুখ ও দুঃখ দুই-ই হইল। সুখের আর একটা কারণও নেপথ্যে রহিয়াছে—মাসিমার পুকুরের রুইমাছের ঝোল—মাসিমার হাতের রান্না—ভুলিবার জিনিষ নয়। তায় এই গ্রীষ্মকালে মাসিমার কলমের আমগাছগুলি নিশ্চয়ই খুব ফলিয়াছে, আর কালো গাইএর খাঁটী দুধ—থাক আর বলিব না, জিভে জল আসিতেছে! অতএব মাসিমার বাবাজীবন যেন নবজীবন-লাভ করিয়া সাইকেলে চড়িয়া অবিলম্বে বরাহনগরের দিকে 'ধাওয়া' করিলেন!

২

আমি মাসিমার ওখানে পঁহুছিয়া দেখি, চোরটা মাসিমাকে 'উস্তং-খুস্তং' করিয়াছে—মাসিমা ভয়ে চৈতন্যহারা হইবার মত হইয়াছেন।

আমি বলিলাম,—"মাসিমা, তুমি যে বড্ড ভয় পেয়েছ, দেখ্‌ছি,—এত ভয় কিসের?"

মাসিমা বলিলেন,—"আর, বাবা, চোরটা কোন্‌দিন গলা কেটে রেখে যাবে, আর তুই বলিস্ কিনা,—'এত ভয় কিসের'! সুবোধ, এখন উপায় কি করি বল্‌তো? আমার তো হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে—এত ভয় হয়েছে যে, রাত্তিরে ঘুমোব কি, রাত আসে না যম আসে।"

আমি বলিলাম,—"মাসিমা, একটু স্থির হও, এত উতলা হ'বার কোনই কারণ নেই। এ ইংরেজের রাজ্য—মগের মুলুক নয়। গলা অমনি কেটে গেলেই হল আর কি! আমার দু'একটা কথার যদি ঠিক ঠিক জবাব দিতে পার, তা' হ'লে আমি একবার বেগে চেয়ে দেখি কি কর্‌তে পারি। প্রথমতঃ, তোমার যে যে জিনিস হারাচ্চে বল্‌চ, সেগুলি কি সত্যই পাওয়া যাচ্ছে না?"

"হ্যাঁ সত্যই পাওয়া যাচ্ছে না। যেখানে থাকার সম্ভাবনা, যেখানে না থাকার সম্ভাবনা—সব জায়গাই খোঁজা হয়েচে।"

"ভাল কথা; কোন্ দিন কোন্ জিনিসটা গিয়েচে, তা' কি তুমি এখন মনে করে বল্‌তে পার্‌বে?"

"তা' আর পার্‌ব না? আমার রূপোর দোক্তার ডিবেটা শুক্কুর-বার শুকুরবার আটদিন, আর শনি, রোব—এই দশদিন হ'ল গিয়েচে। তার একদিন পরে গেচে,—ছোট ঘড়ীটা; তার আবার দু'দিন পরে, বাবুর সেই রূপোবাঁধান ছড়িগাছা; তারপর, কাল আবার আমার অমন সুন্দর পিকদানটাও সরিয়েছে।"

"তা' হ'লে এই দশদিনের মধ্যেই এই চারটে চুরী হ'য়েছে?"

"হ্যাঁ, ঠিক দশদিন। পিকদানটার জন্যে—"

"এর আগে আর কখনও কিছু এ বাড়ীথেকে চুরী গিয়েছিল কি?"

"হ্যাঁ, একটিবার। সে অনেকদিনের কথা—তখন তোমার মেসো বেঁচেছিলেন; আর সে এ সব জিনিস নয়,—কাপড়-চোপড়, বাড়ীর একটা চাকরই চুরী ক'রেছিল।"

"তোমার এখনকার চাকরেরা কেমন ?"

"এরা সব পুরাণো চাকর—খুব বিশ্বেসী। সোণার সামিগ্রী প'ড়ে থাক্‌লেও ছোঁয় না। কেবল কুসুম মাসছয়েক হ'ল এসেছে; তা' লোকের নামে মিথ্যে ক'রে বল্‌তে নেই, সেও, বাপু, চোর-ছ্যাঁচোড় নয়। আমার কোন চাকরের উপর আমার সন্দেহ হয় না।"

"তুমি কি পুলিশে খবর দিয়েছিলে ?"

"না, আমি মেয়েমানুষ, পুলিশ-হাঙ্গামার ভেতর কি ক'রে যাই ? আর শুনেচি, যার চুরী যায়, আমাদের এ পোড়া দেশের পুলিশ তাকেই নাকি চোর ধরে ! আমি কি—"

"আচ্ছা, তা' হ'লে আমি আরও কিছু খোঁজ-খবর নি, তারপর সমস্ত ব্যাপারটা একবার মনে মনে তলিয়ে নিয়ে, যা' কর্‌বার হয়, কর্‌ব। তুমি এখন এ বিষয় নিয়ে আর তোলাপাড়া ক'র না ?"

সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে খুঁটাইয়া আলোচনা করিয়া আমি মাসিমার অনুমতি লইয়া নিকটস্থ থানায় গেলাম। দারোগা-বাবু সব কথা শুনিয়া বলিলেন,—"এতদিন কি 'নাকে সর্ষের তেল দিয়ে' ঘুমুচ্ছিলেন ? দেখুন গিয়ে, ঘরেই কোন চাকরের হাত-টান-রোগ জন্মেছে। আমি চোরাই মালের একটা 'হুলিয়া' ছাপিয়ে দিচ্ছি, এ ছাড়া এখন আর কিছু হ'তে পারে না।"

দিন-পনের বাদে আবার আমি থানায় গেলাম। দারোগা-হুজুর আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর দিলেন,—আমাদের কোন হৃতবস্তুই কোনস্থানে বাঁধা দেওয়া বা বিক্রয় করা হয় নাই, সুতরাং চুরীর কোন কিনারাই হয় নাই।

ঐ কথা শুনিয়া অঙ্গ শীতল করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছি, পথে দেখি, আমাদের কুসুম-ঝী ভদ্রলোকের মত কাপড়-চোপড়-পরা একটি তরুণ যুবকের সহিত বড় আত্মীয়তা করিয়া কথা কহিতেছে।

বাড়ী আসিয়া মাসিমাকে বলিলাম,—"মাসিমা, কুসুমের একটি বাবুর সঙ্গে আলাপ আছে।"

"কি রকম চেহারা বল দেখি ?"

"এই ছোক্‌রাগোছের—ছিব্‌ছিবে—ফর্সা; খুব ফিট্‌ফাট্ কাপড়-চোপড়-পরা ?"

"ওঃ! ও কুসুমের মামাতো ভাই হয়। কুসুম নীচজাতের মেয়ে নয়—তার কথা-বার্ত্তায় টের পাও না ? দুঃখে প'ড়ে পরের বাড়ী চাক্‌রী কর্‌তে এসেছে।"

"ভাইটি কি বরা'নগরেই থাকে ?"

"না, কালীঘাটথেকে আসে; কালে ভদ্রে কচিৎ-কখন আসে।"

(ক্রমশঃ।)

পদ্যরচনার প্রতিযোগিতা।

এই ছবিটি অবলম্বন করিয়া ছেলেদের উপযুক্ত একটি হাসির কবিতা-রচনা করিতে হইবে। কবিতাটি যেন ষোলপংক্তির বেশী বড় না হয়। উহা জুলাইমাসের ৩১শে তারিখের মধ্যে আমাদের হাতে আসা চাই। কবিতাটি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া "বালক"-সম্পাদক, ২৩নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হইবে না। প্রাপ্ত কবিতাগুলির "বালক"-সম্পাদক যথেচ্ছ-ব্যবহার করিতে পারিবেন। যে লেখকের কবিতাটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাঁহাকে একখানি ইংরাজী-পুস্তক পুরস্কার দেওয়া হইবে। তাই লেখকগণ তাঁহাদের রচনাগুলির নিম্নে কোন একস্থানে তাঁহাদের নাম, ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

বালক

১ম বর্ষ] আগষ্ট, ১৯১২। [৮ম সংখ্যা।

কনানার বল্লম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

১০

কনানার দ্বিতীয় কার্য্য।

সম্রাট হিরাক্লিয়স্ বিস্তর সৈন্য-সামন্ত লইয়া আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া, প্রকাণ্ড মুসলমান-সেনাদল, অগণ্য লোকজন-সহ তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছে।

গমন-পথে সেনাদলের মাথার উপর মেঘস্তম্ভের ন্যায় ধূলি উড়িতেছে।

সকলের অগ্রে অস্ত্রধারী দশ-সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য চলিয়াছে।

ইহাদের পরে একদল রক্ষক-সেনা চলিয়াছে—ইহারা অসভ্য লোক। কাল্লেদ ও তাঁহার সেনাপতিরা অতিতেজস্বী ও সুন্দর পারস্য-দেশীয় অশ্বারোহণে যাইতেছেন। আর এই অসভ্য সিপাহীরা উষ্ট্রে চড়িয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া চলিয়াছে।

এই সকলের পরে, একটু দূরে, নানা-জাতীয় উষ্ট্রে চড়িয়া সহস্র সহস্র উগ্রমূর্ত্তি সেনা চলিয়াছে। ইহাদের পশ্চাতে তাম্বু, নানা-প্রকার তৈজস-পত্র ও খাদ্য-সামগ্রী পৃষ্ঠে করিয়া দলে দলে উষ্ট্র চলিয়াছে। ইহাদের পশ্চাতে অনেক স্ত্রীলোক ছেলে-পিলে লইয়া উষ্ট্রে চাপিয়া চলিয়াছে, সকলের অগ্রে যে সেনাদল যাইতেছে, ইহারা তাহাদের অনেকের পরিবার। সকলের শেষে রক্ষী-সেনাদের আর এক বৃহৎ দল চলিয়াছে।

কাল্লেদের রক্ষক-সেনাদলের পশ্চাতে এবং উষ্ট্রারোহী রুদ্রমূর্ত্তি সেনাদলের অগ্রে অগ্রে দুইটী উষ্ট্র একখানি খাটিয়া বহিয়া যাইতেছে।

এই খাটিয়াতে কনানা শুইয়া আছেন, রৌদ্র-নিবারণের জন্য ছাগলোমের কম্বলের চাঁদোয়া রহিয়াছে। দিনের বেলা সেনাদিগকে পথ চলিতে হইতে হইলে, এইপ্রকার চাঁদোয়া না হইলেই নয়।

এই প্রকাণ্ড সেনাদল সূর্য্যোদয়ের ঘণ্টাখানেক পরে যাত্রা করিয়া, দুই-প্রহর বেলায় দুই-ঘণ্টা-কাল কোন স্থানে বিশ্রাম করে; আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিয়া, পুনরায় যাত্রা করত সূর্য্যোদয়ের ঘণ্টা-খানেক আগে কোন স্থানে বিশ্রাম করে। তথাপি এই প্রকাণ্ড সেনাদল কারাভানের অপেক্ষা দ্রুতগামী, গড়ে একদিনে বার-তের-ক্রোশ পথ চলে।

কনানার খাটিয়া-বাহী উষ্ট্র-দুইটীর পশ্চাতে একটী উট চলিয়াছে, এটীর পৃষ্ঠে শোয়ারী নাই। যাত্রা-কালে এটী নিতান্ত দুর্ব্বল ও পরিশ্রান্ত ছিল। প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপে, মরুভূমিতে পথ চলিবার সময়ে, ইহার কৃষ্ণবর্ণ লোম ঝলসিয়া কতকটা কটাবর্ণ হইয়া গিয়াছে—ইহার প্রতি সকলেরই বড় যত্ন ও আদর—এ যেন দ্বিতীয় কাল্লেদ্। দিন যত গত হইতে লাগিল, এই প্রিয় উষ্ট্র ততই সবল হইতে ও মাথা-খাড়া করিতে লাগিল।

কনানার কৃষ্ণবর্ণ উষ্ট্রের পৃষ্ঠে কোন বোঝা নাই—ইহার আপাদমস্তক চিত্রবিচিত্র-বস্ত্রে আচ্ছাদিত; মহান্ উমরের আদরের ধন এই উট মক্কা-হইতে বাশ্‌রায় সুসংবাদ আনিয়াছে— আনিতে তেরদিনও লাগে নাই—এইজন্য ইহার এত আদর ও এত সাজসজ্জা।

এ স্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি। উত্তরদেশীয় অতি দুর্দ্দম্য বহুসংখ্য সৈন্য-সংগ্রহ করত সম্রাট হিরাক্লিয়স্ সগর্ব্বে আসিতেছেন, এক্ষণে কাহ্লেদ্ এই রুদ্রমূর্ত্তি সেনাগণকে লইয়া সেই সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চলিয়াছেন, এ কি বীর-প্রকৃতি লোকের পক্ষে কম আনন্দের কথা।

এই সেনাগণের ছোটবড় সকলেরই বিশ্বাস এই যে, আল্লা ও নবীর নামে কাহ্লেদ্ চাই কি সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে পারেন।

কাহ্লেদ্ যখন সর্ব্বপ্রথমে পারস্যদেশ আক্রমণ করিতে যান, তখন যে সকল সৈন্য তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল, এই যাত্রায় তাহাদেরও অনেকে আসিয়াছে। যুদ্ধশেষে তিনি বাবিলের সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়েন, তাহাও তাহারা দেখিয়াছিল। কাহ্লেদ্ যে পারস্যদেশের রাজার নামে এই অদ্ভুত চিঠি পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও এই সেনাদের জানা ছিল।

"হয় আল্লা ও তদীয় নবীর ধর্ম্ম-গ্রহণ করুন, না হয়, তাঁহাদের দাস যে আমরা, আমাদিগকে কর দিন। আমি বহু সৈন্য লইয়া আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইলেই—আপনি প্রাণ রাখিতে যতটা ভাল বাসেন, তাহারা প্রাণ দিতে ততটা ভাল বাসে।"

ইতিপূর্ব্বে কাহ্লেদ্ একবার পারস্য-দেশে বিজয়ী হইলে অকস্মাৎ তাঁহাকে সুরিয়াদেশে যাইতে হইয়াছিল, কারণ তৎকালে যে সকল মুসলমান-সেনাপতি ও সিপাহী ছিলেন, তাঁহারা হিরাক্লিয়সের সঙ্গে পারিয়া উঠেন নাই। তাঁহার সঙ্গী সেনাগণের তাহাও জানা ছিল। বর্ত্তমান উমরের পূর্ব্বে আবুবেকার কালিফ ছিলেন, তিনি যখন কাহ্লেদ্‌কে সকলের উপরে কর্ত্তৃত্ব-দান করেন, তখন, এই সিপাহীরা উপস্থিত ছিল, আর কাহ্লেদ্ যখন মহান্ যোদ্ধা রোমানুসের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিয়া জয়ী হয়েন, এই সিপাহীরা তাহাও স্বচক্ষে দেখিয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে যখন কাহ্লেদ্ প্রাচীর-বেষ্টিত দম্মেশক-নগর দখল করিতে গিয়া, নগরটীর একদিক্ অবরোধ করত, অপরদিকে আস্তিরখিয়া-হইতে হিরাক্লিয়সের প্রেরিত একলক্ষ সিপাহীকে পরাজয় করেন, এক্ষণকার বিস্তর সৈন্য তৎকালে তাঁহার সঙ্গে ছিল। এই সেনারা দম্মেশক-নগরের পতন দেখিয়াছে, এবং নগরের পতন হইলে রোমদেশীয় রণবিদ্যা-অনুসারে শিক্ষিত হইয়াও বিপক্ষ-পক্ষের বিস্তর সৈন্য পলাইতে আরম্ভ করিলে কাহ্লেদ সসৈন্যে তাহাদিগকে তাড়া করিয়া অনেক পথ গিয়াছিলেন। পলায়িত সৈন্যসংখ্যা কাহ্লেদের সৈন্য-সংখ্যার দ্বিগুণ ছিল। এ সকলও ইহারা দেখিয়াছিল।

এই সিপাহিরা কাহ্লেদের অধীনে বিপক্ষপক্ষের সঙ্গে মরুভূমিতে যে সকল তুমুল যুদ্ধ করিয়াছে, সেরূপ যুদ্ধ আর কখনও হয় নাই। এই সকল যুদ্ধেই কাহ্লেদ্ জয়ী হইয়াছেন, এই কারণে তাহারা জানিত যে, তিনি অজেয়।

আবুবেকারের মৃত্যু হইলে ওমর তাঁহার পদপ্রাপ্ত হয়েন। এই সময়ে কাহ্লেদ্‌কে অন্যায়রূপে অপদস্থ করত অবরুদ্ধ নগর-সকল চৌকি দিতে, কিন্তু অপর সেনাপতিদিগকে প্রকৃত যুদ্ধ-কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। অবশেষে কাহ্লেদ নিতান্ত ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া সুরিয়াদেশে প্রস্থান করেন। এই সিপাহীদিগের তাহাও জানা ছিল।

এক্ষণে কাহ্লেদ্‌কে পুনরায় যথাযোগ্য পদে অভিষিক্ত দেখিয়া, এই বিজয়ী সেনারা যে বিলক্ষণ সন্তুষ্ট হইয়াছিল, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। হিরাক্লিয়স্ মুসলমানদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবেন বলিয়া ভয়-প্রদর্শন করাতে যে সকল মুসলমান-সেনাপতি ভীত হইয়াছিল, এই সিপাহীরা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কতই না ঠাট্টাবিদ্রূপ করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিল। এই সকল কারণে অত্যন্ত গরম ও নিতান্ত পথকষ্ট হইলেও সেনাগণ আমোদ-আহ্লাদ করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিল।

কনানা খাটিয়াতে শুইয়া শুইয়া, কাহ্লেদের প্রশংসা-সূচক লোকদের নানা কথা শুনিতে লাগিলেন। শুনিয়া এক-একবার স্বদেশপ্রিয়তায় এমন উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন যে, এক-একবার এই সেনাদলে যোগদিয়া রণক্ষেত্রে যাইবার সাধ হইল, কিন্তু আবার সেই পূর্ব্বভাব মনে জাগিয়া উঠাতে বল্লম হাতে করিয়া নরহত্যা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ক্ষান্ত হইলেন।

চারদিনের দিন তিনি খাটিয়াহইতে উঠিয়া পুনরায় কৃষ্ণ উটে চড়িলেন। কাহ্লেদ্ কনানাকে উত্তম ও দামী পোষাক পরাইতে ও তাঁহার হাতে বল্লম দিতে আজ্ঞা করিলে কনানা তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইয়া সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন, "পিতঃ, আমি কখনও বল্লম হাতে করি নাই—আর এই যে মেষ-চর্ম্মের জামা পরিয়া আছি, ইহাতেই আল্লা আমাকে বেশ চিনেন।"

কাহ্লেদের রাগ হইল, কিন্তু কনানা যে অবস্থায় শস্য-ক্ষেত্রের মাচাহইতে নামিয়া আসিয়াছিলেন, ঠিক সেই অবস্থায় সুসজ্জিত কৃষ্ণ উটে বসিয়া রহিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, সেনাদলের সঙ্গে যে সকল লোক-জন ভৃত্যরূপে আসিয়াছে, তাহাদের দলে মিশিয়া তাঁহাকে পথ চলিতে হইবে। কিন্তু এখনও তাঁহাকে রুদ্রমূর্ত্তি রক্ষক-সেনাগণে বেষ্টিত হইয়া চলিতে হইল। ফলতঃ কনানা এমন বিখ্যাত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন যে, অনেক যোদ্ধা গমনাগমন-কালে, প্রথমে প্রধান-সেনাপতি কাহ্লেদের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন, পরে কৃষ্ণউষ্ট্রস্থিত কনানার সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন।

শস্য-ক্ষেত্রের মাচায় বসিয়া স্বপ্নে এই সকল দেখিলে মন্দ লাগিত না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এপ্রকার ঘটনা দেখিয়া কনানা উচাটন হইয়া উঠিলেন। সুতরাং আবার পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিলেন।

এক্ষণে বেনি-সৈয়দদিগের শিবির কোথায়, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাহা ঠিক করিলেন, এবং কোন্ দিন এই সেনাদলের উক্ত শিবিরের কএক ক্রোশ দূরে পূর্ব্ব-দিক্-দিয়া চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা, তাহা স্থির করিয়া লইলেন।

পরিচিত কোন্ স্থান কোথায়, কোন্ দিকে এবং কত দূর, এই সকল যে কত সূক্ষ্মরূপে বেদুইন-আরবেরা ঠিক করিয়া লইতে পারে, যাহারা মরুভূমিতে বাস করে নাই, কেবল মরুদেশের ছবিমাত্র দেখিয়াছে, তাহারা তাহা জানে না। তবু কিন্তু কনানা ভাবিয়া দেখিলেন যে, তিনি নিতান্তই পরের হাতে; সুতরাং কেমন করিয়া যে এই মেষ-চর্ম্মের জামা পরিয়া ও পাঁচনী হাতে করিয়া আল্লা ও আরবদেশের জন্য কোন কার্য্য করিতে পারিবেন, তাই ভাবিতে লাগিলেন।

বিশ্রামের ও আহারের আয়োজনবটিত কলরব হইতেছে। এমন সময়ে কনানা শুনিতে পাইলেন, একজন বড়-রকমের কর্ম্মচারী আসিয়া কাপ্তেনকে বলিতেছেন, "খাদ্যদ্রব্য—দানা ইত্যাদি—যাহা কিছু আছে, তাহাতে তিনদিনমাত্র চলিবে, বেশি চলিবে না।"

এমন সময়ে কনানা আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া কহিলেন, "পিতঃ, আপনার এই দাসের আত্মীয় লোকেরা যেখানে থাকেন, সেস্থান এখানহইতে এক-রাত্রের পথ—দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে। মাস-খানেক হইল, তাঁহাদের শস্য-কাটা আরম্ভ হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহারা কম হইলেও পাঁচ-শত-উট-বোঝাই শস্য-বিক্রয় করিবেন। আজ্ঞা করেন ত আজ রাত্রেই আমি যাই, আল্লার সাহায্যে, পরশ্বদিন প্রাতঃকালে শস্য আনিয়া আপনাকে বুঝাইয়া দিব।"

এই বেদুইন-বালককে কাপ্তেনের খুব মনে ধরিয়াছে। বাল-

সন্ধ্যাকাল, সৈন্যদল রাত্রিকালে বিশ্রাম করিবার জন্য থামিল। কল্য সেনাদল বেনি-সৈয়দ আরবদের শিবিরের নিকট-দিয়া চলিয়া যাইবে। কাপ্তেনের তাম্বুর গায়েই কনানার তাম্বু খাটান হইল।

রাত্রিকালে কনানা আহারে বসিয়াছেন। চারিদিকে সেনাগণের

কের চঞ্চল ভাব তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন, আর মনে মনে ভাবিয়াছেন, হয় ত এ পলাইবার চেষ্টা করিবে। তাই তিনি মনে করিলেন যে, এই বালককে কোনপ্রকার কাজের ভার দিলে, সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবে, আর পলাইবে না। তিনি আরও ভাবিলেন

যে, এমন সময় উপস্থিত হইতে পারে, যখন মেষচর্ম্মের জামা-পরা ও রাখালের পাঁচনী হাতে কনানার দ্বারা এমন কাজ দেখিবে যে, কোন পোষাক-পরা ও চকচকিয়া তরোয়াল হাতে সিপাহীর দ্বারা তেমন কাজ হইবে না।

আদেশ হইল যে, সূর্য্যাস্তের একঘণ্টা পরে কনানাকে একশত অশ্বারোহী, শস্য কিনিবার জন্য দশটা উটবোঝাই টাকা, ছালা বা থলিয়া-বোঝাই কুড়িটা উট এবং উপঢৌকন-সামগ্রা-বোঝাই একটা উট লইয়া যাত্রা করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন কনানা এই উপদেশ পাইলেন,—"যে উপঢৌকন দিলাম, তাহা 'মরুভূমির সিংহকে' দিয়া বলিবে যে, আপনকার পুত্র যে কার্য্য করিয়াছে, সে কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ এ সকল দেওয়া হইল।"

আরও স্থির হইল যে, বেনি-সৈয়দ আরবদের নিকট যত শস্য পাওয়া যায়, তাহা কেনা হইয়া গেলে, কনানাকে সেনাদলের আগে আগে গিয়া সুরিয়া-দেশের সীমানা-পর্য্যন্ত দানা-ঘাস ইত্যাদির 'সরবরাহ' করিতে হইবে। এইপ্রকার সম্মান-সূচক কার্য্য-ভার পাইয়া কনানা বড়ই সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হইলেন। যাত্রা করিবার সময় উপস্থিত হইল, কনানা পদোন্নতির উপযুক্ত গম্ভীরভাবে কৃষ্ণ উটের পৃষ্ঠে বসিলেন, সকলের সাক্ষাতে প্রধান-সেনাপতি কাহ্লেদ্ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করত কারাভানের কর্ত্তা করিয়া বিদায় করিলেন।

কনানা বালক, মেষচর্ম্মের জামা-পরা এবং হাতে রাখালের পাঁচনী, অথচ একশত অশ্বারোহী সিপাহীর কর্ত্তা; এ অবস্থায় অন্য কোন দেশে হইলে সিপাহীরা বালক-দলপতির অবাধ্য হইত। কিন্তু কনানার আশ্চর্য্য সাহসের কথা সিপাহীরা সকলেই শুনিয়াছিল, তাই কোন গণ্ডগোল হইল না। যে রাখাল-বালক কনানা মাস-খানেক পূর্ব্বে শস্য-ক্ষেত্রের মাচা ছাড়িয়া আসিয়াছিল, এবং যে বালক বেনি-সৈয়দ আরব-সমাজে কাপুরুষ ও ভীরু বলিয়া বিখ্যাত ছিল, অদ্য রাত্রে সে আবার দেশের দিকে চলিল, সঙ্গে একশত বিরূপাক্ষ-অশ্বারোহী সিপাহী; সকলেই তাহাকে অসমসাহসিক বেদুইন-বীর বলিয়া মানে।

টাকা-কড়ি ও জিনিস-পত্র লইয়া কারাভান মরুভূমিদিয়া চলিল। কনানা বালক বটে, কিন্তু সেনাপতি। তখন অনেক কথা মনে পড়িল। পিতা রাগ করিয়া কত কথা কহিয়াছিলেন, একটী ঘোড়াও দিতে চাহেন নাই। তথাপি কতক্ষণে পিতার তাম্বুতে পঁহুছিবেন, পঁহুছিয়া পিতার আশীর্ব্বাদ লইবেন, এই তাঁহার চিন্তা।

১১

কোমরবন্ধ্।

কনানার দলস্থ যে পাঁচজন অশ্বারোহী আর সকলের অগ্রে গিয়াছিল, রাত্রি দুই-প্রহরের একটু পরে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, বামদিকে অনেক দূরে অনেক তাম্বু দেখিয়া আসিলাম। এই কথা শুনিয়া, কনানা বেদুইনসর্দ্দারের মত, সকলের আগে আগে চলিলেন, আর সকলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা দেখিলেন, সম্মুখে ধিকি ধিকি করিয়া আগুন জলিতেছে। দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এখানে বেদুইন-শিবির।

কনানা উট চালাইয়া বরাবর শিবিরস্থ সর্দ্দারের তাম্বুর দিকে চলিলেন। সর্দ্দারের তাম্বু আর সকল তাম্বুহইতে একটু দূরে, বাহিরের দিকে, নদী-হইতে অনেক অন্তরে বা যেখানে বাহিরের লোকের যাওয়া-আসার সম্ভাবনা, এমন স্থানে স্থাপিত হইয়া থাকে।

তিনি অগ্রসর হইলেন, নীরবে অন্ধকার-রাত্রেও একটা ছায়া দেখা গেল। ছায়াটা যেন বাতাসে নিশ্বাস ফেলিল। আবার সেই ছায়া অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

কনানা উটের উপর-হইতে হড়্হড়্ করিয়া নামিয়া পড়িলেন, উটকে শোয়াইতে হইল না। তিনি শাদা উটটাকে দেখিতে পাইয়া, কাছে গিয়া বলিলেন, "আমি জানিতাম, আমায় দেখিলেই তুমি চিনিতে পারিবে।" কনানার পিতা, "মরুভূমির সিংহ" তাম্বুর দ্বারে আসিয়া, হাত তুলিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে উদ্যত।

কনানা আনন্দে উচ্চ ধ্বনি করিয়া পিতার দিকে দৌড়িলেন, বৃদ্ধ সর্দ্দার পুত্রকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া শিরঃশ্চুম্বন করিতে করিতে বলিলেন,—

"কনানা, আমায় ক্ষমা কর; তুমি আমার বীর পুত্ররত্ন। আমি বলিতাম, কনানা কাপুরুষ, আমাদের কুলের কলঙ্ক; কিন্তু তুমি যে মহৎ কাজ করিয়াছ, আমি এত কাল পৃথিবীতে থাকিয়াও তেমন কিছু করিতে পারি নাই। সত্য বলিতেছি, তুমি আমাকে লজ্জা দিয়াছ, কিন্তু কাপুরুষের মত কাজ করিয়া নয়, বীরত্ব করিয়া লজ্জা দিয়াছ।"

কনানা কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি একাকী বল্লম-ধারী দশ-কুড়ি-জন অসভ্য ডাকাইতের সম্মুখে দাঁড়াইতে ভয় করিতেন না—এত সাহস! কিন্তু আজ অকস্মাৎ টের পাইলেন যে, এত করিলেও তিনি বালকমাত্র; এ কথা এতকাল একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে বালকবৎ পিতার গলা ধরিয়া নীরব রহিলেন।

বৃদ্ধ সর্দ্দার মনের আবেগ-সংবরণ করিয়া কহিলেন, "কনানা, চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের জাতীয় সকল লোকে তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত।" লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "তোরা এখনও ঘুমাইতেছিস্! ওঠ্, ওঠ্; আমার কনানা ফিরিয়া আসিয়াছে, তোরা দেখ্ আসিয়া!"

লোকেরা ডাকা-ডাকি হাঁকা-হাঁকি করিয়া সকলকে জাগাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে লোকেরা বেনি-সৈয়দের বীরপুরুষের সহিত দেখা করিতে আসিতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বে কনানার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শাদা উট লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন; এবং কালিফের মুখ-ঢাকা পত্রবাহক কেমন করিয়া

কনানার বল্লম।*

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কনানাকে যে কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছিল, তিনি সুচারুরূপে সে কার্য্য সম্পন্ন করিলেন—কাহ্লেদ যে ভবিষ্যতে তাঁহার দ্বারা আরও কোন গুরুতর কার্য্য-সাধন-উদ্দেশ্যে কনানার হাতে এই কার্য্যটীর ভার দিয়াছিলেন, কনানা স্বপ্নেও তাহা ভাবেন নাই।

যথাসময়ে সুরিয়া ও আরব-দেশের মুসলমান সেনারা আসিয়া কাহ্লেদের সেনাদলে যোগ দিল, এবং সকলে মিলিয়া পলেষ্টিয়া-দেশের সীমান্তস্থলে যারমস্ক-নামক স্থানে শিবির-স্থাপন করিল। প্রধান সেনাপতি কাহ্লেদের তাম্বুতে কনানার ডাক পড়িল। এই সময়ে আরব-দেশ-রক্ষা করা একপ্রকার অসাধ্য ব্যাপার, কাহ্লেদের হাতে সেই কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছে; কনানা আজ সেই অসাধারণ সেনাপতির সম্মুখে উপস্থিত—বেচারা ভয়ে নিতান্ত কাপুরুষের মত কাঁপিতে লাগিলেন। এই সময়ে সকলেরই দৃষ্টি কাহ্লেদের দিকে—তিনি যা করেন। কনানা কি ভয়প্রযুক্ত কাঁপিতে লাগিলেন? না, কাহ্লেদ কনানার বিবেচনায় ঈশ্বরতুল্য লোক, সেই ব্যক্তির সম্মুখে তিনি একাকী, তাই কাঁপিলেন, ভয়-প্রযুক্ত নহে।

কাহ্লেদ বড় কম কথা কহেন, আর বড় তাড়া-তাড়ি কথা কহেন।

কাহ্লেদ কহিলেন, "হে মরুভূমির সিংহের পুত্র, আমাদের শত্রু আসিতেছে, আর তাহাদের বিষয়ে নানাপ্রকার কথা শুনিতে পাইতেছি। আসল খবর আমি জানিতে চাই—আর অবিলম্বে জানিতে চাই। এ কার্য্যে যাইতে হইলে, তোমার কি কি চাই, বল।"

কনানা তখন প্রণত হইয়াই আছেন। কাহ্লেদের এই তাগিদ হুকুম শুনিয়া কনানা আত্মহারা হইলেন। তিনি ভাবিলেন, এই হুকুমমতে কাজ করিতে গেলে, মৃত্যু নিশ্চিত—বাঁচিবার উপায়মাত্র নাই—কেহ দয়াও করিবে না। এই চিন্তায় আকুল হওয়াতে তিনি উঠিবার কথা একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলেন।

কাহ্লেদ নীরবে বসিয়া রহিলেন। মনুষ্যপ্রকৃতি তাঁহার বিলক্ষণ জানা ছিল, তাই বালককে কোন কথা কহিলেন না। পাঁচ-মিনিট-কাল দুইজনেই নীরব। অনন্তর কনানা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া কম্পিতস্বরে কহিলেন, "পিতঃ, আমি চাই আপনকার খুব দ্রুতগামী ঘোড়া, আপনকার আশীর্ব্বাদ এবং আপনকার কোমরবন্ধ।"

অজেয় কাহ্লেদ একপ্রকার কটিবন্ধনী বা কোমরবন্ধ পরিতেন, সেনামাত্রেই, এমন কি পল্টনের মুটিয়া-মজুরেরাও, তাহা জানিত ও চিনিত। এই কোমরবন্ধ উটের চর্ম্মদ্বারা নির্ম্মিত, খুব নরম, আর পারস্য-দেশীয় একপ্রকার রঙে রং করা। অনেক দূরহইতে দেখিলেও, এই কোমরবন্ধ সহজে কাহ্লেদের কোমরবন্ধ বলিয়া চিনিতে পারা যায়।

এই কোমরবন্ধ বাবিলের রাজবাটীর অতি চমৎকার একটা পর্দ্দার টুকরামাত্র। অজেয় কাহ্লেদের ইহা বড়ই মনে ধরিয়াছিল, তাই তিনি ইহাদিয়া কোমর বাঁধিতে আরম্ভ করেন, অবশেষে ইহাই তাঁহার "উর্দ্দি" হইয়া পড়িয়াছিল। পঞ্চাশ-ক্রোশের মধ্যে কোথায়ও কাহারও এ রঙের অন্য কাপড় বা কোন জিনিষ ছিল না। এই কোমরবন্ধ দেখিয়াই লোকে বুঝিতে পারিত যে, ইনি কাহ্লেদ।

প্রধান সেনাপতি কহিলেন, "যে ঘোড়া তোমার ইচ্ছা, সেইটা নেও, আর এই আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম।" এই বলিয়া কাহ্লেদ একটু থামিলেন। কনানা যদি একশত উট বা এক-হাজার অশ্বারোহী সিপাহী চাহিতেন, কাহ্লেদ অকাতরে দিতেন। অনন্তর আম্‌তা আম্‌তা করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আমার কোমরবন্ধ-দিয়া তুমি কি করিবে, বল ত?"

কনানা স্বাভাবিক সরলভাবে কহিলেন, "জামার ভিতর লুকাইয়া রাখিব; এদিকে আপনি সেনাদলে রটাইয়া দিবেন যে, আপনকার প্রিয় কোমরবন্ধ চুরি করিয়া কোন লোক শত্রুপক্ষের ছাউনীতে গিয়াছে। যে কেহ ঐ কোমরবন্ধের টুকরা-টাক্‌রাও আনিয়া দিতে পারিবে, সে পুরস্কার পাইবে।"

এই কথা শুনিয়া প্রধান সেনাপতি অমনি কোমরহইতে প্রিয় কোমরবন্ধ খুলিয়া লইয়া কনানার হাতে দিলেন। তিনি সসম্ভ্রমে কোমরবন্ধ লইয়া আপন কপালে ছোঁয়াইলেন, পরে মেষচর্ম্মের জামার ভিতর লুকাইয়া রাখিয়া দিলেন।

কনানা হাঁটু গাড়িয়া কাহ্লেদের আশীর্ব্বাদ লইলেন, এবং তাম্বুহইতে বাহিরে গিয়া, খুব ভাল একটা ঘোড়া বাছিয়া লইলেন, অবশেষে রাত্রিকালে, অন্ধকারে একাকী যাত্রা করিলেন।

সকালবেলা ছাউনীতে সকলেই চুপচাপ—কেবল ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল যে, কাহ্লেদের আদরের ধন কোমরবন্ধ-চুরি হইয়াছে।

সেনাদলের সকলকেই এই কোমরবন্ধের সন্ধান-জন্য সতর্ক থাকিতে বলিয়া, আদেশ করা হইল যে, সন্ধান পাইলে, অমনি কোমরবন্ধ বা উহার টুকরা-টাক্‌রা যা' পাওয়া যায়, অবিলম্বে সেনাপতির কাছে লইয়া আসিবে। আর যে আনিতে পারিবে, কোমরবন্ধ খুলিয়া মাটীতে পাতিলে, তাহাতে যত মোহর ধরে, তত মোহর সে পুরস্কার পাইবে।

(ক্রমশঃ।)

* ১১৭ পৃষ্ঠার পর পঠিতব্য

তাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন, এ সকল কথা লোকেরা শুনিয়াছে। এক্ষণে শুনিতে পাইল যে, একজন বিশেষ কর্ম্মচারী লোকজনসহ এক-থলিয়া মোহর লইয়া, "মরুভূমির সিংহ"কে নজর দিতে এবং তিনি উক্ত পত্রবাহকের পিতা বলিয়া তাঁহাকে উমরের ধন্যবাদ জানাইতে আসিতেছেন।

ইতিমধ্যে অজেয় কাহ্লেদের প্রেরিত সওগাৎ এবং কনানার আজ্ঞাবহ একশত অনুচর আসিয়া পঁহুছিল। বেনি-সৈয়দ-জাতীয় লোকেরা এই সকল দেখিয়া অবাক্!

মশাল জ্বলিল। ভাল করিয়া আগুন জ্বালা হইল। বেদুইন-শিবিরে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই চূড়ান্ত আড়ম্বরে উৎসব হইতে লাগিল।

বৃদ্ধ সর্দ্দার কনানাকে পরাইবার জন্য অতি চমৎকার পোষাক বাহির করিয়া আনিলেন; তাহার হাতে পরাইয়া দিবার জন্য একটী অঙ্গুরীয়, পায়ে দিবার জন্য উত্তম পাদুকা আনিলেন; অনেক দিন পরে পুত্র দেশে ফিরিয়া আসিলে এই সকল দিয়া উৎসব করিবার রীতি অপব্যয়ী পুত্রের ফিরিয়া আসার কাহিনী বলিবার অনেক পূর্ব্ব-কালহইতে প্রচলিত ছিল।

কনানা এ সকল পরিলেন না। কেবল মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "পিতঃ, মেষচর্ম্মের জামা গায়ে দিয়া খালি পায়ে থাকিলেই আল্লা আমাকে ভাল চিনেন।"

বেদুইনেরা মাংস কদাচিৎ খায়—বাড়ীতে কোন উৎসব হইলেই যা কিছু খাইয়া থাকে।

বাড়ীতে অতিথি আসিলে তাড়িশূন্য রুটী তৈয়ার হয়, আর উটের দুধ ও আটাদিয়া মোহনভোগের মত কিছু প্রস্তুত করিয়া তাড়িশূন্য রুটীদিয়া অতিথিকে খাইতে দেওয়া হয়। এই মোহন-ভোগকে "আয়েশ" কহে। কিন্তু কনানা ত যে-সে অতিথি নহেন, আদরের ধন।

কোন বিশিষ্ট লোক আসিলে ঘিদিয়া কফি-তৈয়ার করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু কনানার আদর-অভ্যর্থনার জন্য ইহাও যথেষ্ট বোধ হইল না।

কোন বিশেষ মান্যগণ্য লোক আসিলে ছাগলের বা মেষের ছানার মাংস উটের দুধে সিদ্ধ করত একখানি বড় বারকোশে ঢালিয়া উপরে বসা গলাইয়া দেওয়া হয়; আবার গোম সিদ্ধ করত শুকাইয়া লইয়া, সেই গোমের আটাতে মাখনমারা ঘিদিয়া, মোহনভোগের মত পাক করিয়া, উক্ত বারকোশের ধারে ধারে দেওয়া হয়।

কম হইলেও কুড়িটা ছাগলের ও মেষের ছানা মারিয়া রাঁধা হইল, কিন্তু এত করিয়াও লোকদের বোধ হইল না যে, যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছে। একটী জিনিষ এখনও বাকি আছে—বেদুইন-জাতির সমাজে সেইটী যার-পর-নাই উপাদেয় সামগ্রী বলিয়া গণ্য; কনানার ন্যায় আদরের অভ্যাগত ব্যক্তির সম্মানার্থ সেইটী প্রস্তুত না করিলেই নয়। দুইটী মাদী উট মারিয়া মাংস প্রথমে সিদ্ধ করিয়া শেষে ভাজা হইল। কাহার জন্য এত আয়োজন?—মাসখানেক হইল, যে বালক সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল—গমনকালে যাহাকে দুইটী মিষ্ট কথা বলিয়াও বিদায় করা হয় নাই, বরং তিরস্কার ও বিদ্রূপ করা হইয়াছিল, তাহার অভ্যর্থনার জন্য।

পুরুষেরা মাংস, রুটী খাইতে ও উটের দুধ এবং কফি-পান করিতে লাগিল।—এ দিকে স্ত্রীলোকেরা অনেকে মিলিয়া, গান ধরিল। সেকালের কোন কোন বীরপুরুষের নামের স্থলে কনানার নামদিয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে লাগিল। পুরুষদিগের খাওয়া হইয়া গেলে, যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, স্ত্রীলোকেরা অন্দর-মহলে বসিয়া তাহাই খাইতে লাগিল। এদিকে "মরুভূমির সিংহ" স্বদেশানুরাগে এমন মাতিয়া উঠিলেন যে, কাহ্লেদের সৈন্যদলে মিলিয়া যুদ্ধে যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইলেন, ইহা দেখিয়া বেনি-সৈয়দজাতীয় দুইশত লোক তাঁহার সঙ্গে যাওয়া স্থির করিল।

প্রায় অপরাহ্নে কনানা এবং তাঁহার সঙ্গীরা ছাগলোমের বস্ত্রে প্রস্তুত তাম্বুতে নিদ্রা গেলেন; এদিকে বেনি-সৈয়দেরা গোম ইত্যাদি শস্যসকল ছালায় পূরিয়া উটের পৃষ্ঠে বোঝাই দিতে এবং যুদ্ধে যাইবে বলিয়া অনেকে তরোয়াল ও বল্লম ইত্যাদি অস্ত্র মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ।)
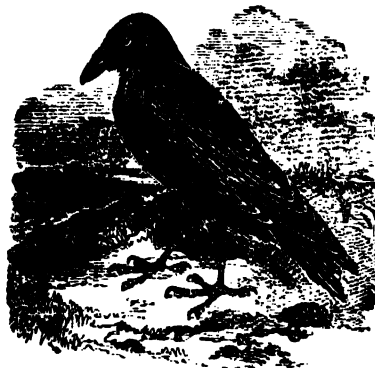
ভূতের কথা।

স্কটিশ্ চার্চ্চেস্ স্কুলের প্রধান-শিক্ষক শ্রীযুক্তবাবু মন্মথমোহন বসু এম্-এ-লিখিত।

তোমরা বোধ হয় সকলেই বাজিকরদের বাজি দেখিয়াছ। গুলি উড়াইয়া দেওয়া, মুখের ভিতরহইতে বড় বড় লোহার গোলা বাহির করা, একটা আমের আঁটি মাটিতে পুতিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাহইতে গাছ ও ফলজন্মান, একটা মানুষকে সকলের সম্মুখে কাটিয়া ফেলিয়া পুনরায় তাহাকে বাঁচান, শূন্যহইতে ঝোলান দড়ি ধরিয়া শূন্যে উঠিয়া যাওয়া—এইরূপ কত অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার বাজিকরেরা আমাদিগকে দেখায়, আমরাও অবাক্ হইয়া তাহা দেখি। সুধু আমরা কেন, আমাদের দেশের বাজিকরদের বাজি দেখিয়া অনেক বড় বড় সাহেবও অবাক্ হইয়া যান। অবশ্য ইউরোপেও অনেক ভাল ভাল বাজিকর আছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সময়ে সময়ে এদেশে আসিয়া বাজি দেখান। এ দেশেরও অনেক লোক আজ-কাল বিলাতি বাজি বা ম্যাজিক করিতে শিখিয়াছেন। এ সকল ম্যাজিকও আমাদের নিকট অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে, আমার চোকে দেশী বাজি যেন আরও অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়। আমাদের দেশের বাজিকরেরা দিনের বেলা সকলের কাছে বসিয়া কোন বিশেষ যন্ত্রাদির সাহায্য না লইয়া বাজি দেখাইয়া থাকে, আর বিলাতী ম্যাজিকওয়ালারা অনেকরকম দামী সাজ-সরঞ্জাম কলকব্জা লইয়া রাত্রিকালে দর্শকগণের বসিবার স্থান-হইতে কিছুদূরে রঙ্গমঞ্চের উপরহইতে বাজি দেখাইয়া থাকে। বলত এরূপ স্থলে কাহার বাহাদুরী বেশী?

যাহা হউক, এদেশী বাজিকর বেশী বাহাদুর, কি বিলাতী ম্যাজিক-ওয়ালা বেশী বাহাদুর, সে কথার মীমাংসা করিতে আজ আমি বসি নাই। একপ্রকার বাজি কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা তোমাদিগকে শিখা-ইয়া দিব বলিয়াই এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি। আশা করি, এই বাজি শিখিয়া তোমরা নিজেরা আমোদ পাইবে এবং আরও পাঁচজনকে আমোদ দিতে পারিবে।

আমি এই বাজির নাম দিয়াছি, "ভূতের কথা"। তোমরা বোধ হয় অনেকেই এই বাজি দেখিয়াছ। বাজিকর আসিয়া ছাদ বা ভূমি বা অন্য কোন দিকে চাহিয়া কথা কহিতে লাগিল, অমনই সেই দিক্হইতে উত্তর আসিতে লাগিল, অথচ সেদিকে কেহ নাই! বোধ হয় যেন ভূতে কথা কহিতেছে। আবার হয়ত দেখিবে, বাজিকর তাহার দুই কোলে দুই পুতুল রাখিয়া তাহাদের সহিত কথা-বার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, পুতুলেরাও মুখ নাড়িয়া স্বচ্ছন্দে তাহার কথার উত্তর দিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক ভূতেও কথা কয় না, পুতুলেও কথা কয় না; বাজিকর একলাই সকল কথা কয়, কিন্তু এমনই কৌশল করিয়া কয়, যেন বোধ হয় অন্যস্থানহইতে কথা আসিতেছে। এই ভাবে কথা কওয়ার ইংরাজি নাম 'ভেন্ট্রি-লোকিজ্ম্', এবং যে ব্যক্তি এরূপ কৌশলে কথা কহিতে পারে তাহাকে 'ভেন্ট্রিলোকিষ্ট' বলে। আমাদের দেশে এই কৌশল বহুকাল অবধি জানা আছে; যাহাদের "চণ্ড বা ভূত নামান" ব্যবসায়, তাহারা সাধারণতঃ এই কৌশল-অবলম্বন করিয়া থাকে।

ভেন্ট্রিলোকিজ্ম্ শব্দের অর্থ, পেটের ভিতরহইতে কথা কহা—যেন ভেন্ট্রিলোকিষ্ট গলাহইতে কথাটী বাহির না করিয়া তাঁহার পেটহইতে বাহির করেন! কিন্তু তোমরা জান, আমাদের পেটের ভিতর কথা কহিবার কোন যন্ত্র নাই। আমাদের যে একমাত্র স্বর-যন্ত্র আছে, তাহা আমাদের কণ্ঠের মধ্যেই আছে, আমাদের সকল কথা সেইখানেই উৎপন্ন হয়। এই যন্ত্রটী বড় চমৎকার, ইহার বিষয়ে ভেন্ট্রিলোকিষ্টমাত্রেরই একটু জানিয়া রাখা আবশ্যক, সুতরাং এসম্বন্ধে মোটামুটি দুই-চারিটী কথা বলিয়া ভেন্ট্রিলোকিজ্ম্সম্বন্ধে যাহা বলিবার আছে, বলিব।

আমাদের কণ্ঠের ভিতর দুইটী নালী আছে,—একটী শ্বাসনালী, অপরটী খাদ্যনালী; শ্বাসনালীটী সম্মুখে, আর খাদ্যনালীটী ঠিক তাহার পশ্চাতে। আমরা যাহা কিছু খাই, তাহা খাদ্যনালীর ভিতর-দিয়া পেটের মধ্যে পাকস্থলীতে যায়; আর আমরা নাক বা মুখদিয়া যে শ্বাস-বায়ু-গ্রহণ করি, তাহা শ্বাস-নালীদিয়া বুকের মধ্যে ফুস্ফুসের ভিতর যায়। পাকস্থলী খাদ্য-পরিপাকের যন্ত্র এবং ফুস্ফুস্ শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র। খাদ্যের পরিপাক হইলে রক্ত হয়, এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা রক্ত পরিষ্কৃত হয়। শ্বাসনালীর উপরের অংশই আমাদের স্বরযন্ত্র। এই যন্ত্রটী কয়েকটী উপাস্থিদ্বারা নির্ম্মিত। উপাস্থি এক-প্রকার নরম হাড়ের মত পদার্থ; ইংরাজিতে ইহাকে 'কার্টিলেজ্' বলে। আমাদের নাকের আগা ও কাণ এই পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত। আমাদের গলার যে অংশ বাহিরহইতে উঁচু ঢিপির মত দেখা যায়—যাহাকে কণ্ঠী বলে—তাহা আমাদের স্বরযন্ত্রের প্রথম ও সব চেয়ে বড় উপাস্থিটীর বাহিরের পিঠ। স্বরযন্ত্রের ভিতরটা নলের মত এবং তাহার উপরের মুখে একটী সরু লম্বা ছিদ্র আছে। আমরা নাক বা মুখদিয়া যে শ্বাস-বায়ু টানিয়া লই, তাহা এই ছিদ্রদিয়া শ্বাস-নালীতে প্রবেশ করিয়া ফুস্ফুসে যায়। আবার যখন নিশ্বাস ছাড়ি, তখন ফুস্ফুসের বায়ু এই পথদিয়া উঠিয়া আসিয়া নাক বা মুখ-দিয়া বাহির হয়। সুধু বায়ু-চলাচলের জন্যই এই পথ ব্যবহৃত হয়। যদি কোনরূপে কোন খাদ্যের কণা এই পথে যাইয়া পড়ে, তাহা হইলে "বিষম" লাগে। সেই জন্য আমরা যখন কিছু খাই, তখন একটী ছোট কবাটদিয়া ইহার উপরের মুখটী বন্ধ থাকে, আমরা এই কবাট-কেই "আলজিব" বলি। একসঙ্গে খাওয়া ও কথা কহা ভাল নয়, কারণ কথা কহিতে গেলে স্বরযন্ত্রের মুখ খোলা রাখিতে হয়, তখন যদি দৈবাৎ কোন খাদ্যের কণা খাদ্যনালীর ভিতরে না গিয়া শ্বাসনালীতে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে ভয়ানক বিষম লাগিতে পারে।
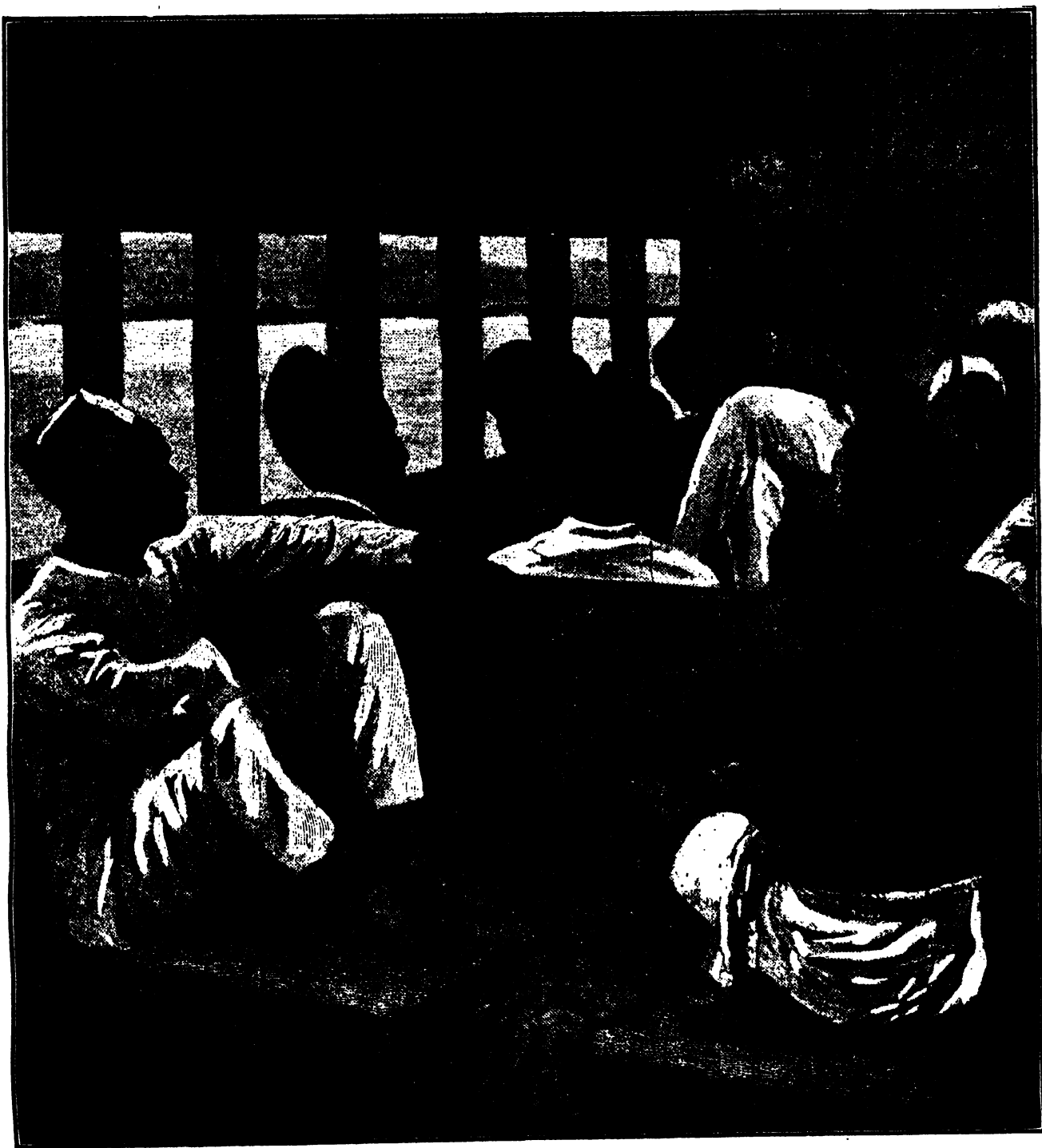
ইহারা রেলগাড়ীতে চড়িয়া যাইতে যাইতে থলী-বাঁশী-বাজাইয়া ও শুনিয়া সময় কাটাইতেছে।

স্বরযন্ত্রের মুখের ছিদ্রের দুইপাশে দুইটী তন্ত্রীর মত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরাজিতে ইহাদিগকে "ভোকালকর্ড্স্" অর্থাৎ স্বর-তন্ত্রী বলে। এই তন্ত্রী-দুইটী বাঁশীর রীডের মত, ইহাদেরই কম্পনে ধ্বনি উৎপন্ন হয়। বাঁশীতে ফুঁ-দিয়া রীড্ কাঁপাইলে যেমন বাঁশী বাজে, তেমনই শ্বাস-বায়ুর আঘাতে স্বরতন্ত্রী কাঁপাইলে শব্দ উৎপন্ন হয়। যেমন বেহালার তার যত বেশী টানিয়া বাঁধা যায়, তত বেশী জোরে তাহাহইতে শব্দ উৎপন্ন হয়, এই স্বরতন্ত্রীতেও সেইরূপ যত টান দেওয়া যায়, শব্দ তত উচ্চ হয়। যখন আমরা চুপ করিয়া থাকি, তখন তন্ত্রী-দুইটী ঢিলাভাবে পড়িয়া থাকে ও তাহাদের মধ্যে ছিদ্রটী ইংরাজি V-অক্ষরের মত দেখায়, কিন্তু যখন কথা কহিতে আরম্ভ করি, তখন উভয় তন্ত্রীতে টান পড়ে ও মধ্যের ছিদ্রটী সরু ও লম্বামত দেখায়। আমাদের গলার ভিতর যে মাংস-পেশী আছে, তাহার সাহায্যে আমরা ইচ্ছামত স্বরতন্ত্রী-দুইটীকে কম বা বেশী জোরে টানিয়া বাঁধিতে পারি, অথবা উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কম-বেশী করিতে পারি, স্বরেরও সেই অনুসারে তারতম্য হইয়া থাকে। যদি আমাদের স্বরতন্ত্রী সকল সময় টানিয়া বাঁধা থাকিত, তাহা হইলে শ্বাসবায়ুর চলাচলের সহিত তাহা-হইতে অনবরত এমন ধ্বনি উঠিত যে, আমরা সকলে অস্থির হইয়া পড়িতাম। কোন কসাইয়ের দোকানহইতে একটা ছাগল বা ভেড়ার জিহ্বাসমেত কণ্ঠনালী আনিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, এই স্বরতন্ত্রীর বিষয় আরও একটু ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। আমরা মানুষের স্বরযন্ত্রের একটা প্রতিকৃতি এই-খানে দিলাম।

১ স্বরযন্ত্র। সম্মুখদৃশ্য।

২ স্বরযন্ত্র। পার্শ্বদৃশ্য (বামদিক উন্মুক্ত করিয়া দেখান হইতেছে)।

১। বায়ুনালীর উপরিভাগ
২। কণ্ঠী-উপাস্থি।
৩। আলজিব্।
৪। স্বরতন্ত্রী।
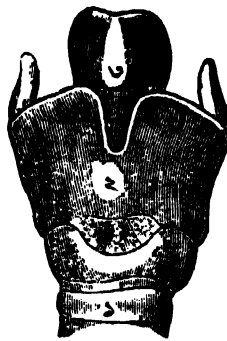
কিন্তু কেবল স্বরযন্ত্রের সাহায্যে কথা কহা যায় না। কথা কহিতে গেলে জিহ্বা, মুখগহ্বর প্রভৃতিহইতে সাহায্য লইতে হয়। অ, আ, ই, উ প্রভৃতি স্বরবর্ণ-উচ্চারণ করিতে হইলে, মুখগহ্বরের আকৃতি নানাভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। স্বরবর্ণ-উচ্চারণের সময় কণ্ঠের বায়ু বিনাবাধায় বাহির হইয়া আসে, কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণ-উচ্চারণ-কালে এই বায়ুকে নানারূপে অল্প-বিস্তর বাধা দিতে হয়। মনে কর, তুমি 'চ' এই বর্ণ-উচ্চারণ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে বর্ণটী উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বা তালুতে ঠেকাইয়া কণ্ঠহইতে বায়ু বাহির হইবার পথ কতক পরিমাণে বন্ধ করিতে হইবে। এইরূপে তালুর সাহায্যে উচ্চারিত হয় বলিয়া, চ, ছ, জ, ঝ, শ প্রভৃতি বর্ণকে তালব্য বর্ণ বলে। ত, থ, দ, ধ-উচ্চারণ করিবার সময় দন্তে জিহ্বা ঠেকাইয়া বায়ুর গতিরোধ করিতে হয় বলিয়া, উহাদিগকে দন্ত্য বর্ণ বলে। প, ফ, ব, ভকে ওষ্ঠ্য বর্ণ বলে, কারণ এই সকল বর্ণ-উচ্চারণ করিবার সময় প্রথমে ওষ্ঠ বা ঠোঁট বুজিয়া বায়ুর গতিরোধ করিতে হয়, পরে সহসা সজোরে ঠোঁট খুলিয়া বায়ু ছাড়িয়া দিতে হয়। ঙ, ঞ প্রভৃতি অনুনাসিক বর্ণ-উচ্চারণ-কালে নাসিকার ভিতরদিয়া বায়ু চালাইয়া দিতে হয়। যাহা হউক, এখানে আর উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই; কোন্ বর্ণ কেমন করিয়া উচ্চারিত হয় তাহা তোমরা একটু চেষ্টা করিলে নিজেরাই বুঝিতে পারিবে।

কেহ কথা কহিলে তুমি কেমন করিয়া বুঝিতে পার যে, সে কথা কহিতেছে? সে যদি তোমার নিকটে থাকে, তাহা হইলে তুমি তাহার ঠোঁট-মুখ-নাড়া ও মুখভঙ্গী দেখিয়া সহজেই বলিয়া দিতে পার যে, সে কথা কহিতেছে। তাহার স্বর যদি তোমার পরিচিত হয়, তাহা হইলে সে অন্তরালে থাকিলেও তুমি কেবল তাহার স্বর শুনিয়া বুঝিতে পার যে, সে কথা কহিতেছে। দূরহইতে শব্দ আসিলে, কোথাহইতে বা কতদূরহইতে শব্দ আসিতেছে, তাহা শব্দের উচ্চতা ও প্রকৃতি-অনুসারে কতকটা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি কেহ আপনস্বর-বিকৃত করিয়া অন্যস্বরে কথা কয় এবং মোটে ঠোঁট-মুখ না নড়ে, তাহা হইলে সে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকি-লেও, তুমি সহজে বুঝিতে পারিবে না যে, সে কথা কহিতেছে। তাহার উপর যদি সে অন্যদিকে চাহিয়া মুখের এমন ভাবভঙ্গী করে, যেন কথা তাহার মুখহইতে বাহির না হইয়া অন্য-স্থানহইতে আসিতেছে, আর সে তোমা-রই মত শুনিতেছে, তাহা হইলে তোমার মনে আরও ভাল করিয়া ধারণা জন্মিবে যে, অন্যলোকে কথা কহিতেছে। দর্শকগণের মনে এইরূপ ভুলধারণা জন্মা-ইয়া দেওয়াই ভেন্ট্রিলোকিষ্টের কাজ।

কিন্তু অন্যস্বর-অনুকরণ করাই বল, আর ঠোঁট-মুখ না নাড়িয়া কথা কহাই বল, সকলই অভ্যাসের ফল। বিনা অভ্যাসে কিছুই শেখা যায় না, আবার অভ্যাস করিলে সকল কাজই সহজ হয়। তুমি যদি ভেন্ট্রিলোকিজ্মের কৌশল শিখিতে চাহ, তাহা হইলে তোমাকেও অভ্যাস করিতে হইবে। মনে কর, তুমি যখন লিখিতে শিখিয়াছিলে, তখন তোমাকে কত করিয়া অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। ভেন্ট্রিলোকিজ্ম্ শিখিতে হইলে অবশ্য তত কষ্ট করিতে হইবে না। দিন আধ-ঘণ্টা করিয়া অভ্যাস করিলে দুইমাসের মধ্যেই ইহা মোটামুটি শেখা যাইতে পারে। তুমি যদি বুদ্ধিমান হও আর মনদিয়া অভ্যাস কর, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, তুমি তিনমাসের মধ্যে একজন ভাল ভেন্ট্রিলোকিষ্ট

হইয়া উঠিবে। অবশ্য যত বেশী অভ্যাস করা যায়, ততই ভাল।

কিন্তু ভেণ্টি্‌লোকিজ্‌ম্‌ শিখিলে যে উপকার পাওয়া যায়, অভ্যাসের কষ্ট তাহার তুলনায় কিছুই নহে। প্রথম উপকার, দেহের। ভেণ্টি্‌লোকিজ্‌ম্‌ অভ্যাস করিলে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত হয়, শ্বাসযন্ত্রের উত্তমরূপ চালনা হওয়াতে রক্ত পরিষ্কৃত হয়, বক্ষঃস্থল ক্রমশঃ প্রশস্ত হয়, কণ্ঠের শক্তি-বৃদ্ধি হয়, স্বরের নানারূপ ভঙ্গী করিবার ক্ষমতা জন্মে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ-শক্তি বেশ তীক্ষ্ণ হয়, পূর্ব্বে যে সকল ধ্বনি কর্ণে ঠেকিত না বা বিভিন্ন ধ্বনির মধ্যে যে সকল পার্থক্য পূর্ব্বে বুঝা যাইত না, এখন সেগুলি বুঝিবার ক্ষমতা জন্মায়। দ্বিতীয় উপকার মনের। যে বিদ্যার গুণে অনেককে আনন্দিত করা যাইতে পারে, সে বিদ্যা শিখিলে বাস্তবিকই মনে আনন্দ হয়। তাহাছাড়া, এ বিদ্যা-অভ্যাস করিলে বুদ্ধি-বৃত্তিরও যথেষ্ট চালনা হয়। বাজিকরমাত্রকেই বিশেষ চতুর, কৌশলী, রহস্যপটু ও প্রত্যুৎপন্নমতি হইতে হয়। লোক-ভুলান যাহার কাজ, তাহার বোকা হইলে চলে না। ভেণ্টি্‌লোকিষ্টকে পদে পদে উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয় দিতে হয়। এই বিদ্যার আর এক গুণ এই যে, প্রয়োজন হইলে ইহাদ্বারা অল্প ব্যয়ে বেশ অর্থ-উপার্জ্জন হইতে পারে। অতএব ভেণ্টি্‌লোকিজ্‌ম্‌ শিখিলে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সকল বিষয়েই সুবিধা হইবার সম্ভাবনা।

ভেণ্টি্‌লোকিজ্‌ম্‌ শিখিতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলি একে একে আয়ত্ত করিতে হয়। প্রথমে প্রথমটীর সাধনা করিবে, তাহার পর দ্বিতীয়, তাহার পর তৃতীয়—এইরূপে একটীর পর আর একটী বিষয়ের অভ্যাস করিলে সহজে সফলতা-লাভ করিতে পারিবে;—

(১) নিয়মিত শ্বাস-গ্রহণ ও ত্যাগ।
(২) নিকটবর্ত্তী স্বরের অনুকরণ।
(৩) ঠোঁট-মুখ স্থির রাখিয়া কথোপকথন।
(৪) ভেণ্টি্‌লোকিজ্‌মের জন্য ব্যবহৃত পুতুল চালাইবার কৌশল।
(৫) দূরস্বরের অনুকরণ।
(৬) নানাপ্রকার ধ্বনির অনুকরণ।
(৭) দর্শকগণের সম্মুখে ক্রীড়া-প্রদর্শন।

(ক্রমশঃ।)

আজগবী সখ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বুদ্ধিসম্বন্ধে মাসিমার কাছে অমন "সার্টিফিকেট" পাওয়া সত্ত্বেও চোর তো ধরিতে পারিলাম না।

মাসিমার ভয় ঘুচিল না, তাহার উপর তাঁহার একটু অসুখের মতও হইল। কাজেই মাসিমার অনুরোধে আমাকে কএকদিন বরাহনগরেই থাকিতে হইল। ইহাতে আমার আপত্তি ছিল না। কলিকাতার ধূলি ও 'পিনাল কোডের' পাতা—দুইটীর একটিও রুচিকর নহে, এদিকে রুইমাছের মুড়া ও কলমের আম দুই-ই রসনা আর্দ্র করিয়া দেয়। সুতরাং মাসিমাকে বড় সাধিতে হইল না, আমি আপাততঃ বরাহনগরেই বিরাজ করিতে লাগিলাম।

এইভাবে দিন-চারেক কাটিল। এই চারদিন চোরের গৌরমূর্ত্তি আমার নেত্রপথে পড়িল না। পঞ্চমদিনের রাত্রে বিছানায় শুইয়া আছি—ঘুম হইতেছে না; একটা দাঁত বড় কন্‌কন্‌ করিতেছে। যন্ত্রণায় আঃ উঃ করিতে করিতে মাসিমার হল-কামরার ঘড়ীতে একটা বাজিল, শুনিলাম। তাহার পর, বোধ করি, একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। মাসিমার হল-কামরার ঘড়ীটা বড় চেঁচায়! ঢ-ঙ ঢ-ঙ ঢ-ঙ করিয়া যাই তিনটা বাজিল, অমনি আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে আমি যে ঘরে শুইয়াছিলাম, সেই ঘরের নীচেকার ঘরের বাহিরের জানালার দিকে কি-একটা আওয়াজ হইল।

অমনি আমার হঠাৎ চুরীর কথাটা মনে পড়িয়া গেল। তখনই আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া আমি নীচে নামিয়া আসিলাম। নীচে একেবারে ঘুট্‌ঘুটে আঁধার, কেবল একটা লোহার গরাদে-দেওয়া খোলা জানালাহইতে একটু মৃদু চন্দ্রালোক প্রবেশ করিতেছে। কে বাহিরের দরজাটা খুব সন্তর্পণে খুলিয়া আমি যে ঘরে শুইয়াছিলাম, তাহার নীচেকার ঘরের ভিতরকার দরোজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি তখন সিঁড়ির শেষধাপে, আমার বুকের ভিতরটা মুহূর্ত্তেকের নিমিত্ত দপ্‌দপ্‌ করিল, তাহার পর আমি নিঃশব্দে সিঁড়িহইতে নামিয়া উহার পিছনে গা-ঢাকা হইলাম। লোকটা মিনিট-দুই-তিন চুপ্‌ করিয়া সেই ঘরের দরোজার কাছে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর, হাঁতড়াইয়া চাবির ছিদ্র খুঁজিয়া, চাবিদিয়াই হউক বা কোন যন্ত্রদিয়াই হউক, সে ঘরেরও কুলুপ খুলিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিল। দরজা ভেজান উচিত ছিল, কিন্তু, বোধ করি, উত্তেজনাবশতঃ তাহা ভুলিয়া গেল। আমার সুবিধাই হইল, আমি তাহারই মত নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে তাহার পিছনে পিছনে গিয়া ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সে একটু দম্‌ লইয়া একটা দিয়াশলাই জ্বালিয়া ফেলিল,—সে দিয়াশলাই জ্বালিবার সময় একটুও আওয়াজ হয় না। আমি আর তাহাকে কোন কিছু দেখিতে না দিয়া একেবারে বাঘের মত

তাহার উপর লাফাইয়া পড়িলাম। সে একটু ধস্তাধস্তি করিয়াছিল, কিন্তু আপনাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে আমি তাহাকে সহজেই কাবু করিয়া ফেলিলাম। তাহাকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া দেখি—একি! এ যে আমাদের কুসুমের সেই মামাতো ভাই!

সে আর টুঁ টাঁ করিল না। আমিও বাড়ীর আর কাহাকেও না জাগাইয়া তাহাকে পথে টানিয়া আনিলাম, সেখানে এক লাল-পাগড়ীর সহায়তায় তাহাকে থানায় লইয়া চলিলাম, সে লক্ষ্মী ছেলেটির মত সুড়্‌সুড়্ করিয়া থানায় চলিল।

পরে টের পাইলাম, সে একটা ইস্কুলের বখাটে ছোক্‌রা। শ্রীধাম বটতলার ছ'পয়সা দামের ডিটেকটীভ-নভেলগুলা পড়িয়া তাহার মাথা বিগড়িয়া গিয়াছে; তাহার সাধ হইয়াছে, সে চৌর-চূড়ামণি হইবে। তাহার পড়িবার ঘরহইতে 'বমাল' বাহির হইল। আর যায় কোথা? কুসুমকে ভোগাদিয়া সে ঘরের ছিরাবৃত্ত চাবিগুলি যোগাড় করিয়াছিল। কুসুম বাল-বিধবা, এই ছোক্‌রা তাহাকে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। তাহার বাড়ী কালীঘাটে নহে, বাগবাজারে।

কুসুমের সেই অবধি "ব্রাহ্মমতে" অরুচি জন্মিয়াছে; জেলহইতে খালাস হইয়া, আশা করি, ছোক্‌রারও আজগবী সখটা মিটিয়া যাইবে!

সম্পূর্ণ।

মাষ্টার মদন

তোমরা অনেকেই হয় ত মাষ্টার মদনের নাম এবং সভা-সমিতিতে তাহার গীত গাহিবার কথা শুনিয়াছ। কিন্তু অনেকেই হয় ত এই সুকণ্ঠ বালক-গায়কের গান শুনিবার কিম্বা এই প্রিয়দর্শন বালকটিকে দেখিবার সুযোগ আজও পর্য্যন্ত পাও নাই। তোমাদের এই দুইটি সাধ কতকটা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে আজ আমরা তোমাদিগকে তাহার সুন্দর প্রতিকৃতিটি উপহার ও এই সঙ্গে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

মাষ্টার মদনের পূর্ণনাম,—মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়। ইহার পিতা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার এই গায়ক ছেলেটিকে লইয়া কলিকাতায়, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে, বাস করিয়া থাকেন। মদনের বয়স যখন দুইবৎসর নয়মাসমাত্র, তখন সে একদিন একাকী ছাদে বসিয়া একটি গান ধরিয়া দিয়াছে, তাহার গীতজ্ঞ পিতা তাহা শুনিতে পাইয়া হারমনিয়ামের সঙ্গে তাহার সেই গান মিলাইতে লাগিলেন; দেখিলেন, হারমনিয়ামের সুরের সঙ্গে শিশুটির কণ্ঠের সুর বেশ নিখুঁতভাবে মিলিয়া গেল। এই ব্যাপারটি আবিষ্কৃত করিয়া তিনি যে বড় আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পর মদনের বয়স যখন তিনবৎসর দুইমাসমাত্র, তখন সে একদিন পিতার কোলে চড়িয়া একটা বড় মজলিসে গান গাহিতে গেল। অতটুকু ছেলে গান গাহিবে শুনিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন। বসন্তবাবু বরং, সেই মজলিসের বড় বড় লোকদের দেখিয়া, কিছু থতমত খাইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু মাষ্টার মদন নির্ভীকচিত্তে সেই আসরে বসিয়া সেখানে উপস্থিত সকল ভদ্রলোককে তাহার মিঠা গলার কয়েকটি শক্ত শক্ত সুরতালযুক্ত গান শুনাইল। যখন তাহার বয়স চারবৎসরমাত্র,—হাতে খড়ি হয় নাই, তখন সে তিরাশীটি গান মুখস্থ করিয়াছিল, এবং সকলগুলিই, একটি অক্ষরও ভুল না করিয়া, সুরতান-লয়-শুদ্ধ করিয়া গাহিতে পারিত। এখন তাহার বয়স ছয়বৎস-

রের উপর হইয়াছে, এখন সে একশতেরও উপর গান আয়ত্ত করিয়াছে এবং সেগুলি সে ভারতীয় সঙ্গীতের সুর, তাল, বা লয়-ঘটিত সমস্ত খোঁচ্‌খাঁচ্‌ বজায় রাখিয়া এমন নিপুণভাবে সকলের মনোমত ধরণে গায় যে, বড় বড় ওস্তাদেরা পর্য্যন্ত তাহার কোন ভুল ধরিতে পারেন না। তাঁহাদের বরং কখন কখন তাল কাটিয়া যায়, সুরের এদিক-ওদিক হয়, কিন্তু মাষ্টার মদনের বড় ত্রুটি ঘটে না। অনেক লোক সমস্ত জীবন ধরিয়া যাহা না শিখিতে পারে, মাষ্টার মদন এত অল্প বয়সেই তাহা নিখুঁতভাবে শিখিয়া ফেলিয়াছে। তাহার পিতা হারমনিয়াম বাজান, এক জন ভাল "তালিম" বাঁয়া-তব্‌লার সঙ্গত করিতে থাকেন, আর সে ধ্বনিধর(ফনোগ্রাফ) যন্ত্রের ন্যায়, নিখুঁতভাবে, হাতদিয়া তালনির্দ্দেশ করিতে করিতে, গান গায়। আগেই বলিয়াছি, সে এখন শতাধিক গান শিখিয়াছে। এই গানগুলি কেহ তাহাকে তেমন যত্ন করিয়া শিখায় নাই, সে শুনিয়া শিখিয়াছে; তা'ছাড়া, শুনা যায়, সে তাহার ঠাকুরমার কাছহইতে শুনিয়া মহাভারত ও রামায়ণ আগা-গোড়া কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং এ ছেলেটির যেমন মেধা, তেমনই স্মরণ শক্তি, দুইই বিস্ময়করী।

সে অনেক বড় বড় মজ্‌লিসে গান গাহিয়াছে। এত সোণার ও রূপার মেডেল পাইয়াছে যে, সবগুলি একসঙ্গে পরিতে পারে না। এখন ভারতবর্ষের সব জায়গার লোকই তাহার নাম শুনিয়াছেন। ইউরোপেও অনেক স্থানে নাকি তাহার কীর্ত্তি রটিয়াছে। তাহার মত এত অল্প-বয়স্ক ও নিপুণ গায়ক, বোধ হয়, আর কোন দেশে নাই। সকলের চেয়ে সুখ্যাতির কথা এই যে, সে তাহার গান শুনাইয়া কয়েকবার টাকা রোজগার করিয়াছে, এবং সেই টাকা দীনদুঃখীদের বিতরণ করা হইয়াছে।

যতদিন সে এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন যদি সে তাহার গীতশক্তির এই রকমই ভাল ব্যবহার করে,—ঈশ্বরের ও অনাথ-আতুরের সেবার্থেই এবং নির্ম্মল আমোদ-প্রমোদের নিমিত্ত গান গায়, এবং তাহার উপর যদি সে চরিত্রটি খুব ভাল রাখিতে পারে, তাহা হইলে আমরা মুক্তকণ্ঠে এই আশীর্ব্বাদ এবং ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি, সে শতায়ুঃ ও সকলেরই স্নেহ, প্রীতি বা শ্রদ্ধার পাত্র হউক, এবং সুবর্ণপদকের স্তূপের মধ্যে বসিয়া থাকুক।

বাঙাল

শ্রীরামপুরের আলেক্‌জাণ্ড্রা মেমোরিয়াল বোর্ডিং স্কুলে আশীটি ছেলে থাকে, তাহার মধ্যে অতি অল্প ছেলেই "বাঙালকে" দেখিতে পারে; তাহার প্রথম কারণ, সে বাঙাল; দ্বিতীয় কারণ, দুই বৎসর আগে যখন সে এই বোর্ডিংএ আসিয়াছিল, তখন সে "বুড়োছেলে" চতুর্থশ্রেণীতে পড়িত; তৃতীয় কারণ, সে কোন খেলাধূলা করিতে বা কাহারও সঙ্গে বড় মিশিতে চায় না, কেবলই বই মুখে করিয়া বসিয়া থাকে; তাই সে সকলেরই উপহাস ও বিদ্রূপের পাত্র।

কুলচন্দ্র মৌলিক (বাঙাল) প্রথমে যখন এই স্কুলে আসিয়াছিল, তখন, আগেই জানাইয়াছি, সে চতুর্থশ্রেণীতে পড়িত, তাহার জন্য সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করিত, কিন্তু সেই বৎসরের মধ্যেই "ডবল্‌ প্রমোশন্‌" পাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠে, ইহাতেও কিন্তু সে অনেক ছেলের বিষদৃষ্টিতে পড়ে। এখন সে প্রায় সব ছেলেরই চোকের বালী, কেবল করুণানিধান বলিয়া একটি ছেলে তাহাকে বড় ভালবাসে, সে প্রায়ই তাহার হইয়া অন্য ছেলেদের দু'কথা শুনাইয়া দেয়। প্রবেশিকা-শ্রেণীতে ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় এ বৎসর বাঙালই প্রথম হইয়াছে, শিক্ষকেরা আশা করিতেছেন সে-ই এ বৎসর প্রবেশিকা-পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের বৃত্তিটি পাইবে।

বৈকালিক রৌদ্র প্রায় পড়িয়া গিয়াছে। ছেলেরা বোর্ডিংএর প্রাঙ্গণে খেলিতে নামিয়াছে। এই সময়ে বাঙাল একখানি বই হাতে করিয়া ক্রীড়া-ক্ষেত্রের একটি নির্জ্জন কোণে গিয়া আশ্রয় লইল। করুণানিধান তাহাকে দেখিতে পাইয়া বোর্ডিংএর শান্ত-প্রকৃতি ছেলেদের "যম" গদাধরকে বলিল,—

"বাঙাল যদি স্কলারশিপ্‌ না পায়, ওর পড়া-শুনা একেবারে বন্ধ হ'য়ে যা'বে। তবে আমার বিশ্বাস ও-ই এ বছর স্কলারশিপ্‌ পা'বে।" গদাধর মুখ ভেঙাইয়া বলিল,—"হাঁ পাবে! স্কলারশিপ্‌ ছেলের হাতের মোয়া কি না, টপ্‌ ক'রে কেড়ে নিয়ে মুখে পুরে দিলেই হ'ল আর কি?"

করুণানিধান। "আমি বল্‌ছি —"

গদাধর। "আরে দূর দূর! ওর নাম করিস্‌ নে; ওর মত নিমুরুদে ছেলে এ বোর্ডিংএ আর একটিও নেই। করুণা, আমি তোকে এখনথেকেই ব'লে রাখ্‌ছি, ও যদি আজ মাঝ-রাত্রে আমাদের সঙ্গে যেতে না রাজি হয়, তা' হ'লে আজ ওর একদিন, কি আমারই একদিন!"

পাঁচু (পঞ্চানন) গদাধরকে দেখিতে পারে না; বাঙালের উপরও তাহার মমতা নাই, কিন্তু তাহার মহাশত্রু গদাধর ওকথা বলিল বলিয়াই, সে বাঙালের সপক্ষ হইয়া বলিয়া উঠিল,—"আরে নে নে! ওর একদিন, কি তোরই একদিন! বাঙাল তোর থোঁতামুখ ভোঁতা ক'রে দিয়ে ফোর্থক্লাসথেকে একেবারে সেকেণ্ড-ক্লাসে উঠে গেছ্‌ল ব'লে তাই বুঝি তুই ও বেচারার পেছনে লেগে আছিস্‌? দেখ্‌বি, দেখ্‌বি, ও-ই স্কলা'শিপ পাবে।"

গদাধরকে অনেক ছেলে ভয়ে ভক্তি করিয়া থাকে। মনে মনে কিন্তু অনেকেই তাহার উপর চটা। পাঁচুর মত আর একজন "পালের গোদাকে" বাঙালের পক্ষে হইতে দেখিয়া, অনেকেই তাহার প্রতি সহানুভূতি-প্রকাশ করিতে লাগিল। ইহাতে গদাধর "তেলে-বেগুণে" জ্বলিয়া গেল। বিড়াল নরম মাটীই আঁচড়ায়, সে আর কাহারও কিছু করিতে না পারিয়া বাঙালকে আদেশসূচক স্বরে ডাকিল,—"এই বাঙাল, শোন্—শুনে যা!" বাঙাল ভয়ে ভয়ে তাহার কাছে আসিল। সে ভাবিয়াছিল, গদাধর তাহার চিরপ্রথামত তাহাকে দুই-চারিটা হাড়-জ্বালান বচন শুনাইয়া ছাড়িয়া দিবে, তাহার জন্য সে প্রস্তত হইয়াও আসিয়াছিল, কিন্তু গদাধর তাহাকে যাহা বলিল, তাহা শুনিয়া তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

কথাটা এই। গদা, পাঁচু, কালাচাঁদ প্রভৃতি কয়েকটা দুষ্ট-ছেলে একদিন স্কুল-পালাইয়া দেখিয়া আসিয়াছে, বারাকপুরের একটি বাগানে অনেক কলমের আমগাছ আছে; তাই তাহারা স্থির করিয়াছে, আজ মাঝ-রাত্রে কয়েকটা বড় বড় ছেলে সাঁতার দিয়া গঙ্গাপার হইয়া সেই বাগান-হইতে আম-চুরী করিয়া খাইয়া আবার সাঁতারদিয়াই গঙ্গাপার হইয়া সকাল হইতে-না-হইতে বোর্ডিংএ ফিরিয়া আসিবে।

গদাধর বলিল,—"এই বাঙাল, শোন্, আমরা আজ মাঝ-রাত্রে গঙ্গাপার হ'য়ে বারাকপুরের সেই বাগানে যা'বই যা'ব। আমরা 'লটারি' ক'রেছি, তা'তে যা'র যা'র নাম উঠেছে, তা'কে তা'কে যেতেই হ'বে। তা'তে তোর নামও উঠেছে।"

বাঙাল দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিল,—"আমি যা'ব না।"

গদাধর বড়ই উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—"যাবি না? কেন যাবি না, জাস্তে পারি কি? ভয় কর্‌ছে, নীলমণিবাবু (বোর্ডিংএর সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট) মারবে? দু'ঘা খাইলে কুলচন্দ্র একেবারে অক্কা পাইবেন! হত্তোর বাঙাল ভূত! তবে এ বোর্ডিংএ ম'র্‌তে এয়েছিস্ কেন? যা কুলোয় শুয়ে তুলোয় দুধ খেগে যা'। 'বাঙাল বরো হেয়ান'—আচ্ছা তুই কেমন না যাস্, আমি দেখ্‌বো।"

বাঙাল বলিল,—"এ রকম করা বরো অন্যায়, তাই আমি যা'ব না।"

গদাধর। " 'বরো অন্যায়'! কি আমার ধর্ম্মপুত্তর যুধিষ্ঠির রে! বল্ না নীলুখুড়োর কোঁৎকাগাছা 'বরো করা'—তা' না ধর্ম্ম ফলাচ্ছেন—বরো অন্যায়! বাঙাল, পুঁটী মাছের কাঙাল, পালা, পালা, ওই জুজু!"

সকলে হাসিয়া উঠিল। বাঙাল বলিল,—"গদাধর, তুমি আমারে ল'য়ে যত ইচ্ছা তামাসা করো, এ কাজ আমি কিছুতেই ক'র্‌বো না; তোমারও করা উচিত নয়।"

পাঁচু বলিল,—"ইস্! তাইতো রে বাঙাল! বক্তিমে কর্‌তে লাগ্‌লি যে! যা যা ঐ রাস্তার মোড়ে গিয়ে বক্তিমের ছটা ছুটিয়ে দে। আজ আমি তোর হ'য়ে দু'কথা বলেছি, তুই যদি আজ আমাদের সঙ্গে নিশান্‌ঘাটে না যাস্ তো আর কক্‌খোনা ব'লবো না। কি মনে ক'রেছিস্, তুই বুঝি আমাদের নামে 'নীলুখুড়ো'র কাছে চুক্‌লি কাট্‌বি?"

"না আমি চুক্‌লিও ক'র্‌বো না, যা'বও না।" এই বলিয়া বাঙাল সেখানহইতে চলিয়া গেল।

গদাধর তাহাকে শুনাইয়া বলিল,—"তুই ত তুই, তোর ঘাড় যে, সে যা'বে!"

বাঙাল যে কাহারও বড় প্রীতিপাত্র ছিল না, তাহা বুঝা গেল; কিন্তু সকলেই তাহার উপর এই বিশ্বাসটুকু রাখিত যে, সে যাহা বলে, তাহা করে। তাই সে যে নীলমণিবাবুর কাছে এই কথা বলিয়া দিবে—এ ভয় কাহারও হইল না।

বাঙাল দুইবৎসর এই বোর্ডিংএ আছে। ইহার মধ্যে সে কঠিন পরিশ্রম করিয়া পড়া-শুনায় যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। সে খেলা-ধুলা করিতে চাহিত না বলিয়া, সকল ছেলেই তাহার উপর বিরক্ত ছিল বটে, কিন্তু তাহার সৎস্বভাব ও আত্মসম্মানজ্ঞানের জন্য সকলেই তাহার প্রশংসা করিত। আজ নিশীথে কিন্তু কুলচন্দ্রকে অধ্যক্ষের বিনানুমতিতেই বোর্ডিংত্যাগ করিতে হইল।

রাত এগারটার সময় অন্য রাত্রির ন্যায় আজও দ্বিতীয় শিক্ষক-মহাশয় ছেলেদের শুইবার ঘরে একবার ঘুরিয়া গেলেন, তখন সব ছেলেই যেন ঘুমাইতেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তখন বড় ছেলে-দের সকলেই প্রায় জাগিয়াছিল, কেবল বাঙাল-বেচারাই অঘোরে ঘুমাইতেছিল, দ্বিতীয় শিক্ষক বিদায় হইবার অল্পক্ষণ পরেই বার-তেরজন ছেলে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল এবং দুইতিনমিনিটের
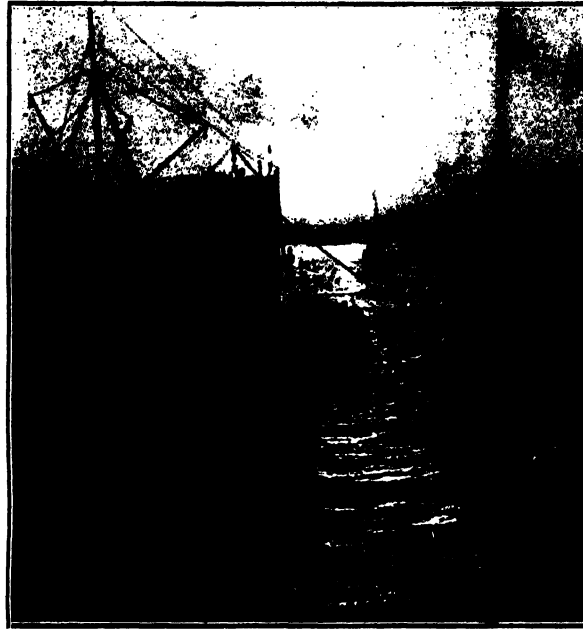
মধ্যে কাপড় গুছাইয়া পরিয়া গামোছা কোমরে বাঁধিয়া প্রস্তুত হইল। এই সব কাজ যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে সম্পন্ন হইল, কেহ বড় আওয়াজ করিল না। গদাধর ও পাঁচু বাঙালকে জাগাইবার আগে তাহাকে বেশ করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল ও তাহার মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিল। তাহার পর, কয়েকজন ছোক্‌রাতে তাহাকে পাঁজা-কোলা করিয়া নীচে নামাইয়া আনিল এবং কৌশলপূর্ব্বক প্রাচীর টপ্‌কাইয়া রাস্তায় গিয়া পড়িল। পথে তাহারা চৌকিদারের ভয়ে সদর-রাস্তা ধরিয়া না চলিয়া গলি-ঘুঁজিদিয়া যাইয়া শ্রীরামপুরের ঘাটে উপস্থিত হইল। দেখিল, ঘাটে একটিও মানুষ নাই, গঙ্গায় জোয়ার আসিয়াছে, তাহার সাদাজলে চাঁদের আলো পড়িয়া এমন সুন্দর দেখাইতেছে যে, তাহারা খানিকক্ষণ মুগ্ধ হইয়া জাহ্নবীর শ্বেতজলে সেই শুভ্রকৌমুদীর শোভা দেখিল। তাহার পর, সকলে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। গদাধর ও পাঁচু বাঙালের কোমরে নিজে-দের ধুতির এক অংশ বাঁধিয়া তাহাকে হিড়্‌ হিড়্‌ করিয়া জলে টানিয়া লইয়া গেল এবং ডুবজলে পঁহুছিয়া সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। বাঙালও অগত্যা সাঁতার দিতে বাধ্য হইল। তখন অবশ্ঠ তাহার মুখের কাপড় খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

গঙ্গাপার হইয়া তাহারা বারাকপুরের সেই বাগানে উপস্থিত হইল। সেখানহইতে বাঙালছাড়া আর সকলেই পেট ভরিয়া আম খাইয়া সকলেই আবার গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিল। ইচ্ছা, পুনরায় গঙ্গাপার হইবে। মাঝ-গঙ্গাপর্য্যন্ত পঁহুছিয়া তাহারা সকলেই প্রায় ক্লান্ত হইয়া পড়িল, জোয়ারের বড় টান, দমও ফুরাইয়া আসিয়াছে, আর সাঁতার দিতে পারে না, অনেকেই গা-ভাসান দিল; কিন্তু প্রভাত না হইতেই বোর্ডিংএ ফিরিতে হইবে, নতুবা নিস্তার নাই, সুতরাং গা-ভাসান দেওয়া চলিল না, তাহারা অতিকষ্টে সাঁতার দিতে লাগিল। কাছে একখানি নৌকা নাই যে, তাহাতে চড়িয়া পার হয়। গদাধর খুব লক্ষ্য করিয়া দেখিল, নিশানঘাটে একখানি নৌকা রহিয়াছে। বলিল,—"কা'র দম্‌ আছে, কে সাঁত্‌রে গিয়ে ঐ নৌকোখানা আমাদের কাছে আন্‌তে পারে?"

কালচাঁদ বলিল,—"এ আমরা মাঝ-গঙ্গায়, যে দিকেই যাই—সমানই দূর। কেউ যদি আবার নিশান-ঘাটে ফিরে যেতে পারে, তা'হ'লে সে শ্রীরামপুরের ঘাটেও যেতে পারে। আজ আমাদের দফা রফা।"

বাঙাল বলিল,—"আমি ও না-খান আন্‌তেছি।"

গদাধর তাহাকে ধমক্‌ দিয়া বলিল,—"বড় বাহাদুর! মর্‌বার আর সময় পেলিনি, এখন ইয়ার্কী কচ্ছিস্‌?"

বাঙাল গদাধরের কথা কাণে তুলিল না, সে সত্যই নিশান-ঘাটের দিকে সাঁতারিয়া চলিল!

অন্য সব ছেলে নিরুপায় হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারা বড় ধীরে ধীরে—প্রাণ হাতে করিয়া সাঁতার দিতেছিল। তাহাদের হাত-পায়ে খিল্‌ ধরিতেছে—অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িতেছে—শীত ধরিয়াছে। সকলেই নিজ নিজ প্রাণ লইয়া ব্যাকুল, কেহই বাঙালের দিকে লক্ষ্য ঠিক রাখিতে পারিল না, সুতরাং সে মরিল কি বাঁচিল, তাহা কেহ বলিতে পারিল না। একমিনিট্‌ দুই-মিনিট্‌ করিয়া প্রায় পনরমিনিট্‌ কাটিয়া গেল। বাঙালের দেখা নাই; সে কি আর আছে? সকলেরই মন বলিতে লাগিল—সে আর নাই, মরিয়াছে। ছেলেরা আর সাঁতার দিতে পারে না; দুই-একজন জলে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। এমন সময়ে, দূরে দাঁড়ের ঝুপ্‌-ঝুপ্‌-আওয়াজ পাওয়া গেল। গদাধর বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, একখানা নৌকা জোরে জোরে দাঁড় বাহিয়া তাহাদের দিকেই আসিতেছে, ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল, বাঙাল একটা দাঁড় ধরিয়াছে। সকল বালক উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, যে বালক-দুইটা হাবুডুবু খাইতেছিল, কালচাঁদ ও পাঁচু তাহাদের সন্তরণে সাহায্য করিতে লাগিল। সকলে হাঁফ্‌ ছাড়িয়া বাঁচিল। পান্সীখানা নিকটস্থ হইলে, মাঝি কাছি ফেলিয়া দিল, বালকেরা তাহা ধরিয়া ধরিয়া পান্সীর উপর উঠিয়া শীতে থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

* * * *

ছেলেরা মরার মত হইয়া বোর্ডিংএ ফিরিয়া দেখিল, সকলে জাগিয়াছে, তাহাদের পলায়ন-বার্ত্তা অধ্যক্ষের গোচর হইয়াছে, তিনি তাহাদের অনুসন্ধানে লোক ছুটাইয়াছেন। তাহাদের ফিরিতে দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন, এই কয়টা অশান্ত ছেলেকে বিলক্ষণ উত্তম-মধ্যম দিয়া বোর্ডিং ও স্কুলহইতে নাম কাটিয়া ও কাটাইয়া তাড়াইয়া দিবেন। তাহাদের আপাততঃ একটী ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা হইল। বাঙালের সেই দিনই প্রবল জ্বর হয়, এখন তাহার বিকার হইয়াছে। দোষী ছেলে-কয়টা নিজেদের বিপদের কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল বাঙালের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। নীলমণি-বাবুর রাগ এখনও পড়ে নাই; তিনি বলিতেছেন, বাঙাল ভাল হইলে সকল অপরাধী বালকেরই নাম কাটিয়া দূর করিয়া দিবেন। তাই বাঙালের ভবিষ্যতের ভরসা স্কলারশিপের কথা মনে করিয়া সব ছেলেই দারুণ অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে।

* * * *

তাহার পর কিছুদিন গত হইয়াছে। প্রবেশিকা-পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, পরীক্ষার ফলও বাহির হইয়াছে। বোর্ডিংএর ছুটী হইতে আর একদিনমাত্র বাকী আছে। অদ্য বৈকালে পারিতোষিক-বিতরণ হইবে। বৈকালবেলা বিদ্যালয়ের সভাগৃহ স্কুলের ছেলেতে, তাহাদের অভিভাবকে ও মাষ্টার-পণ্ডিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পুরস্কার-বিতরণ আরম্ভ হইল; প্রধান-শিক্ষকমহাশয় বার্ষিক-বিবরণী পড়িবার আগে, যে সব ছেলে নীলমণিবাবুর বিনানুমতিতে নিশীথে গঙ্গাপার হইয়া বারাকপুরের বাগানহইতে আমচুরী করিয়া খাইতে গিয়াছিল, তাহাদের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, সে ছেলেদের, নাম তিনি কাটিয়া দিলেন। তাহাতে ছেলেদের

সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অভিভাবকেরাও নিম্নস্বরে প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। প্রধান-শিক্ষকমহাশয় হাত তুলিয়া তাহাদের থামিতে বলিলেন। তাহার পর, তিনি ছল-ছল চোকে বলিতে লাগিলেন,—

"আপনারা শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন, কুলচন্দ্র সম্প্রতি চেতনা-লাভ করিয়াছে। সচেতন হইয়াই প্রথমে দোষী ছেলেদের হইয়া আমার কাছে মাফ চাহিয়াছে, তাহার সেই কাতর অনুনয়-উপেক্ষা করিতে না পারিয়া আমি ছেলেদের ক্ষমা করিয়াছি। ছেলেরা, কুলচন্দ্র ঐভাবে গঙ্গাপার হইয়া যদি এতদিন শয্যাশায়ী না থাকিত, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই বৃত্তিলাভ করিত। এখন তোমাদের ইচ্ছা কি, যাহার বৃত্তিটি পাওনা, তাহার বদলে কুলচন্দ্রকেই যদি ঐ বৃত্তিটি দেওয়া যায়, তাহাতে তোমাদের মত আছে কি?"

সব ছেলে অনেকক্ষণ ধরিয়া সম্মতি-সূচক করতালি-দিয়া সভা-গৃহটি নাদময় করিয়া তুলিল!

সম্পূর্ণ।

বারাণসী।

উচ্চৈঃশ্রবা।

১৩

লংলে-পাহাড়ের উচ্চ টিকড়সকলে বিস্তর বন্য ছাগ চরিয়া বেড়ায়, এ সকল স্থান অনেকটা নির্বিঘ্ন। একদিন দৈবাৎ মটুমটু রাজাটাকে সঙ্গে করিয়া, লংলের এক উচ্চ টিকড়ে আসিয়া, উচ্চৈঃ-শ্রবাকে দেখিতে পাইল। রাজাটার শিকারী কুকুরতিনটাই সঙ্গে। শিকারীরা প্রকাশ্যভাবে না আসিয়া, আঁকা-বাঁকা-পথে, খানা-খন্দের ভিতর-দিয়া, যেখানে পাঁঠাটা ছিল, সেইদিকে চলিল। ইহার আগে যেমন হইয়াছিল, আজও তাই হইল। কোথায় বা পাঁঠা, কোথায় বা কি; শিকারীরা কিছুই দেখিতে পাইল না; কিন্তু উহারা পাঁঠাটাকে যেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, ঠিক সেইখানে পাঁঠার বড় বড় পায়ের দাগমাত্র দেখিতে পাইল। তাই মটুমটু ভাবিল, ঠিক পাঁঠাই দেখিয়াছিলাম, আমার চখের তেমন দোষ জন্মে নাই। কিন্তু এই স্থানের চারিদিকেই কেবল পাথর, মাটী ছিল না, সুতরাং পাঁঠা কোন্‌দিকে গিয়াছে, পদচিহ্ন ধরিয়া তাহা ঠাওর করিবার উপায় ছিল না। ঠাওর করিতে পারিলেও উচ্চৈঃ-শ্রবা আবার আশ্চর্য্যরূপে অদৃশ্য হইত। কিন্তু কুকুরগুলি আশে পাশের প্রায় সমস্ত গর্ত্ত ও ঝোঁপ শুঁকিয়া শুঁকিয়া, অকস্মাৎ

জোরে ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। কুকুরের ডাক শুনিবামাত্র এক প্রকাণ্ড প্রাণী এক খোঁদলহইতে লাফাইয়া উঠিল—এ সেই উচ্চৈঃশ্রবা, লংলে-পাহাড়ের পাঁঠাদলের ভীমসেন। সরু বেতের ছোট ছোট ঝোঁপ, অসমান স্থান, ভাঙ্গা পাথরের বড় বড় টুক্‌রা, লাফাইয়া, ডিঙ্গাইয়া, ঘাড়ের সুন্দর কেশরগুলি দোলাইতে দোলাইতে ও নাচাইতে নাচাইতে উচ্চৈঃশ্রবা দক্ষিণদিকে চলিল। এই দেখিয়া, দলস্থ আর সকল ছাগল নানা ঝোঁপের আড়াল ও গর্ত্ত-হইতে লাফাইয়া উঠিয়া, উচ্চৈঃশ্রবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণে লাফাইতে ও দৌড়িতে লাগিল। এমন সময়ে বন্দুকের আওয়াজ হইল, কিন্তু ঠিক এই সময়ে কুকুরেরা প্রকাণ্ডকায় উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখিতে পাইয়া এবং অনেকটা কাছে গিয়া ভয়ানক ঘেউ-ঘেউ-শব্দ করিয়া উঠিল, কাজেই ছাগলেরা বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইল না। সকলেই অতি বেগে দৌড়িয়াছে, উচ্চৈঃশ্রবা অগ্রে; সে যেদিকে যাইতেছে, সকলেই সেইদিকে ছুটিয়াছে। এইরূপে ছাগলেরা যেন উড়িয়া উড়িয়া, পাহাড়ের উপরদিকে উঠিতে লাগিল। কিন্তু সোজাসুজি নয়, এঁকেবেঁকে, একবার ডানদিকে, আবার বামদিকে, এইরূপে যেন খেলিতে খেলিতে চলিল। যদি উচ্চ, নীচু, উব্‌ড়ো-খাবড়ো জায়গা না হইয়া, সমান জমি হইত, কুকুরেরা এতক্ষণ পিছনদিকের দুই-একটা ছাগলকে লোকান্তরে চালান দিয়া বসিত, ভীমসেন স্বয়ং উচ্চৈঃশ্রবারও রক্ষা পাওয়া দায় হইত। কিন্তু এই পাহাড়িয়া, পাথুরিয়া জমিতে চলা অভ্যাস থাকাতে ছাগলেরা কুকুরের হাত এড়াইয়া অনেকটা দূরে দূরে ছুটিতে লাগিল। ছাগল-তাড়া করিতে করিতে কুকুরগুলি কোন্‌দিকে, কোথায় গিয়া উঠে, দেখিবার জন্য একজন শিকারী ডানদিকে অন্যজন বামদিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিল। এক্ষণে উচ্চৈঃশ্রবা পর্ব্বতের চূড়া ছাড়াইয়া, অপরিসর একটা টিকড়ের উপর-দিয়া বেগে দক্ষিণমুখে যাইতে লাগিল। এখন আর এঁকেবেঁকে নয়, সকলেই সোজা দৌড়িল। বরাবর দক্ষিণ-মুখে গেল। এইবার কুকুরেরা অগ্রসর হইয়া সকলের পিছনকার ছাগলটাকে ধর ধর হইল। ছাগলটা ইহা টের পাইয়া বেগে অনেকটা অগ্রসর হইল। এমন সময়ে সকলে একটা পাথুরে ও খানাখন্দময় স্থান-দিয়া চলিল। অসমান স্থান বলিয়া, ছাগলেরা কুকুর-তিনটাকে ছাড়াইয়া একটু আগে গিয়া পড়িল। এইরূপে ছাগলেরা, ও ছাগলদের পিছনে পিছনে কুকুরেরা, আধক্রোশ, একক্রোশ, দুই-ক্রোশ পথ পাথুরে টিলার উপরদিয়া ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে তালাং-নদীর ধারে এক খাড়া শৈলের কাছে আসিল। বড় বিপদ্‌, দুইদিকে পাথর, কম হইলেও একশত-দেড়শত-হাত উচ্চ। পিছনে তিনটা ভয়ঙ্কর কুকুর ও দুইজন শিকারী, সম্মুখে তালাং-নদী। ছাগলগুলি এখন যায় কোথায়? আর কোন উপায় নাই দেখিয়া, উচ্চৈঃশ্রবা "সংগ্রাম" দিতে মনস্থ করিল। বন্য জন্তুরা পলাইতে জানে না। বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমিও দেয় না।

উচ্চৈঃশ্রবা কুকুরদের হইতে বেশী দূরে নহে; এমন সময়ে দুইবার বন্দুকের আওয়াজ তাহার কাণে আসিল। কুকুরদের সে তত ডরায় না। তাহাদের সঙ্গে দুই হাত লড়িতে পারে, কিন্তু বন্দুকের কাছে বীরত্ব খাটে না। তাই বন্দুকের শব্দ শুনিয়া তাহার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। তবে একটা উপায় এখনও আছে। উচ্চৈঃশ্রবা হয় ত ভাবিল, শিকারী ও তাহাদের কুকুর ত ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে। উহাদের হাতে পড়িলে মরণ নিশ্চিত। কিন্তু যদি খাড়া শৈল-হইতে লাফাইয়া নীচে নদীতে পড়ি, প্রাণ বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। সে বেশী ক্ষণ ভাবিল না। ভাবিবার অবসরও ছিল না; সে দলের কর্ত্তা, কাজেই আর সকলকে পথ দেখাইতে হইবে। সে অমনি ধারে গিয়া, নীচের দিকে মুখ করিয়া লম্ফ দিল,—কোথায় গিয়া পড়িল?—তলায়?—না।

এইখানে নদীর পাড় নিতান্ত খাড়া। একটা কুমড়া ঠিক মাঝখানে কাটিলে যেমন হয়। তালাং-নদী এইখানে একটা পাহাড় তেমনি কাটিয়া আইভলের দিকে গিয়াছে। দুই তীরই খুব উচ্চ ও একবারে খাড়া। উচ্চৈঃশ্রবা লাফ-দিয়া নীচে একটা ছোট পাথরের উপর পড়িল; এই পাথর, সোজা পাড় ছাড়াইয়া কতকটা বাড়িয়া গিয়াছিল। এরূপ পাথর বড় কম ছিল, কিন্তু মধ্যে মধ্যে ছিল। উচ্চৈঃশ্রবা একলাফে এতটা নীচে পড়িলেও শরীরের কোন স্থানে আঘাত লাগিল না। দুই-চারি-বার নিশ্বাস ফেলিয়াই, এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখিল। দেখিল, নীচে গর্ত্ত, গর্ত্তের অন্যদিকে ঐপ্রকার আর একটা শৈল রহিয়াছে; এই দেখিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে, একটু আড়ালে গিয়া আবার লাফ দিল। সার্কাসের খেলোয়াড়দের হাত, পা, গলা, কোমর যেমন ইচ্ছামত খেলে, বন্য ছাগদের পা, শিরা ইত্যাদি তেমনি খেলে, উচ্চৈঃশ্রবা একলাফে এই পাথরের উপরে গিয়া নামিল। এইখানে গিয়াই, কোন্‌দিকে যাইতে ও কি করিতে হইবে, মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহা স্থির করিয়া লইল। একবার বামে, একবার বা ডাইনে ফিরিল। কখনও পিছে হটিল, এইরূপ করিতে করিতে, অন্য এক পাথরের উপর নামিয়া গেল। এখানহইতে হাতদশেক নীচে আরএকটা পথে হাত-পনের নীচে অন্য একটা পাথরের উপর লাফাইয়া পড়িল। এখন পাড়হইতে এত নীচে আসিয়াছে যে, যমেরও সাধ্য নাই যে তাহাকে স্পর্শ করে—কুকুর ত কুকুর!

উচ্চৈঃশ্রবা কি একা?—সঙ্গীরা কোথায়?

উহার দেখাদেখি, দলস্থ আর সকলে ঐরূপে লাফাইয়া সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিয়াছে—বিস্তর ছাগল! যেন ছাগলের ঝর্ণা! যদি উচ্চৈঃশ্রবা দাঁড়াইবার স্থান না পাওয়াতে বরাবর তলায় পড়িত, মরিয়া যাইত—কাজেই উহার দেখা-দেখি যে সকল ছাগল লাফাইয়া নীচে পড়িয়াছে, সেগুলিও মারা পড়িত, একটাও বাঁচিত না। কিন্তু সকলেই, একটার পরে আর একটা, এইরূপে নীচে আসিয়া নামিয়াছে—দেখিতে বড়ই সুন্দর। সকলেরই পা ঠিক্‌, কোনটার পা পিছলে নাই, হড়কায় নাই—যেন সার্কাসের খেলোয়াড়।

কিন্তু সকলের শেষের ছাগলটা যেই দ্বিতীয় পাথরটার উপর

নামিয়াছে, অমনি তিনটা শিকারী কুকুর সকলকার উপরের পাথর-হইতে বোঁ-বোঁ-শব্দে লম্ফদিয়া, ছাগলটাকে ডিঙ্গাইয়া একবারে তালাং-নদীর খরস্রোতে গিয়া পড়িল—যেই পড়িল, অমনি পঞ্চত্ব-লাভ করিল। শিকারী কুকুরেরা শিকারের পিছনে তীরের মত ছুটে, প্রাণের ভয় কাহাকে বলে, জানে না ; কিন্তু অবশেষে শিকারও পলায়, নিজেরাও প্রাণ হারায়। সকলের নীচে, প্রায় জলের ধারে উচ্চৈঃশ্রবা গিয়া পঁহুছিল, এইখান-হইতে সে তিনটা শাদা-কালো রঙ্গের প্রাণীর দেহ স্রোতের সঙ্গে ভাটির দিকে যাইতে দেখিল।

অনেক উচ্চে, শিকারীরা ক্রমাগত শিশ দিতেছিল। তাহাও ছাগ-বীর উচ্চৈঃশ্রবার কাণে আসিল।

মটুমটু ও রাঙ্গাটী সকলের উপরে উচ্চ পাথরে দাঁড়াইয়া দেখিল—শিকার ত হাতছাড়া হইয়াছেই, কুকুরতিনটাও গেল ! শিকার বা কুকুর, কিছুই পাইবার আশা আর নাই। রাগে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া মটুমটু নিজেকে, কুকুর ও ছাগলকে—বিশেষতঃ উচ্চৈঃ-শ্রবাকে কত গালি দিতে লাগিল।

বেচারা রাঙ্গাটীর বড় মনোকষ্ট ; প্রিয় কুকুরের শোকে—একটা নয়, তিন-তিনটা শিকারী কুকুর—তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কতবার শোকের আবেগে কুকুরদের নাম ধরিয়া ডাকিল—কে উত্তর দিবে ?—তাহারা ত নাই।

১৪

রাঙ্গাটীর বয়স কম, সে উদ্যোগী এবং যখন যাহা মনে হয়, তাই করিয়া বেড়ায়। সে কাছাড়ের এক চা-বাগানে সাহেবের গরু-ছাগল চরাইত। দিন-দুই সে কোথায়ও গেল না, গ্রামের (পুঞ্জির) ভিতরই এদিক্-ওদিক্ করিয়া বেড়াইল। প্রিয় কুকুর-তিনটা মরিয়া যাওয়াতে তাহার বড়ই মনোকষ্ট হইয়াছে, পাহাড়ে শিকার করিবার জন্য যাইতে আর মন সরে না। যত পুরাতন হয়, শোকরূপ ছুরির ধার তত কমিয়া যায়। দিন-কতক পরে দিব্য দক্ষিণ-বাতাস বহিতে লাগিল, তাহাতে রাঙ্গাটীর প্রাণে একটু স্ফূর্ত্তি আসিল। এমন সময়ে একদিন মটুমটু শিকারে যাইবার কথা পাড়িল। রাঙ্গাটীও যাইতে সম্মত হইল। এ কয়-দিন মটুমটু চুপ করিয়া বসিয়া ছিল না, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া, বেড়াইয়া, কোথায় কি শিকার আছে, বা না আছে, তাহা দেখিতেছিল। আজ দুইজনে মিলিয়া এক পাহাড়ে, যেই উঠিতেছিল, অমনি চেঁচাইয়া, উপরদিকে চাহিয়া বলিল, "ঐ দেখ, সেই প্রকাণ্ড পাঁঠা ! ওটা না তালাং-নদীতে পড়িয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছিল !" এই বলিয়া অবাক্ হইয়া সে বসিয়া পড়িল। রাঙ্গাটী একদৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিল, শিং দেখিয়া বেশ চিনিল যে, এটা নিশ্চয়ই সেই প্রকাণ্ড পাঁঠাই বটে। তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। সে মনে মনে উচ্চৈঃশ্রবাকে কহিল, আজ তোমারই একদিন আর আমারই একদিন। আমার তিন-তিনটা কুকুরের মাথা তুমি খাইয়াছ !

শিকারীরা যদি কেহ তাড়া করে, কেহ বা লুকাইয়া থাকিয়া দেখে, শিকার কেমন করিয়া কোন্‌দিকে যায়, তাহা হইলে ছাগল ত ছাগল—বন্য কুকুর যে এমন চালাক, তাহারাও প্রায় মারা যায়। এ পাহাড়-অঞ্চলের কোথায় কি, এবং ছাগলদের স্বভাব কিরূপ, মটুমটুর সে সকল বিলক্ষণ জানা ছিল।

সে রাঙ্গাটীকে বলিল, "পাঁঠাটা নীচের দিকে কখনই আসিবে না ; যদি ওখান-থেকে নড়ে, উচ্চ-টিকড়ের উপরদিকে উঠিবে ; কাজেই উহাকে এপাশ কি ও পাশ-দিয়া উঠিতে হইবে। আমি পশ্চিম-পাশে যাই, ও কখনও সেদিকে যাইবে না। আর তুমি পূর্ব্বদিকে যাও। দুই-ঘণ্টার মধ্যে তুমি টিকড়ের ঠিক নীচে গিয়া লুকাইয়া থাকিবে। পাঁঠাকে পূর্ব্বদিকের টিলার গা বহিয়া টিকড়ে উঠিতে হইবে।"

রাঙ্গাটী সেইদিকে চলিল। মটুমটু দুইঘণ্টা এইখানে রহিল। পরে একটা উচ্চ পাথরের উপরে দাঁড়াইয়া বন্দুকটা ঘুরাইতে আর একবার নীচে নামিতে, আবার উপরে উঠিতে লাগিল। মটুমটু পাঁঠাটাকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু তাহার মনের বিশ্বাস, পাঁঠা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সরিয়া যাইবে।

পরে, সে আওতার ভিতর দিয়া দিয়া, দক্ষিণ-মুখে একটু গিয়া, যেখানে উচ্চৈঃশ্রবা ছিল, সেইদিকে চলিল। পাঁঠাকে দেখা তাহার এদিকে আসিবার উদ্দেশ্য নয়, পাঁঠাকে দেখা-দেওয়া প্রধান উদ্দেশ্য। রাঙ্গাটী ঠিক স্থানে গিয়া দাঁড়াইল, একটু পরেই সেই হৃষ্টপুষ্ট পাঁঠা, ও তিনটা পাঁঠীকে, ক্রোশখানিক দূরে, টিলার গা বহিয়া ধীরে ধীরে নামিতে দেখিতে পাইল। দেখিতে দেখিতে ছাগলগুলি দেবদারু-তরুময় একটু গর্ত্তপানা স্থানে নামিল—আর দেখা গেল না। এই গর্ত্ত-হইতে আবার টিলার দিকে উঠিতে, কিন্তু ব্যস্তভাবে দৌড়িয়া উঠিতে লাগিল। সকলেরই কাণ পিছন-দিকে হেলান। রাঙ্গাটী মনে করিল, এইবার মটুমটু গুলি করিবে, এবং আমাকে খবর দিবার জন্য চীৎকার করিয়া উঠিবে, কিন্তু এপ্রকার কিছু হইল না। গোটাকতক বন্য কুকুরের ঘেউঘেউ-শব্দ শুনিতে পাইল। পাথরময় বন্ধুর বা অসমান স্থানে কুকুরে ছাগলদের কিছু করিতে পারে না—দৌড়িয়া ও লাফাইয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু এক্ষণে গাছপালাপূর্ণ সমান জমিতে কুকুরের হাত এড়াইয়া যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব।

দেখিতে না দেখিতে পাঁচটা জঙ্গলী কুকুর বাহির হইল। নিমেষ-মধ্যে সমতল মাঠ-পার হইয়া গেল। ছাগলেরা প্রাণ হাতে করিয়া ছুটিল—সকলের আগে দলপতি উচ্চৈঃশ্রবা, উচ্চৈঃশ্রবার পশ্চাতে আর তিনটা ছাগল কুড়ি-কুড়ি-হাত অন্তর সারি বাঁধিয়া দৌড়িতে লাগিল। সকলের পিছনে যে ছাগলটা দৌড়িতেছিল, সেটার প্রায় একশত-হাত অন্তর পাঁচটা বিকটাকার কুকুর দৌড়িতে-ছিল—কুকুরগুলি ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

বালক

১ম বর্ষ] সেপ্টেম্বর, ১৯১২। [৯ম সংখ্যা।

কনানার বল্লম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

১২

কনানার পত্র-বাহক।

সেনাদলের একজন আর একজনকে জিজ্ঞাসা করে, "তাই ত, এমন করিয়া ত আর বসিয়া থাকা যায় না!"

"প্রধান সেনাপতি নিজেই কি বলেন না, বসিয়া থাকিলে জয়লাভ হয় না?"

"হিরাক্লিয়সের সেনাগণ আমাদের উপর আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়াও কাহ্লেদ আমাদিগকে নিতান্ত বসাইয়া রাখিয়াছেন, এ তাঁর কি বিবেচনা?"

"অজেয় কাহ্লেদের কি ভয় হইয়াছে?"

সিপাহিরা আপন আপন দলের সেনাপতিদিগকে এইপ্রকার নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কিন্তু কাহ্লেদের কাছে যাইয়া এ বিষয়ে কোন কথা পাড়িতে কাহারও সাহসে কুলাইল না। যেদিন কোমরবন্ধ হারাইয়াছিল, এ সেই দিনের পরের দিনের কথা। সেদিন প্রাতঃকালহইতে সূর্য্যোদয়পর্য্যন্ত কাহ্লেদ তাম্বুতে বসিয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না।

কলিকাতা-হাইকোর্টের প্রধান-বিচারপতি
অনারেবল স্যার লরেন্স জেংকিন্স, কে, সি, এস্, আই।

"কোমরবন্ধ হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া, কি উনি অমন করিয়া রহিয়াছেন?"

"যখন বাবিল-দখল করেন, তখন ত কোমরবন্ধ ছিল না—তবে এত ভাবনা কেন?"

"উনি ত আল্লা ও নবীর নামে লড়াই করেন; চকচকে রঙের কোমরবন্ধ কি উঁহাকে বলবিক্রম দিতে পারে?"

এইভাবে দ্বিতীয় দিন কাটিয়া গেল।

অজেয় কাহ্লেদ বিষণ্ণভাবে নীরবে রহিলেন, লোকের মনে এই ধারণা জন্মিল যে, কোমরবন্ধ পাওয়া না গেলে, কোন-না-কোন-প্রকারে সমগ্র সৈন্যদলের অমঙ্গল ঘটিবে।"

তৃতীয় দিন গত হইলে, জনরব উঠিল যে, কোমরবন্ধের একটুক্‌রা পাওয়া গিয়াছে; কয়েকজন ঐ টুক্‌রা শত্রুপক্ষীয় লোকদিগের নিকটহইতে কাড়িয়া আনিয়া প্রধান সেনাপতির তাম্বুতে লইয়া যাইতেছে, শুনিয়া সমগ্র সেনাদলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, সকলের বিশ্বাস

হইল যে, এইবার যুদ্ধ হইবে, তাই সেনারা প্রস্তুত হইতে লাগিল।

প্রধান সেনাপতি কোনপ্রকার আদেশ-প্রচার করাইয়া দিলেন না, তথাপি সকল লোকের বিশ্বাস হইল যে, রাত্রি প্রভাত হইলেই যুদ্ধার্থ যাত্রা-আরম্ভ হইবে।

এখন রাত্রি দুই-প্রহর। সমস্ত দিন কাহ্লেদ অন্ন-জল-স্পর্শ করেন নাই। তিনি একাকী নিজ তাম্বুতে পারস্য-দেশীয় গালিচায় বসিয়া আছেন।

বাবিলহইতে আনীত একটি পাত্রে তৈল—তাম্বুর প্রায় মধ্যস্থলে পাত্রটী রহিয়াছে। ঐ তৈলে কতকগুলি সলিতা জ্বলিতেছে, তাহাতেই বিলক্ষণ অনুজ্জ্বল আলো হইয়াছে।

তাম্বুর বাহিরে লোকের কোলাহল শুনিতে পাওয়া গেল, কিন্তু কাহ্লেদ সেদিকে কর্ণপাত করিলেন না। ইতিমধ্যে একজন সিপাহী অকস্মাৎ তাম্বুতে আসিল, তাহার হাতে বাবিলের রাজবাটী-হইতে আনীত পর্দ্দার এক টুক্‌রা।

"বটে, বটে," এই কথা একটু জোরে বলিয়া, কাহ্লেদ সিপাহীর হস্তহইতে ঐ পর্দ্দার টুক্‌রা লইলেন, কিন্তু, পাছে সিপাহী তাঁহার মনের স্ফূর্ত্তি টের পায়, এইজন্য ঐ টুক্‌রাটুকু অবহেলার ভাবে গালিচার উপর পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। এবং সিপাহীকে একতোড়া মোহর-দিয়া কহিলেন, "দেখ দেখি ঐ টুক্‌রা পাতিলে উহাতে কত মোহর ধরে।"

পর্দ্দার টুক্‌রা সাবধানে পাতিয়া, সিপাহী মোহর বসাইতে লাগিল; দাবার গুলি চালাইলে যেমন, কাহ্লেদ তেমনি অবহেলার ভাবে দেখিতে লাগিলেন।

পর্দ্দার টুক্‌রায় আর মোহর ধরে না, অথচ অর্দ্ধেক মোহর থলিয়াতেই রহিয়া গেল। সিপাহী থলিয়াটী কাহ্লেদকে সসম্মানে দিয়া, পর্দ্দার টুক্‌রার উপরহইতে মোহরগুলি তুলিয়া লইতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া কাহ্লেদ থলিয়াটা তাহাকে দিয়া কহিলেন, "এ সব তোমরা লইয়া চলিয়া যাও।"

সিপাহী তাম্বুহইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, কাহ্লেদ তাহাকে ডাকিলেন। তিনি পর্দ্দার টুক্‌রাটী তুলিয়া অন্য মনে হাতে লইয়া উল্টাইতে পাল্টাইতে ছিলেন। এই টুক্‌রা সেই কোমরবন্ধহইতে ঢালের আকারে কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে। চওড়ায় প্রায় একহাত হইবে।

কাহ্লেদ জিজ্ঞাসিলেন, "এ টুক্‌রা কোথায়, কাহার কাছে পাইলে?"

সিপাহী কহিল, "এখানহইতে একদিনের পথ উত্তরদিকে কোন স্থানের মাঠে আমরা ছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, পথিক-দিগের প্রমুখাৎ শত্রুপক্ষীয়দিগের কোন সংবাদ হয়ত পাওয়া যাইবে। এমন সময়ে দেখি, সুরিয়াদেশীয় তিনজন অপরিচিত লোক ঘোড়ায় চড়িয়া ধীরে ধীরে আসিতেছে, তাহাদের আগে আগে একজন রাখাল চলিয়াছে। তাহাকেই ইহাদের কর্ত্তা বলিয়া বোধ হইল। এই রাখালের ঘোড়ার সম্মুখদিকে বুকপাটার মত এই টুক্‌রা ঝুলিতেছিল। আমরা তাড়া করাতেই সেই কাপুরুষেরা পলাইতে পথ পাইল না। সকলের শেষে সেই রাখাল ঘোড়া ফিরাইল। আমি সকলের আগে ছিলাম, কিন্তু খুব কাছে নয় বলিয়া তাহাকে ধরিতে পারিলাম না, কিন্তু বল্লম ছুড়িয়া মারিলাম, সে ঘোড়াহইতে পড়িয়া গেল। আর—"

"আর তুমি তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছ?" এই বলিয়া প্রধান সেনাপতি কম্পিতকলেবরে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, আর পর্দ্দার টুক্‌রা হাতহইতে পড়িয়া গেল।

"না, না," ভীত সিপাহী বলিতে লাগিল, "মারিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম মাত্র। তাহার গায়ে একটা মেষ-চর্ম্মের জামা। জামাটা বেজায় পুরু, তাই বল্লম গায়ে লাগিল না। সে অমনি নামিয়া দাঁড়াইল, জামাহইতে বল্লম খুলিয়া ফেলিয়া এমন বেগে দৌড়িল যে, সঙ্গীরা পিছনে পড়িয়া গেল, তাহার ঘোড়াটা রহিয়া গেল।

প্রধান সেনাপতি কহিলেন, "বেশ,—বেশ হইয়াছে। মেষ-চর্ম্মের জামা না থাকিলে, বেচারার প্রাণ যাইত—আল্লার ধন্যবাদ হউক।"

সিপাহী চলিয়া গেলে, কাহ্লেদ প্রদীপের কাছে গিয়া, কোমর-বন্ধের টুক্‌রা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। টুক্‌রা-খানি দোহারা। দুইটি টুক্‌রা কাটিয়া লইয়া, জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

তিনি সযত্নে খুলিয়া ফেলিলেন, ভিতরের টুক্‌রাতে, তিনি যাহা খুঁজিতেছিলেন, তাহা পাইলেন।

এই কথা-কয়টী রক্ত-দিয়া চামড়াতে লিখিত ছিল—

"আন্তিয়খিয়া ও আলিপোহইতে ষাটহাজার সৈন্য আসিয়াছে, সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক জবাবল। উত্তরে, যারমস্কে থাকিয়া, আশী-হাজার সৈন্যসমেত মানুয়েল আসিবে, এই অপেক্ষা করিতেছে। তাহার সৈন্যগণ গ্রীক ও সুরীয়, ছয়দিনের পথ দূরে আছে। তাহাদের পশ্চাতে আর একদল আসিতেছে, এই সংবাদ পাঠাইয়া দিয়া আপনকার দাস মানুয়েলের তল্লাসে চলিল।"

"ভাগ্যে সেই মেষ-চর্ম্মের জামা ছিল! আল্লার ধন্যবাদ হউক।" কাহ্লেদ এই বলিতে বলিতে এই টুক্‌রাগুলি কোমরবন্ধে আট্‌কাইয়া রাখিলেন, এবং তাম্বুর ভিতরে ধীরে ধীরে পাইচারি করিতে লাগিলেন।

"জবাবল উত্তরদিকে দুইদিনের পথ দূরে! একদিন আগে মানুয়েল তাহার পশ্চাতে ছয়দিনের পথ দূরে ছিল। আমরা জবাবলের কাছে যখন পঁহুছিব, তখন মানুয়েল তিনদিনের পথ পিছনে থাকিবে, এবং সে দুইদিনের পথ দূরে থাকিতে থাকিতে অগ্রগামী ষাটহাজার সেনা নষ্ট করিতে হইবে।"

তখনি উত্তরমুখে দশহাজার অশ্বারোহী এবং পনেরহাজার উষ্ট্রারোহী সেনা যাইবার আদেশ-প্রচার হইল। সেনারাও মনে

করিয়াছিল যে, এইপ্রকার আদেশ হইবে। তাই হুকুম বাহির হইবার আগেই প্রস্তুত ছিল।

চারিদিন চারিরাত্রি গত হইল, তাঁহারা আবার আসিয়া যারমস্কে শিবিরস্থাপন করিলেন। কিন্তু জবাবলের যাটহাজার সৈন্য একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

আবার কোমরবন্ধের আর একখণ্ড পাওয়া গেল। একজন লোক উষ্ট্রে চড়িয়া, আর একদল উষ্ট্রে ফলমূল ও শস্যাদি বোঝাই-দিয়া, আসিয়াছিল; অগ্রবর্ত্তী লোকটার উষ্ট্রের বুকে ঐ টুক্‌রা বাঁধা ছিল।

উষ্ট্রচালক কাহ্লেদের শিবিরে আসিয়া কহিল যে, আমরা রসদ বেচিবার জন্য মানুয়েলের ছাউনীতে যাইতেছিলাম, পথে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বলিলেন যে, সেখানে গেলে মানুয়েল সমস্ত জিনিস-পত্র বাজেআপ্ত করিবে, একপয়সাও দাম দিবে না, বরং উল্‌টিয়া আমাদিগকে পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিয়া বেগার খাটাইবে; তিনি বলিলেন, তোমরা যদি উত্তরদিকে না গিয়া দক্ষিণদিকে কাহ্লেদের ছাউনীতে যাও, আর এই চামড়ার টুক্‌রা নিদর্শনস্বরূপ লইয়া যাও, তিনি তোমাদের ভাল করিবেন, আর উচিত মূল্য দিবেন, এই বলিয়া সেই চামড়াখানা আমার উটের গলায় বাঁধিয়া দিলেন।

এই নিদর্শনহইতে কাহ্লেদ জ্ঞাত হইলেন যে, মানুয়েলের ছাউনীতে রসদ প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে; পাঁচছয়দিন পরে একদল লোক রসদ লইয়া পঁহুছিবে।

এই উষ্ট্র-চালকের দলে দেড়শত উট এবং এই সকল উটের পৃষ্ঠে খাদ্য-সামগ্রী বোঝাই ছিল। কাহ্লেদ একটু হাসিলেন, আর মনে মনে বলিলেন, বেদুইনবালক বাহাদুর লোক বটে; অনাহারে ক্লিষ্ট শত্রুকে খাদ্য-সামগ্রীতে বঞ্চিত করিয়াছে, অথচ অনায়াসে আমাকে সংবাদ পাঠাইয়াছে।

রাত্রিকালে মানুয়েলের প্রকাণ্ড সেনাদল আসিয়া পঁহুছিল এবং মুসলমানদিগের ছাউনীর উত্তরদিকে ছাউনী করিল। এই দুই সেনাদলের ছাউনীর মধ্যস্থলে এক অতি উচ্চ শৈল ছিল এই পর্ব্বতের যেদিকে আরবদেশ, সেদিকটা নিতান্ত খাড়া মানুয়েল এই শৈলের চূড়ায় নিজের তাম্বু ফেলাইলেন।

মানুয়েলের তাম্বুর একটু দূরেই এই চূড়ার ডগা, এখানহইতে তলভূমিতে দৃষ্টি করিলে, মুসলমান সেনাদের ছাউনী বেশ দেখা যায়।

ধ্যান-পরায়ণা।

রাত্রি প্রভাত হইলে, সন্ধির বিষয়ে কথা কহিবার জন্য প্রধান প্রধান মুসলমান সেনাপতিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিলেন, "আরবেরা আর কখনও সুরিয়াদেশের সীমায় পা দিবে না, এই সর্ত্তে যদি জামিনস্বরূপ কয়েকজন লোককে আমাদের কাছে রাখিয়া দেয়, সমগ্র মুসলমান সেনাদলকে অবাধে চলিয়া যাইতে দিব।"

গ্রীকদিগের প্রকাণ্ড ছাউনী ও সৈন্য-সামন্ত দেখিয়া মুসলমান সেনাপতিদিগের ভয়ে বুক শুকাইয়া গিয়াছিল, তাই তাঁহারা নিস্তারের সম্ভাবনা দেখিয়া, আল্লার ধন্যবাদ করিলেন, এবং মানুয়েলের এই প্রস্তাব শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবার চূড়ান্ত অধিকার কাহ্লেদের, তিনি সেনানায়কদের কথা শুনিয়া কহিলেন, "জবাবলের দশা মনে করিয়া দেখ!"

মুসলমান সেনাদলের অনেকেই প্রস্তাবিত সর্ত্তে সন্ধিস্থাপনের জন্য ইচ্ছুক, এই কথা শুনিয়া মানুয়েল ভাবিলেন, তবে সন্ধি হইবে, তাই আর একদিন সময় দিলেন।

কিন্তু কাহ্লেদ কোমরবন্ধের উষ্ট্রচর্ম্মের উপর হাত রাখিয়া আবার কহিলেন, "জবাবলের দশা মনে করিয়া দেখ।"

কাহ্লেদ বুঝিয়া দেখিলেন যে, শত্রুপক্ষের সৈন্যসামন্ত এক্ষণে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে, তাহার উপর আবার প্রায় অনাহারে রহিয়াছে, অতএব এই বেলা আক্রমণ করিতে পারিলেই, বিজয়লাভ নিশ্চিত। যদি বিলম্ব করি, আমাদেরই সর্ব্বনাশ হইবে।

অবিলম্বে যুদ্ধ-আরম্ভের কথা স্থির হইল, আধঘণ্টা পরে তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলেন, "স্বর্গ ঐ দেখা যায়। যুদ্ধ কর, স্বর্গলাভ হইবে।"

সেনাগণ প্রস্তুত ছিল, অবিলম্বে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল,—এমন ভয়ানক যুদ্ধ সুরিয়াদেশের সমভূমিতে কখনও হয় নাই।

সমস্ত দিন তুমুল সংগ্রাম চলিল। তিন-তিন-বার বেদুইনদিগকে হটিয়া আসিতে হইল। পশ্চাতে, ছাউনিতে যে সকল স্ত্রীলোক ছেলে-মেয়েদিগকে লইয়া ছিল, তিন-তিন-বারই তাহারা সেনা-দিগকে আবার "ধাওয়া" করিতে জিদ্ করিল, আর তিন-তিন-বারই সেনারা আরও ভীষণবেগে শত্রুকে আক্রমণ করিল।

রাত্রি হইল, কোন পক্ষেরই জয় বা পরাজয় হইল না, কিন্তু মানুয়েলের শিবিরে যে সকল বেদুইনকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাহাদের কেহ কেহ কনানাকে চিনিয়া ফেলিল। তাহারা দেখিতে পাইল যে, কনানা গ্রীক সেনাদের ছাউনীতে অবাধে বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন। তাহারা শুনিতে পাইল যে, জবাবলের সেনাগণকে যখন ধ্বংস করা হয়, তৎকালে অনেক কুলি-মজুর পলাইয়া আসিয়াছিল, আর কনানা তাহাদেরই সঙ্গী। সকলেই বুঝিতে পারিল যে, এ ভয়ে পলাইয়াছে।

"ও ভাবিয়াছিল, আমরা হারিয়া যাইব, তাই আমাদের সঙ্গে আরবের জন্য যুদ্ধ না করিয়া, শত্রুদের ছাউনীতে আসিয়া লুকাইয়া রহিয়াছে।"

তাই রাগ করিয়া, তাহারা বলিয়াছিল যে, এই বালক বেদুইন, জবাবলের সুরিয়াদেশীয় দাস নহে—এ কাহ্লেদের সেনাদলে ছিল।

এই কথা শুনিয়া লোকেরা কনানাকে ধরিয়া, বাঁধিয়া, মানুয়েলের কাছে লইয়া গেল। মানুয়েলেরও সন্দেহ হইয়াছিল যে, কেহ-না-কেহ হয়ত কাহ্লেদের কাছে আমার ও জবাবলের সেনা-দলের প্রকৃত অবস্থার কথা বলিয়া দিয়াছে। প্রথম দিনকার যুদ্ধের ফল দেখিয়া তাঁহার এ সন্দেহ দৃঢ় হইল। তিনি কনানাকেই চর বলিয়া স্থির করিলেন।

কনানা মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, "আমিই সংবাদ দিয়াছিলাম।" এই কথা শুনিয়া মানুয়েল তাঁহাকে কাটিবার জন্য তরোয়াল উঠাইলেন, কনানা অনড় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কনানা সাহঙ্কারে কহিলেন, "আমি ভয় করিবার পাত্র নহি।"

মানুয়েল একজন সেনাপতিকে কহিলেন, "ওকে এখানহইতে লইয়া গিয়া সাবধানে রাখ। ও মৃত্যুকে ভয় করে না, তাই ওকে আগে খুব যন্ত্রণা দিতে হইবে।"

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন যুদ্ধ চলিল, কোন পক্ষের জয় বা পরাজয় হইল না। নবীর সেনারা এবারে যেমন, আর কখনও তেমন প্রাণপণে যুদ্ধ করে নাই। ইস্মায়েলীয় সেনারা প্রাণের মায়া-ত্যাগ করিল, একজন গ্রীক সেনাকে না মারিয়া কেহ মরিল না। মুসল-মানেরা আল্লা ও আরবদেশের জন্য যুদ্ধ করিল, তাই পিছে হটিল না—যেন মাটিতে শিকড় গাড়িয়া দাঁড়াইল।

পুনঃ পুনঃ সেনাপতিরা উচ্চরবে বলিতে লাগিলেন—

"ঐ স্বর্গ দেখা যায়; যুদ্ধ কর, স্বর্গলাভ হইবে। যে পলাইবে, তাহাকে নরকে যাইতে হইবে।" সেনারা তাই রণ-মদে মাতিয়া ভয়ানক যুদ্ধ করিতে লাগিল, কেহ হটিল না।

পুনঃ পুনঃ গ্রীক সেনাদল ধাইয়া আসিল, কিন্তু তাহাদের পশ্চাতের শৈলরাশির ন্যায় মুসলমান সেনারা অচল!

যতক্ষণ ভূপতিত না হইল, বেদুইন ততক্ষণ যুদ্ধ করিল,—আর যেই সে পড়িল, অমনি আর একজন আসিয়া তাহার স্থলে দাঁড়াইল।

(ক্রমশঃ।)

-:*:-

ভূতের কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

শ্বাস-গ্রহণ ও ত্যাগের নিয়ম।

নিম্নলিখিতভাবে শ্বাস-গ্রহণ ও ত্যাগের অভ্যাস করিবে।—নাসিকাদ্বারা ধীরে ধীরে নির্ম্মল বায়ুগ্রহণ করিয়া ফুস্‌ফুস্ বায়ুপূর্ণ কর; যতক্ষণ না ফুস্‌ফুস্ পরিপূর্ণ হয়, ততক্ষণ বায়ু টানিতে থাক, সঙ্গে সঙ্গে যতদূর পার বুক ফুলাও; যখন বুঝিবে ফুস্‌ফুস্ পূর্ণ হই-য়াছে, তখন দশহইতে কুড়িসেকেণ্ডপর্য্যন্ত স্থিরভাবে বায়ু ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কর; তাহার পর পুনরায় ধীরে ধীরে নাকদিয়া বায়ু বাহির করিয়া দাও। দিবারাত্র এইভাবে শ্বাস-গ্রহণ ও ত্যাগের অভ্যাস করিলে, শ্বাসযন্ত্রের অবস্থা ক্রমেই ভাল হইবে, রক্ত পরিষ্কৃত হইবে এবং স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইবে।

ফুস্‌ফুসের ভিতর বায়ু ধরিয়া রাখা অভ্যাস থাকিলে ভেণ্ট্রি-লোকিজ্‌ম্‌সংক্রান্ত অনেক ব্যাপারে—বিশেষতঃ দূর-স্বর-অনুকরণ-কালে—বিশেষ সুবিধা হয়। পুতুলগুলিকে কথা কহাইবার সময় মুখদিয়া শ্বাসত্যাগ করাই নিয়ম।

নিকট স্বরের অনুকরণ।

পুতুলকে কথা কহাইবার জন্য নিকট স্বর-অনুকরণ করিতে

শিখিতে হয়। তোমরা পুতুল-নাচ দেখিয়াছ। পুতুল-নাচের অপেক্ষা পুতুলদের কথাবার্ত্তা আরও আমোদজনক। বাজিকর দুই-তিনটী (সময়ে সময়ে আট-দশটী) পুতুল লইয়া তাহাদের সহিত এমন মজার কথাবার্ত্তা কয় যে, যে শুনে সেই হাসিয়া অস্থির হয়। এই পুতুল-গুলি এমনভাবে গড়া হয় যে, বাজিকর ইচ্ছামত তাহাদের মুখ নাড়াইতে পারে। বুড়া, বুড়ী, ছোট ছেলে, মেয়ে, দরওয়ান, বেহারা, মুটিয়া, ফেরিওয়ালা প্রভৃতি নানারকমের পুতুল হইতে পারে। কোন পুতুলকে কথা কহাইতে হইলে, তাহার উপযোগী স্বরের অনুকরণ করিতে হয়। আমাদের স্বর-এমন চমৎকার যে, চেষ্টা করিলে, ইহাহইতে প্রায় সকলরকম স্বরই বাহির করা যায়; যাহার গলা সাধা থাকে, তাহার পক্ষে নানারূপ স্বর-অনুকরণ করা বিশেষ কঠিন নহে।

কোন স্বর-অনুকরণ করিতে অভ্যাস করিবার পূর্ব্বে স্বরটী বিশেষ মনদিয়া শুনিবে; শুনিতে শুনিতে ক্রমে সেই স্বরের বিশেষত্ব কি তাহা বুঝিতে পারিবে, তখন তাহার অনুকরণ করা সহজ হইবে। এখানে সকল-প্রকার স্বর-অনুকরণ করিবার উপায় বলিয়া দিবার স্থান নাই, তবে সচরাচর ভেন্ট্রিলোকিজ্‌মে যে দুইপ্রকার স্বর ব্যবহৃত হয়, তাহা কি করিয়া অনুকরণ করিতে হয় বলিতেছি। এই দুইটি স্বরের যিনি সাধনা করিবেন, তাঁহার পক্ষে অন্য স্বর-অনুকরণ করা খুব সহজ হইবে, কারণ ভেন্ট্রিলোকিজ্‌মে ব্যবহৃত অন্যান্য স্বর-গুলির অধিকাংশই এই দুইটি স্বরের রূপান্তরমাত্র। এই দুইটি স্বরের একটা বুড়ার স্বর; অপরটী বুড়ীর স্বর।

(ক) বুড়ার স্বর:—প্রথমে বুড়ার স্বর-অনুকরণ করিতে শিখিবে, কারণ বুড়ার স্বরের অনুকরণ অপেক্ষাকৃত সহজ। ভেন্ট্রিলোকিষ্টের বুড়া খুব ভদ্র হইলে চলে না। ভেন্ট্রিলোকিজ্‌মে মুখ না নাড়িয়া গলার পিছনদিক্-হইতে কথা বাহির করিতে হয়, সুতরাং স্বরটা একটু কর্কশ হয়, সকল বর্ণ-উচ্চারণ করা যায় না, আর কথাগুলাও বড় শুদ্ধ হয় না। অতএব পুতুলটীর সাজ-সজ্জা চাষা-ভূষার মত হইলেই ভাল হয়।

বুড়ার স্বর-অনুকরণ করিতে হইলে, নিম্নলিখিতভাবে অভ্যাস করিতে হয়:—জিবটী ঢিলাভাবে মুখের ভিতর ফেলিয়া রাখ, ঠোঁট-দু'টী অল্প খুলিয়া রাখ, তাহার পর শূকরের মত ঘোঁৎ-ঘোঁৎ-শব্দ করিতে চেষ্টা কর। এই শব্দ করিবার সময় জিবের সম্মুখ ভাগের সাহায্য না লইয়া কেবল তাহার পিছন দিক্‌টা ব্যবহার করিবে। নিশ্বাসের সহিত দমকে দমকে এই শব্দ বাহির করিতে হয়, সুতরাং ইহাতে পাকস্থলীর মাংসপেশী-সমূহের বেশ চালনা হয়। কিছুদিন অভ্যাসের পর, কেবল অর্থহীন শব্দ-উচ্চারণ না করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে সেই স্বরে কথা কহিবার চেষ্টা করিবে।

(খ) বুড়ীর স্বর:—প্রায়ই দেখা যায় যে, যত বয়স বাড়িতে থাকে, বুড়ীর স্বর ততই উচ্চ ও কর্কশ হইতে থাকে। সেইজন্য বুড়ীর স্বর-অনুকরণকালে ভেন্ট্রিলোকিষ্টেরা তীব্র, উচ্চ, "কাঁক্‌কেকে" স্বর-ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই স্বরটী আয়ত্ত করিতে পারিলে, আরও অনেকপ্রকার স্বর-অনুকরণ করা সহজ হয়। ছোট ছেলেদের স্বর এই স্বরেরই রূপান্তর, কেবল তাহাদের বেলা স্বরটা একটু অনুনাসিক ও কথাবার্ত্তার ধরণ ছেলেদের মত সরল করিয়া লইতে হয়। ছোট মেয়ের স্বর ছোট ছেলেরই মত, তবে স্বরটা আরও একটু কোমল করিয়া লইলে ভাল হয়। অবশ্য ছেলের ভাবভঙ্গী ছেলের মত, মেয়ের ভাবভঙ্গী মেয়ের মত হওয়া আবশ্যক

২২শে জুন, ১৯১২।
ফুটবল-ম্যাচ্—ইংলণ্ড বনাম স্কট্‌ল্যাণ্ড।
স্কট্‌ল্যাণ্ড তিন-গোল, ইংলণ্ড দুই-গোল।

বুড়ীর স্বর-অনুকরণের জন্য নিম্নলিখিতভাবে অভ্যাস করিবে:—স্বরযন্ত্র-সংকোচ করিয়া জিবটী তালুতে বা মুখগহ্বরের ছাদে, দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধর, এবং সেই অবস্থায় তীব্র, উচ্চ, 'জিল'-সুরে "ধী-ঈক্" "ধী-ঈক্" বলিতে থাক। "ঈ"র উচ্চারণ খুব দীর্ঘভাবে করা আবশ্যক। যখন শব্দটী বেশ আয়ত্ত হইবে, তখন তাহার পরিবর্ত্তে সেই সুরে কথা কহিবার চেষ্টা করিবে। প্রথমে ছোট ছোট পদহইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বড় বড় বাক্য-উচ্চারণ করিতে অভ্যাস করিবে।

এইরূপে বুড়া ও বুড়ী উভয়েরই স্বর-অনুকরণ করা অভ্যস্ত হইলে, একদিকে একটা বুড়ীর পুতুল, অপরদিকে একটা বুড়ার পুতুল রাখিয়া তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার চেষ্টা করিবে। এইরূপ কথোপকথনের সময় পুনঃ পুনঃ স্বর-পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয়। একটা ছোট নমুনা দেখাই—

ভেন্ট্রিলোকিষ্ট।—কি কর্ত্তা, ভাল আছ ত?

বুড়া।—কে বাপু তুমি? তোমায় ত আমি চিনি না। দেখ্‌ত বুড়ী, একে কি চিনিস্?

বুড়ী।—আমি কি চোখে দেখ্‌তে পাই যে দেখ্‌ব? জোচ্চোর নয় ত?

বুড়া।—তাই বলেই ত বোধ হচ্চে।

ভেণ্ট্রিলোকিষ্ট।—সে কি কর্ত্তা! এই সেদিন তুমি আমার কাছ-থেকে টাকা নিলে।

বুড়া।—কে তোমার টাকা নিয়েছে?

ভেণ্ট্রিলোকিষ্ট।—কেন, তুমি। এই বুড়ী সাক্ষী।

বুড়ী।—ও মা সে কি কথা! আমি তোমায় কখন দেখিনি। আমি কি চোখে দেখ্‌তে পাই? ইত্যাদি—

এইরূপে একবার হয়ত তোমার স্বাভাবিক স্বরে, পরক্ষণেই হয়ত বুড়ার স্বরে, তাহার পরেই হয়ত বুড়ীর স্বরে কথা কহিতে হইবে। সুতরাং যাহাতে মুহূর্ত্তমধ্যে স্বর-পরিবর্ত্তন করিতে পার, তাহার জন্য চেষ্টা করিবে। উপরিউক্ত ধরণের ছোট ছোট কথাবার্ত্তা-রচনা করিয়া কিছুদিন অভ্যাস করিলেই, এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে।

বুড়াবুড়ীর সহিত কথা কহা আয়ত্ত হইবার পর, ছোট ছেলে, মেয়ে প্রভৃতির সহিত কথাবার্ত্তা-অভ্যাস করিবে। যে ভেণ্ট্রিলোকিষ্ট যত অধিকপ্রকার স্বরের অনুকরণ করিতে পারে, সে তত বেশী সফলতালাভ করে, একথা না বলিলেও চলে।

ঠোঁট-মুখ না নাড়িয়া কথা কহা।

ঠোঁট-মুখ না নাড়িয়া কথা কহিতে না শিখিলে, ভেণ্ট্রিলোকিষ্ট হওয়া যায় না। এইজন্য একখানা বড় আর্শির সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিবে এবং সেই সময় মুখের কোন্ কোন্ অংশ নড়িতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবে। তাহার পর সেই সেই অংশ স্থির রাখিয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিবে। প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় পনের-মিনিট করিয়া এই অভ্যাস করিলেই কিছুদিনের মধ্যে এ কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারিবে। প্রথমে স্বরবর্ণহইতে আরম্ভ করিবে, কারণ—ঠোঁট-মুখ না নাড়িয়া স্বরবর্ণগুলি-উচ্চারণ করা সহজ। অনেক ব্যঞ্জনবর্ণও এইভাবে উচ্চারণ করা কঠিন হইবে না। কিন্তু ঠোঁট না নাড়িয়া প, ফ, ব, ভ, ম প্রভৃতির ন্যায় বর্ণ-উচ্চারণ করা সহজ নহে। যে বর্ণটার উচ্চারণ করা একেবারে অসম্ভব হইবে, তাহার পরিবর্ত্তে আর একটা সুবিধামত বর্ণ বসাইয়া লইবে, যথা—"ফ"এর স্থানে "হ"। আগে বর্ণগুলি আয়ত্ত করিয়া, পরে কথা কহিতে আরম্ভ করিবে।

পুতুল চালাইবার কৌশল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভেণ্ট্রিলোকিজ্‌মের জন্য 'মুখনাড়া' পুতুল-ব্যবহার করিতে হয়। এই পুতুলের নীচের চোয়াল এমনভাবে মুখে লাগান থাকে যে, ভেণ্ট্রিলোকিষ্ট তাহার মুখের ভিতর একটা টিনখণ্ড টিপিলেই নীচের ঠোঁট নামিয়া যায়, টিপ্ ছাড়িয়া দিলেই আবার ঠোঁট উপরে উঠিয়া আসে। এইরূপে একবার টিপ্ দিয়া আর একবার টিপ্ ছাড়িয়া বাজিকর সহজেই আপন ইচ্ছামত পুতুলের ঠোঁট নাড়িতে পারে, এবং যেন পুতুল কথা কহিতেছে, এইরূপ ভাব দেখাইতে পারে। পুতুলের পিছন দিকে একটা গর্ত্ত থাকে, বাজিকর সেই গর্ত্তে হাত ঢুকাইয়া টিনখণ্ডটাকে টিপিলে, কেহ দেখিতে পায় না। এরকম পুতুল বিলাতে অনেক বিক্রয় হয়, এদেশেও আমদানী হয়। ইচ্ছা করিলে, তোমরাও উপযুক্ত মিস্ত্রির সাহায্যে এরূপ পুতুল গড়িয়া লইতে পার। বাজারের পুতুল-গুলি সাধারণতঃ "পাপিয়ে মাসে"-নামক পিষ্ট কাগজের মণ্ডহইতে প্রস্তুত একপ্রকার কঠিন পদার্থদ্বারা নির্ম্মিত হয়। পেষ্টবোর্ড, কাষ্ঠ প্রভৃতির দ্বারাও পুতুল তৈয়ার করা যাইতে পারে।

পুতুলগুলি কথা কহিবার সময় ঠিক তালমত তাহাদের মুখনাড়া আবশ্যক। যখন দুই-তিনটী পুতুল লইয়া কথাবার্ত্তা কহিবে, তখন কোন্ পুতুল তোমার কোন্ দিকে আছে, তাহা যেন সকল সময় মনে থাকে। নতুবা এক পুতুলের কথা আর এক পুতুলের মুখ-দিয়া বাহির হইলে, তোমাকে অপদস্থ হইতে হইবে। অতএব প্রত্যেক পুতুলের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিবে, এবং প্রত্যেক বারে বাজি দেখাইবার সময়, যে পুতুলের যে দিকে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছ, সেই দিকে তাহাকে বসাইবে। কথাবার্ত্তা কহিবার পূর্ব্বে, কি কথাবার্ত্তা হইবে, এবং কাহার পর কে কি বলিবে, তাহা ঠিক করিয়া রাখিবে। কথাবার্ত্তাগুলি যত কৌতুকজনক হয়, ততই ভাল। কিন্তু সাবধান, কোনক্রমে অসভ্যতা বা অশ্লীলতার প্রশ্রয় দিও না। সাময়িক প্রসঙ্গ লইয়া শ্লীলভাবে কৌতুক করিতে পারিলে, বেশ আমোদ হয়।

উপরে যে পুতুলের কথা বলিলাম, সেগুলি ছোট পুতুল। বাজিকর সেগুলি নিজের কোলে রাখিয়া হাতদিয়া চালান। কিন্তু বড় বড় ব্যবসায়ী বাজিকরেরা অনেক সময় মানুষের মত বড় পুতুল লইয়া বাজি দেখান। সে পুতুলগুলি দূরহইতে দড়ির সাহায্যে চালান হয়। সে সকল পুতুলের দামও বেশী। একটা ছোট পুতুল যেখানে চারি-পাঁচটাকায় পাওয়া যায়, সেখানে একটা বড় পুতুলের দাম ত্রিশচল্লিশটাকা।

(ক্রমশঃ।)

উচ্চৈঃশ্রবা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

১৫

এই মাঠটুকু পূর্ব্বদিকে সরু হইয়া গিয়াছে—সেই সরু স্থানটুকু ছাড়াইয়া গেলেই, ভয়ানক অসমান পাথুরিয়া জায়গা। বহুকাল এই পাহাড়িয়া স্থানে থাকিয়া ছাগলেরা বেশ শিখিয়াছে যে, পাথুরিয়া অসমান জমিতে গিয়া উঠিতে পারিলে, কুকুরেরা কিছু করিতে পারিবে না। তাই উচ্চৈঃশ্রবা সেইদিকে চলিল। কিন্তু নাগেশ্বর-বনের ভিতরদিয়া আসিতে আসিতে গাছের শিকড়ে পা ঠেকিয়া যাওয়াতে একটা মাদী ছাগল ক্রমেই পিছাইয়া পড়িতে-

সকলের আগে টিকড়ের গায়ে উঠিয়াই উচ্চৈঃশ্রবা দেখিতে পাইল যে, আর একটু হইলেই কুকুরেরা বেচারীকে ধরিয়া ফেলিবে। উচ্চৈঃশ্রবা আরও দেখিতে পাইল যে, আর হাত-দুই উপরেই এক

কা হকী-টীম্—১৯১২।

এই বৎসর ... করি হকী· । অতীব বাঞ্ছনীয় জয় নিদর্শন "বাই ... পুটি ... লের কের কাপটী "বাইটন-কাপ", তদ্ভিন্ন এই টীম্ "বেঙ্গল চাম্পিয়ন কাপ" ও "লীগ্-কাপ" পাইয়াছে ... মধ্যানের কাপটী "বেঙ্গল চাম্পিয়ন কাপ," আর দক্ষিণদিকের কাপটী "লীগ্-কাপ"। এই হকী-ক্রীড়কের দল ইতঃপূর্ব্বে ১৯... ০৯ ও ১৯১০ ..., পাইয়াছিল এবং ১৯০৯ ও ১৯১০ সালে আরও দুইবার "লীগ্-কাপ" ... ছিল।

সিভিল বনাম মিলিটারী—৬ই জুলাই, ১৯১২।
সিভিল-টীম মিলিটারী-টীমকে দুই গোল দিয়াছে।
সিভিল-টীম্।

সর্ব্বপশ্চাৎ পংক্তিতে—(বামদিক্‌হইতে ডান্‌দিকে)—হারগ্রেভ্‌স (কষ্টমস্), ফিটজ্ প্যাট্রিক (রেঞ্জারস্) হাইল্যাণ্ড (কষ্ট)।
মধ্যপংক্তিতে বসিয়া—(„ „ „)—শারমান্ ও বিসেকার (কলিঃ) কোয়েল (ড্যাল্‌ঃ) ওশিয়া (কলিঃ) কডি (রেঞ্জ) গলব্রেথ (কষ্ট)।
সম্মুখে— („ „ „)—ব্রচী (ড্যাল্) হালষ্টন (ড্যালঃ)।

ভয়ানক অতলস্পর্শ গর্ত্ত। উপস্থিত বিপদ্‌হইতে সঙ্গিনীকে রক্ষা করিবার জন্য উচ্চৈঃশ্রবা সরু জমির উপরে কুকুরদিগের প্রতি মুখ করিয়া দাঁড়াইল। সে একপাশে রহিল, তিনটা ধাড়ী তাহার পাশদিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া নিরাপদ্ স্থানে গেল। এইবার কুকুরেরা বিকট ঘেউ-ঘেউ-চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া পড়িল। এই কুকুরেরা চিরকালই ছাগল মারিয়া খায়, তাই ভাবিল, এই ছাগলগুলিও শীঘ্রই উদরস্থ করিতে পারিবে। কুকুরেরা নিমেষমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া, উচ্চৈঃশ্রবাকে আক্রমণ করিতে আসিল। কিন্তু কুকুরদের এবং উচ্চৈঃশ্রবার মধ্যস্থলে এক অতল গর্ত্ত, সরু তক্তারমত একখান পাথরের উপরদিয়া গিয়া উচ্চৈঃশ্রবাকে আক্রমণ করিতে হইবে, অথচ এই পাথরের উপরদিয়া একবারে একটা বই কুকুরের যাইবার যো নাই। একটা বড় কুকুর হাঁ করিয়া উচ্চৈঃশ্রবার ঘাড়ে পড়িবার জন্য যেই লাফ দিল, উচ্চৈঃশ্রবা সেটাকে এমন জোরে লোহার মত ধারাল শিং-দিয়া ঢুঁ মারিল যে, কুকুরটা ঢুঁ সাম্‌লাইতে না পারিয়া, পশ্চাতে যে কুকুরটা ছিল, সেইটার উপর গিয়া পিছাইয়া পড়িল, এমন সময়ে উচ্চৈঃশ্রবা আর এক ঢুঁ মারিল—আর দুইটা কুকুরই অতল, অন্ধকারময় গর্ত্তে (খাদে) পড়িয়া গেল। এ দুইটাকে আর যে কখনও চন্দ্র-সূর্য্যের মুখ দেখিতে হয় নাই, সে কথা বলা বাহুল্য। এই দুইটা যেই পড়িল, বাকী কয়টা—একটার পিছনে অপরটা "যুদ্ধ দিতে" অগ্রসর হইল। পাঁঠারা ঢুঁ মারিতে হইলে, প্রথমে একটু পিছাইয়া যায়, কিন্তু দুইটা কুকুর পড়িয়া যাইবামাত্রই বাকী কয়টা আসিল, সুতরাং উচ্চৈঃ-শ্রবার পিছনে হটিয়া "তাগ" করিবার অবকাশ রহিল না। কিন্তু তাহার "ঐরাবত"-মাথার "বে-তাগের" এক ঢুঁই যথেষ্ট। সে প্রথম শিং-দিয়া তুলিয়া একে একে দুইটা কুকুরকে "পাতালে" ফেলিয়া দিল; দিয়া, ফিরিয়া দলস্থ সকলকে যেই সংগ্রহ করিতে যাইবে, অমনি আর এক কুকুর লম্ফদিয়া আসিল। অনেক মানুষের যেমন, অনেক পশুরও তেমনি বিপদ্‌হইতে শিক্ষালাভ হয় না। এ কুকুরটারও তাই। উচ্চৈঃশ্রবা এটাকে দেখিয়াই ফিরিল। ফিরিয়া দুই শিংএ করিয়া, কুকুরটাকে তুলিয়া, সেই গর্ত্তে, তাহার সঙ্গীদের কাছে ফেলিয়া দিল।

উচ্চৈঃশ্রবা সদর্পে প্রকাণ্ড মাথা তুলিয়া দেখিল, আর কুকুর আসিতেছে কি না। দেখিতে দেখিতে একপ্রকার শব্দ করিতে লাগিল। আর কুকুর দেখিতে না পাইয়া, দলস্থ ছাগলদের—যাহাদের রক্ষার জন্য এত করিয়াছে—উচ্চৈঃশ্রবা তাহাদের পিছনে পিছনে চলিল।

রাঙ্গাটী ঝোঁপের ভিতর লুকাইয়া থাকিয়া, এই সমস্ত ব্যাপার ক-হইতে ঙ-পর্য্যন্ত একমনে দেখিতেছিল। এই স্থানহইতে রাঙ্গাটী যে স্থানে, সে স্থান বড় জোর একশতহাত দূর।

ইচ্ছা করিলে, অতি সহজে উচ্চৈঃশ্রবাকে কোন্ কালে মারিয়া ফেলিতে পারিত—একশতহাত ত বেশী দূর নয়। তায় আবার রাঙ্গাটীর হাত বড় ঠিক—সে মটুমটুর মত "কথার সাগর" নহে; কাজের লোক। কিন্তু উচ্চৈঃশ্রবার সাহস, বীরত্ব, রণকৌশল দেখিয়া রাঙ্গাটী অবাক্। এমন পরোপকারী বীরকে বধ করিতে তাহার মন সরিল না। বন্দুকটী একপাশে রাখিয়া মনে মনে বলিল, "তুমি অজকুলের ভীম। তুমি যে আমার তিনটা কুকুর মারিয়াছ, সেজন্য আর দুঃখ করি না। আমি তোমার অনিষ্ট করিব না। কুশলে চলিয়া যাও।"

কিন্তু রাঙ্গাটী যে ওখানে ছিল, উচ্চৈঃশ্রবা তাহা জানিত না, এবং রাঙ্গাটী যে কেন ছাগলটাকে মারিতে পারে নাই, মটুমটু তাহাও বুঝিতে পারিল না।

১৬

লুসাই-কুকিদের রীতি এই, যে যত শিকার করে, সেই সকল প্রাণীর মাথা যত্ন করিয়া রাখিয়া দেয়। যাহার ঘরে, যত মাথা, যত বড় বড় পশুর মাথা, তার তত মান। আবার বাঘ, ভালুক ইত্যাদি কোন বিশেষ পশু আসিয়া, গ্রামের মানুষ, গরু ইত্যাদি মারিলে, অবিবাহিতা যুবতীরা বলিত, যে যুবক ঐ বিশেষ পশুর মাথা আনিয়া দিবে, তাহাকে বরমাল্য দিব। এইজন্য লুসাইযুবকেরা বড় বড় পাঁঠার, বাঘের ও অন্যান্য পশুর মাথা-সংগ্রহ করিবার জন্য বড় উৎসুক। আবার শীতকালে এই সকল পশুর মাথা ও চামড়া লইয়া পাহাড়ের লোকেরা কাছাড় ও চট্টগ্রাম ইত্যাদি সহরে আইসে। বাঙ্গালী মহাজনেরা কাপড়, তামাক ইত্যাদির বদলে ঐ সকল কিনিয়া লয়।

উচ্চৈঃশ্রবাকে শিকারীরা চিনিয়া ফেলিল, কারণ অমন হৃষ্টপুষ্ট পাঁঠা, অমন প্রকাণ্ড মাথা, এবং চমৎকার শিং অতি দুর্লভ। কয়েকবৎসর ধরিয়া অনেক শিকারী উচ্চ টিলার মাথায় উচ্চৈঃশ্রবাকে চরিতে দেখিয়া, উহার চমৎকার শিংএর লোভে উহাকে মারিবার চেষ্টায় বেড়াইল, কিন্তু পারিল না। মটুমটু চুপ্ করিয়া থাকিবার লোক নহে; সে উৎসাহদিয়া, রাঙ্গাটীকে লইয়া, একদিন শিকারে বাহির হইল। এদিক্-ওদিক্ ঘুরিয়া, এক টিলার গায়ে উচ্চৈঃশ্রবাকে দলস্থ ছাগলদের লইয়া চরিতে দেখিল। কিন্তু একটু পরেই অজরাজ উচ্চৈঃশ্রবা অদৃশ্য হইল, দুইতিনদিন বিস্তর তল্লাস করিয়াও উদ্দেশ না পাওয়াতে শিকারীরা নিরাশ হইয়া চলিয়া আসিল। রাঙ্গাটী বিরক্ত হইল, বলিল, পাহাড়ে পাহাড়ে শিকারের

মিলিটারী-টীম্।

পিগট্ (মিড্‌লসেক্স) ডাভ্ (ঐ) রিচ্মণ্ড (ব্ল্যাক্ওয়াচ্) প্যাটারসন্ (ঐ) উটেন্ (মিড্‌লসেক্স)
ক্লার্ক (ব্ল্যাক্ওয়াচ্) হোল্ম্রিগ (আর, জি, এ) টার্ণবুল্ (ব্ল্যাক্ওয়াচ্) বেটর‍্যাম (মিড্‌ল) ওয়াটসন্ (ব্ল্যাক্) কনোর (ব্ল্যাক্)।

অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ানর অপেক্ষা বরং চা-বাগানের গরু-চরান ভাল।

কিন্তু মটুমটু নাছোড়বান্দা, একগুয়েমী ভাল নয়, আবার ভালও। গৃহে আসিয়া সে আবার শিকারে বাহির হইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিল। ভাবিল, এবার বেশীদিন থাকিতে হইবে। গায়ে দিবার জন্য একখানি খেশ, কিছু তামাক, বাঁশের চুঙ্গার ভিতর চকমকি-পাথর, কয়লা ইত্যাদি আর কিছু চাউল ও লবণ সঙ্গে করিয়া বন্দুক লইয়া, সে একদিন একাই শিকারে বাহির হইল। সেবার যেথানহইতে ফিরিয়া গিয়াছিল, এবার সেইখানে আসিয়া, নানা চিহ্ন ধরিয়া ছাগলের দলের অন্বেষণ-আরম্ভ করিল। কত পাহাড়ের গা বহিয়া উপরে উঠিল, উঠিয়া এদিক্-ওদিক্, ভাল করিয়া দেখিল। কিন্তু একটাও ছাগল তাহার চখে পড়িল না। দুইএক-বার মটুমটু এমন স্থানে আসিল, যেখানে ছাগলেরা রাত্রে শুইয়া-ছিল। পায়ের দাগ ধরিয়া অনেক দূরে গিয়া, শেষে এমন স্থানে উপস্থিত হইল যে, আর পায়ের দাগ ঠিক করিতে পারিল না। টিলায় ও টিকড়ে উঠিয়া যতদূর চক্ষু যায়, বেশ করিয়া দেখিল, কিন্তু ছাগলের ছপর্য্যন্ত চখে পড়িল না। রাত্রে একস্থানে পড়িয়া রহিল, সকালবেলা, ডগ-খাওয়া ঘাস, পাতা-খাওয়া লতা ইত্যাদি চিহ্ন ধরিয়া, উচ্চৈঃশ্রবার দলের আবার অন্বেষণ-আরম্ভ করিল। ঘণ্টা-তিন-চারি এই সকল চিহ্ন ধরিয়া এমন একস্থানে গিয়া পড়িল, ফলে যেথানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃশ্রবা মটুমটুর গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল। কাজেই শিকারী যে তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহা অজরাজ বেশ টের পাইয়াছিল। এইথান-হইতে ছাগলেরা, একটী সারি বাঁধিয়া, হাতীর দলের মত, দলপতির পিছনে পিছনে পথ চলিতেছিল। কারণ উচ্চৈঃশ্রবা মটুমটুর হাত এড়াইবার মানসে দূরবর্ত্তী স্থানে সকলকে লইয়া যাইতেছিল।

শিকারী ছাগলদের পায়ের দাগ ধরিয়া ধরিয়া চলিল। অবশেষে সন্ধ্যা হইল; পাহাড়ের গায়ে একটা গর্ত্ত ছিল, ঠিক ভল্লুকের মত সেই গর্ত্তে ঢুকিয়া পড়িল। যদি কতকগুলি কাঠ কুড়াইয়া লইয়া গিয়া, গর্ত্তে আগুন না জ্বালাইত, আমরাও উহাকে ভল্লুকই বলিতাম। এই গর্ত্তে বাঁশের চুঙ্গায় চাউল পুরিয়া, আগুনে পোড়া-ইয়া ভাত রাঁধিল, এবং ভোজালি-দিয়া চুঙ্গাটা চিরিয়া ভাত বাহির করিয়া খাইল। এই খানে রাত্রি-যাপন করত সকালবেলা আবার "পদ-চিহ্ন" ধরিয়া অজরাজ উচ্চৈঃশ্রবার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। দুই-এক-বার বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইল, একদল ছাগল অবিরাম দক্ষিণমুখে চলিয়াছে, কিন্তু অনেক দূরে, এত দূরে যে, মটুমটুর ক্লাইবী আমলের বন্দুকের কথা দূরে থাকুক, কামানের গোলাও সহজে অত দূরে যায় না। সে দিন ত গেল, পরদিনও গেল; ছাগলের দল লাপ্তা-পর্ব্বতশ্রেণীর দক্ষিণ টেরে একটা বিল বা হ্রদের উত্তরধারে গিয়া পড়িল।

সম্মুখে প্রকাণ্ড বিল, পিছনদিকে "নাছোড়বান্দা" লুসাইশিকারী, ছাগলের দল এখন যায় কোথায়? খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া, অবশেষে উচ্চৈঃশ্রবা পাহাড়ের পূর্ব্বগায়ের ঢালু ধরিয়া, ফিরিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। মনে করিল, শত্রু দেখিতে পাইবে না। কিন্তু কতকদূর গেলে পর, বন্দুকের শব্দ হইল, এবং একটা শিংএ যেন খট্ করিয়া কিছু লাগিল, আর কাঁধের কতকগুলি লোম উড়িয়া গেল।

শিংএ গুলি লাগিলে, প্রায় সকল পাঁঠাই হতবুদ্ধি হইয়া যায়। উচ্চৈঃশ্রবা গুলি খাইয়া একমুহূর্ত্ত দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া একপ্রকার শব্দ করিল, সে শব্দের বাংলা মানে—"চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা।" এই শব্দ করিবামাত্র দলস্থ ছাগলগুলি, যেটা যেদিকে পারিল, প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টায় ছুটিল।

শিকারী যে ছাগলগুলিকে দৌড়িয়া যাইতে দেখিতে পাইল না, এমন নয়, কিন্তু সেত যে-সে ছাগল চায় না, সে চায় উচ্চৈঃশ্রবাকে। এক্ষণে উচ্চৈঃশ্রবা পাহাড়ের গা বহিয়া পূর্ব্বদিকে ছুটিল, আর মটুমটু পদাঙ্ক ধরিয়া অজরাজের অনুসরণ করিতে করিতে চলিল। যাইতে যাইতে উচ্চৈঃশ্রবার উদ্দেশে অনেক কটু কথা বলিতে থাকিল।

এথানহইতে তালাং-নদী ক্রোশ-দুই-তিন দূরে মাত্র। উচ্চৈঃশ্রবা উলুবন ভাঙ্গিয়া, উচ্চ-নীচ, অতি বন্ধুর স্থানদিয়া, বাতাস পিছনে রাখিয়া, পূর্ব্ব-দক্ষিণ-দিকে যাইতে লাগিল। মটুমটুও পদাঙ্ক ধরিয়া, পিছনে পিছনে চলিল। এ সকল স্থান শিকারীর বেশ জানা ছিল। এইরূপে দিন-পাঁচেক যায়—পাঁচদিনের দিন উচ্চৈঃশ্রবা আগে, মটুমটু পরে, একটা প্রকাণ্ড বিল ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। শিকারী বেশ বুঝিতে পারিল যে, পাঁঠাটাকে পূর্ব্ব-দিকে যাইতে হইবে; গেলেই অতি জলা বাদাবনে গিয়া পড়িবে; সেথানদিয়া চলিতেই পারিবে না, কাজেই ফিরিতে হইবে; এ ভিন্ন আর গতি নাই। শিকারী পাঁঠার অনুসরণ না করিয়া ফিরিল, এবং যেথানদিয়া পাঁঠাকে ফিরিয়া আসিতেই হইবে, সেইদিকে খানিক দূর গিয়া, পাঁঠার পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘণ্টা-দুই ধরিয়া, পশ্চিমে বাতাস বহিতেছিল—বাতাসের জোর ক্রমেই বাড়িতেছিল। দেখিতে-না-দেখিতে ভারী ঝড় উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। কুড়িহাত দূরের জিনিসপর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না, এমন অন্ধকার হইল। কিন্তু এই ঝড় বেশীক্ষণ রহিল না; একটা দমকা ঝড় উঠিয়াছিল, কয়েক মিনিটের মধ্যেই থামিয়া গেল, আর ঘণ্টা-দুই পরে আকাশ বেশ পরিষ্কার হইল। মটুমটু এক-ঘণ্টা-কাল এইথানে রহিল, কিন্তু উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখিতে না পাইয়া, অন্যত্র চলিল। এক্ষণে, পাঁঠাটা কোন্‌দিকে গিয়াছে, কোনপ্রকার চিহ্ন ধরিয়া, সেই দিকে যাইবার চেষ্টা দেখিল। চিহ্ন পাইল—দুই-তিন-স্থানে পাতা-খাওয়া লতা দেখিয়া স্থির করিল, এই পথে পাঁঠাটা গিয়াছে। উচ্চৈঃশ্রবার যেদিকে যাইবার সম্ভাবনা, সে সেই দিকেই গিয়াছে—শিকারীকে বেশ ফাঁকি দিয়াছে। অজরাজ উচ্চৈঃশ্রবার প্রাণ-রক্ষার জন্যই যেন বিধাতা অকস্মাৎ ঝড়-বৃষ্টি উপস্থিত করাইয়া-ছিলেন। (ক্রমশঃ।)

সমর-কপোত।

পারাবতদিগকে রণ-দূতরূপে ব্যবহার করা নিতান্ত আধুনিক ব্যাপার নহে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে যখন জর্ম্মাণীর সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধে, তখন রণ-পারাবতেরা শেষোক্ত শক্তির সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিল, কিন্তু তৎকালপর্য্যন্ত
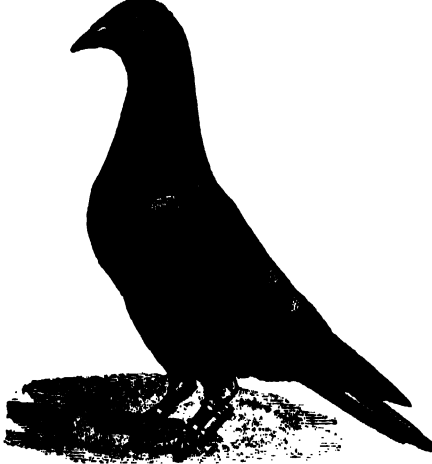
WAR PIGEON SHOWING MESSAGE ATTACHED

তাহাদের শক্তিসামর্থ্যের কথা সাধারণের অপরিজ্ঞাত ছিল; তথাপি ইতিহাস-পাঠে আমরা অবগত হই যে, রোমক ও পারসিকেরাও পূর্ব্বকালে পারাবতদিগকে রণদূতরূপে ব্যবহার করিতেন।

যুদ্ধকালে শত্রুদিগের গতি-বিধিসম্বন্ধে ত্বরিৎ ও নির্ভুল সংবাদ পাওয়া সৈন্যাধ্যক্ষের সবিশেষ আবশ্যক। যে সেনানীকে তাঁহার বার্ত্তা-বাহীর দল নিয়মিতরূপে সংবাদ আনিয়া দেয়, সে সেনানীর সৈন্যসংখ্যা কম থাকিলেও জয়লক্ষ্মী তাঁহারই অঙ্কগত হন।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে জর্ম্মাণী যে অভিজ্ঞতা-লাভ করে, তাহার ফলে তাহার সীমান্তস্থিত ও দুর্গরক্ষিত প্রত্যেক সহরে এক-একটী করিয়া সরকারী কপোত-কুলায়িকা স্থাপিত হয়। তাহার পর, ফ্রান্সও জর্ম্মাণীর পন্থানুসরণ করে। পরে, ইটালী, রুষিয়া ও স্পেনেও কপোতাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংলণ্ড সামরিক কার্য্যে কপোত-ব্যবহার করে নাই, তবে নৌ-সেনা-বিভাগকে সাহায্য করিবার জন্য ইংলণ্ডে, পোর্টস্মাউথ, ডেভনপোর্ট ও শিয়ারনেসে বহুকালাবধি কপোত-কুলায় স্থাপিত আছে।

ইংলণ্ডে প্রথমে তিমি-দ্বীপে নৌ-সেনাবিভাগকর্ত্তৃক কপোত-গৃহ স্থাপিত হয়। সেই কুলায়িকাটি প্রথমে আলোক-স্তম্ভাকৃতি একটি সুদৃশ্য দ্বিতল-গৃহ ছিল। কাপ্তেন তক্‌নেল্ তথায় অল্পসংখ্যক পারাবত রাখিয়া তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া পারাবতদ্বারাও যে প্রকৃত সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

ঐ কার্য্য করিয়া তিনি বৃহত্তর ও বিশদতর আয়তনসম্পন্ন একটী
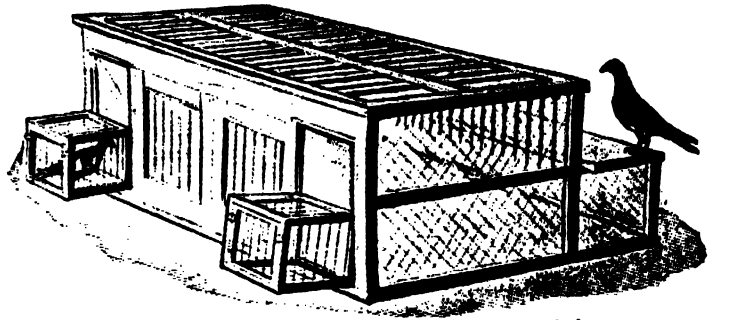
TRAP USED WITH PORTABLE LOFT

কপোত-গৃহ-নির্ম্মাণ-জন্য কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট আন্দোলন উপস্থিত করেন। তাহার ফলে, গস্‌পোর্টে একটী সুবৃহৎ কপোত-গৃহ নির্ম্মিত হয়। এই কপোত-কুলায়িকাটিও দ্বিতল। দ্বিতলে শিক্ষিত পারাবতগুলিকে
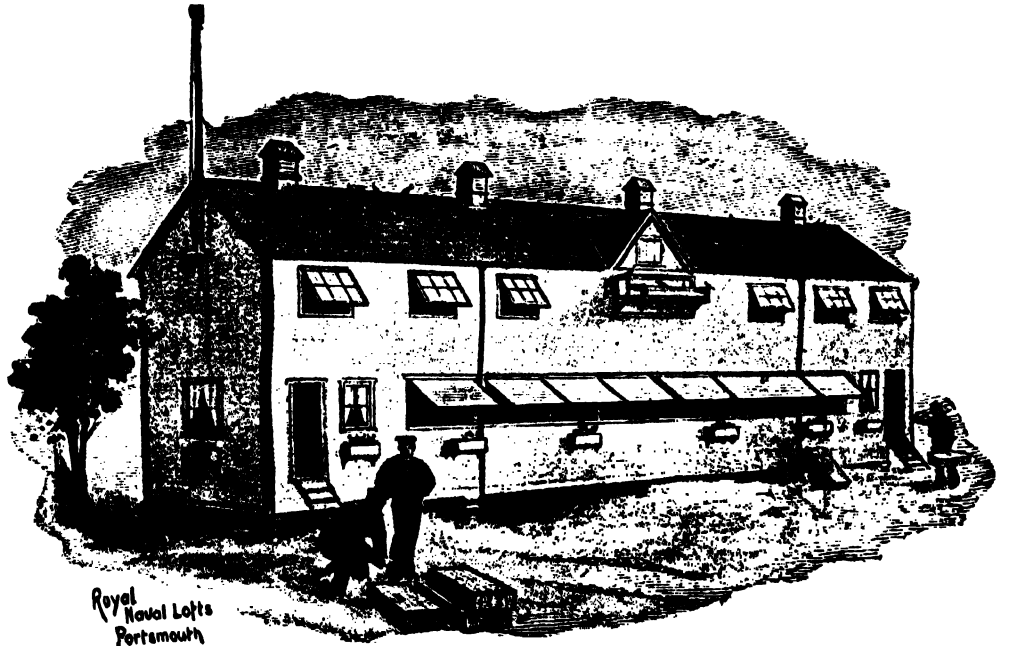
Royal Naval Lofts Portsmouth

রাখা হয়। তথায় অন্যূন পাঁচশত পারাবত বাস করিতে পারে। নিম্ন-তলে অন্য কুলায়িকার পারাবতদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হয়। ঐ কপোতা-

বাসের অগ্র-পশ্চাতে দুইটী আফিস-ঘর আছে। উহার মধ্যে একটিতে ঝুড়ি, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি গুদামজাত করিয়া রাখা হয়; এবং দ্বিতীয় আফিস-কামরায় একটী টেলিফোঁন্ আছে, কোন খবর আসিলেই সদরে সেই সংবাদ-প্রেরণ করিবার জন্য ঐ টেলিফোঁন্ ব্যবহৃত হয়। এই ঘরেই কোন্ পায়রা কতক্ষণে কত দূরে যায়, কোন্ পায়রা কোন্ সময়ে ডিম পাড়িবে, কোন্ পায়রা কোন্ কুলোদ্ভূত ইত্যাদি ইত্যাদি তথ্য-পূর্ণ একখানি বিবরণী-পুস্তকও রাখা হয় পায়রাদিগের ডিম পাড়িবার সময়টি জানা সবিশেষ আবশ্যক, কেননা সে সময়ে তাহারা বেশীদূর উড়িয়া যাইতে পারে না।

MESSAGE HOLDER ON BIRDS LEG

নৌ-বিভাগের এই কপোত-কুলায়িকাগুলি বড় পরিষ্কার করিয়া রাখা হয়। প্রতি প্রভাতে এক নীল-কুর্ত্তা-পরা নাবিক গিয়া কপোত-দিগের খোপগুলি চাঁচিবার যন্ত্র-দিয়া চাঁচিয়া পোঁচড়া-দিয়া চুণকাম করিয়া দেয়। তাহার ফলে, কপোত-কুল বেশ সুস্থ থাকে, এবং স্বভাবপালিত পক্ষীদিগের ন্যায় তাহাদেরও গায়ের পালকগুলি বেশ চক্‌চকে থাকে। সৌভাগ্যক্রমে, যুদ্ধকালে এই গগন-বিহারী বার্ত্তাবহ দিগের শক্তি-পরীক্ষার আবশ্যকতা আজও হয় নাই, কিন্তু তাহাদিগের উপর যে নির্ভর করা যায়, তাহা অনেকবার প্রতিপন্ন হইয়াছে। যে সময়ে রাজপোত ফরাসিস্ উপকূল-ত্যাগ করে, সে সময়ে কয়েকবার এইরূপ কয়েকটি পারাবত ছাড়িয়া দিয়া দেখা গিয়াছে যে, রাজপোত ব্রিটিস-উপকূলহইতে লক্ষিত হইবার পূর্ব্বেই ঐ পারাবতেরা প্রায় পঞ্চাশক্রোশ পথাতিবাহনপূর্ব্বক গস্‌পোর্টে বার্ত্তাবহন করিয়া আনিয়াছে। সম্প্রতি জলতলে প্রচ্ছন্ন রণপোতগুলি উপরে তুলিবার সময়েও ঐ পারাবতদিগের দ্বারা বার্ত্তা-প্রেরণ করা হইয়াছিল। যুদ্ধের জাহাজগুলি যখন চানেল-দিয়া যায়, কিম্বা যখন জাহাজগুলির শোলেণ্টে গতি-পরীক্ষা হয়, তখন সেই জাহাজগুলিতে খাঁচা করিয়া বার্ত্তাবাহী পারাবত রাখা হয়, তাহারা, ঘড়ীর মত নিয়মিত সময়ে, বার্ত্তা-বহন করিয়া আনে।

GERMAN WAR PIGEON TRAINING SCHOOL STRASBURG.

FRENCH SOLDIERS DISPATCHING WAR PIGEON WITH MESSAGE.

তারহীন বার্ত্তাবহ-যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়াতে, এই পারাবতদিগের প্রয়োজনীয়তা কমিয়াছে, কিন্তু তাহা বলিয়া পারাবতদিগকে একেবারে বাদ দেওয়া যাইতেছে না। শত্রুরা ইচ্ছা করিলে মধ্যহইতে তারহীন বার্ত্তাবহ-যন্ত্রের সংবাদ আট্‌কাইয়া জানিয়া লইতে পারে, তা' ছাড়া তারহীন সংবাদ-প্রেরণ ও গ্রহণজন্য দস্তুরমত সাজ-সরঞ্জামযুক্ত 'ষ্টেশন' থাকা আবশ্যক, কিন্তু পারাবত যেখানহইতে খুসী ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে, কেবল সংবাদগ্রহণের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকা আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংলণ্ডে স্থলস্থিত সেনা-বিভাগের সাহায্যার্থে পারাবত ব্যবহৃত হয় না। তজ্জন্য ইউরোপের অন্যান্য শক্তিদিগের সামরিক বিভাগে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে হইবে। জর্ম্মাণী ষ্ট্রাসবুর্গে একটা ট্রেনিং স্কুল খুলিয়াছে, সেখানহইতে কোন কোন সামরিক কর্ম্মচারী

কপোত-গৃহ-রক্ষণ-বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া অন্যান্য অধীন কপোত-গৃহের ভারপ্রাপ্ত হন। চরের কার্য্যার্থে যখন কপোত আবশ্যক হয়, তখন তাহাদের হাল্‌কা খাঁচায় করিয়া সেই খাঁচাটা মোটরীর মত পিঠে বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া হয়। তখন অনিষ্টাশঙ্কায় প্রত্যেক পায়রাকে আলা'দা আলা'দা খোপে রাখা হয়। ঐ খাঁচার ডালাটার উপরে চর কাগজ রাখিয়া লিখে, উহার ভিতরদিকে কতকগুলি ঘুড়ীর কাগজের মত পাৎলা কাগজও গোঁজা থাকে। চর তাহাতে সংবাদ লিখিয়া কাঁচ-কড়ার একটা নলের ভিতর পুরিয়া পারাবতের পায়ে আট্‌কাইয়া দেয়।

TRAVELLING LOFT JAPANESE ARMY

জর্ম্মাণীতে প্রতি কপোত-কুলায়িকার সহিত অন্যান্য কপোত-কুলায়িকাগুলির যোগ আছে। এক কুলায়িকার পারাবত-দিগকে উভয়-পার্শ্ববর্ত্তী কুলায়িকায় উড়িয়া যাইতে শিখান হয়। সেইজন্য একদেশহইতে অন্যদেশে সংবাদ-প্রেরণ করিতে হইলে, সংবাদটি কেবল এক কুলায়িকাহইতে অন্য কুলায়িকায় প্রেরণ করিলেই চলে। তাই সেখানে কোন পারা-বতকে সাড়ে পঁয়তাল্লিশক্রোশের বেশী উড়িতে হয় না। এইপ্রকারে পারাবতের পথ হারাইবার সম্ভাবনা খুব অল্প হইয়া পড়িয়াছে।

ইংলণ্ডে যে ভাবে কপোতগুলিকে রাখা হয়, ইউরোপের অন্যান্যদেশে সে ভাবে রাখা হয় না। সে সব দেশে বড় বড় বাড়ীর ছাদে বা উপরের তলায় পায়রাগুলিকে রাখা হয়, আর অন্য কুলায়িকার পারাবতদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হয়। তাহার পর, যখন, যে কুলায়িকাহইতে তাহারা সংবাদ আনিয়াছিল, সেই কুলায়িকার দিকে সংবাদ প্রেরণ করা হয়, তখন তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়; দিলে, তাহারা নিজ নিজ কুলায়িকায় ঠিক ফিরিয়া যায়।

পায়রা খবর দিয়া আবার ফিরিয়া আসিবে, এ উপায়

RUSSIAN SCOUTS SENDING MESSAGE BY WAR PIGEON

জর্ম্মাণীই প্রথমে উদ্ভাবিত করে। সেই দেশে এক কপোতাবাসহইতে অন্য কপোতাবাসে সংবাদ-প্রেরণ-প্রথা প্রচলিত হইয়া গেলে, কপোত-গৃহ-রক্ষকেরা বুঝিলেন যে, কপোতেরা যদি খবর দিয়া আবার ফিরিয়া আসিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের ধরিয়া বন্দী করিয়া রাখিবার হাঙ্গামা পোহাইতে হইবে না, খুব সুবিধা হইবে।

প্রথমতঃ এ প্রয়াস পক্ষি-প্রকৃতির প্রতিকূল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ এক-দিবস একটা কাণ্ড দেখিয়া উহা সম্ভাবিত বোধ হইল। একটা বুড়া পায়রাকে কুলায়ান্তর করা হইয়াছিল, সে অনেকবার পলাইয়া গিয়া গিয়া শেষে নব-কুলায়ে থাকিতে সম্মত হইল। কয়েকমাস বেশ রহিল, তাহার পর ডিম পাড়িবার সময় সে মাঝে মাঝে পুরাণো কুলায়ে যাইতে আরম্ভ করিল; এক পর্য্যবেক্ষণপটু কুলায়িকা-কর্ম্মচারী লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, পুরাণো কুলায়ে ফিরিয়া পায়রাটা যে খোপে কাঁকড় আছে, সেই খোপেই বরাবর গিয়া ঢুকে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, তাহার নূতন খোপে ঐ আবশ্যক বস্তুটী নাই। এইরূপে পারাবত যাহাতে সংবাদ দিয়া স্বীয় নীড়ে ফিরিয়া যায়, তাহার উপায় নির্দ্দিষ্ট হইল। পায়রা যদি কাঁকড়ের জন্য পুরাণো খোপে ফিরে, তাহাহইলে মটর বা জল না পাইলেও ফিরিবে।

অতঃপর, কতকগুলি বাচ্ছা পায়রা লইয়া পরীক্ষা করা হয়। চব্বিশঘণ্টা তাহাদের কিছুই খাইতে দেওয়া হয় নাই, কেবল জল দেওয়া হইয়াছিল। তাহার পর, তাহাদিগকে একটী দূরবর্ত্তী কুলায়িকায় পাঠাইয়া দিয়া খাইতে দেওয়া হয়, কিন্তু জল দেওয়া হয় নাই, তাহাতে তাহারা সহজাত বুদ্ধিগুণে আপনাদের নীড়ে ফিরিয়া আসিয়াছিল। কয়েকদিন ধরিয়া ঐ পারাবতগুলিকে সেই দূরবর্ত্তী কুলায়িকায় খাইতে পাঠান হয়। পরে একদিন তাহাদের নির্দ্ধারিত সময়ে আহারের কুলায়িকায় না পাঠাইয়া, শুধু ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তাহারা প্রথমে আকাশে উঠিয়া ঘুরিতে লাগিল, তাহার পর, দুই-একবার দুই-একটী ভুল দিকে উড়িয়া গেল, শেষে তাহারা খুব দ্রুতভাবে যে কপোতাবাসে খাদ্য পাইত, সেই কপোতাবাসের দিকে উড়িয়া চলিল। এখন ইউরোপের কয়েকটী কপোত-গৃহে এমন সব পারাবত আছে, যাহারা সংবাদ দিয়া আবার স্ব স্ব কুলায়িকায় ফিরিয়া আসিতে পারে।

ফ্রান্সদেশে গতিশীল কপোত-কুলায়িকা লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে; কিন্তু তেমন সুবিধা হয় নাই। যেস্থানহইতে কপোত ছাড়া হয়, সেস্থানহইতে কুলায়িকা স্থানান্তর করা হইলে, পায়রারা প্রায় চিনিয়া নিজ নিজ কুলায়িকায় ফিরিতে পারে না।

যে গৃহে কপোতেরা থাকে, সেই গৃহটাই যুদ্ধস্থলে টানিয়া লইয়া গিয়া পায়রাদিগকে প্রথম ছাড়িয়া দিবার কয়েকদিবস পরে তাহাদের দ্বারা সংবাদ-প্রেরণ করিয়া জাপান কতক কৃতকার্য্য হইয়াছে।

অভ্যাস।

যে ছেলেটি জীবনে কৃতকার্য্য হইতে চায়, তাহার একটী বিষয়ে ভাল করিয়া মনোযোগ করা দরকার; তাহার চরিত্র কিপ্রকারে গঠিত হইতেছে, ইহা তাহার সতত ভাবিয়া দেখিতে হইবে। তোমাদের চরিত্র দিন দিন গোপনে গঠিত হইতেছে, এবং তোমা-দের বর্ত্তমান্ চরিত্র-গঠনের উপর তোমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল বা অমঙ্গল অনেকটা নির্ভর করিতেছে, কাজেই এ বিষয়ে তোমাদের সবিশেষ মনোযোগ করা দরকার। অভ্যাসদ্বারাই আমাদের জীবনের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য হয়। তোমরা যে সমস্ত কার্য্য এখন সহজেই করিয়া থাক, তোমরা যখন শিশু ছিলে, তখন সে সমস্ত কার্য্য আদৌ করিতে পারিতে না। তোমরা নিজে নিজে খাইতে, কাপড় পরিতে, এমন কি চলিতে পর্য্যন্ত পারিতে না। তোমা-দিগকে ঐ সব কার্য্য করিতে শিখিতে হইয়াছিল। এখন তোমাদের

অনেকে লেখা-পড়া শিখিতেছ; তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ যে, লেখা-পড়াও অভ্যাস-সাপেক্ষ। কিন্তু অভ্যাস করিলেই কার্য্য-মাত্রেই ক্রমশঃ সহজসাধ্য হয়। ফুটবল, ক্রিকেট্ প্রভৃতি খেলাতেও অভ্যাস করা দরকার। আমরা যখন প্রথমে ক্রিকেট্ খেলিতে যাই, তখন ব্যাট্ কিরূপে ধরিতে হইবে, তাহাও জানি না, এবং অনেক দিন ধরিয়া অভ্যাস না করিলে, আমরা কখনও ভাল ব্যাট্স্ম্যান হইতে পারি না।

আমাদের জীবনের সর্ব্ববিষয়ে দু'রকম অভ্যাস দেখিতে পাওয়া যায়; আমরা তদ্দ্বারা আমাদের চরিত্র হয় সুগঠিত করিয়া তুলিতেছি, নয় বিকৃত করিয়া ফেলিতেছি। কু-অভ্যাস কেমন করিয়া ছেলেদিগকে জীবনে অকৃতকার্য্য করিয়া ফেলে, ক্রিকেট্-খেলাহইতে তাহার একটী উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। অনেক ছেলে ব্যাট্ করিতে গেলে চোট খাইবার ভয়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। বল্‌টি তাহাদের গায়ের দিকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়াই তাহারা ভয়ে পা সরাইয়া লয়। এই দোষ অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উহারই জন্য অনেক ছেলে সাতজন্মেও ভাল ব্যাট্‌স্‌ম্যান্ হইয়া উঠিতে পারিবে না। ঐ কু-অভ্যাস অবিলম্বে দূর করা দরকার।

জীবন-ক্ষেত্রেও তোমরা কিরূপে আচরণ করিতেছ, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা অত্যাবশ্যক, কেননা তোমাদের চিন্তা, কথা, কার্য্য ও অভ্যাসসকলদ্বারা তোমাদের চরিত্র প্রতিনিয়ত গঠিত হইতেছে। আলস্য ছেলেদের একটী সাধারণ কু-অভ্যাস; তোমরা যদি সাবধান না হও, তবে সেই অভ্যাস তোমাদের জীবন অনেকটা নিষ্ফল করিয়া ফেলিবে। প্রাতে অনেক ছেলে পিতামাতা বা শিক্ষকের ডাক শুনিয়া, "আর দুই-এক-মিনিট শুয়ে থেকে উঠ্‌ব," এ ভাবিয়া তাহাদের অলস ভাবকে প্রশ্রয় দেয়। এইরূপে রোজ রোজ শয্যাত্যাগ করিতে বিলম্ব করিয়া তাহাদের অলস ভাব ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া যায়; শেষে তাহাদের সর্ব্বনাশ হয়। তোমরা এ বিষয়ে সাবধান হও।

আর একটী দোষ ছেলেদের মধ্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, অর্থাৎ মিথ্যাকথন। এই দোষটি অনেক সময়ে অতি সামান্য বীজহইতে উৎপন্ন হয়। অনেক ছেলে সঙ্গীদের নিকট মান পাইবার আশাতে আত্মশ্লাঘা করিতে ভালবাসে, কাজেই যাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে, তাহারা অনেক সময়ে তাহা বলিয়া থাকে। এপ্রকার কাজ করা বড়ই বিপজ্জনক। কিংবা ধর, তোমরা কোন বিপদে পড়িলে; শাস্তির ভয়ে তোমরা হয় মিথ্যাকথা বলিলে, নয় ত সত্যটি গোপন করিলে। তোমরা হয় ত মনে করিলে যে, মিথ্যা-কথা বলা অতি সামান্য বিষয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তোমরা মিথ্যাকথা বলিয়া তোমাদের ভাবী উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করি-তেছ। মনে রাখিও, তোমাদের চরিত্র-গঠন-ব্যাপারে কোন কার্য্যই সামান্য নয়।

তোমরা যদি সৎলোক হইতে চাও, তাহা হইলে সবরকম কু-অভ্যাসের সহিত প্রাণপণে সংগ্রাম কর। তোমাদের কোনও মন্দ কার্য্যকেই সামান্য মনে করা উচিত নহে। বিশেষতঃ এ জগতে যাহা কিছু ভাল, তাহাতে আসক্ত হওয়া আবশ্যক। তোমরা যেন সচ্চরিত্র হইয়া উঠিতে পার, তজ্জন্য দুইটি বিষয় প্রয়োজনীয়, প্রথমতঃ তোমাদের উৎকৃষ্ট আদর্শের প্রয়োজন আছে; দ্বিতীয়তঃ তোমাদের শক্তি পাওয়া আবশ্যক। জগতের জনক ঈশ্বরই এক-মাত্র শক্তিদাতা। তিনি তোমাদিগকে ভাল বাসেন; তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিলে, তিনি তোমাদের সাহায্য করিবেন।

উল্লেখযোগ্য উক্তি।

সুবিখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রচারক চার্লস্ কিংসলী এই বলিয়া তাঁহার একটী বন্ধুকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, "তুমি এই একটী নিয়ম কর, এবং যাহাতে তুমি এই নিয়মটি রক্ষা করিতে পার, তাহার জন্য ঈশ্বরের কাছে সাহায্য-প্রার্থনা কর যে, যদি সম্ভব হয়—'অন্ততঃ একটী মানুষকেও আমি আজ অধিকতর জ্ঞানী, সুখী কিম্বা উত্তম করিয়াছি'—এই কথা বলিতে না পারিলে, তুমি কোন দিন ঘুমাইতে যাইবে না। এ কাজ করা তুমি যত কঠিন মনে করিতেছ, দেখিবে, তাহার অপেক্ষা ইহা সহজসাধ্য এবং সুখকরও বটে।"

জুলাইমাসের পদ্যরচনার প্রতিযোগিতা।

জুলাইমাসের 'পদ্যরচনার প্রতিযোগিতায়' শ্রীমতী সরস্বতী দেবী-প্রেরিত কবিতাটি প্রথম স্থান এবং শ্রীমান্ প্যারীমোহন সেনগুপ্ত-প্রেরিত কবিতাটি দ্বিতীয় স্থান-অধিকার করিয়াছে। আমরা নিম্নে কবিতা-দুইটি প্রকাশিত করিলাম।—"বালক"-সম্পাদক।

১। সভ্যতার আক্কেল-সেলামী।

(১)

কোট্, প্যাণ্ট্ পোরে তুমি, মাথায় হ্যাট্টী দিয়ে,
ছড়ি হাতে আস্‌ছিলে না, কুকুর সঙ্গে নিয়ে?
লাট-সাহেবের বাচ্ছা বোনে, "ধরা ভেবে সরা,"
হন্‌হনিয়ে, বুক ফুলিয়ে, যেন লড়ায়ে গোরা?

(২)

ঝমাঝম্ বৃষ্টি এল, আর নিভে গেল তেজ?
ঠ্যাঙ্গা খেয়ে "জন্তু" যেমন গুটায়ে চলে লেজ!
দমে' গেছে বুকের পাটা, কোমর গেছে পড়ে,'
হাসিমুখ, হাঁড়িপারা একটু জলের তোড়ে?

(৩)

"ঝোড়ো কাকের" দশায় (তোমার) "কুকুর বিড়াল কাঁদে,"
কেবা দেখে কুকুরটাকে? পড়েছে সে ফাঁদে,
হাঁটু-জল ভেঙ্গে, দাদা, আস্‌ছ ধীরে ধীরে?
কোথা বুটের মচ্‌মচানি, চাও না যে গো ফিরে?

(৪)

খোলা গায়ে, খোলা পায়ে, অসভ্য যে আমি,
ঝাঁপি শিরে, উঁচুস্থানে, জলে নাহি নামি,
তোমাচেয়ে সুখে আছি, না হই বা সভ্য,
"জবড়-জঙ্গ" সেজে, (তোমার) "বানর ভিজা লভ্য"!

শ্রীমতী সরস্বতী দেবী। বয়স, ১৩ বৎসর।
৩৬ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। সখের চূড়ান্ত।

বাঙ্গালাদেশে চাষের ব্যাপার কখন দেখে নাই
(তাই) খেয়াল হল টমাস্-ভায়ার মাঠ বেড়ান চাই।
সঙ্গে কুকুর, হাতে ছড়ি, ফুট্‌ফুটেটি হ'য়ে।
গেলেন টমাস্ ধীরে ধীরে মাঠের পানে ধেয়ে।
একে বর্ষা, তাতে বিকাল,—বৃষ্টি এল হায়!
সাহেব-বাবু কুকুর নিয়ে এখন কোথা যায়?
দৌড়ে গিয়ে ধানের ক্ষেতে যেই দিয়েছেন পা,—
একটী আছাড় ধড়াস্ করে,—ভিজে গেল গা।
মাথার উপর বৃষ্টির তোড়, মাঠভর্ত্তি জল।
কোট-প্যাণ্টালুন সবই গেল, সাহেব ত বিকল।
আধখানা পা কাদায় ডোবে, তোলে যা'হ'ক করে,
ভিজে প্যাণ্টালুন পায়ে জড়ায়, 'হুমড়ি খেয়ে' পড়ে।
যা'হ'ক করে সাম্‌লে নিয়ে মাঠে উঠ্‌তে যায়।
হড়্‌কে পড়ে' ভিজে জুতা,—আবার আছাড় খায়!
চাষা দেখে হেসে বলে,—"পান্তয়া যে হ'লে,
'এস সাহেব টোকার তলায়, তা' না হলে ম'লে।"

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।
(বয়ক্রম—১৫ বৎসর।) বৈদ্যবাটী, চাঁপদানী

পদ্যরচনার প্রতিযোগিতা।

এই ছবিটি অবলম্বন করিয়া ছেলেদের উপযুক্ত একটি হাসির কবিতা-রচনা করিতে হইবে। কবিতাটি যেন ষোল-পংক্তির বেশী বড় না হয়। উহা সেপ্টেম্বরমাসের শেষ তারিখের মধ্যে আমাদের হাতে আসা চাই। কবিতাটি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া "বালক"-সম্পাদক, ২৩ নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হইবে না। প্রাপ্ত কবিতাগুলির "বালক"-সম্পাদক যথেচ্ছ-ব্যবহার করিতে পারিবেন। যে লেখকের কবিতাটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাঁহাকে একখানি ইংরাজী-পুস্তক পুরস্কার দেওয়া হইবে। তাই লেখকগণ তাঁহাদের রচনা-গুলির নিম্নে কোন একস্থানে তাঁহাদের নাম, ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

বালিকা

১ম বর্ষ।] অক্টোবর, ১৯১২। [১০ম সংখ্যা।

কনানার বল্লম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

১৩

রাত্রি উপস্থিত হওয়াতে তৃতীয়দিনের যুদ্ধ স্থগিত হইল, কিন্তু নবিজীর সৈন্যদল যুদ্ধারম্ভে যেখানে ছিল, সেইখানেই রহিল, একপাও হটিল না।

কাহ্লেদ্ সেনাগণের সঙ্গে মাটীতে বসিয়া পড়িলেন, পশ্চাদ্দিকে যে স্ত্রীলোকেরা ছিলেন, তাঁহারা অল্প-স্বল্প খাদ্য-সামগ্রী তৈয়ার করিয়া আনিয়া দিলেন।

সমস্ত রাত্রি তিনি স্বীয় ধূসরবর্ণ রণ-অশ্বের পাশে বসিয়া বসিয়া, আকাশপানে তারাগণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিলেন, মনে নানা চিন্তা।

কল্য হয় মরিতে, না হয় পলাইতে হইবে, এ ভিন্ন আর গতি নাই। কাহ্লেদ্ যে এমন অজেয়, তিনিও জয়লাভের আশায় জলাঞ্জলি দিলেন। কাহ্লেদ্ বীরপুরুষ, রণে ভঙ্গদিয়া পলাইবার লোক নহেন; কাহ্লেদ্ বীরপুরুষ, আপনার গুমর-রক্ষার জন্য আর সকলে যে মারা যাইবে, ইহাও তাঁহার প্রাণে সহিবে না।

আজি রাত্রে তাঁহার দারুণ মনোকষ্ট। কিন্তু পূর্ব্বদিক্ ধূসর-বর্ণ হইয়া আসিলে, তিনি স্থির করিলেন, নিজে মরি, সেও ভাল, তথাপি যত জনকে বাঁচাইতে পারি, তাহা করিব।

স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকারা, আর যে সকল আহত লোককে স্থানান্তর করা যাইতে পারে, তাহাদিগকে অবিলম্বে বিদায় করিয়া দিতে হইবে, আর, যে সকল জিনিষ-পত্র তাহারা লইয়া যাইতে পারে, সে সকল লইয়া, নানাদিকে সকলে ছড়াইয়া পড়ুক।

ইহারা চলিয়া গেলে, যে সকল লোক আমার সঙ্গে থাকিতে ও আমার সঙ্গে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তাহাদিগকে লইয়া আমি শত্রুপক্ষকে থামাইয়া রাখিব, অগ্রসর হইতে দিব না; ইত্যবসরে অবশিষ্ট সৈন্যগণ সরিয়া পড়িবে, তাহারা বরাবর মক্কা ও মদিনায় যাইবে, এবং যতক্ষণ একটী প্রাণীও বাঁচিয়া থাকিবে, ঐ দুইটি নগররক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে।

মন্ত্রণা স্থির হইলে, তিনি একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস-ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, এবং নিজের রণ-ক্লান্ত ঘোড়ায় চড়িয়া, এই মন্ত্রণানুসারে সমস্ত কার্য্য যেন হয়, তাহা দেখিতে গেলেন।

আর কখনও অজেয় কাহ্লেদ্ স্বীয় সেনাগণকে পিছে হটিতে আদেশ করেন নাই, তবে সান্ত্বনার বিষয় এই যে, নিজে সকলকে লইয়া হটিতেছেন না।

মানুয়েলের ছাউনীতেও সকলের মনে ঐপ্রকার চিন্তা, সকলেরই মুখ মলিন। খাদ্য-সামগ্রী একরত্তিও নাই। লোকে ঘোড়া ও উট মারিয়া পর্য্যন্ত খাইয়াছে। উট-ঘোড়া যথেষ্ট নাই যে, তৈজসপত্র লইয়া সরিয়া পড়িবে; শক্তি-সামর্থ্যও নাই যে, যুদ্ধ করিবে।

সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা একটু শক্ত-সমর্থ ছিল, তাহাদিগকে আনিয়া সম্মুখে দেওয়া হইয়াছে। শত্রুরা তাহাদিগকে দেখিয়াই ভীত হইয়াছে। পশ্চাদ্দিকে সবল লোকজন নাই—তহবিল খালি।

সম্রাট হিরাক্লিয়সের গৌরবের ধন আশীহাজার অয়সচক্ষু যোদ্ধার মধ্যে এক্ষণে যাহারা অবশিষ্ট ছিল, রাত্রিকালে তাহারা আগুন পোহাইতে পোহাইতে বলিল যে, মুসলমানদিগের তীক্ষ্ণ তরোয়াল

এবং বেদুইনদিগের স্বদেশহিতৈষিতার কাছে ত আমাদিগকে হারিয়া যাইতে হইল, আর পারিয়া উঠিব না।

মানুয়েল এবং তাঁহার সেনা-নায়কদিগের বিলক্ষণ জানা ছিল যে, তিনদিনের মধ্যে ত তাঁহাদের সাহায্যার্থ আর সৈন্য আসিতে পারেই না; তাঁহারা আরও জানিতেন যে, তাঁহাদের আর এক-দিনও যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য নাই।

এই সকল ভাবিয়া-চিন্তিয়া মানুয়েল বলিলেন, "চরকে ডাকিয়া আন, এবং শত্রুপক্ষের আর যে সকল সিপাহী আমাদের কাছে বন্দী হইয়া আছে, তাহাদিগকে বল, তাহারা যদি আমাদের হইয়া মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিব, যাহারা করিবে না, তাহাদিগকে এক্ষণেই কাটিয়া ফেলিব; একটুও দয়া করা হইবে না।"

অনাহারে ক্লিষ্ট ও দুর্ব্বল কনানা আসিয়া মানুয়েলের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কনানাকে হাত-পা বাঁধিয়া পাহাড়ের গোড়ায় একটা গর্ত্তে ৫০-ঘণ্টাকাল ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল, একমুষ্টি অন্ন বা একবিন্দু জলও বেচারাকে কেহ দেয় নাই।

মানুয়েল কহিলেন, "এইবার তোমাকে নানাপ্রকার যাতনা দেওয়া হইবে। তুমি আমার এত অনিষ্ট করিয়াছ যে, হাজার যন্ত্রণা দিলেও শোধ যায় না। কিন্তু আজ তোমাকে ভয়ানক কষ্ট দিব। তোমার কিছু বলিবার আছে কি?"

কনানা একটু ভাবিলেন, এবং ইতস্ততঃ করিতে করিতে উত্তর করিলেন "শুনুন, মরুভূমিতে ঝড় উঠিলে উট শুইয়া পড়ে, এবং উড্ডীয়মান বালুরাশিকে বলে, 'আমাকে ঢাকিয়া ফেল, মারিয়া ফেল, আমার ত আর উপায় নাই,' কি বলেন? কিন্তু আপনি যে সকল লোককে ধরিয়া আনিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ আছেন, আমি যে গর্ত্তে ছিলাম, সেইখানদিয়া তাঁহাকে যাইতে দেখিয়াছি, তিনি অতিবড় বৃদ্ধ। তাঁহার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি। শুনিলাম, আপনি বন্দীদিগকে কাটিয়া ফেলিবেন, কিন্তু আর সকলের সঙ্গে, স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা ও বৃদ্ধলোকদিগকে মারিয়া ফেলা আমাদের জাতির রীতি-বিরুদ্ধ। আপনি আমাকে যেরূপ যন্ত্রণা দিতে মনস্থ করিয়াছেন, তাহার দ্বিগুণ যন্ত্রণা দিন, ঘাড় পাতিয়া সহিব, কিন্তু ঐ বৃদ্ধকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা হউক।"

মানুয়েল জিজ্ঞাসিলেন, "কোন্ বৃদ্ধ?"

কনানা কহিলেন, "ঐ লম্বা পাকা-দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ। আর ত বৃদ্ধ কেহ নাই।"

"ঐ বৃদ্ধ তোমার কে?"

কনানা থমকিয়া গেলেন, কিছু বলিলেন না।

মানুয়েল বলিলেন, "না বল যদি, বৃদ্ধের প্রাণ যাইবে।"

এই কথা শুনিয়া কনানা কম্পিত ওষ্ঠে উত্তর করিলেন, "উনি আমার পিতা।"

"তা বেশ," বলিয়া একজন সিপাহীকে মানুয়েল কহিলেন, "বৃদ্ধকে লইয়া আইস।"

বৃদ্ধ আনীত হইলেন, কিন্তু তাম্বুর একদিকে আসিয়া, পুত্রের প্রতি অতি রুষ্টভাবে তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে অন্য বন্দীদিগের প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলেন যে, বিপদ্‌কালে কনানা পলাইয়া আসিয়া শত্রুদিগের ছাউনীতে ছদ্মবেশে ছিল। এই কথায় বৃদ্ধেরও বিশ্বাস হইয়াছিল, আর তাহারা কনানাকে ধরাইয়া দেওয়াতে তিনি সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন,—কারণ তিনি যে স্বদেশ-হিতৈষী বেদুইন।

মানুয়েল এই ভাব দেখিয়া কহিলেন, "এ কি তোমার পিতা?—গতিক দেখিয়া ত বোধ হয় না।"

কনানা—মস্তক-নমনপূর্ব্বক সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন, কিছু কহিলেন না।

পিতার রুষ্টভাবের তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাতে কনানার যত কষ্ট হইতেছিল, মানুয়েলের ভয় দেখানতে তত কষ্ট-বোধ হয় নাই। মানুয়েল বলিতে লাগিলেন,—

"তুমি বলিয়াছ, এই বৃদ্ধকে ছাড়িয়া দিলে, আমি যতপ্রকার তোমাকে যন্ত্রণা দিতে পারি, তুমি তাহা সহিবে। কিন্তু তুমি আমার যে ক্ষতি করিয়াছ, তাহার পূরণ হইল কৈ? তুমি কাহ্লেদ্‌কে সব ভেদ জানাইয়াছিলে বলিয়াই ত তিনি জবাবলকে পরাজয় করিতে পারিয়াছেন। তুমি কাহ্লেদ্‌কে আমাদের ঘরের খবর জানাইয়াছিলে বলিয়াই ত আমাদের সঙ্গে তিনি সন্ধি করিলেন না। তুমি যদি সন্ধান বলিয়া না দিতে, আজ আমি মক্কা ও মদিনা দখল করিতে রওয়ানা হইতাম, আর গিয়া ঐ দুইটি নগর ভূমি-সাৎ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমি সাহস ভাল বাসি, আর কাহ্লেদের অপেক্ষা সাহসের পরিচয় তুমি বেশী দিয়াছ। তোমার মত সাহসী বালককে মারিয়া ফেলিতে আমার প্রাণ চায় না। তাই তোমাকে তোমার নিজের ও তোমার বৃদ্ধ পিতার প্রাণ বাঁচাইবার সুযোগ দিতেছি। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইলে পর্ব্বতের চূড়ায় ঐ ডগায় গিয়া দাঁড়াইবে। দাঁড়াইয়া তোমাদের জাতীয় রীতি-অনুসারে এই বল্লম তোমার মাথার উপর দোলাইতে থাকিবে। তোমার ও তোমার পিতার নাম এমন চেঁচাইয়া বলিবে যেন লোকেরা শুনিতে পায়। আর তাহাদিগকে বলিবে যে, আর একঘণ্টার মধ্যে ত্রিশহাজার আরব সম্রাট হিরাক্লিয়সের হইয়া তরোয়াল চালাইবে। এই বলিয়া বল্লম ছুড়িয়া মারিবে, আর তুমি যদি ঠিক লক্ষ্য করিয়া একজন আরবকে মারিয়া ফেলিতে পার, তখনি তোমার পিতাকে ছাড়িয়া দিব। তা'-ছাড়া তোমাকে আমাদের লোকদের মধ্যে রাজা করিয়া দিব। 'না' বলিও না। বলিলে, প্রথমে তোমাকে যত পারি, যন্ত্রণা দিয়া, শেষে লোহার চিমটা লাল করিয়া তোমার পিতার চক্ষু তুলিয়া ফেলিব, তা না তুলিলে, সে চক্ষু রাঙ্গাইয়া তোমার লাশ দেখিতে থাকিবে।"

মানুয়েলের কথা যেই শেষ হইল, বৃদ্ধ শেখ অমনি কহিতে লাগিলেন,—

"বৎস, কনানা, আমি তোমার বিষয়ে অন্যায় বিচার করিয়াছি। যদি পার, আমায় ক্ষমা কর, কিন্তু মানুয়েল্-রাজা আমার চক্ষু তুলিয়া ফেলুন, ডরাই না। পৃথিবীর সমস্ত লোকের চক্ষু আমাকে দিলেও, আমার পুত্রকে বিশ্বাসঘাতক হইতে দিব না। তুমি আগে বল্লম হাতে করিতে চাও নাই। আল্লার নাম করিয়া বলি, শুন, এই নাস্তিক কুকুর পৃথিবীর সমস্ত ধন দিলেও, তুমি এখন বল্লম তুলিবে না।"

কনানা পিতার দিকে তাকাইলেন না। তাঁহার চক্ষু মানুয়েলের দিকে। সকলে নীরব হইলে কনানা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে, মহারাজ, আপনকার এই বন্দীকে প্রভাতপর্য্যন্ত একা বসিয়া ভাবিতে দিউন।"

মানুয়েল লোকদিগকে কহিলেন "ইহাকে পর্ব্বতের চূড়ায় লইয়া গিয়া, একা বসিয়া থাকিতে দেও। কিন্তু উহার পিতার চক্ষু তুলিবার জন্য লোহা গরম করিতে দেও গিয়া।"

কনানা পর্ব্বতের চূড়ার উপরে গিয়া, এমন এক স্থানে বসিলেন, যেখানহইতে উপত্যকা-ভূমি বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে তাঁহার যে অভিপ্রায় ছিল, এই স্থানহইতে উপত্যকা-ভূমিতে দৃষ্টিপাত করাতেই, সে অভিপ্রায় বদলিয়া গেল। তিনি চকিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া, প্রাতঃকালের ধূসরবর্ণ আলোকে, তাঁহার চখের মত তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি চখে যতদূর দৃষ্ট হয়, তত দূর বেশ করিয়া দেখিলেন।

অনন্তর তিনি বসিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন, পাগড়ীর কাপড় ঝুলিয়া পড়াতে মুখ একেবারে ঢাকা পড়িল। তিনি নড়িলেন না, বা আবার উপত্যকার দিকে তাকাইলেনও না।

(ক্রমশঃ।)

ভূতের কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

দূরস্বরের অনুকরণ

ভেণ্ট্রিলোকিজ্‌ম্ যত প্রকার আছে তাহার মধ্যে দূরস্বরের
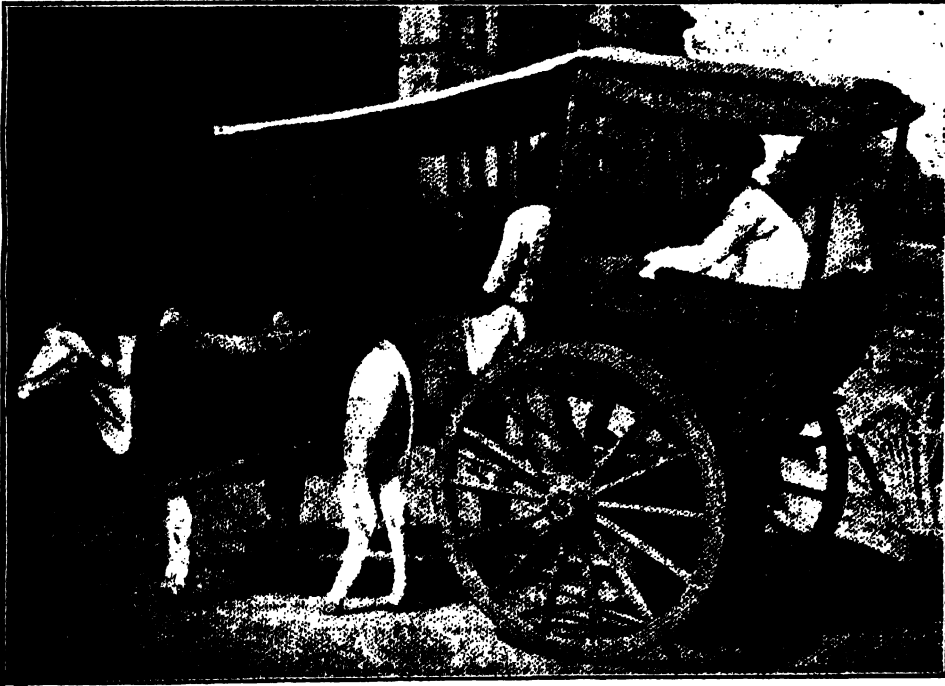
অনুকরণই সবচেয়ে কঠিন, কিন্তু ইহা শিখিতে না পারিলে, প্রকৃত ভেণ্ট্রিলোকিজ্‌ম্-শিক্ষা হয় না। যিনি যে পরিমাণে ইহা শিখিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে ভেণ্ট্রিলোকিজ্‌মে সফলতা-লাভ করেন

দূরস্বর তিনপ্রকার:—(ক) ছাদের দিক্ বা ঊর্দ্ধহইতে কথা; (খ) ভূমির দিক্ বা নিম্নতলহইতে কথা; (গ) সমতলহইতে কথা।

এই তিনপ্রকার স্বরই আয়ত্ত করিতে গেলে, প্রথমে "গুঞ্জন-ধ্বনি" অর্থাৎ মৌমাছি কিছু দূরে গুন্‌-গুন্‌-শব্দ করিলে, যেরূপ শুনায়, সেইরূপ শব্দ কণ্ঠের পশ্চাৎদিক্‌হইতে উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে হয়। ইহার জন্য নিম্নলিখিতভাবে অভ্যাস করিবে—শ্বাসবায়ু টানিয়া ফুস্‌ফুস্‌ বায়ু-পূর্ণ কর; তাহার পর মুখ অল্প খুলিয়া একটু একটু করিয়া থাকিয়া থাকিয়া সেই বায়ু বাহির করিতে থাক, এবং সঙ্গে সঙ্গে গলার ভিতর উকি-তোলার মত শব্দ কর। এইরূপ শব্দ করিবার সময়, জিহ্বা স্থির ও সরলভাবে পড়িয়া থাকিবে এবং শব্দটী মুখ-গহ্বরের ছাদে গিয়া আঘাত করিবে। প্রথম অভ্যাস-কালে যে শব্দ উৎপন্ন হইবে, তাহা বড় মিষ্ট শুনাইবে না, কিন্তু ক্রমাগত অভ্যাস করিতে করিতে এই শব্দ সুমিষ্ট গুঞ্জনে পরিণত হইবে। যতদিন না এই স্বর দীর্ঘকালস্থায়ী "আঃ"-শব্দের ন্যায় শুনায়, ততদিন অভ্যাস-ত্যাগ করিও না। ইহার জন্য কিছু অধিকদিন সময় লাগিবে বটে, কিন্তু ইহাতে একবার সিদ্ধি-লাভ করিলে, প্রকৃত ভেন্ট্রিলোকিজ্‌মের বার-আনা শেখা হইয়া যায়। প্রথমে "আঃ"-শব্দটী দূরহইতে আসিতেছে বলিয়া বোধ হইবে না, কিন্তু একবার ইহা আয়ত্ত হইয়া গেলে, ক্রমশঃ ইহাকে কণ্ঠের আরও পশ্চাতে উৎপন্ন করিতে পারিবে এবং খাদ্যনালী-সংকোচ করিয়া তোমার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ দূরহইতে শব্দটী আসিতেছে বলিয়া দর্শকগণকে বুঝাইতে পারিবে। এই অভ্যাসের দ্বারা কণ্ঠের কোন ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে করিও না, তবে একদিনে বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়। গলার ভিতর যদি সামান্য বেদনা-অনুভব কর, তাহা হইলে অল্প গ্লিসারিণের সহিত সমান-পরিমাণে লেবুর রস মিশাইয়া ব্যবহার করিলেই, তাহা সারিয়া যাইবে।

"গুঞ্জন-ধ্বনি" অভ্যস্ত হইয়া গেলে, বিভিন্নপ্রকার দূর-স্বরের অনুকরণ করা কঠিন হইবে না। ইহার জন্য কিরূপ অভ্যাসের প্রয়োজন, তাহা নিম্নে বলিতেছি—

(ক) ছাদ বা উর্দ্ধহইতে কথা :—মাথা তুলিয়া বুক চিতাইয়া হাত-দুটী পাশে ফেলিয়া বেশ সোজা হইয়া দাঁড়াও; এই অবস্থায় একবার গভীরভাবে শ্বাসগ্রহণ কর, নীচের চোয়ালটী পিছনের দিকে টানিয়া সম্পূর্ণ স্থিরভাবে রাখ এবং ঠোঁট-দু'টী অল্প (আন্দাজ সিকি-ইঞ্চি) খুলিয়া রাখ; এইবার যাহা বলিতে চাও, বল। মনে কর, তুমি বলিতে চাও, "ও মশাই, এই আমি ছাতে এসেছি।" এই কথাটী মুখগহ্বরের ছাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া "গুঞ্জন-স্বরে" বলিতে চেষ্টা কর। ঠিক্‌ বলিতে পারিলে, শব্দ তালুতে ঠেকিয়া বাহির হইয়া আসিবে। কথা বলিবার সময়, যতদূর পার, ধীরে ধীরে নিশ্বাস ছাড়িবে, তাহা হইলে বোধ হইবে, যেন দর্শকগণের মাথার উপরের কোন দূরস্থানহইতে চাপা সুরে শব্দ আসিতেছে। যদি শব্দটী উপরহইতে ক্রমে নীচের দিকে নামাইয়া আনিতে চাও, তাহা হইলে ক্রমশঃ স্বর উচ্চতর করিয়া কণ্ঠের সম্মুখ-ভাগহইতে তাহা উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিবে।

(খ) নিম্নতলহইতে কথা :—নিম্নতল বা নীচের দিক্‌হইতে কথা কহিবার উপায় শিখিলে, মেঝিয়ার ভিতরহইতে কথা, বাক্সের ভিতরহইতে কথা, টেবিলের নীচুহইতে কথা, গেলাসের ভিতরহইতে কথা প্রভৃতি অনেকপ্রকার কথা কহিতে পারা যায়। ছাদের দিক্‌হইতে কথা আসিতেছে দেখাইতে গেলে, মুখ-গহ্বরের ছাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতে হয়, সুতরাং ধ্বনিটী তালুতে ঠেকিয়া উচ্চারিত হয়; কিন্তু নীচের দিক্‌হইতে কথা আসিতেছে দেখাইতে গেলে, কণ্ঠহইতেই শব্দ উচ্চারিত হয়। এই কথা কহিবার সময়, ঘাড় সম্মুখদিকে নত করিবে এবং যতদূর পার, কণ্ঠের পশ্চাদ্‌ভাগহইতে কথাগুলি উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিবে। অবশ্য "গুঞ্জন-স্বরেই" কথাগুলি বলিতে হইবে। যদি কোন জিনিসের ভিতরহইতে খুব চাপা সুরে কথা আসিতেছে দেখাইতে চাও, তাহা হইলে, যতক্ষণ না দাড়ি বুকে গিয়া ঠেকে, ততক্ষণ ঘাড় ক্রমশঃ নোয়াইতে থাকিবে। এই চাপা স্বর-অনুকরণ করিবার আর এক উপায় এই;—জিবটীকে, যতদূর পার, পিছনদিকে ঠেলিয়া কণ্ঠের মাংসপেশী-সংকোচ কর, যেন শ্বাস রুদ্ধ হইয়াছে এইরূপ ভাব দেখাও। এই অবস্থায় যে কথা কহা যায়, তাহা দূরহইতে আসিতেছে বলিয়া বোধ হয়। বাক্সের ভিতরহইতে কথা এইরূপে উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

(গ) সমতলহইতে কথা :—উপর বা নিম্নহইতে কথার অপেক্ষা সমতলহইতে দূরধ্বনির অনুকরণ করা সহজ। সম্মুখ বা পাশহইতে কেহ কথা কহিতেছে দেখাইতে গেলে, অনেক সময় পর্দ্দার সাহায্যে মুখ লুকাইয়া মুখ-নাড়াও চলে, সুতরাং কথাও অনেকটা স্পষ্ট হয়। একটা দরজা, জানালা বা পর্দ্দার পাশে দাঁড়াও; ঠোঁট-দুটী অল্প (প্রায় $\frac{1}{৩}$ ইঞ্চি) খুলিয়া সম্পূর্ণ স্থিরভাবে রাখ এবং "গুঞ্জন-স্বরে" কথা কও। কথাগুলি কিছু দূরহইতে আসিতেছে দেখাইবার জন্য জিহ্বার অগ্রভাগ মুখ-গহ্বরের ছাদে ঠেকাইয়া শব্দের গতিরোধ কর। তাহার পর দরজা বা জানালা খুলিয়া দাও, এবং এইবার শব্দ স্পষ্ট হইয়াছে দেখাইবার জন্য উচ্চতর স্বরে কথা কও।

নানাপ্রকার ধ্বনির অনুকরণ।

যাহার গলা সাধা আছে, সে ইচ্ছা করিলে, অনেকপ্রকার ধ্বনির অনায়াসে অনুকরণ করিতে পারে। ইহার জন্য কেবল একটু মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। যে ধ্বনি-অনুকরণ করিতে চাও, তাহা প্রথমে পুনঃ পুনঃ মনদিয়া শুনিবে, তাহার পর, তাহা আপনার গলাহইতে বাহির করিবার চেষ্টা করিবে, এবং কিছুদিন এইরূপ অভ্যাস করিলেই, অনেক স্থলে কৃতকার্য্য হইবে। কুকুরের ঝগড়া, বিড়ালের ঝগড়া, নানাপ্রকার জানোয়ারের ডাক, পুরাতন কবাটের কেঁচকেঁচানি, ফুটন্ত জলের টগ্‌বগ্‌-শব্দ প্রভৃতির অনুকরণ করা বেশ সহজ। দুই-একটী উদাহরণ দিতেছি,—

(ক) করাতদিয়া কাঠ-কাটার শব্দ:—নীচের ঠোঁটদিয়া নীচের দাঁতগুলি ঢাকিয়া, থুৎনীটী পিছনদিকে টানিয়া স্থিরভাবে রাখ;

উপরের দাঁতগুলি জিবের কাছে আন ও জিব সামান্য একটু বাহির কর। এইবার খুব দ্রুত ফুৎকার দিয়াই, আবার তৎক্ষণাৎ বায়ু টানিয়া লও, এবং মুখ এক অবস্থায় রাখিয়া বারংবার এইরূপ করিতে থাক। বায়ু যত অল্পে অল্পে বাহির করিবে, করাত তত ধীরে ধীরে চলিতেছে বলিয়া বোধ হইবে।

(খ) ভেড়ার ডাকঃ—বুড়ীর স্বর-অনুকরণ করিতে যে জিল স্বর ব্যবহৃত হয়, সেই স্বরে ভেড়ার মত "ব্যাঃ" কি "ম্যাঃ" করিয়া ডাক। যদি জিহ্বাদ্বারা শব্দের গতিরোধ করিয়া দুই-তিন-বার এইভাবে ডাকা যায়, তাহা হইলে বোধ হইবে, যেন কোন ভেড়া দূরহইতে কাতর স্বরে ডাকিতেছে। যদি শব্দটী নিকটে আসিতেছে দেখাইতে চাও, তাহা হইলে জিবটী ক্রমশঃ সরাইয়া মুখের ভিতর প্রায় সরলভাবে ফেলিয়া রাখ।

দর্শকগণের সম্মুখে ক্রীড়া-প্রদর্শন।

দর্শকগণের সম্মুখে বাজি দেখাইয়া সফলতা লাভ করিতে হইলে, প্রথমে শিক্ষার প্রয়োজন, সুতরাং ভাল অভ্যাস না করিয়া একার্য্যে অগ্রসর হইও না। যে যে ব্যাপার দেখাইবে, পূর্ব্বহইতে তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিবে। দর্শকগণের প্রকৃতি বুঝিয়া এই তালিকা ঠিক করিতে হয়; কারণ, বালক-বালিকারা যাহাতে আমোদ ও শিক্ষা পায়, বয়স্কদিগের হয়ত তাহা ভাল না লাগিতে পারে। তালিকা যেন "একঘেয়ে"-রকম না হয়। মনে কর যদি আধঘণ্টা ভেন্ট্রিলোকিজ্‌ম্ হয়, তাহা হইলে পুতুলদের সহিত কথাবার্ত্তায় ১৫ মিনিট, দূর স্বরের অনুকরণে ১০ মিনিট ও নানা ধ্বনির অনুকরণে ৫ মিনিট সময় দিলে, বোধ হয়, ঠিক হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কথাবার্ত্তাগুলি যত কৌতুকজনক হয়, ততই ভাল; মধ্যে মধ্যে দুই-একটী ছোট-খাট হাসির গান গাহিতে পারিলে, আরও ভাল হয়। দূরস্বর-অনুকরণ করিবার সময় কবাট-জানালা প্রভৃতির যথাসম্ভব ব্যবহার করিবে। একটা পর্দ্দা থাকিলে, অনেক সুবিধা হয়, তাহার সাহায্যে একেবারে দুইতিনটী কাল্পনিক লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহা চলে। অনেক ভেন্ট্রিলোকিষ্ট এইরূপ কাল্পনিক কোন ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বাজি-আরম্ভ করেন। মনে কর, তুমি বাজি-আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, পর্দ্দার কাছে যাইয়া বলিলে, "ওহে গদাধর, খেলা কি আরম্ভ কর্ব্বে?" অমনই যেন গদাধর পর্দ্দার আড়ালথেকে উত্তর করিল "এই যে যাচ্ছি, তোমার মুণ্ডু চিবুতে।"

বাজি দেখাইতে দেখাইতে যদি কোন পুতুলের কল বিগড়াইয়া যায়, তাহা হইলে একহাতদিয়া অন্য পুতুলটীর সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবে, সঙ্গে সঙ্গে অপর হাত-দিয়া কলটী ঠিক করিবার চেষ্টা করিবে। যদি ঠিক না করিতে পার, তাহা হইলে সে পুতুল ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ অন্য আর একটা কিছু দেখাইতে আরম্ভ করিবে। কাহারও কাহারও ভেন্ট্রিলোকিজ্‌ম্ করিলে, গলায় সামান্য বেদনা হয়। তাহারা যদি ভেন্ট্রিলোকিজ্‌ম্ করিবার একঘণ্টা পূর্ব্বে একটা ডিম ভাঙ্গিয়া এক পিয়ালা গরম কাফির সহিত মিশাইয়া অল্প অল্প করিয়া পান করে, তাহা হইলে সেরূপ কোন অসুখ হয় না।

আমার শেষ কথা এই যে, কখন শিক্ষা শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে করিও না। যখনই সুবিধা পাইবে, অভিজ্ঞ ভেন্ট্রিলোকিষ্ট-গণের নিকটহইতে উপদেশ-গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে। মনে থাকে যেন, সাধনাই পূর্ণতালাভের উপায়; ঐকান্তিক যত্ন ও অধ্যবসায় কখন বিফল হয় না।

উচ্চৈঃশ্রবা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

হে পবন, তুমি যথাকালে মেঘরাশি মাথায় করিয়া আসিয়া, পর্ব্বতে, বিলে, হ্রদে বর্ষণ কর। সেই জলের গুণে মাঠে ঘাস, গাছ-পালা হয়, সেই ঘাস, ও সেই গাছ-পালার ফল খাইয়া নানা জীব সজীব থাকে। আজ তুমিই ঠিক সময়ে ঝড় বহাইয়া ও বৃষ্টি বর্ষাইয়া শত্রুর হাতহইতে বেচারা উচ্চৈঃশ্রবার প্রাণরক্ষা করিলে। তুমি দেবাদিদেব সৃষ্টিস্থিতিপালনকর্ত্তার অদৃশ্য হস্ত।

১৭

মটুমটু ভাবিল, পাঁঠাটা যখন ক্রমাগত পাহাড়ের পূর্ব্বঢালু ধরিয়া যাইতেছে, তখন প্রকাণ্ড ঝিলের আশ-পাশের পাহাড়-অঞ্চলে উহার যাইবার অভিপ্রায় আছে, দেখিতে পাই। ঐ দিক্‌টায় ওটাকে অনেক-বার দেখাও গিয়াছে। আজ সমস্ত দিনই পাঁঠাটা পশ্চিমমুখে যাইবে, কিন্তু রাত্রে বাতাস ফিরিলেই, পূর্ব্বমুখে চলিতে থাকিবে, সন্দেহ নাই।

তাই মটুমটু পায়ের দাগ ধরিয়া ধরিয়া পাঁঠার পিছনে পিছনে গেল না, কিন্তু পূর্ব্বদিকে পাহাড়-পার হইয়া ঝিলের দিকে বরাবর গেল।

সত্য সত্যই হাওয়া ফিরিল। মটুমটু যেখানে, সেখানহইতে হ্রদ অনেক দূর। প্রাতঃকালে শিকারী হ্রদের দিকে চাহিয়া দেখে,

অতি ক্ষুদ্র কোন-কিছু যেন পাহাড়ের গোড়ার দিকে চলিয়া বেড়াইতেছে। সে বেশ বুঝিতে পারিল, এ আর কিছু নয়, সেই অজরাজ। তাই আগ্‌লাইবার জন্য অদৃশ্যভাবে দ্রুত চলিল। উদ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিয়া, সাবধানে এদিকে ওদিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইল, কম হইলেও পাঁচশতগজ দূরে অপর টিলাতে একটা কি দাঁড়াইয়া আছে। এই "একটা কি" আর কিছু নয়, সেই অজরাজ উচ্চৈঃশ্রবা। শিকারী ও শিকার, উভয়ে উভয়কে বেশ দেখিতে পাইল।

মটুমটু খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া দেখিল। দেখিয়া বলিল, "অরে, পাঁঠা, তোর শিং-সমেত মাথা আজ আমার। এই দেখ, আমার বন্দুক—তোর যম। আজ তোমাকে ছাড়ব না, এই দেখ"—বলিয়াই বন্দুক ছুড়িল। কিন্তু উচ্চৈঃশ্রবা অনেক দূরে, বন্দুকের পাল্লার বাহিরে ছিল। পাঁঠাটা এমনভাবে শিকারীর দিকে চাহিয়াছিল যেন, একমনে তাহার কথা শুনিতেছিল। যেই বন্দুকের ঘোড়া পড়িয়া, ধূমা বাহির হইল, উচ্চৈঃশ্রবা অমনি একধারে সরিয়া গেল। সে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেই স্থানের একটু দূরে শিশিরঢাকা উলু-ঘাসের উপরে বন্দুকের গুলি আসিয়া পড়িল।

উচ্চৈঃশ্রবা দেখিতে পাইল—পাইয়া হ্রদের দক্ষিণদিক্ ঘুরিয়া বড় খডের (দুই পাহাড়ের মধ্য-স্থলের নালার মত স্থানকে খড অর্থাৎ অখাত বলে) দিকে চলিল। এই সময়ে শিকারী অনেক দূরে ছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি করিয়া, অনেকটা অগ্রসর হইয়া, পাঁঠার পিছনে পিছনে ধাইল। মটুমটু বেশ বলবান্ লোক, শিকার করিতে ত খুব ভাল বাসেই, তাহাছাড়া তাহার গোঁ, ঠিক বন্য মহিষের গোঁয়ের মত। যে শিকারটা চখে ভাল লাগে ও খুব মনে ধরে, সেটার প্রাণ-বধ করিবার জন্য সে নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

সমস্ত দিন শিকারী শিকারের অনুসরণ করিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে, খডে খডে চলিল। রাত্রি হইল। পাহাড়ের গায়ে একটা গর্ত্ত পাইয়া, আগুন করিয়া, রাত্রি-যাপন করিল। ভোরের বেলা উঠিয়া আবার চলিল। ছাগলের পায়ের দাগ ঘাসের উপর কখনও স্পষ্ট দেখিতে পায়, ঘন শিশির পড়াতে আবার ভাল দেখিতে পায় না। কিন্তু ছাগলের খাওয়া লতা-পাতা দেখিয়া পথ ঠিক করিয়া লয়। এইরূপে শিকার ও শিকারী একজন নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য, অন্যজন পরের প্রাণ-বধ করিবার জন্য পাহাড়-পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া চলিল। মটুমটু উচ্চৈঃশ্রবাকে দুই-একবার দেখিতে পায় বটে, কিন্তু অনেক দূরে; বন্দুকের পাল্লার বাহিরে; পাল্লার ভিতরে একবারও পাইল না। পাঁঠাটা যেন বুঝিতে পারিয়াছিল যে, শিকারীর বন্দুকের পাল্লা দুইশত-গজের বেশী নয়, তাই সাবধানে পাল্লার বাহিরে থাকে। একদিন শিকারী ভাবিল, এইখানে একবার পাঁঠাটাকে পাল্লার ভিতর পাইলে, আর যায় কোথায়! ফলে এ তাহার বেশ জানা স্থান, তাই এইখানে পাঁঠাকে পাল্লার মধ্যে পাইবার জন্য, মটুমটুর এত আকাঙ্ক্ষা। একদিন শিকারী গা-ঢাকা-দিয়া উচ্চৈঃশ্রবার খুব নিকটে—প্রায় পাল্লার মধ্যে গেল, আর একটু হইলে অজরাজকে যমালয়ে চালান দিত, কিন্তু এমন সময়ে বাতাস ফিরিল, এতক্ষণ পূর্ব্বদিক্‌হইতে বহিতেছিল, এক্ষণে পশ্চিমে বাতাস বহিল; পাঁঠাটা শিকারীর গন্ধ পাইয়া সাবধানে পাল্লার বাহিরে বাহিরে রহিল। একমাসকাল মটুমটু বহুকষ্টে উচ্চৈঃশ্রবার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল। দিনকতক পরে, সে এমন সাবধানে চলিত যে, পাঁঠাটা একদিনের তরেও তাহার দৃষ্টি-পথ-অতিক্রম করিতে পারিল না।

উচ্চৈঃশ্রবা বরাবর দৌড়িয়া অনেক দূরে গিয়া পড়ে না কেন? পাঁঠা ত শিকারীর অপেক্ষা বেশী বেগে চলিতে পারে। কিছু আগে, বা ডাহিনে বামে গিয়া শিকারীর চখের আড়াল হইলেই, ত আপদ্ চুকিয়া যায়। পাঁঠা তা পারে না—কারণ পথ চলিতে চলিতে ভাল ঘাস পাইলেই, একটু থামিয়া ঘাস খাইতে হয়। শিকারীর সঙ্গে চাউল আছে, রাত্রে বাঁশের চুঙ্গায় ভাত রাঁধিয়া খায়, আবার দেখিতে পাইলেই, খরগোস-শিকার করে, সুতরাং তাহার দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপার এক-প্রকার চলিয়া যায়। কাজেই সমস্ত দিন উচ্চৈঃশ্রবাকে লক্ষ্য করিয়া পথ চলে। কিন্তু উচ্চৈঃশ্রবাকে শত্রুর ভয়ে রাত্রে গর্ত্তের ভিতর বা পাহাড়ের এমন নিভৃতস্থানে থাকিতে হয়, যেখানে ঘাস বা লতা-পাতা পাওয়া যায় না। কাজেই দিনের বেলাই আহারের যোগাড় দেখিতে হয়। ক্রমাগত একমাসকাল শত্রু তাড়া করিয়া আসাতে পাঁঠাটা বিলক্ষণ ক্লান্ত হইয়াছে; বেচারার চখের জ্যোতিঃ যেমন ছিল, তেমনি আছে; পাগুলিতেও বিলক্ষণ শক্তি আছে; কিন্তু পেট-ভরা ঘাস খাইতে না পাওয়াতে, ক্ষুধার কষ্ট তাড়নাকারী শিকারীর মত আর এক শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

একমাসকাল লুসাই-শিকারী উচ্চৈঃশ্রবাকে লুসাইদেশের নানাস্থানে তাড়া করিয়া বেড়াইল। যে দিন দিনের বেলা ঝড়-তুফান হয়, সেই দিন যা একটু বিশ্রাম করিতে পায়, নহিলে শিকারী ছায়ার মত—তবে কি না, অনেকটা দূরে—পিছনে থাকেই।

ইহার পরে দিনপনের এমন পথে চলিতে হইল যে, শিকারী শিকারকে এবং শিকার শিকারীকে দেখিতে পায়। কোন দিন সকাল-বেলা মটুমটু পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াই উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখিয়া বলে, "দাঁড়া, ভাই; ঢের পথ চলা হইয়াছে, এখন থাম।" অজরাজও দূরে শিকারীকে দেখিতে পাইয়া, মাটীতে বার-কতক লাথি মারে, এবং বাতাসের দিকে মুখ করিয়া, কখনও দৌড়িয়া কখনও বা ধীরে ধীরে চলিতে থাকে, কিন্তু কখনও তিন-চারি-শত গজের বন্দুকের পাল্লার ভিতর থাকে না, বরং অনেকটা বাহিরে থাকে। শিকারী গাছতলায় বিশ্রাম করিতে বসিলে, উচ্চৈঃশ্রবা, সেই অবসরে যতটা পারে, ঘাস খাইয়া লয়। শিকারীকে কখনও

দেখিতে না পাইলে, উচ্চৈঃশ্রবা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, দৌড়িয়া এমন স্থানে গিয়া উঠে, যেখানহইতে শিকারীকে দেখা যাইবারই কথা। শিকারী কোন স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলে, পাঁঠাটা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া, একমনে তাহাকে দেখিতে থাকে। এইরূপে পাঁঠা ও শিকারী দেড়মাসকাল পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইল। শিকারীও শিকার হাত করিতে পারিল না, শিকারও শিকারীর হাত এড়াইতে পারিল না। এই দুইয়ের মধ্যে এক আশ্চর্য্য-রকমের ভাব দাঁড়াইল। শিকারীর গন্ধ শুঁকিয়া মাসাধিককাল চলাতে পাঁঠার এমন অভ্যাস হইল যেন ঐ গন্ধ না হইলে, পথ চলা হয় না। একদিন সকাল-বেলা মটুমটু নিদ্রাহইতে উঠিয়া উত্তরদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, এমন সময়ে পিছন দিকে—অনেক দূরে—পাঁঠার হাঁচি শুনিতে পাইল; ফিরিয়া দেখে, কতক্ষণে, কোন্ দিকে সে চলিতে আরম্ভ করে, তাহাই দেখিবার জন্য ছাগলটা যেন একমনে, ব্যস্তভাবে তাই লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছে। বাতাস ঘুরিল, কাজেই উচ্চৈঃশ্রবাও অন্য পথ ধরিল। একদিন সকাল-বেলা শিকার ও শিকারী উভয়ে যাত্রা করিল। নিকটে একটা গভীর ঝর্ণা ছিল, ছাগলটা লাফাইয়া সেটা পার হইয়া গেল, কিন্তু শিকারী আর পারে না। অনেক কষ্টে দুইঘণ্টাকাল বিস্তর চেষ্টার পর মটুমটু ঝর্ণা-পার হইল, হইয়াই ছাগলের হাঁচি শুনিতে পাইল। চারিদিকে তাকাইয়া দেখে, উহাকে দেখিতে না পাইয়া, সঙ্গীর কি হইল, দেখিবার জন্য যেন উচ্চৈঃশ্রবা ফিরিয়া আসিতেছে।

রে উচ্চৈঃশ্রবা, হে অজরাজ, এমন "নাছোড়বন্দা" শত্রুর প্রতি এত টান কেন? এ যে যমের সঙ্গে খেলা! ঈশ্বর ঝড়-তুফান-দ্বারা এতবার তোমায় সাবধান করিয়া দিলেন, তা কি সব ভুলিয়া গিয়াছ? পালাও, পালাও! ঈশ্বর এখনও তোমায় বাঁচাইতে পারেন। শত্রুর ছায়াপর্য্যন্ত মাড়াইতে নাই।

(ক্রমশঃ।)
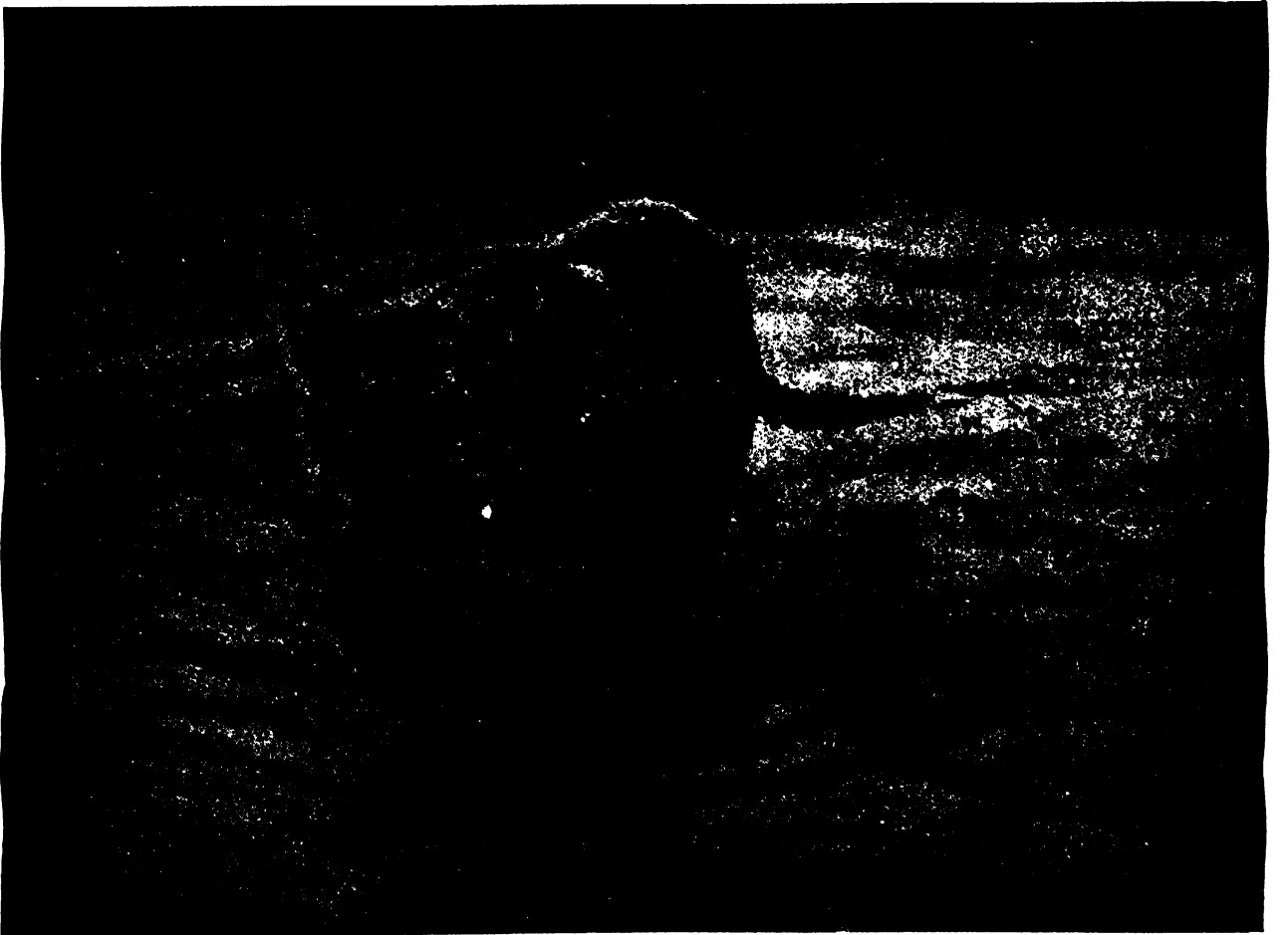
'টাইটানিক'-ডুবী।

"হোয়াইট্ ষ্টার লাইনের" মহাপোত "টাইটানিকের" অস্তিত্বের ইতিহাস অতীব সংক্ষিপ্ত,—এতদূর সংক্ষিপ্ত যে, তাহার অপেক্ষা সংক্ষিপ্ততার আর ধারণাই করা যায় না,—এমনই সংক্ষিপ্ত যে, তাহার সংক্ষিপ্ততায় মানবহৃদয়ে শোক-সঞ্চার হয়। জগতের এই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পোতটির ভাসমান হইবার ও জলযাত্রা দেখিবার অপেক্ষায় জগৎশুদ্ধ লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিলেন। সকলেই ইহার বিপুল অবয়ব এবং অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুষ্ঠান-আয়োজন ও বিলাস-ব্যবস্থার কথা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলেন। অনেকেই এইপ্রকার একটী আরামপ্রদ—বিশেষতঃ এইরূপ একটী অনিমজ্জনীয় ও নিরাপদ্ জীবন-পোতের পরিকল্পনা ও সংগঠন হইয়াছে শুনিয়া বড়ই সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু, পরে, ঐ সমস্ত লোকেরাই যখন সহসা শুনিলেন যে, অমন 'হাতীর মত' জাহাজখানি পনরশত যাত্রীর (তাঁহাদের কয়েকজন জগদ্বিখ্যাত লোক ছিলেন) সহিত 'মোচার খোলার' মত জলতলে ডুবিয়া গিয়াছে, তখন তাঁহারা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

কয়েকটি ছত্রে যদি আমরা ইহার ইতিহাসটুকু লিপিবদ্ধ করিতে চাই, তাহা হইলে এই কয়টি কথাই লেখা যাইতে পারে :—

বেল্‌ফাষ্টের অন্তর্গত কুইন্স আইল্যাণ্ড-নামক স্থানে সুবিখ্যাত পোতনির্ম্মাতা মেসার্স হার্লাণ্ড এণ্ড উল্‌ফের কারখানায় টাইটানিক নির্ম্মিত হয়, ঐ সঙ্গে উহার যুড়ি জাহাজ ওলিম্পিক্‌ও গঠিত হইয়াছিল। এই যুগল-পোত এত বড় করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, এই দুইটীর নির্ম্মাণের জন্য আলাহিদা করিয়া সূত্রধর-শালা ও বাষ্পাধার নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপিত করিতে হইয়াছিল এবং তিনটি জাহাজ-নির্ম্মাণ করিতে যতটা জায়গা আবশ্যক করে, এই দুইটী জাহাজে ততটা জায়গা যুড়িয়াছিল। ১৯০৯ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে টাইটানিকের পানি-তরাস যোড়া হয়, ১৯১১ সালের ৩১শে মে তারিখে উহা ভাসান হয়। ১৯১২ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে বেলফাষ্ট-নগরে বোর্ড-অব্-ট্রেডের কর্ম্মচারীরা উহার পরীক্ষা-কার্য্য সমাধা করেন, ৪ঠা এপ্রিল-তারিখে উহা সাউথাম্‌টনে পঁহুছে এবং তাহার পরবর্ত্তী বুধবারে, ১০ই এপ্রিল তারিখে, উহা দুই-হাজার দুইশত আটজন আরোহী ও পোত-কর্ম্মচারীসহ নিউ-ইয়র্ক-অভিমুখে প্রথমবার সমুদ্র-যাত্রা করে। সেইদিনই উহা সারবার্গ-নামক স্থানে থামে, বৃহস্পতিবারে কুইন্সটাউনে যায়, তাহার পর নিউ-ইয়র্ক-অভিমুখে যাত্রা করে; আশা ছিল, পরবর্ত্তী বুধবারে উহা নিউ-ইয়র্কে পঁহুছিবে, কিন্তু তাহা আর হইল না। রবিবার রাত্রি পৌনেবারটার সময়ে, একটী স্রোতোবাহী তুষার-শৈলের সহিত সংঘৃষ্ট হইয়া, তাহার আড়াইঘণ্টা পরে ডুবিয়া গেল। উহার ৬৮৮ জন কর্ম্মচারী ও ৮১৫ জন আরোহী ঐ সঙ্গে ডুবিয়া যান এবং ৭০৫ জন কর্ম্মচারী ও আরোহীকে "কার্পেথিয়া"-নামে একটী জাহাজ আসিয়া উদ্ধার করে।

জগতের বৃহত্তম পোত টাইটানিকের অস্তিত্বের ইতিহাস সংক্ষেপে উহাই। ওলিম্পিকের অপেক্ষা টাইটানিকের দৈর্ঘ্য তিন ইঞ্চি এবং কালি মোটামুটি হিসাবে প্রায় ২৭,০০০ মণ বেশী ছিল। টাইটানিক-ডুবীর অপেক্ষা ঘোরতর দুর্ঘটনা সমুদ্র-বক্ষে আর হয় নাই। কতগুলি ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে ও অবধারিতভাবে অবগত হওয়া গেলে, সভ্যজগতের অন্তস্তলপর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, এখনও পর্য্যন্ত এই ঘা সামলাইয়া উঠিতে পারা যায় নাই।

যাহা হউক, এখন যাত্রারম্ভহইতে তুষারশৈলের সহিত সংঘৃষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত টাইটানিকের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাউক। যাত্রীদিগের বন্ধুবান্ধবদিগকে তরীত্যাগার্থে বাঁশী বাজাইয়া ইঙ্গিত করিবার অব্যবহিত পরেই জাহাজের সেতুবর্ত্ম বা পুলগুলি তুলিয়া লওয়া হইল। তাহার পর, টাইটানিক ধীরে ধীরে পোতাশ্রয় ত্যাগ করিয়া চলিল, যাঁহারা জেটিতে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা তখন চীৎকার করিয়া আরোহীদের উদ্দেশে বিদায়-বাণী বলিতে ও শেষবার্ত্তা জানাইতে লাগিলেন। পোতাশ্রয়ে সারি সারি স্থিত পোত-বহরহইতে বৃহত্তম পোতখানি প্রথমবার পোতাশ্রয়-ত্যাগ করিতেছে বলিয়া ভোঁ-টোঁ কিছুই বাজিল না। হৈ চৈ না করিয়া অন্য অন্য জাহাজ সচরাচর যেমন করিয়া পোতাশ্রয়-ত্যাগ করে, তেমনই করিয়া টাইটানিক সমুদ্র-বক্ষে ভাসিতে চলিল। কিন্তু এইরূপ কোন উৎসবের অভাবসত্ত্বেও এমন দুইটী উদ্দীপক-ঘটনা ঘটিল, যাহার জন্য টাইটানিক একেবারে ঠিক নিরুত্তেজনায় তীরত্যাগ করিতে পারিল না। তাহার মধ্যে প্রথম ঘটনাটি শেষ সেতুবর্ত্মটি তুলিয়া লইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ঘটিল। একদল লোক (এঞ্জিনে কয়লা দেওয়া তাহাদের কাজ) তাহাদের বোচ্‌কা-বুচ্‌কী কাঁধে ঝুলাইয়া জেটিদিয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল, উদ্দেশ্য জাহাজে যাইবে। কিন্তু সেতুবর্ত্মের যে প্রান্তটা তীরের দিকে পড়ে, সেইদিকের একজন নিম্নতন কর্ম্মচারী তাহাদিগকে জাহাজে যাইতে দিতে দৃঢ়-ভাবে অসম্মতিপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহারা তর্কাতর্কি করিয়া ও হাত-মুখ নাড়িয়া তাহাদের কেন বিলম্ব হইয়াছে তাহা তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার মত-পরিবর্ত্তন হইল না, তিনি তীরের দিকে হস্তসঞ্চালন করিয়া তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে বলিতে লাগিলেন। তাহারা আপত্তি করিতে লাগিল, ইতিমধ্যে সেতুবর্ত্ম উঠাইয়া লইয়া তাহাদের টাইটানিকে উঠিবার নির্ব্বন্ধ অকস্মাৎ নিষ্ফল করিয়া দেওয়া হইল। আজ সেই মজুরেরা টাইটানিকে যাইতে পারে নাই বলিয়া যে খুব আনন্দ এবং ঈশ্বরের

TITANIC
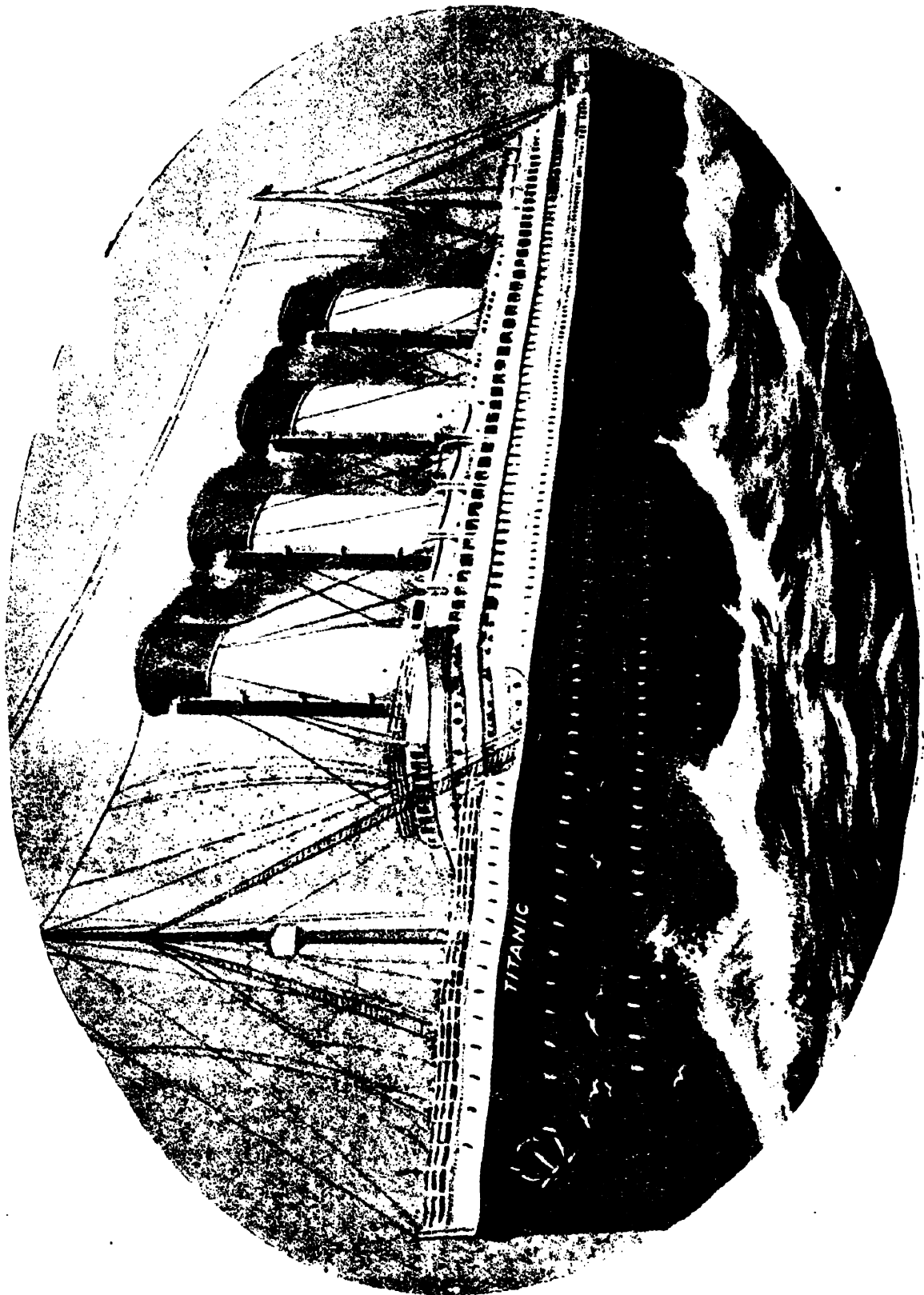
কাছে যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উহার পর, আর একটী ঘটনা ঘটে। টাইটানিক কিছু দূর যাইতে না যাইতে কি এক আকর্ষণে তাহার সঙ্গে "নিউ-ইয়র্ক" বলিয়া একটী জাহাজকেও টানিয়া লইয়া চলিল। নিউ-ইয়র্কের নাবিকেরা সেই আকর্ষণহইতে উহাকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে কার্য্য বড় সহজবোধ হইল না, তখন অগত্যা টাইটানিককে. থামাইয়া কৌশলপূর্ব্বক নিউইয়র্ককে টাইটানিকহইতে ছাড়ান হইল। কিছু দূর যাইতে না যাইতে আবার "টিউটনিকের" সঙ্গেও ঐ হাঙ্গামা বাধিল; যাহা হউক, টিউটনিকও কোনক্রমে বাঁচিয়া গেল। অতঃপর টাইটানিক "স্পিট্‌হেড্" ছাড়াইয়া "আইল-অব-ওয়াইটের" নববসন্তপল্লবিতা পরমশোভাশালিনী তটভূমি অতিক্রম করিয়া যাইতে যাইতে হোয়াইট ষ্টার লাইনের আর একটী জাহাজের সঙ্গে অভিবাদন-বিনিময় করিল, ঐ লাইনের যদি কোন জাহাজ গৃহমুখে যায়, এইজন্য ঐ জাহাজটি প্রতীক্ষা করিয়া ছিল। তাহার পর, টাইটানিকের যাত্রীরা কয়েকখানা রণপোতও দেখিতে পাইলেন। গোধূলির সময়ে টাইটানিক স্থিরবাতে সারবার্গে ভিড়িল এবং সাড়ে আটটার সময় তথাহইতে যাত্রী ও ডাক লইয়া চলিয়া গেল। বৃহস্পতিবার বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরে, যদিও বায়ু এত শীতল ছিল যে, কাহারও 'ডেকে' বসিবার উপায় ছিল না, তবুও সুখামোদে 'চ্যানাল' পার হইয়া টাইটানিক কুইন্সটাউনে উপস্থিত হইল।

বৃহস্পতিবারেই টাইটানিক কুইন্সটাউন-ত্যাগ করিয়া চলিল। ঐ দিনে যখন কুইন্সটাউন-ছাড়া হয়, তখনহইতে রবিবারের প্রাতঃকালপর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। সমুদ্র বেশ প্রশান্ত ছিল, এমনই প্রশান্ত ছিল যে, আরোহীদের মধ্যে অতি অল্প লোকই আহারকক্ষে অনুপস্থিত থাকিতেন। বায়ু পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমমুখী ও বেশ নির্ম্মল ছিল, কিন্তু সময়ে সময়ে বড় শীতল হইত, এত শীতল হইত যে, যাত্রীরা অধিকাংশ সময়ই পাঠাগারে বসিয়া পড়িতেন বা চিঠিপত্র লিখিতেন।

বৃহস্পতিবারের বেলা বারটাহইতে শুক্রবারের বেলা বারটাপর্য্যন্ত টাইটানিক ৩৮৬ মাইল, শুক্রবারহইতে শনিবারপর্য্যন্ত অতিক্রম ৫১৯ মাইল এবং শনিবারহইতে রবিবারপর্য্যন্ত ৫৪৬ মাইল করিল।

এইবারে রবিবারের ঘটনাটি একটু বিস্তারিতভাবে বলি, কারণ এই দিবসেই টাইটানিক একটী হিমশিলার সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়া ডুবিয়া যায়। প্রভাতে পোত-ধনাধ্যক্ষ জাহাজের বৈঠকখানায় উপাসনা-কার্য্য পরিচালিত করিলেন; তাহার পর, আরোহীরা ডেকের উপর গিয়া জলযোগান্তে এমনই তাপ-পরিবর্ত্ত-লক্ষ্য করিলেন যে, অনেকেই তীব্র শীত-বায়ুর দিকে মুখ করিয়া ডেকের উপরে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। শীতল আবহাওয়ার মধ্যদিয়া অতিদ্রুতভাবে জাহাজখানি ছুটিতেছিল বলিয়াই, প্রধানতঃ ঐরূপ একটী কৃত্রিম বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হইয়াছিল।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর, মিঃ কার্টার বলিয়া ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীভুক্ত একজন পরিচারক (পাদ্রী), যাঁহারা যোগ দিতে ইচ্ছা করিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া জাহাজের বৈঠকখানায় ধর্ম্মগীত গাইবার মজলিস্ বসাইলেন। প্রায় একশত আরোহী জমায়েৎ হইল। একজন স্কচ্ এঞ্জিনিয়ার পিয়ানো বাজাইতে লাগিলেন। মিঃ কার্টার প্রত্যেককেই তাঁহার প্রিয় ধর্ম্মগীতটির নামোল্লেখ করিতে অনুরোধ করিলেন। যিনি যখন যে গীতটির নামোল্লেখ করেন, মিঃ কার্টার সেই গীতটির কথা সকলকে জানাইয়া তাহার একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও দিয়া দেন। ধর্ম্মগীতসম্বন্ধে মিঃ কার্টারের এইরূপ জ্ঞান দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইতেছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, অনেকেই সামুদ্রিক বিপদ্‌সম্বন্ধী ধর্ম্মগীতগুলির উল্লেখ করিলেন; এবং "For those in peril on the sea" এই গীতটি গায়িবার সময়ে সকলেরই কণ্ঠস্বর মৃদু হইয়া গিয়াছিল।

রাত্রি দশটার পরপর্য্যন্ত সম্ভবতঃ গীতালাপ চলিয়াছিল। তাহার পর, ভাণ্ডারীরা ছুটী লইবার পূর্ব্বে আরোহীদিগকে কাফি ও বিস্কুট দিবে বলিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া, মিঃ কার্টার, বৈঠকখানাকক্ষটি ব্যবহার করিতে দিয়াছেন বলিয়া, পোতকোষাধ্যক্ষকে ধন্যবাদপূর্ব্বক মজ্‌লিস্ ভাঙিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে এপর্য্যন্ত তাঁহারা যে আরামে ও নিরাপদে সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছেন, তিনি তাহারও কথা তুলিলেন; পোতখানির দীর্ঘতা ও স্থিরতার কথাও উঠিল, এবং আমোদ-আহ্লাদে যাত্রা করিতে করিতে পোতখানি যে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিউ-ইয়র্কে পঁহুছিবে, এ আশাও অভিব্যক্ত হইল। কিন্তু যে সময়ে লোকেরা সকৃতজ্ঞভাবে তাঁহার ঐ সরল ও হৃদয়স্পর্শী কথাগুলি শুনিতেছিলেন, সেই সময়েই যে "সামুদ্রিক উৎপাত"-দ্বারা এই মহাপোতখানি নিমজ্জিত হইবে, তাহা কয়েক-মাইলমাত্র দূরে অবস্থিতি করিতেছিল। মানুষের আশা এবং মনুষ্য-কল্পিত জড়পদার্থের উপর মানুষের নির্ভরতা এমনই ক্ষণস্থায়িনীই বটে।

(ক্রমশঃ।)

-:*:-

ফিল্ডিং

যাহারা ক্রিকেট্ ভাল করিয়া খেলিতে চায়, তাহাদের কি করিয়া ফিল্ডিং অভ্যাস করা উচিত, আমরা জানুয়ারী-সংখ্যাতে তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়াছি। এবার কোন্ অবস্থানে ফিল্ডারের কিরকম গুণ থাকা চাই এবং কোন্ অবস্থানে কিরূপে কাজ করিতে হইবে, আমরা তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। এই প্রবন্ধ পড়িবার সময়ে, যাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, তাহা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে।

উইকেট্-কিপার।—উইকেট-কিপারের অবস্থানটিকেই সবচেয়ে গুরুতর ও দায়িত্বপূর্ণ বলিলেও চলে; দলের কৃতকার্য্যতা অনেকটা তাহারই উপর নির্ভর করে। ফিল্ডিং করিবার সময়ে উইকেট্-কিপারের এমনভাবে দাঁড়ান উচিত, যাহাতে বলটি উইকেট্ ছাড়াইলেই, সে তাহা ধরিতে এবং আবশ্যকমতে বেলে ঠেকাইতে পারে। ব্যাট্স্ম্যান্ নিজের জায়গায় ঠিক দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময়ে যদি উইকেট-কিপার বেলগুলি বল্‌দিয়া আঘাত করিয়া ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে সে আম্পায়ারের কাছে আপিল না করিয়াই বেলগুলি আবার উইকেটের উপর বসাইয়া দিবে। যখন কোন ফিল্ডার তাহার কাছে বলটি ছুড়িতেছে, তখন তাহার উইকেটের পিছনে দাঁড়াইয়া থাকা দরকার। তা'-ছাড়া উইকেট্-কিপারকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে, যাহাতে, যেস্থানে ফিল্ডার নাই, বলটি উইকেটের নিকটহইতে খানিকদূর ছুটিয়া গিয়া এমন স্থানে আসিয়া পড়িলে, সে তাহা ধরিতে পারে। উইকেট্-কিপার উইকেটের যত নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, ততই ভাল, কেননা একটু দূরে থাকিলে, ব্যাট্স্ম্যানকে ষ্টাম্প্ করিবার সুবিধা হইবে না। এইরূপে নিপুণ উইকেট্-কিপার আপন দলকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু মনে রাখিও, অভ্যাস না করিলে, কোনরকম কাজই ভাল করিয়া করা যায় না।

শার্ট্-স্লিপ্।—এই অবস্থানের জন্য ছেলেদের তিনটি গুণ থাকা প্রয়োজনীয়; (ক) তাহার চট্পটে হওয়া দরকার; এই অবস্থানে ঘুমাইবার বা এদিক্-ওদিক্ ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিবার যো নাই। (খ) শার্ট্স্লিপের বল ধরিবার শক্তি থাকা চাই। বিশেষ বোলার যদি জোরে বল দেয়, তবে শার্ট্স্লিপের ক্যাচ্ করিয়া ব্যাট্স্ম্যানকে আউট্ করিবার অনেক সুযোগ হয়। বলটি ক্যাচ্ করিবার শক্তি না থাকিলে, কাহারও এই অবস্থানে ফিল্ড্ করিতে যাওয়া উচিত নয়। (গ) তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিও আবশ্যক। অনেক সময়ে বলটি শার্ট্স্লিপের কাছে এমন দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসে যে, ইতস্ততঃ করিবার যো নাই, ফিল্ডারের হাত বলটি ধরিবার জন্য যেন আপনা-আপনি যথাস্থানে পৌঁছিতে না পারিলে, নয়। এরূপস্থলে ফিল্ডারকে বল ধরিতে হইলে, তাহার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি থাকা খুব দরকার। বোলার যদি জোরে বল দেয়, তাহা হইলে শার্ট্স্লিপ প্রায় উইকেট্-কিপারের পিছনে দাঁড়াইয়া থাকিবে; অন্যদিকে আবার, বোলার যদি আস্তে বল দেয়, তবে সে উইকেট্-কিপারের আরও দক্ষিণে দাঁড়াইবে। যে বোলার বল দিতেছে না, সে যাহাতে ছুটিয়া ছুটিয়া ক্লান্ত হইয়া না পড়ে, এইজন্য সচরাচর এই অবস্থানেই থাকে।

থার্ড্ ম্যান্।—এই অবস্থানে একজন চালাক ও চট্পটে লোক থাকা দরকার, কারণ বলটা প্রায়ই বাঁকিয়া যাইতে যাইতে তাহার কাছে ছুটিয়া আসিবে। সে উইকেট্হইতে অধিকদূরে দাঁড়াইবে না, কেননা বেশী দূরে দাঁড়াইলে, বলটি তাহার নিকট আসিয়া পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই ব্যাট্স্ম্যান্ সহজে রাণ পাইতে পারে। যে ছেলে এই অবস্থানে দাঁড়াইবে, তাহার বল ছুড়িতে খুব দক্ষতা থাকা দরকার, কারণ অন্যান্য ফিল্ডারের অপেক্ষা ব্যাট্স্ম্যানকে রাণ-আউট করিবার তাহার বেশী সুযোগ হইবে। সে উইকেট্-কিপারের কাছে বলটি ছুড়িয়া দেওয়া অভ্যাস করিবে।

পয়েণ্ট।—এই অবস্থানে এমন কোন ছেলে দাঁড়ান চাই, যাহার নজর খুব খর। তাহার বলটি ধরিবার দক্ষতাও থাকা চাই, পয়েণ্টের ব্যাট্স্ম্যানের খেলা-লক্ষ্য করা উচিত, যাহাতে সে উইকেটের খুব কাছে দাঁড়াইতে হইবে কি একটু দূরে থাকিতে হইবে, তাহা ভাল বুঝিতে পারে। অনেক সময়ে দেখা যায়, যে ব্যাট্স্ম্যান বলটি জোরে মারিতেছে না, পয়েণ্ট যদি তাহার খুব নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে ক্যাচ্ করিবার অনেক সুযোগ পায়। কিন্তু ফিল্ডার যদি নিজকার্য্যে বুদ্ধি-প্রয়োগ না করে, তাহা হইলে ব্যাট্স্ম্যানকে আউট করিবার অনেক সুযোগ হারাইবে। বলটি তাহার পায়ের দিকে ছুটিয়া আসিলে বা তাহার মাথার উপরদিয়া উড়িয়া গেলে, ইতস্ততঃ বা ভুল না করিয়া তাহা ধরিতে পারা দরকার। পয়েণ্টের অনেক সময়ে দুই হাত-ব্যবহার করিবার যো থাকে না, কাজেই তাহার উভয় হাতেই সমানভাবে বল ধরিবার শক্তি থাকা চাই।

কভার-পয়েণ্ট।—এই অবস্থানে একজন উত্তম ফিল্ডারের খুব দরকার। সচরাচর তাহার ঢের কাজ হইবে, এবং সেই সব কার্য্য ভাল করিয়া করা সহজ কথা নহে। থার্ড্-ম্যান্ যেমন, কভার-পয়েণ্টও তেমনই ব্যাট্স্ম্যানকে রাণ-আউট করিবার অনেক সুযোগ পায়, এইজন্য তাহার বলটা ধরিয়া তাড়াতাড়ি উইকেট্-কিপার বা বোলারের কাছে ছুড়িয়া দিবার দক্ষতা থাকা চাই।

বোলার যদি জোরে বল দেয়, তাহা হইলে কভার-পয়েণ্ট উইকেট-হইতে বেশী দূরে থাকিবে, বোলার যদি আস্তে বল দেয়, তবে সে আরও কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে। তাহার সকল সময়ে সতর্ক ও চট্‌পটে হওয়া দরকার।

মিড্-অফ্।—এই ফিল্‌ডারের তীক্ষ্নদৃষ্টি ও বিচার-শক্তি থাকা চাই। সে অনেক সময়ে মনে করিতে পারে যে, বলটি তাহার বুকে আঘাত করিতে আসিতেছে, এমন সময়ে তাহা তাহার মাথার উপরদিয়া উড়িয়া গেল। এইপ্রকারে ফিল্‌ডারকে অনেক সময়ে প্রবঞ্চনা করা হয়। তাহাছাড়া এই অবস্থানে যে ছেলেটি ফিল্‌ড্ করিবে, তাহার সাহসথাকা আবশ্যক, কেননা প্রায় অন্য কোন অবস্থানে বলটি এমন জোরে ফিল্‌ডারের কাছে ছুটিয়া আসে না।

লঙ অফ্ ও লঙ অন্।—এইস্থানেও তীক্ষ্নদৃষ্টি ও বিচার-শক্তি থাকা দরকার। বিশেষতঃ ব্যাট্‌স্ম্যান্ যদি খুব জোরে বল মারে, তাহা হইলে লঙ অফ্ ও লঙ অন ক্যাচ্ করিবার প্রচুর সুযোগ পাইবে। যাহারা ক্রিকেট কখনও খেলে নাই, তাহারা প্রায়ই মনে করে, যে বলটি উঁচুতে উড়িয়া যায়, তাহা অতি সহজে ধরা যায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। একে বলটি ঠিক কোথায় নামিয়া আসিবে, তাহা স্থির করা তত সহজ নহে; তাহাতে বলটী নামিয়া আসিতে আসিতে ফিল্‌ডারের মনে নানা চিন্তা উদিত হইয়া থাকে। পাছে বলটী ধরিতে না পারিয়া তাহাকে দর্শকদের কাছে উপহসিত হইতে হয়, এই ভয়ে সে সহজে ভুল করিতে পারে। ফিল্‌ডারের বিচার ও দৃষ্টি যাহাতে যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ন হয়, এইজন্য তাহার অভ্যাস করা বড় দরকার।

মিড্-অন্।—এই অবস্থানই সবচেয়ে সহজ, কেননা বলটি প্রায়ই না বাঁকিয়া ফিল্‌ডারের কাছে ছুটিয়া আসে। সচরাচর যে ছেলে তত ভাল ফিল্‌ডার নহে, তাহাকে এই অবস্থানে দাঁড়াইতে দেওয়া হয়।

শর্ট্-লেগ্।—বলটি প্রায়ই এই ফিল্‌ডারের দিকে বাঁকিয়া বাঁকিয়া ছুটিয়া আসে, কাজেই তাহার চালাক ও চট্‌পটে হওয়া আবশ্যক, নতুবা সে বল ঠিক ধরিতে পারিবে না।

লঙ-লেগ্।—এই অবস্থানে মাঝে মাঝে ক্যাচ্ করিবার সুযোগ হইবে, কাজেই ইহাতে বল ধরিবার শক্তি দরকার হইবে; তা'-ছাড়া এই ফিল্‌ডার যত দ্রুতগামী হইবে, ততই ভাল, কারণ বলটি যাহাতে বাউণ্ডারিতে পৌঁছিতে না পারে, এইজন্য তাহাকে দ্রুতবেগে এদিক্ বা ওদিক্ ছুটিয়া যাইতে হইবে।

যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে ক্যাপ্তেনের উইকেটের নিকটবর্ত্তী কোন অবস্থানে থাকা ভাল, কারণ উইকেটের কাছে থাকিলে, তিনি, বোলিং কিরূপে হইতেছে, তাহা দেখিতে পাইবেন, এবং অন্যান্য ফিল্‌ডারকে আবশ্যকমত সুব্যবস্থিত করিবার তাঁহার সুবিধা হইবে। প্রত্যেক ফিল্‌ডার যথাস্থানে দাঁড়াইয়া আছে কি না, ক্যাপ্তেনের তাহাও দেখা উচিত। অনেক সময় দেখা যায়, কোন ফিল্‌ডার ঠিক জায়গাহইতে একটু সরিয়া গিয়াছে বলিয়াই, বিপক্ষদল আরও রাণ পাইতেছে। কেবল তাহা নয়, ফিল্‌ডারদের ঐপ্রকার বিশৃঙ্খলার জন্য বোলার অনেক সময়ে বিরক্ত হইয়া উঠে এবং তাহার কার্য্য পূর্ব্বের মত ভাল করিয়া করিতে পারে না। ঐপ্রকার বিশৃঙ্খলা দলের বড়ই ক্ষতির কারণ হয়। যদি দুইজন ফিল্‌ডার বলটি ক্যাচ্ করিতে একসঙ্গে ছুটিয়া যায়, তাহা হইলে যাহার বলটি ধরিবার যো বেশী বলিয়া বোধ হয়, ক্যাপ্তেন তাহার নাম হাঁকিবেন। এরূপ না করিলে, পরস্পর-আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা হইবে, এবং কেহই বল ধরিতে পারিবে না। যদি কোন ফিল্‌ডার ভুল করে, তাহা হইলে ক্যাপ্তেন তাহাকে সকলের সম্মুখে তিরস্কার করিবেন না, করিলে, সম্ভবতঃ, ফিল্‌ডারের মন খারাব হইয়া যাইবে।

হাওয়ার চাপ

আমাদের ঘরোয়া পরিচিত সামগ্রীগুলির সাহায্যে আমরা অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য জানিতে পারি। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ, হাওয়া আমরা দেখিতে পাই না এবং হাওয়ারও যে ভার আছে, তাহাও আমরা সহজে অনুভব করিতে পারি না; কিন্তু ঘরোয়া সামান্য দুই-একটী জিনিসের সাহায্যে আমরা হাওয়ারও যে ভার আছে, তাহা প্রমাণিত করিতে পারি।

একটা ফাঁদালো-মুখ কাচের বোতল লও। বোতলের ভিতর একটুক্‌রা কাগজ জ্বালিয়া ফেলিয়া দাও। তাহার পর, দুই-এক-সেকেণ্ড পরে বোতলের মুখে একটা সিদ্ধ ডিম খোসা ছাড়াইয়া বসাইয়া রাখ। তোমরা হয়ত মনে করিতেছ যে, ডিমটা বোতলের মুখে ছিপির মত বসিয়া থাকিবে, কিন্তু তোমরা যদি লক্ষ্য করিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, ডিমটা ক্রমশঃ বোতলের ভিতর ঢুকিয়া যাইতেছে, কে যেন ভিতরহইতে উহাকে টানিতেছে! তাহার পর, তোমরা দেখিতে পাইবে, উহা হঠাৎ একটা ভয়ানক শব্দ করিয়া বোতলের ভিতর ঢুকিয়া গেল। এইরূপ হইবার কারণ কি? কারণ বড় সোজা। বোতলের ভিতর যে কাগজের টুক্‌রা জ্বলিতেছিল, তাহা বোতলের ভিতরকার হাওয়াটুকুকে গরম করিয়া প্রসারিত করিয়া দিয়াছে, তাহাতে

কতকটা হাওয়া বোতলের মুখদিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহার পর, বোতলের মুখে ডিমটা বসাইয়া দেওয়াতে, বাহিরের হাওয়া ভিতরে ঢুকিবার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাই বোতলের ভিতরকার হাওয়ার চাপ বহিঃস্থ বায়ুর চাপের অপেক্ষা কম হওয়াতে, ডিম ভিতরে ঢুকিতে বাধ্য হইয়াছে। পরে ডিমটা ভিতরে ঢুকিয়া বোতলের তলায় পড়িয়া যাওয়াতে, বোতলের মুখ আবার ফাঁক হইয়া পড়িয়াছে, তাই বাহিরের হাওয়া বোতলের ভিতর ঢুকিবার সময় ঐরকম শব্দ হইয়াছে।

আর একটী পরীক্ষা করা যাউক। এক গামলা জল লও। জলের উপর একটী ছিপি ভাসাইয়া দাও। ছিপির উপর এক-টুক্‌রা কাগজ জ্বালিয়া রাখিয়া দাও। তাহার পর, ছিপিটি একটী খালি কাচের গেলাস্‌দিয়া আস্তে আস্তে ঢাকিয়া দাও। দেখিতে পাইবে, গেলাসের নীচুহইতে বুজ্‌কুড়ি উঠিতেছে। গেলাসের ভিতরকার হাওয়া জ্বলন্ত কাগজে গরম হইয়া গিয়া প্রসারিত হইয়াছে, সমস্ত হাওয়াটুকু তাই আর গেলাসে ধরিতেছে না, তলা-দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে; কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দেখা গেল যে, গেলাসের মধ্যের জল উপরে উঠিতেছে। ইহার কারণ এই—কাগজটা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলে, হাওয়া ঠাণ্ডা হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, গেলাসের ভিতরকার হাওয়ার চাপও কাজেই কম হইয়া পড়িল, তাই জলের উপরিভাগস্থিত হাওয়ার চাপে জল উপরে উঠিতে লাগিল।

ক্রিকেট্-স্কোর

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে চেষ্টারফিল্ড্‌নামক স্থানে ইয়র্কশায়ার ও ডার্বিশায়ারে ঐ ম্যাচ্ হয়। ইয়র্কশায়ারের ব্রাউন ও টানিক্লিফ্-নামক দুইজন খেলোয়াড় প্রথম উইকেটে সে বৎসর ঐ সর্ব্বোচ্চ স্কোর করিয়াছিলেন। একজন ৩০০ রাণ এবং অন্যজন ২৪৩ রাণ করেন; কেহই আউট্ হন নাই।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইয়র্কশায়ার ও ওয়ারিকশায়ারে এজ্‌বাস্টন-নামক স্থানে এই ম্যাচ্ হয়। ইয়র্কশায়ার ঐরূপ স্কোর করে, কাউন্টি ম্যাচে সে বৎসর আর কোন দল ঐ দলের অপেক্ষা বেশী স্কোর করিতে পারে নাই। তাঁহাদের একজন ২১০ রাণ করিয়াছিলেন।

বিনীদ্র নৃপতি।

এক সময়ে কোন দেশে এক যুদ্ধপ্রিয় ও দুর্দ্ধর্ষ যুবা-রাজা রাজত্ব করিতেন। মানুষ যাহা যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, তাঁহার সে সমস্তই ছিল। তিনি খুব ধনী ও শক্তিশালী ছিলেন, তাঁহার প্রকাণ্ড একদল সৈন্য ছিল, তাহাদের সহায়তায় তিনি প্রতিযুদ্ধেই জয়লাভ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার অর্থ ও সামর্থ্য-সত্ত্বেও তাঁহার করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই তাঁহাকে ভাল করিতে পারেন নাই; অবশেষে তিনি তাঁহার রাজ্যমধ্যে এই কথা ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে তাঁহাকে স্বাভাবিক ও প্রশান্তভাবে ঘুম পাড়াইয়া দিতে পারিবে, তাহাকে তিনি তাঁহার অর্দ্ধরাজ্যদান করিবেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এই কথাও রটনা করিলেন যে, যে তাঁহাকে

রাজ্যমধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অসুখী লোক ছিলেন। তাঁহার অস্থির মন এত উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ হইয়া থাকিত যে, রাত্রিতে তিনি ঘুমাইতে পারিতেন না।

তিনি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ডাক্তারের দ্বারায় আপনার চিকিৎসা ঘুম পাড়াইতে আসিয়া বিফল হইবে, তাহাকে তিনি কয়েদ্ করিয়া রাখিবেন।

একদিন এক পরমসুন্দরী কৃষক-কুমারী আসিয়া বলিল,—"আমি আপনাকে ভাল করিয়া দিব।" রাজার মানসিক অসুখসত্ত্বেও

সেই বালিকার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"বালিকে, তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও, বড় বড় ডাক্তারেরা আমাকে ভাল করিতে পারেন নাই, তুমি কি পারিবে?" সেই তরুণী কৃষক-কুমারী বলিল,—"মহারাজ, আমার কাজ অর্থাৎ আপনাকে ভাল করিবার চেষ্টা না করিয়া আমি চলিয়া যাইতে পারি না।"

রাজা বলিলেন,—"ভাল, তুমি আমাকে কি ঔষধদিয়া ভাল করিবে—তোমার মা তোমাকে সামান্য কোন একটা ঔষধের কথা বলিয়া দিয়াছেন, কেমন কি না?"

বালিকা উত্তর করিল,—"হাঁ এ ঔষধ আমার মা-ই আমাকে শিখাইয়াছেন। ঔষধটি এই।"

এই বলিয়া বালিকা রাজাকে এক মুক্ত জানালার কাছে লইয়া গিয়া স্বর্গের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি, তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করিতে আসিয়াছ?"

কৃষক-বালা উত্তর করিল,—"না, মহারাজ, আমি আপনাকে প্রার্থনা করিতে শিখাইতে আসিয়াছি।"

কিন্তু রাজা তখনও মনে করিতে লাগিলেন যে, বালিকাটি তাঁহার সহিত রহস্যই করিতেছে, তিনি ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাঁহার সৈনিকদিগকে ডাকিয়া বালিকাকে একটা অন্ধকারময় কারা-কক্ষে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আদেশ দিলেন। তিনি তাঁহার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সৈনিকেরা বালিকাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতেছে, দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয়ে একটুও দয়ার সঞ্চার হইল না। তাহার পর, সৈনিকেরা বালিকাকে কারাকক্ষে লইয়া চলিল। বালিকা কি তখন কাঁদিতেছিল? না, তাহার মধুর অধরে তখন মধুর হাস্য ফুটিয়াছিল। তাহা দেখিয়া রাজার কঠিন অন্তঃকরণ কোমল হইয়া পড়িল। তিনি বালিকার পিছনে পিছনে কারা-কক্ষের দ্বারপর্য্যন্ত যাইলেন। বালিকা কারাকক্ষে প্রবেশ করিয়াই ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করিল,—"হে রাজন! হে স্নেহময় পিতঃ! রাজা যাহাতে নম্র অন্তঃকরণে তাঁহার পাপরাশির জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাহিতে পারেন, তজ্জন্য তুমি তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে শিখাও, তাহা হইলে তিনি মনের সুখে ও শান্তিতে ঘুমাইতে পারিবেন।"

তাহার পর, বালিকা নীরবে, নতমস্তকে প্রাথনা করিতে লাগিল। রাজা দৌড়িয়া কারাদ্বারে গিয়া প্রহরীদের বলিল,—"ইহাকে শীঘ্র শৃঙ্খল-মুক্ত কর, এখনই ছাড়িয়া দাও, যেখানে খুসী চলিয়া যা'ক।"

রাজা নিজকক্ষে ফিরিয়া, বিছানার কাছে নত-জানু হইয়া, কারাগারে কৃষক-কুমারী যেমন করিয়াছিল, তেমনি হাত জোড় করিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখদিয়া একটীও কথা বাহির হইল না, কারণ তাঁহার মা তাঁহাকে যে প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছিলেন, তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে মনে মনে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ অল্পক্ষণ পরেই তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। পরদিন প্রভাতে তিনি যেন আর সে মানুষ নন, একেবারে বদ্‌লিয়া গিয়াছেন, আগেকার অপেক্ষা ঢের ভালমানুষ হইয়াছেন। তাহার ফলে, তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়িয়া দিলেন, ধন বা শক্তিসঞ্চয়ের ইচ্ছা আর তাঁহার মনে স্থান পাইল না; কি করিয়া তিনি তাঁহার প্রজাদের সুখে রাখিতে পারেন, ইহাই এখন তাঁহার প্রধান ভাবনার বিষয় হইয়া উঠিল।

এই সময়ে তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে, কৃষক-কুমারী যদি আমার কাছে থাকিয়া আমাকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে আমি অনেক ভাল-ভাল কাজ করিতে পারি।

সেই বালিকার অনুসন্ধানে তিনি চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না। রাজা বড়ই নিরাশ হইয়া পড়িলেন; তবে এখন তিনি প্রার্থনা করিতে শিখিয়াছেন, সুতরাং আর তাঁহাকে বিনীদ্র-রজনীযাপন করিতে হয় না। তাঁহার যৌবনের শক্তি ও শারীরিক লাবণ্য আবার ফিরিয়া আসিল। তাঁহার মৃদু ও সুনিপুণ শাসন-গুণে, তাঁহারই প্রজারা সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হইয়া উঠিল। এমন সময়ে, একদিন এক লাবণ্যবতী ললনা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাজার দিকে চাহিয়া মোহন হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, আমি সেই কৃষক-কুমারী।" রাজা মহানন্দে বলিয়া উঠিলেন,—"আমি তোমাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছি। এতদিন আমি তোমার আগমন-প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমার প্রতিশ্রুতিমত আমার অর্দ্ধরাজ্যের তুমিই অধিশ্বরী। তুমি কি আমার মহিষী হইয়া আমার প্রজারঞ্জন-কার্য্যে সাহায্য করিবে?"

কৃষক-বালা সলজ্জভাবে উত্তর দিলেন,—"আমি সেই অভি-প্রায়েই আসিয়াছি, কিন্তু আমার একটা কথা আছে, আমার মাও আমার সঙ্গে থাকিবেন। তোমাকে কি করিয়া ভাল করিতে হইবে, তাহা তিনিই আমাকে শিখাইয়াছিলেন। তিনিই প্রতিরাত্রে আমাকে বলিতেন, 'মা, যদি তুমি সুনিদ্রায়, সুখে, শান্তিতে ও সুখস্বপ্নে রজনী ভোর করিতে চাও, তাহা হইলে প্রার্থনা করিতে ভুলিও না।'"

-:*:-

সংখ্যা-কৌতুক।

১নং

৩	৫	৭	৯	১১	১
১৩	১৫	১৭	১৯	২১	২৩
২৫	২৭	২৯	৩১	৩৩	৩৫
৩৭	৩৯	৪১	৪৩	৪৫	৪৭
৪৯	৫১	৫৩	৫৫	৫৭	৫৯

২নং

৫	৬	৭	১৩	১২	৪
১৪	১৫	২০	২১	২২	২৩
২৮	২৯	৩০	৩১	৩৬	৩৭
৩৮	৩৯	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭
৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৬০	১৩

৩নং

৯	১০	১১	১২	১৩	৮
১৪	১৫	২৪	২৫	২৬	২৭
২৮	২৯	৩০	৩১	৪০	৪১
৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭
৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	১৩

৪নং

৩	৬	৭	১০	১১	২
১৪	১৫	১৮	১৯	২২	২৩
২৬	২৭	৩০	৩১	৩৪	৩৫
৩৮	৩৯	৪২	৪৩	৪৬	৪৭
৫০	৫১	৫৪	৫৫	৫৮	৫৯

৫নং

১৭	১৮	১৯	২০	২১	১৬
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
২৮	২৯	৩০	৩১	৪৮	৪৯
৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫
৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৩১

৬নং

৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩২
৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩
৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯
৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫
৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৪৬

এই ছয়টী চতুষ্কের মধ্যহইতে তুমি কোন একটী সংখ্যা মনে কর, তুমি কোন্ সংখ্যাটি মনে করিয়াছ, আমি বলিয়া দিব।—আচ্ছা, আমি একটী সংখ্যা মনে করি; করিয়াছি, আপনি বলুন তো দেখি?—ভাল তুমি যে সংখ্যাটি মনে করিয়াছ তাহা কি ১নং চতুষ্কে আছে?—আছে।—২নং চতুষ্কে আছে?—আছে।—৩নং চতুষ্কে আছে?—আছে।—৪নং চতুষ্কে আছে?—আছে।—৫নং চতুষ্কে আছে?—নাই।—৬নং চতুষ্কে আছে?—আছে।—তুমি ৪৭ মনে করিয়াছ।—কেমন করিয়া বলিলেন?—১নং, ২নং, ৩নং ৪নং ও ৬নং চতুষ্কের উপরের ডানদিক্কার কোণের সংখ্যাগুলি যোগ করিলে কত হয়?—১+৪+৮+২+৩২=৪৭! তাইত এত বড় মজাত! আচ্ছা আমি আর একটী সংখ্যা মনে করি—করিয়াছি। —ভাল, ঐ সংখ্যাটি ১নং চতুষ্কে আছে?—আছে।—২নং চতুষ্কে আছে?—আছে।—৩নং চতুষ্কে আছে?—আছে।—৪নং চতুষ্কে আছে?—আছে।—৫নং চতুষ্কে আছে?—নাই।—৬নং চতুষ্কে আছে?—নাই।—তুমি ১৫ মনে করিয়াছ।—আচ্ছা দেখি, ডানদিক্কার উপরকার কোণের সংখ্যাগুলি যোগদিয়া কেমন পনের হয়—

১নং	...	১
২নং	...	৪
৩নং	...	৮
৪নং	...	২
৫নং		
৬নং		
		১৫

বাঃ! এ যে ঠিক পনেরই হইল!—এখন যাও, তোমার বন্ধুদের বয়স কত তাহা তাহাদের গণিয়া বলিয়া দাও গিয়া। এই চতুষ্কছয়টা সঙ্গে লইতে ভুলিও না।

বালক

১ম বর্ষ] নবেম্বর, ১৯১২। [১১শ সংখ্যা।

কনানার বল্লম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

১৪

কাহ্লেদ্ শেষে যে মন্ত্রণা স্থির করিয়াছিলেন, একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই কনানা সেই মন্ত্রণানুসারে কার্য্য হইতেছে, দেখিলেন। প্রাতঃকালের ধূসরবর্ণ আলোকে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তৈজসপত্র ও মানুষ পিঠে করিয়া উঠ-সকল দক্ষিণদিকে চলিয়াছে। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, উপত্যকার অনেক দূরে ছায়ার মত দাগ-সকল ক্রমে যেন মিলাইয়া যাইতেছে। লোকেরা তাম্বু গুটাইয়া বাঁধিয়া, চলিয়া যাইতেছিল। ফলে অজেয় কাহ্লেদ্ সেনাগণকে হটিয়া যাইতে হুকুম করিয়াছেন।

তিনি চকিতের ন্যায় উঠিয়া মানুয়েলের তাম্বুতে গেলেন। কনানা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মহারাজ যে কথা দিয়াছেন, তাহা থাকিবে ত? যদি আমি ঐসব কথা বলিয়া, বল্লম ছুড়িয়া, একজন আরবকে মারি, মহারাজ সেই মুহূর্ত্তে আমার পিতাকে মুক্ত করিয়া দিবেন ত?"

মানুয়েল কহিলেন, "আমি স্বর্গ-মর্ত্ত্যের দিব্য করিয়া বলিতেছি, তাই হইবে।"

কনানা বলিলেন, "তবে আমাকে বল্লম দিতে আজ্ঞা হউক।"
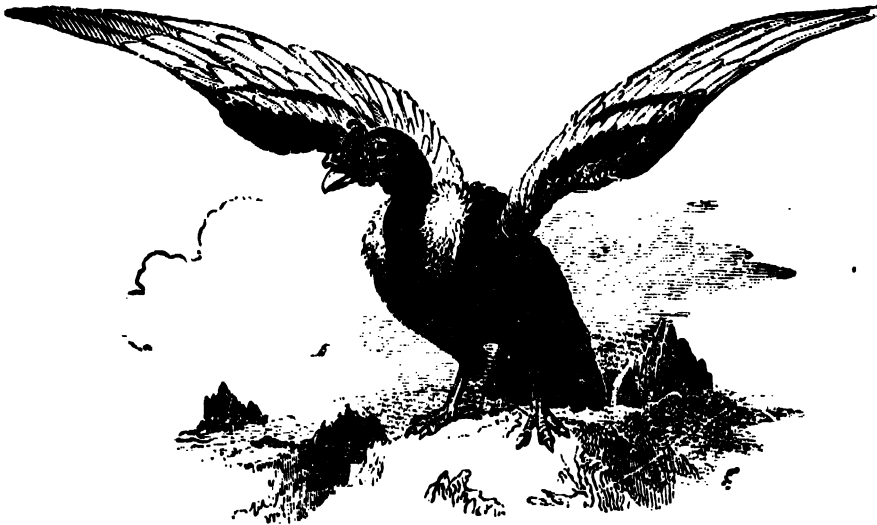
কনানা জানিতেন যে, এ সময়ে পিছে হটিতে গেলে আরব-দেশের সর্ব্বনাশ। কিন্তু তিনি ভাবিতেই লাগিলেন, একটুও নড়িলেন না। এমন সময়ে, একজন সেনাপতি আসিয়া তাঁহার কাঁধে হাত দিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন, আর বলিলেন যে, মুহূর্ত্তমধ্যে সূর্য্যোদয় হইবে।

কনানার পিতা ধীরে ধীরে কাছে গিয়া বলিলেন, "কনানা, এইপ্রকার কাজ করিয়া যদি আমায় মুক্ত করিয়া দেও, তবে আমি আগুনে লোহা গরম করিয়া নিজেই নিজের চক্ষু তুলিয়া ফেলিব।"

কনানা তাঁহার কথা কানে পাতিলেন না। তিনি বল্লম লইলেন, হাতে করিয়া দেখিলেন, বড় হাল্কা, তাই তাচ্ছিল্যভাবে

মাটীতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এর চেয়ে ভারী বল্লম দেও। আমি কি গ্রীক বালকের মত মোমের পুতুল? এমন বল্লম দেও, যার আঘাতে মানুষ মরে।"

লোকেরা একটা ভারী বল্লম আনিয়া দিল।

কনানা এটা হাতে লইয়া অস্ফুট-স্বরে বলিলেন, "এটার হাতল বেদুইনের পক্ষে বড়ই ছোট। কিন্তু দাঁড়াও, আমি ঠিক করিয়া লইব এখন। এস, এইটা লইয়াই যাই।"

এই বলিতে বলিতে তিনি জামার ভিতরহইতে কি একটুকরা ছিঁড়িয়া বাহির করিলেন, এবং তড়িৎগতিতে ফিরিয়া, পর্ব্বতের চূড়ার ডগায় গিয়া, সেই টুক্‌রাটুকু বল্লমের হাতলে কশিয়া জড়াইলেন।

অনন্তর তিনি একবারে ধারে গিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন।

সূর্য্য সমভূমি ছাড়াইয়া উঠিল। বেদুইন-বালক কনানার কথা-মত কাজ করিবার এই সময়। তিনি মেষচর্ম্মের জামা গায়ে দিয়া, এবং মরুদেশে প্রচলিত পাগড়ী মাথায় দিয়া, যেভাবে হোরেব-পর্ব্বতের চূড়ায় হারোণের সমাধি-মন্দিরের গোপুরে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইভাবে দাঁড়াইলেন।

তাঁহার হাতে আর মেষ-পালকের পাঁচনী নাই—কিন্তু এক বল্লম কশিয়া ধরিয়াছেন, প্রাতঃ-সূর্য্যের ন্যায় বল্লমের ফলা ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল।

হোরেব-পর্ব্বতে তিনি সম্মুখ-দিকে বক্রভাবে দাঁড়াইয়া, কপালে হাত দিয়া চক্ষু আড়াল করিয়া, ব্যগ্রভাবে নিজের গন্তব্য দূরবর্ত্তী পথ-নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন।

এখন তাঁহার সেপ্রকার ব্যগ্রতা নাই। তিনি ধীরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। সূর্য্যের তেজ চখে পড়িল, কিন্তু তিনি কপালে হাত দিয়া চক্ষু ঢাকিলেন না, চাহিয়াই রহিলেন।

দেহের একটী শিরাও নড়িল না। তিনি কিসের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন?

মানুয়েল্ জিজ্ঞাসিলেন, "কি, ভয় পাইলে না কি?" তিনি কনানার খুব নিকটে আসিয়াছেন, কিন্তু এমনভাবে আছেন, যেন উপত্যকার লোকে দেখিতে না পায়। তিনি আবার কনানাকে কহিলেন, "মনে আছে ত, কথা না রাখিলে, বৃদ্ধের চক্ষু থাকিবে না।"

কনানা মানুয়েলের দিকে না ফিরিয়াই উত্তর করিলেন,—

"ঐ দেখিতেছেন, একজন লোক ধূসর-বর্ণ ঘোড়ায় চড়িয়া ধীরে ধীরে সেনা-দলের মধ্যে ফিরিতেছেন? উনি ক্রমেই নিকটে আসিতেছেন। উনিই অজেয় কাহ্লেদ্। উনি যদি আমার বল্লমের পাল্লার ভিতরে আসিয়া পড়েন, তাহা হইলে কি মহারাজ খুশি হইবেন না?—তাই অপেক্ষা করিতেছি।"

রাজা মানুয়েল্ ইহা শুনিয়া বলিলেন, "বেশ ছেলে—সাবাস্, সাবাস্ ছেলে। তুমি যে কাজে মন দেও, সে কাজ ভাল করিয়া কর। ওকে মারিয়া ফেল,—তোমাকে এত ধন-দৌলত দিব যে, বৃদ্ধকালপর্য্যন্ত সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে।"

কনানা এ কথার উত্তর দিলেন না। কিন্তু দাম্ভিক-ভাবে পর্ব্বতের চূড়ায় দাঁড়াইয়া একমনে দেখিতে ও অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে অজেয় কাহ্লেদ্ সিপাহীদের লাইন ছাড়িয়া, ঘোড়া হাঁকাইয়া পর্ব্বতের চূড়ার অনেকটা কাছে আসিলেন।

এই দেখিয়া রাজপুত্র মানুয়েল্ কনানাকে কহিলেন, "এইবার, এইবার!"

কনানা ধীরে ধীরে বল্লম উঠাইলেন। তিনবার মাথার উপর বল্লম ঘুরাইলেন। এবং বেদুইনেরা শত্রুকে দেখিতে পাইলে, কিম্বা সমভূমিতে বিপক্ষের সম্মুখীন হইলে, যেমন করিয়া বলে, কনানা তেমনি করিয়া তিনবার কহিলেন,

"আমি কনানা, মরুভূমির সিংহের পুত্র, আইস।"

এই কথা বলিয়া তিনি মুহূর্ত্ত-কাল থামিলেন। পরে যা বলিতে হইবে, তা বলা সহজ কথা নয়। ফল যা দাঁড়াইবে, তা তিনি বেশ জানিতেন। নিজের পরিণাম-ফল দেখিবার জন্য তাঁহাকে কষ্ট করিতে হইল না।

পর্ব্বতের নীচে যত সৈন্য-সামন্ত ছিল, সকলেরই চক্ষু পর্ব্বতের চূড়ায় দণ্ডায়মান কনানার দিকে। সহস্র সহস্র লোক, তিনি কি বলেন, শুনিবার জন্য কান পাতিয়া রহিয়াছে। তাঁহার কথার কি ফল দাঁড়ায়, তাহা দেখিবার জন্য অযুত অযুত লোক ব্যগ্র।

এমন সময়ে রাজকুমার মানুয়েল্ তীব্রস্বরে কহিলেন, "আর কেন?—লাগাও, লাগাও।"

কনানা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন,

"একঘণ্টার মধ্যে ত্রিশ-হাজার আরব-সেনা গিয়া হিরাক্লিয়সের সেনাদলে তরোয়াল চালাইবে।"

এই বলিয়া বল্লম ঘুরাইয়া, কাহ্লেদকে লক্ষ্য করিয়া, সজোরে ফেলিয়া দিলেন। কাহ্লেদ্ সেই অবধি একই স্থানে দাঁড়াইয়া-ছিলেন।

চটক-পক্ষীর ন্যায় শব্দ করিতে করিতে পর্ব্বতের চূড়াহইতে চাক্‌চিক্যশালী বল্লমের ফলা পড়িতে উভয় পক্ষের লোকেরা দেখিল—যেন আকাশের তারা খসিয়া পড়িল।

কনানা ঠিক লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বেদুইন-বালক নত হইয়া দেখিতে লাগিলেন, ভাব দেখিয়া বোধ হইল, লক্ষ্য যে এতটা অকাট্য হইবে, তাঁহার এমন আশা ছিল না। কাহ্লেদের বাহন ধূসর-বর্ণ ঘোড়ার বুকে বল্লম বিঁধিল। আঘাত লাগিবামাত্র ঘোড়াটা বেগে ভূপতিত হইয়া মরিয়া গেল।

ইস্মায়েলীয় দলে ভয়ানক কোলাহল উঠিল। নর-নারী সকলে আর্ত্তস্বর করিতে লাগিল। "কনানা দারুণ বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাস-ঘাতক কনানার সর্ব্বনাশ হউক।" গগন-ভেদ করিয়া এই শব্দ উঠিল।

কাহ্লেদের সেনাদলে এমন বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল যে, গ্রীক-সেনাগণ অগ্রসর হইতে পারিলে, এক-সহস্র গ্রীকসৈন্য একলক্ষ বেদুইনসৈন্যকে তাড়াইয়া দিতে পারিত। কিন্তু গ্রীক-দিগের অগ্রসর হইবার সামর্থ্য ছিল না।

কনানা পর্ব্বতের চূড়ায় দাঁড়াইয়া রহিলেন,—অনড়। "বিশ্বাস-ঘাতক," "বিশ্বাসঘাতক" বলিয়া যে লোকেরা চেঁচাইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তিনি শুনিতে পাইলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, লোকে এ কথা বলিবে, তাই ও সব কথা গায়ে মাখিলেন না।

তিনি ধীরভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। কাহ্লেদ্ ঘোড়ার বক্ষহইতে বল্লম বাহির করিয়া লইয়া, সেনাগণের নিকটে গেলেন।

যাইতে যাইতে তিনি একটী বারমাত্র ফিরিয়া, পর্ব্বতের চূড়ায় কনানার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন। তিনি হাত তুলিয়া বেদুইন বালককে আশী-র্ব্বাদ করিলেন—বালক ও বুঝিতে পারি-লেন যে, উনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, অভিশাপ দিলেন না। এই করিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেন।

কনানা কম্পিত-কলেবরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মেষ-চর্ম্মের জামার ভিতরে হাত দিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর ভয়ানক শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি ফিরিয়া, ধীরভাবে মানুয়েলের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজকুমার মানুয়েল কহিলেন, "বেশ, বেশ; কিন্তু একজন আরবকেও ত মার নাই। তুমি একজন আরবকে মারিবে, এই কথা ছিল—তাই আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।"

কনানা বলিলেন, "তুমি যে মুহূর্ত্তে একজন আরবকে মারিবে, সেই মুহূর্ত্তে আমি তোমার পিতাকে ছাড়িয়া দিব—এই ত আপনার কথা! স্বর্গ-মর্ত্ত্যের দিব্য করিয়া আপনি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। আপনি প্রতিজ্ঞা-রক্ষা করিবেন! আপনি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে তুচ্ছ করিবেন না। কারণ আমি একজন আরবকে বধ করিয়াছি।

এই বলিয়া কনানা মেষচর্ম্মের জামা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, এবং সকলেই দেখিতে পাইল যে, তাঁহার কোমরে অতি চমৎকার কোমরবন্ধ ঝক্ মক্ করিতেছে, আর তাঁহার বুকে ছুরিকা গাঁথা,—বুক বহিয়া অজস্র রক্ত পড়িতেছে। কনানা বিষম কাঁপিতে কাঁপিতে ও টলিতে টলিতে পশ্চাৎ হটিয়া পর্ব্বতের চূড়াহইতে নীচে পড়িয়া গেলেন।

রাজকুমার মানুয়েল কনানার পিতার দিকে মুখ করিয়া কহিলেন, "যাও, তুমি মুক্ত হইলে। তোমার মুক্তির মূল্য দিবার জন্য ভয়ঙ্কর বলি উৎসৃষ্ট হইয়াছে।"

এই বলিয়া নিজ তাম্বুর ভিতরে গেলেন ও কর্ত্তব্যবিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

পর্ব্বতের চূড়া-হইতে একজন কর্ম্মচারী আসিয়া কহিল, "বোধ হয়, বেদুইনেরা পলা-ইয়া যাইতেছে। কেবল অশ্বারোহী এবং উষ্ট্রা-রোহী লোকেরা বেগে পাহাড়ের দিকে ছুটিয়াছে। কেবল পদাতিকেরা সম্মুখে রহিয়াছে।

রাজকুমার মানুয়েল আজ্ঞা দিলেন, "যে সেনাগণের শক্তি-সামর্থ্য আছে, তাহারা গিয়া উহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করুক। যত সৈন্য পার, সম্মুখের দিকে আন, আর যদি উহারা পলাইতে চেষ্টা করে, বাধা দিবে না, বরং উৎসাহ দিবে।"

এই আজ্ঞানুসারে চতুর্থ দিনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল; কিন্তু সক-লেরই নিতান্ত নিস্তেজ ভাব—কাহারও হস্ত-পদ যেন নড়িতে চাহে না।

বেদুইনেরা সুযোগ-মত হটিয়া যাইতে লাগিল, কাজেই তাহাদের সম্মুখস্থ সৈন্যশ্রেণীর লোকসংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। কিন্তু যাহারা ছিল, তাহারা একই স্থানে অনড় হইয়া রহিল, অগ্রসর হইল না।

(ক্রমশঃ।)

'টাইটানিক'-ডুবী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যাহা হউক, গীতালাপাদির শেষে যাত্রীরা যখন কেহ "ক্যাবিনে" গিয়া শুইয়াছেন, কেহ বা কাপড় ছাড়িতেছেন, কেহ কেহ বা ধূম-পানের কক্ষহইতে গল্প-গাছা করিতে করিতে ফিরিতেছেন, তখন টাইটানিক, বোধ করি, পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুততর গতিতে চলিতেছিল, এই সময়ে এঞ্জিনগুলি একটু অতিরিক্ত পরিমাণে নড়িয়া উঠিল, এবং ক্যাবিনের শয্যাগুলিও অধিকতর বেগে দুলিতে লাগিল। কিন্তু তদ-তিরিক্ত আর কিছুই হইল না, কোন কিছু ভাঙিয়া গেলে যেরূপ শব্দ উৎপন্ন হয়, সেরূপ কোন শব্দ হইল না। একটা গুরুপদার্থের সহিত আর একটা গুরুপদার্থ সজোরে সংঘৃষ্ট হইলে, যেরূপ একটা "টাল"-অনুভব হয়, একটা নির্ঘোষ উঠে, সেরূপ কিছুই হইল না। পুনরায় এঞ্জিনগুলির অতিরিক্ত সঞ্চলন ও শয্যাগুলির অতিরিক্ত দোলন অনুভূত হইল। তখন যাত্রীদের কাহারও মনে হইল যে, জাহাজ বুঝি গতি-বেগ বাড়াইতেছে। কিন্তু সেই সময়েই তুষার-শিলা জাহাজ ফুটা করিয়া ফেলিতেছিল, এবং জাহাজের মধ্যে জল-প্রবেশ করিতেছিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে এঞ্জিনের বেগ শ্লথ করিয়া জাহাজটি একে-বারে থামাইয়া ফেলা হইল। জাহাজের কম্পন ও নর্ত্তন চারি-দিবসযাবৎ অরোহিগণের "সঙ্গের সাথী" হইয়া উঠিয়াছিল, ঐ দুটি এক্ষণে সহসা স্থগিত হইয়া গেল। তাহাতে কোন কোন যাত্রী অনুভব করিলেন যে, কোনকিছু একটা হইয়াছে। একজন যাত্রী তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া ক্যাবিনহইতে বাহির হইয়া একজন কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জাহাজ থামান হইল কেন ?"

তিনি উত্তর করিলেন,—"বলিতে পারি না, তবে বিশেষ কোন কারণ, বোধ করি, নাই।"

যাত্রী বলিলেন,—"আচ্ছা, আমি ডেকে গিয়া দেখি, কি হইয়াছে।"

কর্ম্মচারী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"তা জান, কিন্তু ডেকে ভয়ানক শীত।"

বস্তুতঃ প্রথমে টাইটানিকের কোন আরোহীরই মনে হয় নাই যে, উহা গুরুতররূপে ধাক্কা খাইয়া ছিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্ত শীতে কেহ বড় ডেকের উপর গিয়া জাহাজ সহসা থামিবার কারণ জানিবার জন্ত উৎসুক হন নাই। এক ঘরে কতক-গুলি আরোহী তাস খেলিতেছিলেন, তাহারা নাকি হিম-শিলাটাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তথাপি উদ্বিগ্ন হন নাই। তাহাদের মধ্যে একজন ভাবিতেছিলেন যে, কাপ্তেন অতি সাবধান, তাই দেখিতে-ছেন, হিম-শিলাটা কাছদিয়া চলিয়া গেল, ইহাতে জাহাজের কোন ক্ষতি হইয়াছে কি না ; আর একজন বলিয়াছিলেন যে, হিম-শিলার আঁচড় লাগিয়া জাহাজের এক জায়গার রং উঠিয়া গিয়াছে, তাই কাপ্তেন সেই স্থানটি আবার রং করাইয়া লইতেছেন। কেহ আবার আমোদ করিয়া হিম-শিলার একাংশ ভাঙিয়া যদি বরফ পড়িয়া থাকে, তাহার কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিবেন বলিয়া ডেকের উপরে চলিলেন। ফলতঃ ইহাতে কাহারও মনে ভীতির সঞ্চার হয় নাই, যিনি বেশ মুড়ি-সুড়ি দিয়া শুইয়াছিলেন, তিনি উঠিতে চান না, অনেক কর্ম্মচারীও উদাসীনভাবে লিখিতেছেন বা বসিয়া আছেন বা শুইতে যাইতেছেন। এমন সময়ে উপর-হইতে কে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"সমস্ত আরোহী জীবন-রক্ষক কোমরবন্ধ পরিয়া ডেকের উপরে আসুন।"

আরোহীরা কেহ হুড়াহুড়ি করিলেন না, সকলেই প্রশান্তভাবে ডেকের উপরে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখন সমুদ্র স্থির, টাইটানিকের গতি আবার রুদ্ধ হইয়াছে। স্থির-সমুদ্রের ঈষৎ চঞ্চল জল জাহাজের গায়ে লাগিয়া ছলাৎ-ছলাৎ-আওয়াজ হইতেছে, তাহাতে টাইটানিক একটুও নড়িতেছে না, এরূপ জাহাজের আরোহীদের বিপদাশঙ্কা বড় সহজে হয় না। কিন্তু বিপদের লক্ষণগুলি ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইতে লাগিল। বাষ্পাধারগুলিহইতে বিপর্য্যয় হুশ্-হুশ্-শব্দে বাষ্প বাহির হইতে লাগিল। সেই ভৈরব-নিনাদে সকলেরই শ্রবণ-যুগল কিয়ৎকালের নিমিত্ত বধির হইয়া রহিল। কিন্তু তথাপি কেহ কোন ভীতি-লক্ষণ দেখাইলেন না। কোন মহিলাই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন না। কেহই ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন না। কেহই ডেকময় ছুটাছুটি করিয়া কি হইয়াছে, কেনই বা তাঁহারা জীবন-রক্ষক কোমরবন্ধ পরিয়া ডেকের উপর আসিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য অস্থিরতা-প্রকাশ করিলেন না। সকলেই স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বা ডেকের উপর আস্তে আস্তে একটু পায়চারী করিয়া পোত-কর্ম্মচারিগণের জীবন-পোতগুলি প্রস্তুত-কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। কেহই পোত-কর্ম্মচারিগণের সাহায্যার্থে গেলেন না, কারণ যাত্রীদের দ্বারায় সে বিষয়ে প্রকৃত সাহায্য পাওয়া যাইত না।

যাত্রীদিগের এইরূপ মানসিক স্থৈর্য্যের কারণ জানিতে হইলে, পাঠকদিগকে বুঝিতে হইবে যে, এরূপ বিপদের অভিজ্ঞতা তাঁহাদের অনেকেরই ছিল না, তাই স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত জাহাজত্যাগ করিতে চান নাই, এবং অনেক যাত্রী ঐ বিপদ্ মাথায় করিয়াই ক্যাবিনের মধ্যে শয়ন করিতে গিয়াছিলেন। তাহাছাড়া, নিম্নলিখিত হেতুগুলিও বিদ্যমান ছিল :—তখন প্রকৃতিতে দুর্য্যোগের কোন লক্ষণই ছিল না। রাত্রিটি নক্ষত্রালোকে উজ্জ্বল হইয়া ছিল। জাহাজটি তখন স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাহইতে কোন বিপদ্ই অনুভূত হইতেছিল না। একটাও হিম-শিলা দেখা যাইতেছিল না। জাহাজের কোন পার্শ্বে কোন ছিদ্র হইয়া জল ঢুকিতেও দেখা যাইতেছিল না। কোন কিছুই ভগ্ন বা বিপর্য্যস্ত হয় নাই।

Photograph by De Luca & Co.

লর্ড ও লেডি কার্মাইকেল্।

যুক্তবঙ্গের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া লর্ড কার্মাইকেল যে দিন প্রথম কলিকাতায় পদার্পণ করেন, সেই দিন উট্রাম-ঘাটে এই ফটোটি তুলা হয়।

কোন ভীতিসূচক শব্দ শ্রুত হইতেছিল না। কোন আতঙ্ক বিদ্যমান ছিল না। এই দুর্ঘটনাটি যে কিরূপ প্রকৃতির, ইহাতে জাহাজের যে কতটা ক্ষতি হইয়াছে, কয়েকঘণ্টার মধ্যে জাহাজটী ডুবিয়া গেলে, যে কি অনিষ্ট হইবে, তাহাও অনেকেরই জানা ছিল না। তাহাছাড়া যাত্রীদের জন্য কত নৌকা ও জীবন-রক্ষক যন্ত্রাদি আছে এবং সেগুলির দ্বারা কত লোকের জীবন-রক্ষা হইতে পারে, তাহাও যাত্রীদিগের অপরিজ্ঞাত ছিল। হয়ত পোত-কর্ম্মচারিগণ বিচার-বিবেচনপূর্ব্বক ইচ্ছা করিয়া যাত্রীদিগকে এ বিষয়ে অজ্ঞ রাখিয়াছিলেন বলিয়াই, এইরূপ হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, জাহাজখানি অতিপ্রকাণ্ড একমাইলের ছয়ভাগের একভাগ লম্বা ছিল। উহার উপরিভাগস্থিত তিনটি ডেক যাত্রীপূর্ণ। এরূপস্থলে এতটা জায়গা সম্পূর্ণরূপে স্বীয় আয়ত্তাধীন রাখা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।

যাহা হউক, এইসময়ে লোকেরা ক্রমে ক্রমে সিঁড়িদিয়া উপরে উঠিয়া ডেকে আসিয়া জড় হইতেছিলেন। বারটা বাজিয়া যখন কুড়ি-মিনিট হইল, তখন একজন কর্ম্মচারী আসিয়া হাঁকিলেন,—"স্ত্রীলোকেরা ও ছেলে-মেয়েরা নীচেকার ডেকে নামিয়া যান। পুরুষেরা নৌকাগুলিহইতে তফাতে থাকুন।" পুরুষ-যাত্রীরা পিছাইয়া গেলেন, এবং স্ত্রীলোকেরা নীচেকার ডেকে নামিয়া নৌকায় উঠিতে গেলেন। প্রথমে দুইজন মহিলা তাঁহাদের স্বামীদের ছাড়িয়া নীচে যাইতে অসম্মতা হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে কতক বুঝাইয়া-পড়াইয়া, কতক বা জোর করিয়া নীচে নামাইয়া দেওয়া হইল। এই সময়েই, বোধ করি, যাত্রীরা বিপদের আসন্নতা ও গুরুত্ব উপলব্ধ করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের মানসিক স্থৈর্য্যের কোন তারতম্য ঘটিল না। তখনও তাঁহারা পোত-কর্ম্মচারিগণের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া রহিলেন।

এই বিপদ্-সম্বন্ধে যদিও বা কাহারও মনে কোন সন্দেহ ছিল, পরে যে ঘটনাটি ঘটিল, তাহাতে সে সন্দেহ একেবারে দূর হইয়া গেল।

যাত্রীরা নৌকাগুলি দেখিতেছেন, এমন সময়ে, সহসা সম্মুখের ডেকহইতে একটী "রকেট্"-বাজি ঊর্দ্ধে, যেখানে নক্ষত্রগুলি ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল সেইখানে, সশব্দে উৎক্ষিপ্ত হইল, যাত্রীরা সকলেই বলিয়া উঠিলেন,—"রকেট্"! তখন আর কাহারও মনে বিপদ্-সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না; কেননা "রকেট্" ছুড়িবার উদ্দেশ্য অন্য পোতের সাহায্যপ্রার্থনা। একটার পর একটী করিয়া অনেকগুলি রকেট্-ছোড়া হইল।

নৌকাগুলি যে ডেকে স্ত্রীলোকেরা নামিয়াছে, সেই ডেকের রুজু-রুজু করা হইতে লাগিল। স্ত্রীলোক ও ছেলে-মেয়েরা রেলিং ডিঙাইয়া সেই নৌকাগুলিতে যাইয়া সেগুলি পূর্ণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর, সেগুলি একে একে জলে নামান হইতে লাগিল।

বারটা-চল্লিশ-মিনিটহইতে জাহাজে ব্যাণ্ড বাজিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং রাত দুইটাপর্য্যন্ত বাজিয়াছিল। সে রাত্রে অনেক বীরোচিত কার্য্য হইয়াছিল, কিন্তু এই বাদকদিগের অপেক্ষা বীরোচিত কার্য্য, বোধ করি, আর কেহই করে নাই। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জাহাজখানি সমুদ্রতলে নামিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের স্থানে দাঁড়াইয়া যুগপৎ তাঁহাদের অমর অন্ত্যেষ্টির ও কীর্ত্তি-গৌরবের গাথা বাদ্যযোগে গান করিতেছেন!

নৌকাগুলি ভাসান হইলে, সেগুলি পরস্পরের কাছা-কাছি রাখিয়া কোন জাহাজের প্রতীক্ষায় থাকাই সিদ্ধান্ত হইল।

নৌকারোহীরা নৌকাগুলিহইতে টাইটানিকের বিরাট আকৃতি দেখিয়া তৎপ্রতি সম্ভ্রমে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। জাহাজখানি লম্বায় একমাইলের ছয়ভাগের একভাগ। উচ্চে তলাহইতে সর্ব্বোচ্চ ডেকপর্য্যন্ত ২৫ গজ, তাহার উপর, চারিটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চিম্‌নী, তাহার উপর আবার মাস্তলগুলি খাড়া রহিয়াছে,—কি উচ্চ! উহার চতুর্দ্দিক্‌হইতে বিদ্যুতালোক বিকীর্ণ হইতেছে, আর উহার চারিপাশে যাত্রীপূর্ণ নৌকাগুলি ভাসিতেছে। ঐ যাত্রীরাই কিয়ৎকালপূর্ব্বে উহার ডেকে বিচরণ করিয়াছেন, সানন্দে ঐকতান-বাদ্য শুনিয়াছেন, পাঠাগারে বই পড়িয়াছেন; আর এখন, উহা ডুবিয়া যাইতেছে দেখিয়া সভয়ে ও সাশ্চর্য্যে দাঁড় টানিয়া উহাহইতে দূরে পলাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

যাত্রীরা উহাহইতে দূরে চলিয়া যাইবার সময়ে সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা ও আশা করিতে লাগিলেন যে, উহা যেন আর না ডোবে, তাঁহারা সকালেও যেন উহাকে দেখিতে পান। কিন্তু টাইটানিক ক্রমে ক্রমে জলে নামিয়া যাইতে লাগিল। উহার মাথার দিক্‌টাই আগে ডুবিতে লাগিল। ঐরূপে ডুবিতে ডুবিতে উহার পিছনদিক্‌টা উপরে উঠিয়া পড়িল এবং উহার মাথার দিক্‌টা একেবারে জলমগ্ন হইল। বরাবর আলো জ্বলিতেছিল, কিন্তু এইবার একবার নিবিয়া গিয়া আবার জ্বলিয়া উঠিয়া, একেবারে নিবিয়া গেল। তখন একটা ভয়ানক বিমিশ্র শব্দ উঠিল। কিন্তু জাহাজখানি ঐ অবস্থাতেই নিশ্চলভাবে খাড়া রহিল। এখন উহার পশ্চাৎভাগটিমাত্র প্রত্যক্ষগোচর হইতে লাগিল। উহা ১৫০ ফিট হইবে। পাঁচ-মিনিট কি তাহার অপেক্ষাও কম সময় উহা ঐ অবস্থায় রহিল। তাহার পর, উহার পশ্চাৎভাগটি একটু ডুবিয়া গেল, পরে উহা একেবারে জলতলে বিলুপ্ত হইল। তখন উহাতে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা তুষার-শীতলজলে পড়িয়া যে হাহাকার করিয়া উঠিলেন, সে হাহাকারশব্দ লোকে ভুলিতে পারিলেই তাঁহাদের মন ভাল থাকে! জল যদি না অত শীতল হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের কোমরে জীবন-রক্ষক কোমরবন্ধ ছিল বলিয়া, তাঁহারা কয়েকঘণ্টা বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেন, কিন্তু ঐ সাক্ষাৎ মৃত্যুসদৃশ শীতল জলের নিমিত্ত ৪০ মিনিট পরেই ঐ দুর্ভাগ্য পোতারোহিদিগের সকল জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান হইল! আর কাহারও বিলাপ-ধ্বনি শ্রুত হইল না।

(ক্রমশঃ।)

উচ্চৈঃশ্রবা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

১৮

এইরূপে বসন্তকালটা ধরিয়া, শিকার ও শিকারী—একজন প্রাণের দায়ে, অন্যজন অপরের প্রাণ-বধ করিবার জন্য লুসাই-দেশের নানা পাহাড়ে বেড়াইল। লংলের নিকটহইতে আরম্ভ করিয়া, তুইচাং-নদীর তীর-দিয়া, আইজল-পর্য্যন্ত গেল—আবার নানা পাহাড় ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিল। এইরূপে আড়াইমাস গেল। পথে আর আর ছাগলের দল শিকারীর চথে পড়িয়াছিল, ইচ্ছা করিলে সে অনেক ছাগল, কুকুর ও হরিণ মারিতে পারিত, কিন্তু সেদিকে মটুমটুর ভ্রূক্ষেপ নাই—তাহার চক্ষু কেবল উচ্চৈঃশ্রবার দিকে। যাহারা ময়নার বাচ্চা খুঁজিয়া বেড়ায়, একবার তাহাদের একদলের সঙ্গে মটুমটুর দেখা হইল। তাহারা তাহাকে চিনিত—তাহারা কত কথা বলিল, কিন্তু সে তাহাদের কথা গায়ে মাখিল না—পাঁঠার লক্ষ্যেই চলিল। মধ্যে মধ্যে অন্য ছাগলদলের পায়ের দাগ দেখিলে উচ্চৈঃশ্রবা সেই দাগের উপর-দিয়া যায়, ইচ্ছা, ঐ সকল ছাগলের পায়ের দাগের সঙ্গে নিজের পায়ের দাগ মিশিয়া গেলে, শিকারী গোলে পড়িবে। কখনও বা বেচারা শাদা ফুলময় উলুবন ভাঙ্গিয়া যায়, মনে করে, রাত্রে শিশির পড়িয়া, পায়ের দাগ মিটাইয়া যাইবে, শিকারী আর ঠাওর করিতে পারিবে না। কিন্তু মটুমটু পাকা শিকারী, তাহার সঙ্গে চালাকী খাটে না। আবার এক্ষণে বৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু তেমন কু-আশা হয় না, কাজেই উচ্চৈঃশ্রবার অনুসরণে শিকারীর আর কোন বাধা রহিল না।

উভয়েই চলিতেছে—মধ্যস্থলে বড় জোর তিন-চারি-শত-গজ ব্যবধান। পথকষ্টে, আহারের কষ্টে শিকার ও শিকারী উভয়েই বিলক্ষণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, চেহারা দেখিলে বেশ টের পাওয়া যায়। শিকারীর মাথার প্রায় সব চুল পাকিয়া গিয়াছে, পায়ের বল অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। উচ্চৈঃশ্রবার ঘাড়ের মাংস লোল হইয়াছে, মাথাটা আর তত সোজা হয় না। কারণ ঘাড় বেশ একটু বাঁকিয়া গিয়াছে; অনেকটা বসিয়া গেলেও, চক্ষু-দুইটীর জ্যোতিঃ তাড়নার আরম্ভে যেমন ছিল, তেমনি আছে—আর শিং-দুইটী তেমনি খাড়া, তেমনি তীক্ষ্মাগ্র রহিয়াছে।

সমস্ত রাত্রি মশা ও ডাঁসের যন্ত্রণায় ভাল ঘুম হয় না; তবু শিকারী খুব সকালে উঠিয়া, পাঁঠা যে পথে গিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া, কোন দিন বা খাতপার হইয়া বরাবর উচ্চৈঃশ্রবার, যতটা পারে, কাছে গিয়া পড়িতে চেষ্টা পায়। ইচ্ছা, পাল্লার ভিতরে পাইলেই গুলি করে। কিন্তু শিকারীর অপেক্ষা শিকার কম চালাক নহে। শিকারীর চালাকী বুঝিয়া উচ্চৈঃশ্রবা পা চালাইয়া চলে, এবং ঠিক পাল্লার বাহিরে থাকিয়া চলিতে থাকে। এইরূপে দুইমাস গেল, তিনমাস চলিল। শিকারী ও শিকার অনেক পাহাড়, টিলা, টিকড় ঘুরিয়া আবার লংলে-পাহাড়ের পূর্ব্ব-ঢালুতে আসিল। উচ্চৈঃশ্রবা আগে আগে—কিন্তু পাল্লার বাহিরে—মটুমটু পিছনে পিছনে। এই পাহাড়ে উচ্চৈঃশ্রবার জন্ম হইয়াছিল, এই পাহাড়ে অনেক পথ চলিবার পর, শিকার ও শিকারী, উভয়েই থামিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল—কিন্তু অজরাজ কম হইলেও ছয়শতহাত দূরে—পাল্লার বাহিরে—শিকার এক টিকড়ে, শিকারী অন্য টিকড়ে—শিকার মাটীতে গড়াইল,—কিন্তু চক্ষু শিকারীর দিকে—শিকারী বসিয়া পড়িল। প্রায় তিনমাস হইল, শিকার প্রাণ-রক্ষা করিবার চেষ্টায়, আর শিকারী সে বেচারার প্রাণ-বধ করিবার চেষ্টায় লুসাই-দেশের দশ-বারটা পাহাড়—কম হইলেও পঞ্চাশ-ক্রোশ পথ—হাঁটিয়া বেড়াইয়াছে।

যেখান-হইতে প্রথমে দুইজনে যাত্রা করিয়াছিল, এক্ষণে সেই খানে ফিরিয়া আসিল। আহার-কষ্টে, পথকষ্টে, রাত্রি-জাগরণে শিকার ও শিকারী উভয়েই বিবর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে—শরীরে আর তেমন তেজ নাই, মনে তেমন স্ফূর্ত্তি নাই—কিন্তু মটুমটুর গোঁটুকু তেমনি আছে। শিকারী বিশ্রাম করিতে বসিয়া, বাঁশের চোঙ্গাহইতে দোক্তা-তামাক বাহির করিয়া মুখে দিল। পাঁঠাটা উঠিয়া ঘাস ও লতাপাতা খাইতে লাগিয়া গেল। কিন্তু এক-এক-বার মাথা তুলিয়া দেখে, শিকারী কোথায় ও কি করি-তেছে। মটুমটু যতক্ষণ বিশ্রাম করিবে, পাঁঠা ততক্ষণ ঐ টিকড়ে থাকিয়া ঘাস খাইতে থাকিবে। শিকারী এই কয়মাসে তাহা বেশ জানিয়া লইয়াছে। কেননা শত-শত-বার এইরূপ ঘটিয়াছে! আমাদের দেশে একটা কথা আছে, "সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে, গাঁজা খেলে লক্ষ্মী ছাড়ে"। সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে কি না, জানি না; কিন্তু গাঁজা খেলে যে "লক্ষ্মী" ছাড়ে, তা বেশ জানি। আরও বেশ জানি যে, দোক্তা খেলে "লক্ষ্মী"-টক্ষ্মী কেউ ছাড়ে না, কারণ অনেক বাঙ্গালী-গৃহিণী দোক্তা খান, এবং দোক্তার চূর্ণ-দিয়া দাঁত মাজেন। দোক্তা খাওয়াতে লুসাই-শিকারীর বুদ্ধি বাড়িল কিনা, দেখা যাউক।

মটুমটু দোক্তা গালে দিয়া চিবাইল,—একবার এ গালে, আবার ও গালে রাখিয়া রস খাইল। এইরূপ করিতে করিতে, আইনের কেতাব নাড়া-চাড়া করিলে, যেমন উকিলের বুদ্ধি খুলিয়া যায়, তেমনি লুসাই শিকারীর বুদ্ধি খুলিয়া গেল। সে কোমরহইতে ভুজালী বাহির করিয়া, কতকগুলি ডালপালা কাটিয়া জড় করিল।

উচ্চৈঃশ্রবা দূর-হইতে এ সব দেখিতে লাগিল। মটুমটু এইগুলি, ও আর কতকগুলি পাতর টিকড়ের একধারে সাজাইল, সাজাইয়া নিজের খেস ও আর আর কাপড়-দিয়া এমন করিয়া ঢাকিল, দূরহইতে দেখিলে, বোধ হইবে যেন একটা মানুষ—শিকারী নিজে—খেস মুড়ি-দিয়া শুইয়া আছে। অনন্তর এইটার একপাশে উচ্চৈঃশ্রবার পিছনদিকে খুব নিকটে একটা প্রকাণ্ড খাড়া পাথরের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। পাঠাটা কিছুই টের পাইল না—তাহার বিশ্বাস, শিকারী খেস মুড়ি-দিয়া ঘুমাইতেছে।

ঘাস খাওয়া ছাড়িয়া উচ্চৈঃশ্রবা দাঁড়াইল; ঠিক যেন কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরস্থ পাথরের ষাঁড়, শরীরের গঠন ঠিক হরিণের

মত সুন্দর; শিং-দুইটা আজ যেন দেখিতে বড়ই সুন্দর। পাঠাটা একদৃষ্টে পাথরের উপর শোয়া নকল শিকারীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, আর ভাবিতেছে, ও আমার পিছনে পিছনে না আসিয়া এতক্ষণ শুইয়া রহিয়াছে কেন? এক্ষণে শিকারী যেখানে আসিয়াছে, সে স্থানহইতে পাঠাটা প্রায় তিন-শত-গজ ব্যবহিত। এদিকে শিকারী প্রায় একঘণ্টা হামাগুড়ি দিতে দিতে আবার গিয়া, ধীরে ধীরে টিকড়ের গা বহিয়া নীচে নামিল, উচ্চৈঃশ্রবা কেবল নকল শিকারী শুইয়া আছে, দেখিল; আসল শিকারীকে দেখিতে পাইল না—ফলে এই অবধি সে নকল শিকারীকেই আসল শিকারী মনে করিয়া, প্রাণ ভরিয়া ঘাস খাইতে লাগিল।

পাঁঠাটার ঠিক পিছনে পাথরের ঢিবি, ঢিবির পরেই উলুবন—উলুঘাসে ফুল হইয়াছে, দুরহইতে বোধ হয়, যেন কেহ তুলা শুকাইতে দিয়াছে। মটুমটু মাথায়, গায়ে ফুলসমেত উলুঘাস জড়াইয়া দেখিতে বেশ শাদা হইল। অনন্তর হামাগুড়ি দিয়া দিয়া উচ্চৈঃশ্রবার খাড়া শিংএর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আরও দুই-শত-গজ অগ্রসর হইল। তখনও পাঁঠাটা নকল শিকারীর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া কেবল মাঝে মাঝে অধীর হইয়া পা-দিয়া মাটি আঁচড়াইতেছিল। একবার সে ব্যস্তভাবে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু পিছন-দিকে যে পাথরের ঢিবি ছিল, শিকারী তাহারই আড়ালে থাকাতে উচ্চৈঃশ্রবা তাহাকে দেখিতে পাইল না। পাইলে, বন্দুকের পাল্লার ভিতরে থাকিলেও, বেচারা পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিত। শিকারী ঢিবির আড়ালে আড়ালে হামাগুড়ি দিতে দিতে খুব কাছে আসিয়া পড়িল। সে উচ্চৈঃশ্রবার গণ্ডারবৎ বক্র-গ্রীবা, প্রশস্ত স্কন্ধ-দুইটী দেখিতে লাগিল—আহারের কষ্টে অনেকটা ক্ষীণ হইয়া পড়িলেও ঐ গ্রীবা ও কাঁধ শিকারীমাত্রেরই লোভনীয়। শিকারী আরও দেখিল, পাঁঠাটা, মানুষে যেমন করে, তেমনি করিয়া নাক-দিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস টানিতে ও ফেলিতেছে, সূর্য্যের তেজে পাঁঠাটার ঘাড়ের লোমগুলি ঝকমক করিতেছে। এ সকল দেখিয়াও, একই ঈশ্বরের সৃষ্ট সহপ্রাণী বলিয়া পাঁঠাটার প্রতি তাহার দয়া-মায়া হইল না—বরং লোভ হইল। সে আস্তে আস্তে বন্দুক তুলিল।

হে পবন, এই বেলা ঝড় বহাও, কু-আশা ঢালিয়া দেও, সমস্ত ঘোর অন্ধকার হইয়া পড়ুক। তাহা হইলে এই প্রাণীর প্রাণ বাঁচিয়া যায়। পবন, তোমার কি আর আগেকার মত বলবিক্রম নাই? নদীর চড়াতে কি আর বালির রাশি নাই? এক-দমকা ঝড় তুলিয়া বালি উড়াইয়া দেও, কু-আশা ঢালিয়া দেও—দিয়া উচ্চৈঃশ্রবার প্রাণ বাঁচাও, এমন যে সুন্দর, সাহসী, পরোপকারী প্রাণী, সে কি আজ এই নিষ্ঠুর, হিংস্র দ্বিপদ প্রাণীর হাতে প্রাণ হারাইবে? আজ প্রায় তিনমাস হইল—ইহার মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবার একটাও ভুল হয় নাই, আজ আহারে ব্যস্ত থাকিয়া একটা ভুল করিয়াছে—নকলকে আসল বলিয়া ধরিয়াছে—সেই ভুলের ফলে কি বেচারাকে প্রাণ হারাইতে হইবে?

কিন্তু এ দেশে আকাশ আর কখনও এমন নির্ব্বাত, মেঘ ও কু-আশাশূন্য হয় নাই। অন্য দিন, রহিয়া রহিয়া ময়না ডাকে, শ্যামা ডালে বসিয়া গান ধরে, কোকিল কু কু করে, তাহাতে পশুপক্ষী সকল প্রাণীরই অন্যমনস্কতা ঘুচিয়া যায়, আজ যেন এ বনে পাখী নাই; নিষ্ঠুর শিকারীর ভয়ে সকলেই যেন বন ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। এখনও উচ্চৈঃশ্রবা একদৃষ্টে সেই নকল শিকারীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে—চখে যেন পলক নাই।

এমন সময়ে শিকারী বন্দুক তুলিল। মটুমটুর লক্ষ্য অব্যর্থ—কিন্তু তাহার হাত একটু কাঁপিল—বোধ হয় যেন ভয়ে কাঁপিল। শিকারীর প্রকৃতিতে নিষ্ঠুরতা ও ভীতি দুই ছিল।

কিন্তু হাত স্থির হইল। শিকারীর মুখ আবার গম্ভীর, দৃষ্টি আবার প্রচণ্ড হইল। বন্দুকের আওয়াজ হইল, কিন্তু সচরাচর যেমন হয়, তেমন হইল না। কেমন যেন বিদ্‌ঘুটে শব্দ হইল, তাই শিকারী মাথা নোওাইল না। দূরে পাথরের উপরে ঢুপ করিয়া কিছু যেন পড়িয়া গেল, পরে দীর্ঘনিশ্বাসের—অন্তিম নিশ্বাসের শব্দ হইল, এ দুই শব্দই শিকারীর কানে আসিল। কিন্তু সে মাথা তুলিয়া কোন দিকে তাকাইল না বা অগ্রসর হইয়া দেখিতেও গেল না। মুহূর্ত্তেক পরে সকলই নিস্তব্ধ হইল। তখন শিকারী ভয়ে ভয়ে মাথা তুলিল। পাঁঠাটা জীয়ন্ত আছে না মারা গিয়াছে?

পাথরের ঢিবির অন্যদিকে কৃষ্ণমিশ্রিত পিঙ্গলবর্ণ এক প্রকাণ্ড পাঁঠা শাদা ফুলময় উলুঘাসের উপর পড়িয়া রহিয়াছে—এ সেই উচ্চৈঃশ্রবা, দেহে প্রাণ নাই, গ্রীবা ও স্কন্ধও শিথিল, কান-দুইটীও হেলিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শিং-দুইটী যেমন, তেমনই রহিয়াছে—একটুও হেলে নাই। এই শিংএ উচ্চৈঃশ্রবার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা বিধাতা যেন স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন। উচ্চৈঃশ্রবার বয়স পনের বৎসর। শৃঙ্গ-দুইটী বড়ই সুন্দর। এই শৃঙ্গদ্বারা বাল্য-কালে কত লড়াই করিয়াছে। কতবার জিতিয়াছে—শৃঙ্গে সে সময়কার আংটীপানা দাগ আছে। পরে সুখ-দুঃখের কত বৎসর গিয়াছে—সে সকলেরও চিহ্ন শৃঙ্গে আছে। একবার ভারী পীড়া হইয়াছিল, সে বৎসর শিং ভাল বাড়ে নাই—যেটুকু বাড়িয়াছিল, সেটুকু সরু—সে চিহ্ন শিংএ অঙ্কিত আছে। পঞ্চম-বৎসরে যখন, তখন প্রণয়-ব্যাপারে হাতে খড়ি—প্রতিবাদীর সঙ্গে যুদ্ধ—সে বৎসর শিং বেশ বাড়িয়াছিল; পঞ্চম-বৎসরের চক্রাকার দাগটী বেশ স্পষ্ট। এই দাগের কাছে তখন শৃঙ্গের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ। তখন অনেক বন্য কুকুরকে এই তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের আঘাতে রসাতলে যাইতে হইয়াছিল। ফলে এই শিংদ্বারা উচ্চৈঃশ্রবা স্বজাতির বিস্তর উপকার করিয়াছে—আজ কি না দেখিতে সুন্দর বলিয়া শিংএর জন্য অকালে বেচারার প্রাণ গেল!

মটুমটু ধীরে ধীরে গিয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল—কি দেখিতে লাগিল? উচ্চৈঃশ্রবার সুন্দর শৃঙ্গ—যে শৃঙ্গ এত কষ্টে আজ লাভ হইল, সেই শৃঙ্গ? না। লুসাই-শিকারীর দৃষ্টি উচ্চৈঃশ্রবার স্থির, স্বর্ণবর্ণ চক্ষুদুইটীর দিকে—দেহে প্রাণ নাই, কিন্তু চক্ষু-দুইটী অমুদ্রিত—আর প্রাণ থাকিতে যেমন উজ্জ্বল, তেমনি উজ্জ্বল। শিকারীর দেহে প্রাণ আছে বটে, কিন্তু সে বড়ই ক্লান্ত প্রাণ। কেন যে ক্লান্ত, তা জানে না। বহু কষ্টে—তিন-তিন-মাস পরিশ্রমের পর, বড় সাধের ফল-লাভ হইয়াছে—শরীর তাই নিতান্ত অবসন্ন। সে মৃত উচ্চৈঃশ্রবাহইতে একটু দূরে গাছতলায় বসিল, কিন্তু পিছন ফিরিয়া বসিল।

ক্রমশঃ।

লর্ড ও লেডি হার্ডিঞ্জ।

"এঞ্জিনিয়ারিং।"

প্রিয় বৎস,

তোমার শেষ-পত্রে তুমি এঞ্জিনিয়ার হইবার বাসনা-প্রকাশ করিয়াছ—ভাল কথা। তুমি যে বৃত্তিটি মনোনীত করিতে চাহ, তাহাতে তোমার সাফল্য-লাভের সবিশেষ সম্ভাবনা আছে। তুমি বলবান্ ও ব্যায়ামানুরাগী, তোমার দৃষ্টি-শক্তি ভাল, তোমার প্রকৃতি ধীরা এবং তুমি সমুদয় পুরুষোচিত খেলা ভালবাস। এঞ্জিনিয়ারিংএ সফলতা-লাভ করিতে হইলে, ঐ কয়টী গুণ থাকাই একান্ত আবশ্যক।

তোমার বুদ্ধিও প্রখরা, তাহা-ছাড়া এঞ্জিনিয়ারিংএ সফলকাম হইতে হইলে, যে গুণটির সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন হয়, সেই কাণ্ডজ্ঞান বা সহজ-বুদ্ধিও তোমার আছে।

তুমি লিখিয়াছ, তুমি "সিভিল এঞ্জিনিয়ার" হইতে চাহ। তুমি হয়ত শুনিয়া থাকিবে যে, বর্ত্তমানে "ইলেকট্রীক্যাল্" বা "মাইনিং" এঞ্জিনিয়ারের কার্য্য এদেশে অনেক পাওয়া যাইতেছে, এবং এই দুইপ্রকার "এঞ্জিনিয়ারিং" শিখিবার জন্য দেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে হয় না।

প্রথমে বৎসর-দুই কোন "এঞ্জিনিয়ারিং-কলেজে" এঞ্জিনিয়ারিং-এর সাধারণ মূলতত্ত্বাবলী-অধ্যয়ন করিয়া লইলে, তুমি এঞ্জিনিয়ারিং-এর চারিটি শাখার মধ্যে কোন্ শাখাটি মনোনীত করিবে, তাহা যথোচিতরূপে স্থির করিবার এবং অবশিষ্ট তিনবৎসরের মধ্যে সেই শাখার বিশিষ্ট জ্ঞান বা ব্যুৎপত্তি-লাভেরও সবিশেষ যোগ্য হইবে।

এঞ্জিনিয়ারিং-কলেজে প্রবেশ করিতে হইলে, প্রথমে তোমাকে "ম্যাট্রিকিউলেশন্"-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে; আমি জানি, তুমি এখন তজ্জন্য কঠিন পরিশ্রম করিতেছ, এবং আগামী মার্চ্চ-মাসে ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার তোমার খুব সম্ভাবনা আছে। তোমার বয়স তখন ষোলবৎসর হইবে, সুতরাং পরীক্ষার ফল বাহির হইলেই, তুমি—কলেজের অধ্যক্ষের কাছে "শিক্ষানবীশ-বিভাগে" ভর্ত্তি হইবার জন্য যে নিয়মাবলী মুদ্রিত আছে, তাহার একখানি অনুলিপি চাহিয়া পাঠাইবে; উহা পাইলে, মনোযোগপূর্ব্বক পড়িয়া আবেদন-পত্রের 'ফার্ম'খানির শূন্য স্থলগুলি পূর্ণ করিবে। উহার সঙ্গে তুমি ম্যাট্রিকিউলেশন্-পরীক্ষায় কোন্ বিষয়ে কত "নম্বর" পাইয়াছ, তাহাও লিখিতে ভুলিও না। ফার্মখানির শূন্য স্থলগুলি তোমাকে যে বেশ পরিষ্কৃত ও নির্ভুলভাবে পূর্ণ করিতে এবং তাহাতে যাহা যাহা লিখিবে, সে সম্বন্ধে যে, তোমাকে খুব সাবধান হইতে হইবে, তাহা তোমাকে বলাই বাহুল্য। ঐরূপ করিলে, তোমার মনোনীত হইবার সম্ভাবনা অধিক হইবে।

তুমি জান, আমার অবস্থা এমন যে, আমি যতদূর সম্ভব পরিমিত-ভাবে ব্যয় করিলেও, তোমার বিদ্যালয়ের বেতনটুকুছাড়া আর কিছুই দিয়া উঠিতে পারিব না; সুতরাং তুমি যদি কম-মাহিয়ানায় ভর্ত্তি হইতে পার, তাহা হইলেই তোমার সেখানকার সকল ব্যয়-সংকুলান আমার পক্ষে বরং সম্ভবপর হইবে। অতএব, এঞ্জিনিয়ারিং-কলেজে ভর্ত্তি হইয়াই তুমি একখানি কম-মাহিয়ানায় পড়িবার দরখাস্ত-পত্রের

'ফার্ম' চাহিয়া লইবে। উহার শূন্যাংশগুলি সযত্নে লিখিয়া পূর্ণ করিয়া, পরিষ্কৃতভাবে ভাঁজ করিয়া একখানি খামে পুরিয়া কলেজের অধ্যক্ষের কাছে পেশ করিবে। সৌভাগ্যক্রমে যদি তুমি ন্যূন-বেতনে পড়িবার অনুগ্রহ-লাভ কর, তাহা হইলে আমার মাসে দশটাকা করিয়া খরচ বাঁচিয়া যাইবে, এবং যদি তুমি ম্যাট্রিকিউলেশনে উচ্চ-স্থানাধিকার করার নিমিত্ত বৃত্তি পাও, তাহা হইলে তোমার নিমিত্ত আমার একপয়সাও খরচ হইবে না। বদান্য

গবর্ণমেণ্টের অধীন কর্ম্মচারীর মেধাবী সুপুত্র এমনই সকল অনুগ্রহ-লাভ করিতে পারে।

কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, যদি তুমি ন্যূন-বেতনে পড়িতে বা বৃত্তি না পাও, তাহা হইলে শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং-কলেজে তোমার পুস্তকাবলী, যন্ত্রাদি, লিখন-সামগ্রী, কাপড়-কাচাই, বেতন, আহার, বাতি, "ক্লাবের ফিঃ" ইত্যাদির বাবদ আমার বৎসরে ৩৫০৲ সাড়ে-তিনশত টাকা করিয়া খরচ হইবে।

সাকল্যে তোমাকে সেখানে পাঁচবৎসর পড়িতে হইবে। দুই-বৎসর পড়ার পর, তুমি তোমার ঈপ্সিত বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি-লাভের চেষ্টা করিতে পার।

যে বিষয়ে তুমি ব্যুৎপন্ন হইতে চাহ, সর্ব্বদা সে বিষয়সংক্রান্ত তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা করিবে। ছুটীতে বাড়ী আসিলে, সকল স্থানে ঘুরিয়া তোমার শিক্ষণীয় বিভাগের কাজ দেখিয়া বেড়াইবে,—মন্তব্য-পুস্তকে বিশদ্‌ভাবে মন্তব্য লিখিয়া ও নক্সা আঁকিয়া লইবে।

তুমি দেখিতে পাইবে, ভবিষ্যতে ঐ মন্তব্য ও নক্সাগুলি তোমার বড় কাজে লাগিতেছে—ফলে বক্তৃতা বুঝিবার পক্ষেও ঐ দুইটি বস্তু অল্প হিতকর হইবে না। মাল-মস্‌লার দাম, কুলী-মজুরদের রোজ, এবং অন্য অন্য আবশ্যক তথ্যসংগ্রহ করিবে। এক-কথায় বলি, যে কার্য্যকে তুমি তোমার উপজীবিকা করিতে উদ্যত হইয়াছ, সে কার্য্য অবহেলার সহিত শিখিলে, চলিবে না, চারিদিকে চোখ রাখিয়া মনঃ-প্রাণ ঢালিয়া দিয়া কাজটি শিখিতে হইবে।

কলেজে অধ্যয়ন-কালে যদি তুমি পরীক্ষাগুলিতে প্রতিবৎসরই ভাল করিয়া উত্তীর্ণ হইতে পার, তাহা হইলে তুমি একটী বৃত্তি

পাইয়া ইংলণ্ডে গিয়া অতিরিক্ত জ্ঞান-সঞ্চয় করিতে পারিবে। ঐ বৃত্তি দুইবৎসরযাবৎ ভোগ্য, উহা পাইলে, তুমি বৎসরে ২৪০০৲—৩২০০৲ টাকা পাইতে পার।

তোমার মেজদাদার বয়স এখন ১৭বৎসর হইয়াছে, সে ম্যাট্রি-কিউলেশন্ দেয় নাই, আগামী বৎসরে "বি"-শ্রেণীর পরীক্ষা দিবে; যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলে এঞ্জিনিয়ারিং-কলেজের দ্বিতীয়-বার্ষিক-শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবে। তাহার পর, সেখানে তাহার শিক্ষা ও বেতন-বিষয়ে তোমার সহিত কোনই পার্থক্য থাকিবে না।

তুমি জান, তোমার বড়দাদা "—টেক্‌নিক্যাল্ স্কুল"হইতে ওভারশিয়ারী পাশ করিয়াছে, সে এখন "মেকানিক্যাল্ এঞ্জিনিয়ার" হইতে চাহে; তাহার বয়স এখন ১৮ বৎসর।

তুমিও তোমার দাদাদের মত করিয়া এঞ্জিনিয়ারিং-কলেজে ঢুকিতে পার বটে, কিন্তু তুমি এখন ম্যাট্রিকিউলেশন্ পড়িতেছ, তাহাছাড়া তোমার বয়সও তত বেশী হয় নাই, সুতরাং তুমি এঞ্জিনিয়ারিং-কলেজে গোড়াহইতে পড়িলেও, ক্ষতি নাই।

পাশ হইলে, তোমরা সকলেই আশীটাকা-বেতনে কর্ম্মারম্ভ করিয়া আটশতটাকা পর্য্যন্ত পাইতে পার। আমার এক বন্ধু এখন মাসে নয়শতটাকা বেতনও পাইতেছেন। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী পিতা।

-:*:-

ক্রিকেট্।

আম্পায়ারগিরি

যাহারা ক্রিকেট্ খেলে, তাহাদের, কিরূপে আম্পায়ারী করা উচিত, ইহা জানা দরকার। হয়ত ম্যাচ্ খেলিবার সময় লোকে হঠাৎ তোমাকে আম্পায়ার হইতে বলিবে, তখন আম্পায়ারী করিতে হইলে যে জ্ঞান ও অভ্যাস প্রয়োজনীয়, তাহার অভাবে তুমি মহামুস্কিলে পড়িবে।

আম্পায়ারগিরি কোনমতে সহজ কাজ নহে, এবং প্রায়ই দেখা যায়, এ কাজে যাহাদের অভ্যাস হয় নাই, তাহারা নিজেরা কষ্ট পায়, অন্যান্য লোককেও বিরক্ত করে।

আম্পায়ারী করিতে হইলে, ক্রিকেটের নিয়মাবলী যে ভাল করিয়া জানা দরকার, তাহা বলা বাহুল্য; কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায়, যাহারা আম্পায়ারী করে, তাহারা খেলাটির নিয়মাবলী প্রায় কিছুই জানে না। এইজন্য আমরা "বালকের" পাঠকগণকে এই পরামর্শ দিতেছি, তোমরা যদি ক্রিকেট্ খেল কিম্বা এই খেলাটি দেখিতে চাও, তবে ইহার নিয়মাবলী বেশ মনদিয়া পড়িবে।

বঙ্গদেশে দেখা যায়, ভাল আম্পায়ারদের অভাবে যাহাকে-তাহাকে আম্পায়ার করা হয়; এইপ্রকার বিশৃঙ্খলা সর্ব্বপ্রকার বিবাদ্‌বিসংবাদের কারণ হয়। আম্পায়ারের মতি স্থির রাখা চাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভয়ানক রৌদ্রে পীড়িত হইতে হইতে এই কার্য্যে নিবিষ্ট থাকা সহজ কথা নহে, কাজেই আম্পায়ারের ধৈর্য্যশীল ও স্থির-মতি হওয়া আবশ্যক। তাহাছাড়া তাহাকে সর্ব্বদাই বলটি নজরে রাখিতে হইবে; এই কাজটি ভাল করিয়া করিতে হইলে, আম্পায়ার ঘুমাইবার বা এদিক্-ওদিক্ ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিবার বেশী সুযোগ পাইবে না। অনেক সময় দেখা যায়, যে আম্পায়ার শর্ট-লেগের কাছে দাঁড়াইয়া আছে, সে সুযোগ বুঝিয়া একটু তন্দ্রা যায়, কাজেই উইকেট্-কিপার হঠাৎ তাহার কাছে আপিল করিলে, সে ইতস্ততঃ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুতেই স্থির করিয়া উঠিতে পারে না। সংক্ষেপে বলি, এই কাজটী মনদিয়া করা অত্যাবশ্যক।

চাররকম আপিলের নিষ্পত্তি আম্পায়ারের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন :—

(ক) উইকেট্-কিপারের বলটী ক্যাচ্ করার সম্বন্ধে আপিল।

(খ) ব্যাট্‌স্‌ম্যানকে ষ্টাম্প্ করার বিষয়ক আপিলসকল।

(গ) এল্, বি, ডব্‌লিউ।

(ঘ) ফিল্‌ডার যখন হাত মুঠার খুব কাছে রাখিয়া বলটী ধরে, তখনকার আপিল।

অন্যান্য বিষয়ের মীমাংসা করা তত কঠিন নহে।

(ক) উইকেট্-কিপার যখন বলটি ধরিয়া আপিল করে, তখন আম্পায়ারের দুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার মীমাংসা করা উচিত; (১) বলটি ব্যাটের পাশদিয়া যাইবার সময়ে এদিক্ বা ওদিক্ একটু সরিয়া পড়িল কি না, ইহা একবার দেখা দরকার; (২) সেই সময়ে শব্দ হইল কি না, ইহাও দেখা দরকার। আম্পায়ার যদি নিশ্চয় করিয়া জানিয়া থাকে যে, এদিকে বলটী একটু সরিয়া গিয়াছে, এবং অন্যদিকে শব্দ হইয়াছে, তাহা হইলে সে ইতস্ততঃ না করিয়া আপিল গ্রাহ্য করিতে পারিবে। পক্ষান্তরে, তাহার মনে লেশমাত্র সন্দেহ থাকিলে, সে "নট আউট্" বলিবে। এ বিষয়ে খুব মনোনিবেশ করা দরকার।

(খ) ষ্টাম্পিং। এই বিষয়েও দুইটা কথা মনে রাখা আবশ্যক; (১) ব্যাট্‌স্‌ম্যানের দেহ বা ব্যাটের কোন অংশ 'ক্রিযের' ভিতরে না থাকিলে, সে আউট্ হয়। তাহার পা বা ব্যাট্ কেবল লাইনের উপরেই থাকিলে, চলিবে না। অনেক ক্রিকেটার এই

বিধিটী জানে না। আম্পায়ার "আউট্" বলিলে পর, তাহারা যার-পর-নাই বিরক্ত হইয়া তাহাদের বন্ধু-বান্ধবের কাছে ফিরিয়া আসিয়া এপ্রকার কথা বলে, "আমার পা ঠিক লাইনের উপরেই ছিল; আমি কোনমতে আউট হই নাই; আম্পায়ার অন্যায় করিয়াছে।"
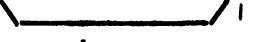
তোমাকে আম্পায়ারী করিতে হইলে, তুমি সর্ব্বদা এ কথাটী মনে রাখিবে যে, ব্যাট্স্ম্যানের পা বা ব্যাট্ লাইনের উপরেই থাকিলে, চলিবে না। (২) দ্বিতীয় কথা হইতেছে এই যে, উইকেট্-কিপার যদি উইকেটের সাম্‌নে হাত বাড়াইয়া বলটি ধরিয়া ষ্টাম্প্ করে, তাহা হইলে ব্যাট্স্ম্যান্ আউট হয় না। উইকেট্-কিপার যাহাতে ব্যাট্স্ম্যানকে ষ্টাম্প্ করিয়া আউট করিতে পারে, এইজন্য বলটি আগে উইকেট্-অতিক্রম করা আবশ্যক। বলটি উইকেটের পাশদিয়া যাইতে না যাইতেই তাহা ধরিয়া ব্যাট্স্ম্যানকে ষ্টাম্প্ করা নিষিদ্ধ। উইকেট্-কিপারের কেবল যে উইকেটের সাম্‌নে হাত বাড়ান নিষিদ্ধ, তাহা নয়; তাহার মুখ, টুপী, পা প্রভৃতিও উইকেটের পিছনদিকে রাখা চাই, নতুবা সে ষ্টাম্প করিয়া ব্যাট্স্ম্যানকে আউট করিতে পারিবে না। আম্পায়ারের এই বিধির কথা মনে রাখা দরকার।

(গ) এল্. বি, ডব্লিউ। এই বিষয়ে আপিল হইলে, আম্পায়ার বড় মুশ্‌কিলে পড়িতে পারে; ইহার মীমাংসা করা অনেক সময়ে বড়ই কঠিন হয়। তাহাছাড়া ব্যাট্স্ম্যান এইরূপে আউট হইয়া প্রায়ই বিরক্ত হয় এবং সময়ে সময়ে আম্পায়ারকে গালাগালিও করে। ব্যাট্স্ম্যান যাহাতে এল্, বি, ডব্লিউ হয়, এজন্য বলটি ঠিক উইকেটের সম্মুখে পিচ্ করা চাই; যদি তাহা একটু এদিক্-ওদিকে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাট্স্ম্যান আউট হইতে পারে না। কিন্তু এস্থানে আম্পায়ারের মীমাংসার্থে একটী গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হয়, যে বলটি ঠিক উইকেটের দিকে ফেলা হইয়াছে, তাহা যদি ব্যাট্স্ম্যানের দেহে না লাগিত, তাহা হইলে কি উইকেটে আঘাত করিত? এমন অনেক বল আছে, যাহা ঠিক উইকেটের দিকে দেওয়া হইলেও কোনমতে তাহাতে আঘাত করিবে না; কোন কোন বল উইকেটের উপরদিয়া ছুটিয়া যাইবে, আবার কোন কোন বল একটু বাঁকিয়া গিয়া তাহার পাশদিয়া চলিয়া যাইবে। অতএব বলটি ব্যাট্স্ম্যানের পায়ে লাগিবার সময়ে উঠিয়া যাইতেছে না নামিয়া পড়িতেছে, এবং তাহা বাঁকিয়া যাইতেছে কি না, এ বিষয় আম্পায়ারের বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা দরকার। এ বিষয়ে আর একটী কথা স্মরণে রাখা আবশ্যক, কেবল পায়ে নয়, ব্যাট্স্ম্যানের হাতছাড়া শরীরের অন্য কোন অঙ্গেই বলটি লাগিলে, ব্যাট্স্ম্যান আউট হইতে পারে। কিন্তু বলটি তাহার শরীরের কোন অংশে লাগিবার পুর্ব্বে ব্যাটে আঘাত করিলে, সে আউট হইতে পারে না। আম্পায়ারের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ হইলেই, সে ব্যাট্স্ম্যানের অনুকূলে মত দিবে।

(ঘ) ফিল্ডার যখন হাত মাটীর খুব কাছে রাখিয়া বলটি ধরে, তখন ব্যাট্স্ম্যান আউট হইয়াছে কি না, তাহা স্থির করা অনেক সময়ে খুব কঠিন হয়। ফিল্ডারের হাত জমী স্পর্শ করুক বা না করুক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না, বলটি জমীতে না লাগিলেই, ব্যাট্স্ম্যান আউট হয়। কিন্তু ফিল্ডার যদি বল ধরিয়াই তাহা জমীতে লাগাইয়া দেয়, তাহা হইলে ব্যাট্স্ম্যান আউট হইল কি না, তাহা আম্পায়ার বিবেচনা করিয়া স্থির করিবেন।

ক্যাচ্ করার সম্বন্ধে আর একটী কথা স্মরণ করা দরকার; বলটি যদি ব্যাট্স্ম্যানের হাত বা অঙ্গুলিতে লাগিয়া ফিল্ডারের হাতে বরাবর ছুটিয়া যায়, তাহা হইলে সে আউট হয়, পক্ষান্তরে তাহা কব্জি বা বাহুতে লাগিলে, ব্যাট্স্ম্যান আউট হয় না।

রাণ-আউট।—সচরাচর ব্যাট্স্ম্যান রাণ-আউট হইয়াছে কি না, ইহার নিষ্পত্তি করা তত কঠিন নহে। তাহার ব্যাট্ কিম্বা দেহের কোন অংশ ক্রিষের ভিতরের জমিতে পড়িলে, সে আউট হয় না, কিন্তু তাহা জমিতে না লাগিলে, নয়। অনেক ছেলে ইহা বুঝিতে না পারিয়া ব্যাট্ উঁচু করিয়া রাণ করে; তাহাদের ব্যাট্ জমিতে লাগিল না বলিয়া, তাহারা রাণ-আউট হয়।

নো-বল।—বল দিবার সময়ে বোলারের পিছনের পা যদি ক্রিষ-স্পর্শ করে, তাহা হইলে নো-বোল হয়। বোলিং-ক্রিষের পিছনের জমিতে একটি পা ছুঁইয়া না থাকিলে, চলিবে না। লাইন ছুঁইলে কিম্বা পা উঁচু রাখিয়া বল দিলে, নয়। বোলিং-ক্রিষটা ঠিক করিয়া আঁকা চাই; অনেক সময়ে দেখা যায়, মালী-মহাশয় নিজ খেয়ালক্রমে বোলিং-ক্রিষটা এইরূপে প্রস্তুত করেন __________/। ইহা ঠিক নহে, উহা এইরূপ হওয়া দরকার |__________|। বোলার যদি ঐ দুইটি ছোট লাইনের ভিতরে পা না রাখিয়া বল দেয়, তাহা হইলে আম্পায়ার "নো-বল" বলিবে।

পিচ্ ঠিক ২২ গজ লম্বা কি না, আম্পায়ারকে তাহাও দেখিতে হইবে।

ওয়াইড্।—যে কোন বল ব্যাট্স্ম্যানের আয়ত্তের মধ্যে নহে, তাহাকে ওয়াইড্ বলে। এ বিষয়ের বিচার ও নিষ্পত্তি করা তত কঠিন হইবে না। কেবল মনে রাখা চাই, যে বলটি ব্যাট্স্ম্যানের মাথার উপরদিয়া উড়িয়া যায়, তাহা ওয়াইড্ হইতে পারে।

আম্পায়ার-নির্ব্বাচন।—সচরাচর উভয় দলই আম্পায়ারকে নিযুক্ত করে। তৎসম্বন্ধে ছেলেদের একটী কথা মনে রাখা দরকার, তুমি নিজ দলকে সাহায্য করিবার জন্য নয়, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার জন্যই আম্পায়ারস্বরূপে নিযুক্ত হইয়াছ। দুঃখের বিষয়, অনেকে এ প্রয়োজনীয় কথা একেবারে ভুলিয়া যায়, কাজেই তাহারা নিরপেক্ষভাবে বিচার না করিয়া, যতদূর সম্ভব, নিজেদের দলের দিকে টানিয়া মত দেয়। কাপ্তেন আম্পায়ারী করিবার

জন্য এমন ছেলেকে নিযুক্ত করিবেন, যে স্বদলের জয়ের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবে।

আম্পায়ারের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও উত্তম শ্রবণ-শক্তি থাকা চাই। তাহা-ছাড়া তাহার ইতস্ততঃ না করিয়া অবিলম্বে ও অবিচলিতভাবে আপিলের নিষ্পত্তি করা দরকার, নতুবা খেলোয়াড়েরা বিরক্ত হইবে। দুঃখের বিষয়, আম্পায়ার যাহাতে তাহাদের অনুকূলে মত দেয়, এইজন্য কোন কোন ফিল্ডার নানাপ্রকার কৌশল-অবলম্বন করে। কেহ কেহ খুব জোরে চেঁচাইয়া উঠিয়া আপিল করে; আবার কেহ কেহ আপিল করিবার সময়ে মাথার উপরে হাত তুলে, তাহাদের আশা এই যে, আম্পায়ার তাহাদের চেঁচাচেচি শুনিয়া বা তাহাদের হাত-তোলা দেখিয়া তাহাদের সপক্ষে বিচার-নিষ্পত্তি করিবে। যাহারা এইপ্রকার কুকৌশল-অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহাদের আপিল-সম্বন্ধে আম্পায়ারের একটু সাবধান হওয়া দরকার।

ম্যাচ্-আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দুইজন আম্পায়ার বাউণ্ডারি ঠিক করিয়া লইবে, না করিলে, গোলযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

আম্পায়ারের অবস্থান।—একজন আম্পায়ার বোলারের উইকেটের দুই-তিন গজ পিছনে, এবং অন্যজন স্কোয়ার-লেগে দাঁড়াইবে। যে আম্পায়ার বোলারের কাছে দাঁড়াইয়া আছে, সে সাবধান থাকিবে যেন বোলারের কার্য্যে কোনপ্রকার বাধা না দেয়; এবং ব্যাট্‌স্‌ম্যান যাহাতে বিরক্ত না হয়, এইজন্য তাহাকে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।

আমাদের শেষ কথাটী এই, আম্পায়ারগিরি সহজ ব্যাপার নহে। আম্পায়ারের কার্য্য ভাল করিয়া করার চেয়ে আম্পায়ারকে গালাগালি করা ঢের সহজ। খেলোয়াড় ও দর্শকেরা তাহার কার্য্যের দুরূহতার কথা মনে রাখিয়া তাহার প্রতি শিষ্টাচরণ করিবে। যদিও সে মধ্যে মধ্যে ভুল করিয়া ফেলে, তাহা হইলেও আমাদের তাহাকে গালাগালি দেওয়া উচিত নহে, বরং, যতদূর সম্ভব, তাহার নিষ্পত্তি-সকল সন্তুষ্ট-চিত্তে গ্রাহ্য করাই উচিত।

-:*:

বালিশ-যুদ্ধ।

যুদ্ধ অনেকরকমের আছে, যথা—জলযুদ্ধ, স্থলযুদ্ধ, দ্বৈরথ-যুদ্ধ, গদাযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, বাক্‌যুদ্ধ, বালিশ-যুদ্ধ—

বালিশ-যুদ্ধ? হা, হা, হা,—সে কি?

দুনিয়ার তোমার কিছু জানিলে না, ভায়া, কেবল ঘরের কোণে বসিয়া "Geography is the description of the Earth's surface" মুখস্থ করিয়াই মরিতেছ। তোমাদের মত নাবালকদের কাছে আমার কোন কথা বলাই বেকুবি।"

আহা, বলই না শুনি, অত "মাগ্‌গি" হও কেন?

তবে শোন, তখন আমি "——বোর্ডিং-স্কুলে" পড়ি। বোর্ডিং-এ আমরা ছোট-বড়, কালা-গোরা, ঢেঙা-বেঁটে, ভাল-দুষ্টু তখন পঞ্চাশ-জন জোয়ান থাকি; বাঘ রাতের বেলা শিকারে বাহির হয়, আমরাও, অর্থাৎ বালক-ব্যাঘ্রেরা, রাতের বেলা এক-একদিন এক-একরকম ফন্দী আঁটিতাম।

সেদিন "সুপারী-ঠন্‌ঠন্" তখনও রোঁদে বাহির হইয়া আমাদের ঘরে ঢুঁ মারিয়া যায় নাই। "সাদা সাতকড়ি" বিছানার উপর শুশুক কি করিয়া গঙ্গার জলে উল্টায়, তাহা আমাদের দেখাইতে-ছিল; "বাস্তুঘুঘু" ওরফে জগা তাহার পিছনে তাহার ভারী বালিশদিয়া গদাম্ করিয়া এক-ঘা লাগাইয়া দিল। তাহাতে "দেড় চক্ষু"র (তাহার চোক টেরা ছিল) কি মনে হইল, সে বাস্তু-ঘুঘুকে তাহার বালিশ ছুড়িয়া মারিল, তখন বালিশ-মারামারি করাটা

বড়ই ছোঁয়াচে হইয়া পড়িল; বনে একটা শিয়াল "হুয়া" করিলেই, যেমন সকল শিয়ালই "হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া" করিয়া উঠে, তেমনি আমাদের ওখানকার সব "মিঞার"'ই হাত চুলকাইতে লাগিল, সকলেই—মণে ফণেকে, ভোঁদা হাঁদাকে, গুপে উপেকে গদাগদ্ বালিশ-পেটা করিতে লাগিল। কিন্তু—

"যেখানে বাঘের ভয়,
সেখানেই সন্ধ্যে হয়"

এ হেন সময়ে "স্থ"-মহাশয় দর্শন দিলেন। বলিলেন,—"কি হচ্ছিল সব?" অনেক বালিশের ভুঁড়ী-ফাটা তুলায় ঘর নৈরাকার, আমাদের কসুর কবুল করিতে হইল।

মিঃ "স্থ" চিবাইয়া বলিলেন,—"তা' বেশ, বঙ্গবীরেরা বাক্‌যুদ্ধ ছেড়ে বালিশ-যুদ্ধ-আরম্ভ করেছেন—এ উন্নতিই বল্‌তে হবে। তবে আজ আর এ উন্নতির অবকাশ দেওয়া সঙ্গত মনে কর্‌ছিনে, কাল ঘুমোবার আগে আধঘণ্টাটাক্ তোমাদের এই বালিশ-যুদ্ধ করবার অনুমতি দেওয়া গেল; কিন্তু আজ যদি আর কারু মুখে "টুঁ"-শব্দ শুনি, তা' হ'লে তা'রই একদিন, কি আমারই একদিন।" এই বলিয়া তিনি মোচা গোঁফের ভিতর একটু হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। হায়, তখন যদি সে হাসির মানে বুঝিতাম!

তাহার পর, আমাদের বোর্ডিংএর দুই সর্দার রাধিকা ও হর্ষ কালকের লড়াইয়ের জন্য চুপি চুপি লোক বাছিতে লাগিল। "ডাক ডাক কিস্‌কেরি ডাক?"—"মেরি ডাক।" চুপে চুপে বেশ চলিতেছিল। রাধিকা গোল বাধাইল, সে অন্যায় করিয়া বড় ছেলেগুলাকে নিজের দলে লইতে লাগিল। ইহাতে হর্ষ ভারি চটিয়া গেল, বলিল,—"তুই জুচ্চুরি করে বড় বড় ছেলে-গুলোকে নিজের দলে টেনে নিচ্ছিস্। বা রে, তবে আমি কি ঘাস কাট্‌বো না কি?

রাধিকা—বড় ছেলে বড় দিকে আস্‌বেই ত!

হর্ষ—বড় দিক্ মানে?

রাধিকা—যে দিক্ জিত্‌বে।

হর্ষ—ইস্ তাইত রে! "গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল!"

রাধিকা—আমি কাঁঠাল চাই না, মরদবাচ্ছা চাই।

হর্ষ—আচ্ছা, আয় দেখি, তুই মরদ-বাচ্ছা কি আমি মরদ-বাচ্ছা। এই বলিয়া হর্ষ তাহার প্রকাণ্ড বালিশটা উঁচাইল।

রাধিকা—একটা কথা বল্লুম, তাইতেই একেবারে গায়ে ফোস্‌কা পড়ে গেল?

হর্ষ—ফোস্‌কা পড়বে না ত কি? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!

রাসবিহারীর লোককে উস্‌কান চিরকেলে রোগ—সে বলিল,—"হাত থাকতে মুখোমুখি কেন? Horse, মার him a চাট্!" রাধিকার পিছনহইতে পঞ্চুই বুঝি বলিল,—"চোপ্‌রাও, রাসভ!"

রাসবিহারীর নাম খাস্ত করাতে সে চটিয়া উঠিয়া বলিল,—"তুম্ চোপ্‌রাও।"

রাধিকার পিছনের ছোক্‌রা বলিল,—"হ'ব না চুপ, কে চুপ করাবে, তুই?"

ইহাতে রাসু তাহার দিকে তাড়িয়া আসিতে গিয়া, একটা ছোক্‌রার ল্যাং লাগিয়া পড়্‌ত পড়্ একেবারে রাধুর ঘাড়ে! আর যায় কোথা? রাধু মনে করিল, রাসু ইচ্ছা করিয়াই তাহার ঘাড়ে পড়িয়াছে, সে রাসুর পিঠে গদাম করিয়া এক-ঘা বালিশের বাড়ি লাগাইয়া দিল।

তখন হর্ষ রাসুর হইয়া রাধুকে উল্টা বালিশ-পেটা করিল। পঞ্চু হর্ষকে বালিশ-দিয়া মারিল; ক্রমশঃ, কেমন করিয়া জানি না, দুইটা দল হইয়া পড়িল। বড় ছোঁড়াগুলো রেধোর দলে, আর আমরা সব ছোট ছোক্‌রা হর্ষের দিকে।

দুই দলে গরম হইয়া বালিশ-পেটা-পিটি করিতে করিতে শোবার ঘরথেকে বাহির হইয়া পড়িয়া আদ্ধেক সিঁড়ি নামিয়া পড়িলাম। লড়াইটা বেড়ে চলিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ 'দাঁড়ি' পড়িয়া গেল।

দেখিলাম, নীচেকার ছোক্‌রারা একটু জড়সড় হইয়া পড়িয়াছে। আমি ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিয়া উঠিলাম,—"লড়াই ফতে"! এমন সময়ে কে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"হাঁ, এই যে গিয়ে তোমাদের লড়াই ফতে করাচ্ছি।"

"এই রে, এ যে দেখ্‌ছি—সুঃ," সকলে একেবারে কাঠের পুতুলের মত খাড়া রহিলাম। তখন, যে যে জানিত, সে সে মনে মনে নিশ্চয়ই আওড়াইতেছিল—

"ক্ষান্ত হও, বীরবর, রণে নাহি প্রয়োজন;
এই দেখ, গুম্ফ মোর করি আমি আনমন!"

মিঃ সুপ্ নাকটা ভেঁপু বাজানর মত ঝাড়িয়া রাধিকাকে ক্যাঁক্ করিয়া পাক্‌ড়াও করিয়া বলিল,—"তোমার হাতে ওটা কি,—বালিশ না?"

রাধিকা নিজের বালিশটার দিকে অবাক্ হইয়া দেখিয়া বলিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

সুঃ। এখনই বালিশ-পেটা-পিটির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল না?

রা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুঃ। আমার মনে হচ্ছে, একটু আগে আমি তোমাদের বলে গিয়েছি যে, তোমরা যদি ইচ্ছা কর তো 'কাল' আধঘণ্টাটাক্ এ বাঁদুরে কাণ্ডটা চালাতে পার। কেমন কি না, আমি এই কথাই ব'লে যাইনি কি, একবার তোমরা অনুগ্রহ করে মনে করে দেখত!

আমরা ভাবিলাম, বোবার শত্রু নাই চুপ করিয়া রহিলাম।

সুঃ। তা'হ'লে, আমি যা বল্‌ছি, সেই কথাই সত্য। তোমাদের এমনি মতিচ্ছন্ন ধরেছিল যে, আমার সে হুকুমটা তামিল করা আবশ্যক মনে করনি। আমি তোমাদের আহ্লাদ দিলে, তোমরা এম্‌নি করেই আমার ভালবাসার পুরস্কার দাও; আজই

বীরমাতুনী জুড়ে দিয়েছিলে। বেশ, ভাল, উত্তম! লড়াই ফতে করছিলে বটে? এই লড়াই ফতে"—

ইতি রাধুপৃষ্ঠে সপাং!

"এই লড়াই ফতে—"

ইতি রামুপৃষ্ঠে আর এক ঘাং,

এবং সে চীৎকার করিয়া চিৎপটাং!

"এই—এই লড়াই ফতেঃ—"

থাক্। আমরা সকলেই "প্রহারেণ ধনঞ্জয়" হইয়া "লেজ গুটাইয়া" শোবার ঘরের দিকে ছুটিয়া চলিলাম। স্থঃ "রুধিরাক্ত রণস্থলের" প্রতি "কোপকষায়িত-লোচনে" দৃষ্টি করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এবার, বোধ হয়, আর কেউ আমার আদেশ অমান্য করাটা তত নিরাপদ্ মনে করবে না?"

কিন্তু যাই বল, ভায়া, ধপাধপ্ ধপাধপ্ আমাদের সে লড়াইটা তোফা চলিয়াছিল!

সেপ্টেম্বর-মাসের পদ্যরচনার প্রতিযোগিতা।

সেপ্টেম্বর-মাসের 'পদ্যরচনার প্রতিযোগিতায়' কেবল শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়-প্রেরিত কবিতাটি প্রকাশোপযোগিনী হইয়াছে। আমরা নিম্নে উহা অবিকল মুদ্রিত করিয়া দিলাম।—"বালক"-সম্পাদক।

অতিলোভের শাস্তি

আলিপুরের চিড়িয়া-খানায় রেলিং-দিয়ে ঘেরা—
খোঁয়াড়-মাঝে মস্ত দুটী গণ্ডার আছে ধরা॥
সারাটা দিন বেড়ায় তারা জলে, কাদায়, রোদে।
(কিন্তু) ভরপেট না খেতে পেয়ে উদর সদা কাঁদে॥
দর্শকেরা ফল-মূলটা দেয় যা' দয়া ক'রে।
সে সব খেয়ে পেট্‌টা তা'দের তবু কতক ভরে॥
একদিন এই খাবার খেতে হ'ল এক মজা।
লোভে পড়ে দুটায় সেদিন পেলে খুব সাজা॥

দয়ালু এক দর্শক এল কলার-ছড়া নিয়ে।
দিলে ফেলে খোঁয়াড়েতে রেলিং-ধারে গিয়ে॥
দুদিক্ থেকে গণ্ডার-দুটো খাবার দেখ্‌তে পেয়ে।
আগে নেবে ব'লে দুটোই এল খুব ধেয়ে॥
খাবার লোভে অন্ধ হ'য়ে আসে তেড়ে ঝুঁকে,
কাছে এসে দুটোর কিন্তু গেল মাথা ঠুঁকে॥
খাবার খাওয়া চুলোয় গেল, মাথার ব্যথায় মরে।
দর্শকেরা হেসে হেসে গেল যে যার ঘরে॥

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়।
বয়স ১৩ বৎসর।
২৬ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

বালক।

১ম বর্ষ।]　　　　ডিসেম্বর, ১৯১২।　　　　[১২শ সংখ্যা

কনানার বল্লম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পরিশ্রান্ত ও অনাহারক্লিষ্ট গ্রীক-সেনাগণ দাঁড়াইয়া রহিল, একপদও অগ্রসর হইল না। রাজপুত্র মানুয়েল রণ-ক্ষেত্রে নাই যে, অগ্রসর হইতে জিদ্ করিবেন। মুসলমান সেনাদলেও কাহ্লেদের কণ্ঠরব শ্রুত হইল না।

এই ভাবে একঘণ্টাকাল গত হইল।

এমন সময়ে, সম্রাট হিরাক্লিয়সের যে সকল সৈন্য পশ্চাদ্দিকে যেখানে ছাউনী করিয়া ছিল, সেখানে মহাহুলুস্থুল পড়িয়া গেল। কেবল চীৎকার রব, ও যুদ্ধাস্ত্রের ঝন্ঝনানি এবং তৎসঙ্গে "লা ইল্লাহা ইল্ আল্লা মহম্মদ রসুল ইল্ আল্লা" এই রব সকল দিকে উঠিল।

দশহাজার অশ্বারোহী ও কুড়ি-হাজার উষ্ট্রারোহী সৈন্য হিরাক্লিয়সের এই বেচারা সেনাদলকে আক্রমণ করিয়াছে। বেচারাদের আত্মরক্ষার শক্তি নাই। কনানা যেমন বলিয়াছিলেন, তেমনি ঘণ্টা-খানিকের মধ্যে ত্রিশসহস্র আরব আসিয়া হিরাক্লিয়সের সেনাদলে পড়িয়া ভয়ানক বিভ্রাট উপস্থিত করিল।

আর একঘণ্টাকাল গত হইল। কাহ্লেদেরও রণনিনাদ থামিল। মুসলমান সেনারা জয়-সূচক আনন্দ-রব তুলিল। মানুয়েল ও তাঁহার সমস্ত সেনানায়ক যুদ্ধে হত হইয়াছেন। হিরাক্লিয়সের এমন যে প্রকাণ্ড সেনাদল, তাহার এককালে লোপ হইল।

কাহ্লেদের ছাউনীতে, শত্রু-পক্ষ-হইতে আনীত টাকা-মোহর-সকল ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। আরবদেশ-রক্ষা হইল।

দেখিতে না দেখিতে সিপাহীরা একমঞ্চে চমৎকার রাজাসন প্রস্তুত করিল, তাহাদের ইচ্ছা, আপনাদের বিজয়ী সেনাপতিকে ঐ আসনে বসাইয়া তাঁহার সম্মানার্থে উৎসব ও আমোদ-আহ্লাদ করে।

বীরশ্রেষ্ঠ কাহ্লেদ্ নিমন্ত্রণ-গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কোন এক ভারী জিনিস দুইহাতে সাপটিয়া ধরিয়া, মাথা হেঁট করিয়া তাম্বুহইতে বাহির হইলেন। ধীরে ধীরে মঞ্চে উঠিয়া, সযত্নে সেই ভারী জিনিসটী রাজাসনের উপর রাখিলেন।

ঐ ভারী জিনিস—কনানার আহত ও প্রাণশূন্য দেহ।

কম্পিত হস্তে কাহ্লেদ্ কনানার দেহের মেষচর্ম্মের জামা তুলিয়া ধরিলেন, তখন সকলেই দেখিতে পাইল যে, বেদুইন-বালকের কোমরে কাহ্লেদের সেই আদরের ধন কোমরবন্ধ রহিয়াছে।

কাহ্লেদ্ গদগদভাবে কহিলেন, "আমি ওকে এই কোমরবন্ধ দিয়াছিলাম। এই কোমরবন্ধের যে সকল টুক্‌রা তোমরা আমাকে আনিয়া দিয়াছ, তাহাতে লিখিয়া কনানা আমাকে সমস্ত সন্ধান

জানাইয়াছিল, তাই আমরা জবাবল ও মানুয়েল্‌কে জয় করিতে পারিয়াছি। আমার উপর এই বল্লম ফেলিতে দেখিয়া তোমরা উহাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়াছিলে, কিন্তু বল্লমের বাঁটে এই টুক্‌রাটুকু বাঁধা ছিল। বেচারা নিজের রক্তে এই টুক্‌রাতে লিখিয়াছে, 'হটিও না। এই নাস্তিকেরা খাইতে না পাইয়া মরিয়া যাইতেছে। আসিয়া ইহাদের পিছনকার ছাউনী-আক্রমণ কর।' এইরূপে বেচারা আমাদের কাছে অবশেষে আসিয়াছে, আসিবার আর ত উপায় ছিল না। এ ত বিশ্বাসঘাতকের কাজ নহে। না, কখন না। এ আর কিছুই নয়,—কনানার বল্লমের দ্বারা আরবদেশের রক্ষা হইয়াছে।"

সম্পূর্ণ।

'টাইটানিক'-ডুবী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সকলেরই মতে টাইটানিক রাত্রি দুইটা বাজিয়া বিশমিনিটের সময় ডুবিয়া গিয়াছিল। উহার পর, আন্দাজ ভোর সাড়ে-তিনটার সময় দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে, বহুদূরে, একটু ক্ষীণালোক ফুটিল। কামান-গর্জ্জনের অস্পষ্ট শব্দও শুনা গেল। তাহার পর, আবার আলোক-টুকু মিলাইয়া গেল। "কার্পেথিয়া"-জাহাজহইতে রকেট ছোড়ার দরুণ ঐ আলোক দেখা গিয়াছিল ও শব্দ হইয়াছিল। যাত্রিগণ, যে দিকে ঐ আলোক ফুটিয়াছিল, সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহারা দেখিলেন, আবার একটী আলোক-রশ্মি ফুটিল, তাহার নীচে আর একটী। কিয়ৎক্ষণ পরে আলোক-রশ্মি দুইটী সম-রেখায় দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন একটী জাহাজ যে আসিতেছে, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারিলেন।

যাত্রীরা মনে করিয়াছিলেন যে, অপরাহ্নের পূর্ব্বে তাঁহাদের কোন জাহাজে উঠিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এক্ষণে যে ভাবে ঐ আলোক-রশ্মি-দুইটী ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইতে লাগিল, তাহাতে সকলেই জানিতে পারিলেন যে, রজনী-প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের উদ্ধার হইবে। তাঁহারা এত শীঘ্র যে বিপদুত্তীর্ণ হইবেন, ইহা সহসা মনে ঠাঁই দিয়া উঠিতে পারিলেন না। কি পুরুষ, কি নারী সকলেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং সকলেই আপন আপন মনে বলিয়া উঠিলেন,—"ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক!" এই কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের সময়ে তারহীন বার্ত্তাবহযন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা মার্কোণির সুখ্যাতি সকলেরই মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল, সকলেই তাঁহার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কারণ, টাইটানিকহইতে ঐ যন্ত্র-সাহায্যে যদি কার্পেথিয়াকে সংবাদ না দেওয়া হইত, তাহা হইলে এই যাত্রীদিগের জীবনরক্ষার আশা সুদূরপরাহত হইত। কেননা একজন কর্ম্মচারী সেই সময়ে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি যে নৌকাটিতে ছিলেন, তাহা আর একঘণ্টার অধিক জলোপরি ভাসিতে পারিত না।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, টাইটানিকের আরও যাত্রীর জীবন-রক্ষা করা যাইত, কিন্তু করা হয় নাই। আরও যাত্রীর যে জীবন-রক্ষা করা যাইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক যাত্রীই এই বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে না পারিয়া পোত-কর্ম্মচারীদিগের আদেশ-পালনে অবহেলা করিয়াছিলেন। অনেকের স্ত্রী তাঁহাদের স্বামীদের সঙ্গত্যাগ করিতে চাহেন নাই। অনেক লোকেরই ধারণা ছিল যে, টাইটানিক ডুবিবার নয়, ঐ জাহাজেই অল্পকাল অপেক্ষা করিলে, অন্য জাহাজ আসিয়া পড়িবে, তখন তাহাতে চড়িলেই হইবে। কাজেই নৌকাগুলিতে কিছু কিছু স্থান থাকা সত্ত্বেও সেগুলিকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। ঐ জাহাজের কোন কোন কর্ম্মচারীরও নাকি এই ধারণা ছিল যে, টাইটানিক অনি-মজ্জনীয় জীবন-তরী! যাহা হউক, যেই টাইটানিক হিমশিলাটার সঙ্গে সংঘৃষ্ট হইয়াছিল, অমনি মার্কোণিগ্রাম-ব্যবহার করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ পোতগুলিকে ঐ বিপদ্‌বার্ত্তা দেওয়া হয়।

অনেকে এই কথা বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা-দের বাছিয়া লওয়াতেও অনেক প্রাণহানি হইয়াছে এবং অনেক স্থলে অনেকের গভীর মর্ম্ম-বেদনার কারণ হইয়াছে।

ঐ পোত-ডুবীহইতে রক্ষিত একটী নৌ-কর্ম্মচারীকে যখন নৌ-বিচারালয়ে এই প্রশ্ন করা হয়,—"স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগকে আগে রক্ষা করাই কি সরকারী নিয়ম?" তখন তিনি উত্তর দিয়া-ছিলেন,—"না, উহা মানব-প্রকৃতির নিয়ম।" এই জন্যই যে ঐ নিয়মটি নৌ-বিভাগে প্রচলিত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, প্রশংসার বিষয় এই যে, যখন টাইটানিকের শোচনীয় পরিণাম-সম্বন্ধে কাহারও মনে আর কোন দ্বিধামাত্র ছিল না, তখনও সেই পোতস্থিত আরোহী বা কর্ম্মচারীরা প্রাণভয়ে অস্থির হইয়া পড়েন নাই। ১৫০০ আরোহী নীরবে নিজ নিজ স্থানে রহিলেন, এবং কর্ম্মচারীরা আপন আপন কর্ত্তব্য করিতে লাগিলেন। তখনও বাদকেরা বাজনা বাজাইয়া সকলের হৃদয় মাতাইতে লাগিলেন। এঞ্জিনিয়ারেরা ডেকহইতে অনেক নীচে বৈদ্যুতিক বাতির কল চালাইতেছিলেন, যতক্ষণ না জাহাজ উল্টাইয়া কল ভাঙিয়া পড়িল, ততক্ষণ তাঁহারা সেইখানেই ছিলেন। আর এঞ্জিন চলিল না বলিয়াই, বাতি নিবিয়া গেল। যখন বুঝা

গিয়াছিল যে, জাহাজখানা আর বাঁচিবে না, ডুবিয়া যাইবেই যাইবে, তখনও অন্ততঃ ডেকের উপর না উঠিয়া পোত-গহ্বরে থাকিয়া শেষপর্য্যন্ত বাতি জ্বালাইয়া রাখিবার চেষ্টার মূলে অপূর্ব্ব-বীরত্বই ব্যক্ত হয়। কিন্তু এই বীরত্বের নাম সেই এঞ্জিনিয়ারদের কাছে বীরত্ব নহে—কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য তাঁহারা জাহাজটির সঙ্গে উল্টাইয়া অতলগর্ভে ডুবিয়া মরিয়া পালন করিয়াছেন!

প্রাগুক্ত পনেরশত যাত্রীর মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তিই প্রাণরক্ষা করিয়া কার্পেথিয়ায় উঠিতে পারিয়াছিলেন। মিঃ লাইটোলার, কর্ণেল গ্রেসি ও কুড়িজন লোক একটা উল্টান নৌকা দেখিয়া তাহা ধরিয়া ঝুলিতে থাকেন, তাহার পর সকাল হইলে তাহাতে উঠিয়া দুইসারিতে পিঠাপিঠি করিয়া দাঁড়ান। তাহাতে যতক্ষণ ছিলেন, তাঁহারা পড়িয়া যাইবার ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; তাহার পর, একটী জীবন-তরী অতিকষ্টে তাঁহাদের উদ্ধার করে। যতক্ষণ তাঁহারা সেই উল্টান নৌকাটাতে দাঁড়াইয়াছিলেন, ততক্ষণ প্রভাতে যেন কোন জাহাজ আসিয়া তাঁহাদের তুলিয়া লয়, তাহার জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন। ভোর-বেলা তাঁহারা কার্পেথিয়ায় নীত হন।

কার্পেথিয়ার কাপ্তেন 'অনিমজ্জনীয় টাইটানিক' ডুবিতেছে, এই খবর পাইয়া যদিও তখন তাঁহার পোত ৫৮ মাইল দূরে ছিল, তথাপি সমস্ত কর্ম্মচারীদের কাজে লাগাইয়া দিলেন, তিনজন ডাক্তার বৈঠকখানা-ঘরে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন, পাচকেরা গরম গরম চা, দুধ ইত্যাদি ও অন্যান্য খাদ্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, অন্য এক-শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা কম্বল ইত্যাদি ঠিক করিতে লাগিলেন এবং কার্পে-থিয়া, যতদূর দ্রুতগতিতে চলিতে পারে, ছুটিয়া আসিতে লাগিল। টাইটানিককে দেখিবার জন্য চারিদিকে লোক রাখা হইল। চারিদিকে হিমশিলা, সুতরাং সেইসব লোকদের সেইগুলির দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইল। ঐ বিপদসঙ্কুল পথদিয়া কার্পেথিয়া যতদূর সম্ভব দ্রুত-গতিতে চলিয়াছিল, ইহার জন্য তাহার কাপ্তেনকে দোষ দেওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ ছিল।

বেলা সাড়ে-আটটার সময় কার্পেথিয়া শেষ নৌকার আরোহী-দিগকে তাহার উপর লইয়া, জীবন-তরীগুলিও তুলিয়া ডেকের উপর রাখিল। তাহার পর, উহা চারিদিকে ঘুরিয়া আর কোন যাত্রী জলে ভাসিতেছে কি না, তাহা দেখিতে লাগিল। কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে কাপ্তেন জাহাজে, যাঁহাদের জীবন রক্ষিত হইয়াছে, তাঁহাদের জন্য কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ ও মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশে একটী উপাসনার আয়োজন করিলেন। ইতিমধ্যে "কালিফোর্ণিয়া" ও "বার্ম্মা"-নামে দুইটি জাহাজও সেখানে আসিয়া পড়াতে, তিনি উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকদের লইয়া ত্বরিৎগতিতে নিউইয়র্ক-অভিমুখে চলিলেন। সেই দিনের মধ্যে টাইটানিকের আটজন কর্ম্মচারীকে সমুদ্রে কবর দেওয়া হইল। তাঁহাদের মধ্যে চারিজনকে নৌকা-হইতে মৃতই তোলা হইয়াছিল, আর চারিজন পরে মারা যায়।
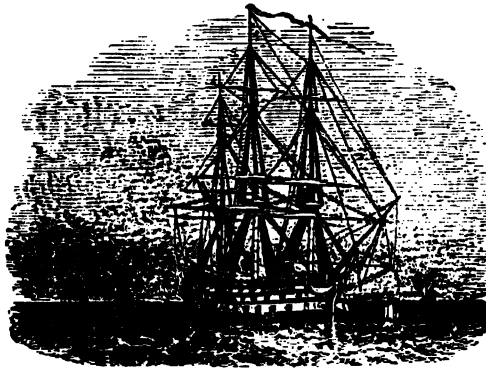
কার্পেথিয়া নিউইয়র্কে পহুঁছিলে, যাত্রী-দিগের দেশস্থ আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু প্রশংসার বিষয়, মহিলারা খুব প্রশান্ত-ভাবেই তাঁহাদের আত্মীয়দের সহিত মিলিতা হইলেন। এই দুর্ঘটনার সময় যাত্রিগণের আত্মসংযমের ও প্রশান্ততার প্রচুর পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তদ্ভিন্ন যাত্রী ও কর্ম্মচারিগণের প্রশংস-নীয় আজ্ঞাবহতারও উল্লেখ করা উচিত। যাত্রীদিগকে যাহা করিতে বলা হইতেছিল, তাঁহারা তাহাই করিতে-ছিলেন। কর্ম্মচারীদিগের ত কথাই নাই, তাঁহারা যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছিলেন, বিনাপত্তিতে জীবন তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তাহাই করিয়া-ছিলেন। এরূপ আজ্ঞাবহতা সকলেরই অনুকরণযোগ্য, এবং এরূপ আজ্ঞাবহতার দৃষ্টান্ত জগতে বড় সুলভ নহে।

এই দুর্ঘটনার সময়ে আরও একটি লক্ষ্যযোগ্য বিষয় এই হইয়াছিল যে, মানুষ যতই নিরীশ্বরবাদিতার বড়াই করুক না, এই সময়ে সকলেই ব্যাকুলভাবে সেই সর্ব্বশক্তিমানের কাছে মস্তক অবনত করিয়া সাহায্য-প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারে নাই। সম্পূর্ণ

উচ্চৈঃশ্রবা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

দোক্তা বাহির করিয়া মুখে দিল। কিন্তু মুখে রস নাই—দোক্তা থু করিয়া ফেলিয়া দিল। তাহার গা যেন কেমন কেমন করিতেছিল। কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। ইহার মুখে ভাল কথা কোন কালেই ছিল না। সম্পদে বিপদে, রাগে হর্ষে, সকল অবস্থায় মুখে কেবল কুকথা—কেবল গালি। শরীর-মন দুইই আজ অবসন্ন; সে রহিয়া রহিয়া, কুকথা "উদ্গীর্ণ" করিতে থাকিল।

খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিয়া উঠিল, "ইচ্ছা করে ওকে বাঁচাইয়া তুলি ; কিন্তু আর ত তা হবে না।"

দূরে যেখানে গায়ের খেস ও ঝোলাঝুলি রাখিয়াছিল, সেইগুলির উপর চক্ষু পড়াতে মটুমটু গিয়া সেসকল গুছাইয়া লইল। লইয়া মৃত সুশৃঙ্গ উচ্চৈঃশ্রবার খুব কাছে আসিল, এইবার অজরাজের শৃঙ্গ, বিশাল গ্রীবা ও স্কন্ধ দেখিয়া তাহার মনের ক্ষুণ্ণ ভাব চলিয়া গেল, আনন্দ ও উল্লাস—একপ্রকার পাশব উল্লাস হইল। যে উল্লাসের বশে বাঘ, কুকুর ইত্যাদি শিকারী পশুরা কোন প্রাণীকে মারিয়া সেই প্রাণীর মৃত দেহ লইয়া খেলা করে, এ সেইপ্রকার উল্লাস। সে কাঠ পুড়াইয়া আগুন করিল, কোমর-হইতে ভুজালী বাহির করিয়া মৃত পাঁঠাটার চামড়া তুলিয়া লইল। গলা কাটিয়া মাথাটা একপাশে রাখিয়া দিল—রাখিয়া দিবার আগে উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া বার-কতক দেখিল, দেখিয়া আত্মশ্লাঘার রসের একটু স্বাদ পাইল। অনন্তর ঘাড়ের খানিকটা—যতটা খাইতে পারিবে তাহার অপেক্ষা একটু বেশি—মাংস কাটিয়া লইল। আগুনে এই মাংস পোড়াইয়া খাইল। অনন্তর বিশ্রাম করিয়া নিজের গ্রামের দিকে ফিরিল। উচ্চৈঃশ্রবার চামড়া ও মাথা বোচ্‌কায় বাঁধিয়া পিঠে করিয়া লইল।

প্রায় তিন-মাস কষ্ট সহিয়া মটুমটুর হৃষ্টপুষ্ট, বলবান দেহ অনেকটা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। সেরূপ শ্রী, আগেকার মত স্ফূর্ত্তি আর নাই—সে নিজে ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছে, কিন্তু উচ্চৈঃশ্রবার মাথা পাইয়া যে আনন্দ হইয়াছে, সেই আনন্দে সে-সকল কষ্ট অনেকটা চাপা পড়িয়াছে।

১৯

মটুমটু উচ্চৈঃশ্রবার মাথা ও চামড়া লইয়া নিজ গ্রামের দিকে চলিল। যাইতে যাইতে পথে ঝর্ণার ধারে বা গাছের তলায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে নিজের হাত, পা, উরু ইত্যাদি দেখে, আর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে। • একদিন "হাজারটাকা খরচ করিলেও, সে শরীর আর পাব না"—এই বলিয়া ছাগলের মাথাটী বাহির করিয়া চক্ষু-দুইটী ও শিং-দুইটী প্রাণ ভরিয়া দেখিল। দেখিয়া সম্মুখে একটু দূরে রৌদ্রে রাখিয়া দিল। এখানহইতে উহার গ্রাম একশত কি দেড়শতক্রোশ দূর। পথে বিশ্রাম না করিলেই নয়; আবার ছাগলের মাথা ও চামড়া রৌদ্রে না দিলেই নয়; কাজেই দুইপ্রহরবেলা বিশ্রাম করে। কিন্তু ছাগলের চক্ষু দেখিলেই, সেই দিনের কথা মনে পড়ে, পড়াতে মনের ভিতর যেন ঐ তীক্ষ্ণ শিং খোঁচা মারিতে থাকে ; তাই কাপড়দিয়া মাথাটা ঢাকিয়া দেয়, কিম্বা পিছন ফিরিয়া বসে।

কয়েকদিন পরে লুসাই-শিকারী লাপ্তাপাহাড়ে নিজের গ্রাম ও গৃহে পঁহুছিল। কিন্তু আর শিকারে যায় না। আর আগেকার মত স্ফূর্ত্তি নাই। জুদম করিয়া অর্থাৎ কৃষিকর্ম্ম করিয়া যাহা পায়, তাহাতেই দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার একপ্রকার চলে। উচ্চৈঃশ্রবার প্রাণবধ করিতে গিয়া যে কষ্ট সহিতে হইয়াছিল, তাহাতে তাহার শরীর মাটী হইয়া গিয়াছে। জুমের সময় যা কিছু শ্রম করে, নহিলে আর কিছু করে না—করিতে পারেও না। একাই থাকে। একাই ঘরের দ্বারে বা গাছের তলায় বসিয়া কি যেন ভাবে।

একদিন একটী লোক দেখা করিতে আসিল। এ লোকটী মটুমটুর একবয়েসী এবং যৌবনকালে দুইজনে মিলিয়া কত শিকার করিয়াছে।

সে বলিল, "শুনেছি, তুমি সেই প্রকাণ্ড পাঁঠাটাকে শিকার করিয়াছিলে।"

মটুমটু বাক্যব্যয় করিল না। কেবল মাথা নাড়িয়া কথাটা মানিয়া লইল। লোকটা আবার বলিল,—

"কৈ, সেটার মাথা কৈ ?—শিং-দুইটা নাকি বড় চমৎকার !"

মটুমটু ঘরের বেড়ায় টাঙ্গান কাপড়-ঢাকা মাথাটা দেখাইয়া দিল। লোকটা গিয়া কাপড়খানা সরাইল। মাথা ও শিং দেখিয়া কত তারিফ করিল। মটুমটু হাঁ না বই ও বিষয়ে আর কোন কথা কহিল না। রাত্রে ঘরে আগুন করা হইল। উচ্চৈঃশ্রবার চখে আলো প্রতিফলিত হইয়া ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। সে ঝক্‌মকানী মটুমটুর চক্ষুদিয়া প্রবেশ করিয়া প্রাণে আঘাত করিল। তাই বন্ধুকে বলিল, "দেখা হইয়া থাকে ত মাথাটা আবার ঢাকিয়া দেও।"

"ওটা ঘরে রাখিলে যদি মনে বেদনা পাও, তবে বেচে ফেল না কেন ? চা-বাগানের কোন সাহেব দেখিলে লুফিয়া নিবে।"

"রেখে দে তোর চা-বাগানের সাহেব ; আমি ও মাথা কখন বেচিব না—কখনও হাতছাড়া করিব না। আমি ওর প্রাণবধ করিয়াছি। আমার ধড়ে যতদিন প্রাণ থাকিবে, ততদিন ও আমার কাছে থাকিবে। ও আমার শরীর মাটী করেছে। এই চারি-বৎসরে শরীরের কি হাল হইয়াছে, দেখ দেখি। এই ত আমাকে বুড়া করিয়া ফেলিয়াছে। এই পাঁঠা আমার শরীরের অর্দ্ধেক বলক্ষয় করেছে। এ এখনও আমার শরীরের রক্ত চুষিয়া খাই-তেছে। কিন্তু এখনও আমার ধড়ে প্রাণ আছে। ওর সঙ্গে কি আমার আজ নূতন দেখা! লাপ্তা-টিকড়ের ঝর্ণার কাছে ও যখন মায়ের কোলে, তখন আমি হামাগুড়িদিয়া ওকে ধরিতে গিয়াছিলাম। আজও সেই ঝর্ণার কাছে গেলে, ওর গলা যেন শুনিতে পাই! থাকুক, ও মাথা আমার কাছেই থাকুক।"

রাত্রে জোরে ঝড় বহিল,—বৃষ্টি হইল। যে কাপড়খানা-দিয়া ছাগলের মাথাটা ঢাকিয়া রাখা হইয়াছিল। বাতাসে তাহা সরিয়া গেল। এপ্রকার ঝড় প্রায়ই হইয়া থাকে। কিন্তু দুই-একবার যেন ঘরের দরজায় একপ্রকার শব্দ হইল। অমনি ঝাঁপ খুলিয়া

গেল, আর পাঁঠার মাথাটা যে কাপড়দিয়া ঢাকা ছিল, তাহা উড়িয়া পড়িল। দুই-একবার বিদ্যুৎ চম্‌কিল। বিদ্যুতের আলোক উচ্চৈঃশ্রবার চখে প্রতিফলিত হইল। চক্ষু-দুইটা যেন পদ্মরাগ-মণির মত চম্‌কিয়া উঠিল। দেখিয়া অতিথির মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল।

সারাদিন ঢল ঢলিল, রাত্রে জলের বেগে বেশী হইল। তালাং-নদীর স্রোত দুইতীর প্লাবিত করিয়া তীরবেগে ছুটিল।

এমন সময়ে ভূমিকম্প হইল। পৃথিবী ভয়ানক কাঁপিয়া উঠিল। জননী বসুমতী জোরে কাঁপিয়া উঠাতে তাঁহার ক্রোড়স্থ পর্ব্বত-সকল যেন শিহরিয়া উঠিল। অনেক পাহাড়, অনেক পাহাড়ের-

প্রাতঃকালেও বৃষ্টি থামিল না। কিন্তু অতিথি ভোর হইবামাত্র চম্পট্ দিল। সমস্ত দিনই ঝড়-বৃষ্টি হইল, বৃষ্টির ফোঁটা ক্রমেই বড় বড় হইল। ফলে মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। পর্ব্বতের গা বহিয়া দেশের ঢল নামিল।

ঢালু ধ্বসিয়া পড়িল। তালাঙের ভয়ঙ্কর স্রোতঃ পাথর, গাছ, গোরু, হাতী, মহিষ লইয়া বহুদূরে সাগরকে যেন ঢেউ দিতে ছুটিল।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক ঝড়, আরও মুষলধারে বৃষ্টি। একরাত্রে মটুমটুর গ্রাম জলে ভাসাইয়া লইয়া গেল। বেচারার ঘরের চাল

তালাঙ্গের স্রোতে ভাসিয়া চলিল। সে কোথায়? পাহাড়ের লোকে সাঁতার জানে না। বেচারা প্রথমে শালের খুঁটি, যে খুঁটিতে উচ্চৈঃশ্রবার মাথা বেতদিয়া বাঁধা ছিল, সেই খুঁটি ধরিয়া রহিল। কিন্তু তুমি কাঁপিয়া উঠাতে দুর্ব্বল হাতে আর খুঁটি ধরিয়া থাকিতে পারিল না। তালাঙ্গের স্রোতঃ তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল—কোথায়? বঙ্গ-উপসাগরকে ঢেউ দিতে।

পর্ব্বতে অবিরল মুষলধারে বৃষ্টিপাত, ও তৎসঙ্গে ঝড় ও ভূমিকম্প এবং বিদ্যুৎবেগে জলরাশির নীচের দিকে গমন দেখিয়াই আমাদের দেশের সেকালের কবিরা কোন কোন নদীতে দেবত্বারোপ করিয়াছেন।

পরদিন ঝড়, বৃষ্টি, কুয়াশা সকলই চলিয়া গেল। মটুমটুদের গ্রামে কাহারও ঘরে চাল নাই—অনেকের গরু, ছাগল প্রভৃতি পশুও নাই। কিন্তু ছোট ছোট শালের খুঁটিমাত্র রহিয়াছে। মটুমটুর ঘরের যে খুঁটিতে (এটাকে যাহা বলে, তাহার অর্থ মেরুদণ্ড—মাঝখানের খুঁটি) উচ্চৈঃশ্রবার সশৃঙ্গ মাথা বাঁধা ছিল, সে খুঁটিও ছিল। পদ্মরাগ-মণির মত তাহার চখের তারা-দুইটী তেমনি চক্-মক্ করিতেছিল। শিং-দুইটী যেমন, তেমনি রহিয়াছে। তালাঙ্গের প্রবল স্রোতে কত গাছ ভাঙ্গিয়াছে, কত টিলা ধ্বসিয়াছে, কিন্তু উচ্চৈঃশ্রবার শিং যেমন, তেমনি রহিয়াছে।

আজ মটুমটু কে, কোথায় ছিল, কেউ জানে না। কিন্তু উচ্চৈঃশ্রবার মাথা এখনও আছে। লংলের কেল্লার এক সাহেবের কুঠির বারান্দায় সেই মাথা দেখিয়া কত সাহেব শিং-দুইটীর তারিফ করেন।

-:*:-

কথোপকথনের নিয়মাবলী

১। যে কথা তুমি মিথ্যা বলিয়া জান বা বিশ্বাস কর, সে কথা সত্য বলিয়া প্রচার করিও না। মিথ্যা কথা বলিলে, মনুষ্যত্বেরই বিরুদ্ধে এক মহাপাপ করা হয়; কারণ যেখানে সত্যের প্রতি কোন সম্মান-প্রদর্শন করা হয় না, সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন নিরাপদ্ সমাজ-বন্ধন ঘটে না। মিথ্যা-কথা কহিলে, মিথ্যুকের নিজেরই মহানিষ্ট হয়; কারণ মিথ্যা-কথা বলার নিমিত্ত কেবল যে তাহাকে বড় লজ্জায় পড়িতে হয়, তাহা নহে, তাহার মনও এমনই ছোট হইয়া যায় যে, যখন তাহার মিথ্যা-কথা বলিবার কোন প্রয়োজন হয় না, তখনও সে প্রায়ই সত্য-কথা বলিতে বা মিথ্যা-কথা এড়াইতে পারে না। তাহার পর, কালক্রমে তাহার এমনই দুরবস্থা উপস্থিত হয় যে, অপরে তো বিশ্বাস করেই না যে, সে সত্য-কথা বলিতেছে, সে নিজেও কখন্ সত্য, কখন্ বা মিথ্যা বলিতেছে, তাহা অনুভব করিতে পারে না।

২। যেমন মিথ্যা-কথা না বলার সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া উচিত, তেমনি মিথ্যা-কথার কাছা-কাছি কোন কথা বলার সম্বন্ধেও সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। এমন কোন কথাই বলা উচিত নহে, যাহার দুইটা অর্থ হয়; আর যে কথা কেহ ঠিক সত্য বলিয়া জানে না, লোকের মুখে শুনিয়াছে, সে কথাও তাহার সত্য বলিয়া লোককে বুঝান উচিত নহে।

৩। অন্ত লোকের কথোপকথন শুনিয়া যে জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতালাভ করা যায়, পাছে তাহাহইতে তুমি আপনাকে আপনি বঞ্চিত কর, এইজন্য তুমি অল্পভাষী হইবে।

৪। তুমি চীৎকার করিয়া, উদ্ধত হইয়া ও অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাইয়া কথা কহিবে না; তোমার প্রতিপক্ষকে চীৎকার করিয়া নহে, যুক্তিদ্বারাই নীরব করিয়া দিবে।

৫। অন্যলোকে যখন কথা কহিতেছে, তখন তাহার কথা-শেষ না হইতেই তুমি কথা কহিয়া তাহার বক্তব্যে বাধা দিবে না। তাহার যাহা বলিবার আছে, তাহা সম্পূর্ণ শুনিয়া লইলে, তুমি তাহার কথা আরও ভাল বুঝিতে এবং ভাল করিয়া উত্তরও দিতে পারিবে।

৬। যে কথাটি কহিতে চাও, সে কথাটি কহিবার পূর্ব্বে একটু ভাবিয়া দেখিবে, তাহা বলা উচিত কি না। বিশেষতঃ যখন কোন গুরুতর বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে চাও, তখন সবিশেষ সাবধান হইবে। বক্তব্যগুলির অর্থ-সম্বন্ধে ভাল করিয়া বিচার-বিবেচনা করিবে।

৭। যখন তুমি গর্ব্বিত, লঘুচিত্ত ও অশিষ্ট লোকদের সঙ্গে থাকিবে, তখন তুমি তাহাদের অকৃতকার্য্যতা দেখিয়া তাহাদের ও অন্যদের সঙ্গে কথোপকথনকালে অধিকতর সতর্ক হইতে শিখিবে, তাহা হইলে তুমিও তাহাদের মত ভুল করিবে না।

৮। তুমি আপনিই আপনার প্রশংসা করিও না। তুমি যদি আত্মপ্রশংসা কর, তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, তোমার তেমন সুযশ নাই; যে একটু খ্যাতি আছে, তাহাও যাইবার মত হইয়াছে। কাহাকেও আত্মপ্রশংসা করিতে দেখিলে, অন্যলোকের তাহাতে সেই লোকের প্রতি বড় বিরক্তি ও ঘৃণা জন্মে।

৯। উপযুক্ত সুযোগ পাইলে, যাহারা অনুপস্থিত আছে, তাহাদের প্রশংসা করিবে। কিন্তু কাহারও অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা করিবে না। তবে যদি তুমি জান যে, সে বাস্তবিকই দোষযোগ্য, বা তাহার সম্বন্ধে দোষ না দিলে, অপরকে নিরাপদ্ বা অপরের উপকার করা যায় না, তাহা হইলে দোষ দেওয়া কর্ত্তব্য হইতে পারে।

১০। কাহারও মন্দ অবস্থা বা স্বাভাবিক কোন ত্রুটি দেখিয়া

তাহাকে ঠাট্টা বা টিট্‌কারী করিও না। ঐরূপ করিলে, উপহসিতের মনে অনেকদিন মালিন্য থাকিয়া যায়।

১১। কাহাকেও তিরস্কার, ভয়প্রদর্শন বা হিংসাসূচক কোন বলিলে, কিছুই লাভ হয় না, তাহাতে তিরস্কৃত ব্যক্তি সংশোধিত না হইয়া বরং ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তখন তিরস্কারকই তিরস্কারযোগ্য হইয়া পড়ে।
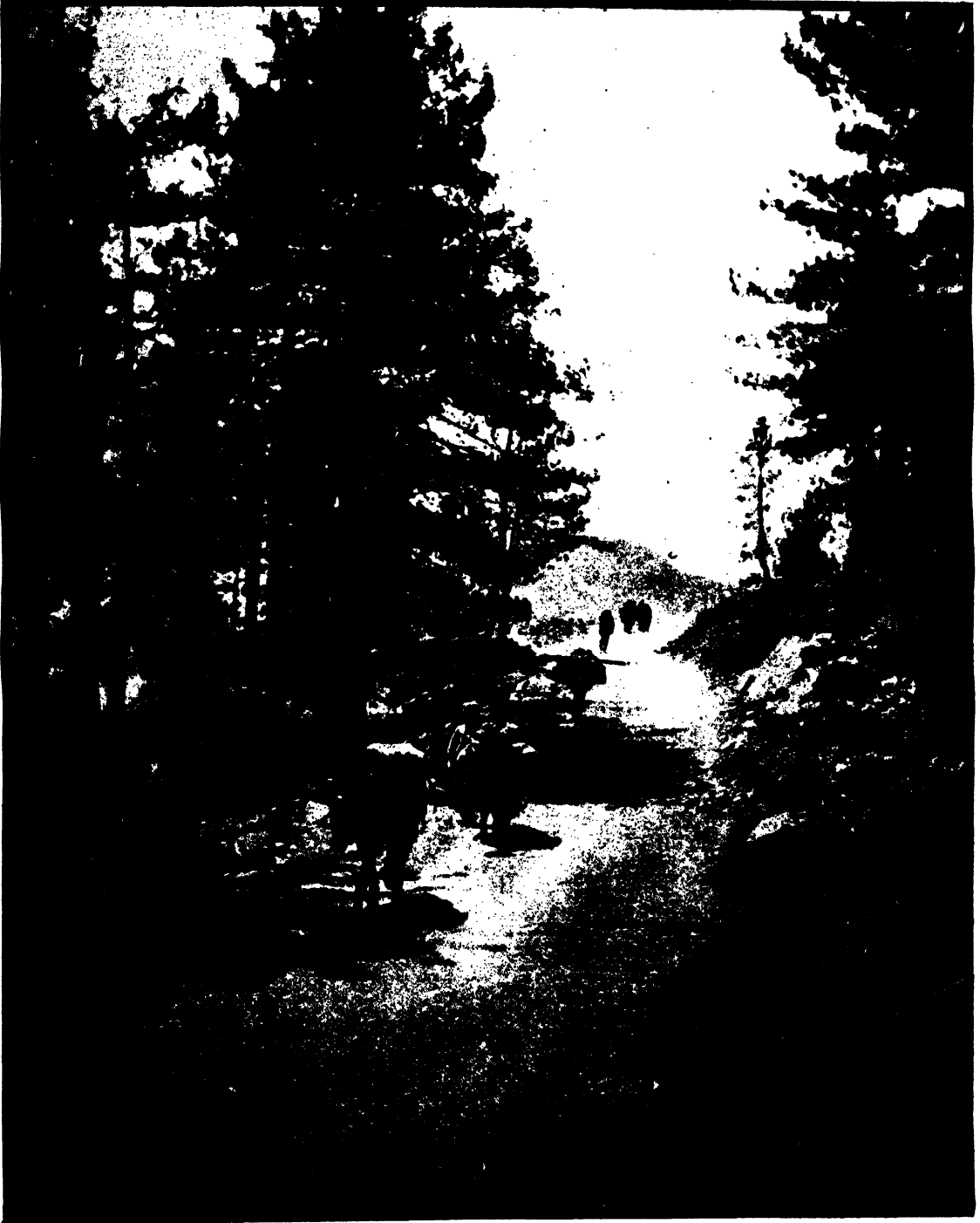
সিমলা-পাহাড়ের একটি দৃশ্য

কথা বলিও না। কাহারও কোন দোষের নিমিত্ত যদি তাহাকে কিছু বলিতে চাও, তাহা হইলে তাহাতে তিরস্কার বা তিক্ততার কোন ভাব যেন না থাকে। তিক্তভাবে কাহাকেও কোন কথা

১২। যদি কোন ক্রোধন-স্বভাবলোক তোমাকে কুকথা বলে, তাহা হইলে তাহার উপর রাগান্বিত না হইয়া বরং তাহার সেই দুঃস্বভাব দেখিয়া দুঃখপ্রকাশ করিও। তুমি দেখিতে পাইবে,

চুপ্ করিয়া থাকিলে কিম্বা তাহাকে মিষ্ট কথা বলিলেই, তুমি তাহার দুরাচরণের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রতিশোধ লইতে পারিবে। এইরূপ বিনীত ব্যবহারের ফলে, হয় সেই কোপন-স্বভাব লোকটার কোপ দূর হইবে, নয় সে সেই দুরাচরণের জন্য অনুতপ্ত হইবে, তখন তাহার সেই আত্মগ্লানিই তাহার সেই কুকথার প্রচুর দণ্ড হইবে। ঐরূপ কিছু যদি নাও হয়, তবু তুমি অন্ততঃ নির্দ্দোষ রহিবে, তাহাতে তোমার সুবুদ্ধি ও সুবিবেচনার খ্যাতি রটিবে, এবং তোমার মনের মধ্যে কোন বিক্ষোভ উপস্থিত হইবে না—শান্তিতে থাকিতে পারিবে

নিদ্রা

সকলেরই কি করিয়া ঘুমাইতে হয়, তাহা জানা উচিত। কারণ নিদ্রাগমনকালে কয়েকটি নিয়মপালন না করিলে, একেবারেই নিদ্রা হয় না, বা নিদ্রা গিয়া কোন বিশিষ্ট উপকার হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ, চিৎ হইয়া শোওয়া ভাল নহে। চিৎ হইয়া না শুইবার অনেক গুরুতর হেতু আছে, সব কারণগুলি এখানে না দেখাইয়া মোটের উপর এই কথা বলিলেই চলিবে যে, চিৎ হইয়া ঘুমাইলে, ঘুম ভাঙিয়া যাইবার বা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে। বাঁ-কাতে ঘুমাইলে, হৃদয়টা বিছানায় গিয়া ঠেকে, তাহাছাড়া পাকস্থলীর অধিকাংশ বাঁদিকে আছে। সেইজন্য ডাহিনদিক্ চাপিয়া ঘুমাইলে, অনেকেরই ভাল ঘুম হয়। অনেকে আবার বাঁ-দিক্ চাপিয়া ঘুমাইলে, আদৌ ঘুমাইতে পারে না।

কিন্তু চিৎ হইয়া ঘুমান-সম্বন্ধে সকলেরই সবিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। যাহাদের চিৎ হইয়া শুইবার বদ্ অভ্যাস আছে, তাহাদের বরং পিঠের এক-অংশে কোন কিছু শক্ত-গোছের জিনিস বাঁধিয়া রাখা উচিত, তাহা হইলে যদিও তাহারা ঘুমের ঘোরে চিৎ হইয়া শুইতে যায়, অসুবিধাবোধ করিয়া আবার কাৎ হইয়াই শুইবে। এই কৌশলটুকু-অবলম্বন করিলে, যাহাদের ঘুমের ব্যাঘাত জন্মে, তাহারা দেখিতে পাইবে যে, ঐ কৌশল-অবলম্বনের পর, তাহাদের নিদ্রাসম্বন্ধে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

নিদ্রাগমনসম্বন্ধে আর একটী কার্য্যকর সৎপরামর্শ এই যে, কেহ ভাবিতে ভাবিতে বা বই পড়িতে পড়িতে নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিবে না, এবং প্রভাতে কেহ ডাকিলেই, তৎক্ষণাৎ বিছানা ছাড়িয়া উঠিবে। অবশ্য সকলের একরকমে ঘুম আসে না। বুড়া লোকদের মধ্যে কেহ কেহ বই পড়িতে পড়িতে ঘুমের চেষ্টা করিলে ঘুমাইয়া পড়ে, আবার রুগ্ন লোকেরা বিছানায় শুইয়া চা-পান করিতে পাইলে, সুবিধা-বোধ করে। কিন্তু সুস্থ লোকদের—বিশেষতঃ যুবকদের—পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিয়ম এই যে, নিদ্রা যাইতে মন করিয়া নিদ্রা যাইবে, এবং সকালে কেহ ডাকিলেই, তৎক্ষণাৎ বিছানা ছাড়িয়া উঠিবে।

নিদ্রাগমনসম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ নিয়ম এই যে, নিদ্রা যাইবার কয়েকঘণ্টা পূর্ব্বহইতে মানুষে যেন একটু বিবেচনাপূর্ব্বক সকল কার্য্য করে। মানুষ যদি খড় বেশী উত্তেজিত হয়, তাহা হইলে তাহার ঘুম হয় না। তদ্ভিন্ন পেটের যদি কোন গোলমাল থাকে, তাহা হইলে হাজার আরাধনা করিলেও, নিদ্রা আইসে না। সেই-জন্য ঘুমাইতে যাইবার আগে আমাদের একটু চুপ্‌চাপ্ থাকা ও উদরের ক্রিয়া যেন অতিরিক্ত না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

চুট্‌কী-চটক।

ত্রিদিব-প্রবেশ

সে অনেকদিনের কথা; কোন সময়ে এই ভারতে একটী বড় ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। সাতবৎসর ধরিয়া অনেক দয়া-দাক্ষিণ্যের কাজ করিবার পর, একদিন তিনি ত্রিদিবে প্রবেশ করিতে চলিলেন। স্বর্গে উঠিবার সিঁড়ির তিনটীমাত্র ধাপ। সেই তিনটী ধাপ-পার হইয়া স্বর্গদ্বারে পহুঁছিয়া তিনি জোরে জোরে স্বর্গদ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন। ভিতরহইতে কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেও দরজা খট্‌খট্ করে?" সাধু উত্তর করিলেন, "প্রভু, আমি আপনার দাস, স্বর্গে প্রবেশ করিতে চাই।"

কিন্তু সাধু তাহার পর আর কোন উত্তর পাইলেন না। স্বর্গদ্বার বন্ধই রহিল।

সাধু ক্ষুণ্ণমনে ভারতে ফিরিয়া আসিলেন এবং আরও সাত-বৎসর ধরিয়া নানা সৎকার্য্য—পরহিত করিয়া কাটাইলেন। সপ্ত-

বর্ষান্তে তিনি স্বর্গে উঠিবার সোপানের তিনটী ধাপ-অতিক্রম করিয়া আবার গিয়া স্বর্গদ্বারে করাঘাত করিলেন। ভিতরহইতে আবার প্রশ্ন হইল,—"কে ও, দরজা খট্‌খট্‌ করে?" সাধু বলিলেন,—"হে ঈশ্বর, আমি আপনার ক্রীতদাস।"

কিন্তু সেবারও স্বর্গদ্বার উন্মোচিত হইল না। ধার্ম্মিক ব্যক্তি আবার ক্ষুণ্ণমনে ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, তিনি বড় স্বার্থপরের মত জীবন-যাপন করিয়াছেন। অতএব তিনি স্থির করিলেন, আর তিনি আপনার কথা ভাবিবেন না। সৎকার্য্যের জন্যই সৎকার্য্য করিবেন।

পুনরায় সাতবৎসর ধরিয়া তিনি নিঃস্বার্থভাবে মহৎজীবন-যাপনের চেষ্টা করিলেন। তাহার ফলে, তাঁহার মনে আত্ম-চিন্তার আর লেশমাত্র রহিল না।

সপ্তবর্ষান্তে পুনরায় স্বর্গসোপানত্রয়-অতিক্রম করিয়া ত্রিদিব-তোরণে পহুঁছিয়া এবার বড় ধীরে ধীরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। আবার প্রশ্ন হইল,—"কে ও, দরজা খট্‌খট্‌ করে?"

সাধু বিনয়-নম্র-স্বরে কহিলেন,—"পিতঃ, আমি—তোমার সন্তান!"

ত্রিদিবদ্বার তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়া গেল। সাধু ত্রিদিবে প্রবেশ করিলেন।

সমান বখরা।

এক রাজা তাঁহার রাজ্যমধ্যে এই কথা-ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, তাঁহার কাছহইতে যে যাহা চাহিবে, তাহাকে তিনি তাহাই দিবেন। প্রথমে বড়লোকেরা আসিয়া রাজার যত ধন-রত্ন, জমী-জায়গা চাহিয়া লইয়া গেল। তাহার পর গরীব লোকেরা আসিয়া ঐ সবই চাহিতে লাগিল। রাজা বলিলেন,—"আর আমার জমী-জায়গা, টাকা-কড়ি নাই—আমীরেরা সব লইয়া গিয়াছে। এখন থাকিবার মধ্যে আমার আছে—রাজার কর্ত্তৃত্ব, আমীরেরা ইহা চায় নাই। ইহা আমি তোমাদেরই দিলাম। তোমরা গিয়া উহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব কর।"

গরীবেরা রাজ-কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছে শুনিয়া বড়লোকেরা আসিয়া রাজাকে অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিল,—"আপনি এ দান গরীবদের কাছহইতে ফিরাইয়া লউন। গরীব লোকগুলা আমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে, ইহা আমরা সহিতে পারিব না।

রাজা বলিলেন,—"আমি তোমাদের কোন অনিষ্ট করি নাই। তোমরা যাহা চাহিয়াছিলে, তাহাই লইয়াছ, ঐ সমস্তই তোমরা আমার সর্ব্বস্ব ভাবিয়া সবই লইয়া গিয়াছ, গরীবদের জন্য কিছুই রাখিয়া যাও নাই। এখন তোমরা যাহা পাইয়াছ, তাহা যদি গরীবদের সঙ্গে সমান-ভাবে ভাগ করিয়া লও, তাহা হইলে আমি রাজ-কর্ত্তৃত্ব-প্রতিগ্রহণ করিব।" আমীরেরা বুঝিয়া দেখিল যে, ঐরূপ করাই সর্ব্বোত্তম, ফলে গরীবেরাও রাজ-স্বত্বের অংশী হইয়া বেশ আরামে জীবন-যাপন করিতে লাগিল।

-:*:-

৩

সারমেয়দ্বয়।

একরাজার দুইটি শিকারী কুকুর ছিল। তাহাদের দুইজনকে দূরে দূরে শিকলদিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত। কিন্তু তাহাদের ছাড়িয়া দিলেই, ভয়ানক ক্ষেয়ো-ক্ষেয়ি করিত। রাজার ইচ্ছা, সারমেয়দ্বয়ের মধ্যে সম্প্রীতি হয়। তাই তিনি সেসম্বন্ধে তাঁহার এক বুদ্ধিমান সভাসদের কাছে পরামর্শ চাহিলেন। তিনি বলিলেন,—"দুইটি কুকুরকেই শিকারে লইয়া যান। নেকড়ে-বাঘ দেখিলে, প্রথমে

একটা কুকুরকে লেলাইয়া দিবেন, যখন দেখিবেন সেটা বড় কাবু হইয়া পড়িয়াছে, তখন আর একটাকে ছাড়িবেন, তাহা হইলে দুইজনের মধ্যে বেশ ভাব হইয়া যাইবে।"

রাজা তাহাই করিলেন। একটা নেকড়ে-বাঘ দেখিয়া প্রথমে একটা কুকুরকে লেলাইয়া দিলেন। সেটার যখন অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল, তখন দ্বিতীয়টাকে ছাড়িলেন। ফলে, প্রথম কুকুরটা জীবন-রক্ষকের কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ হইয়া পড়িল। উভয়ের মধ্যে আর বিরোধ রহিল না।

-:*:

অন্ধ ও খঞ্জ।

একদিন একরাজা তাঁহার সকল প্রজাকে ভোজ দিতে ইচ্ছা করিয়া দিকে দিকে ঘোষণা-প্রেরণ করিলেন। এক অন্ধ প্রজা সে কথা শুনিয়া হায় হায় করিতে লাগিল। সে চোকে দেখিতে পায় না, সে কি করিয়া পথ চিনিয়া গিয়া রাজ-নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিবে? সে দুঃখ করিতেছে, এমন সময়ে শুনিল, এক খঞ্জও রাজ-নিমন্ত্রণে যাইতে পাইবে না বলিয়া পরিতাপ করিতেছে।

তখন তাহারা দুইজনে দুইজনকে সাহায্য করিতে সম্মত হইল। কানা খোঁড়াকে কাঁধে করিয়া লইয়া যাইবে। আর খোঁড়া কানাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে। এইরূপে দুইজন দুইজনকার ত্রুটি সারিয়া লইয়া রাজভোজে উপস্থিত হইল।

সওদাগর ও উটওয়ালা

একসওদাগর একমোট দামী রেশম ইস্তাম্বুলে বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য একটা উট-ভাড়া করিয়াছিল।

সে উটওয়ালাকে বলিল,—"তুমি এখনই রওনা হও, আমি পিছনে যাইতেছি।"

কিন্তু পরদিন সে অসুখে পড়িয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিল না।

সওদাগর তাহার মাল দাবী করিতে আসিল না দেখিয়া, উট-ওয়ালা তাহা বেচিয়া টাকাগুলা আত্মসাৎ করিতে মনস্থ করিল। রেশম বেচিয়া উটওয়ালা এত টাকা পাইল যে, সে উট-ভাড়া দেওয়ার কারবার ছাড়িয়া দিবার অভিপ্রায়ে, তাহার উটগুলি বেচিয়া ফেলিল, এবং একটী সুন্দর বাড়ী কিনিয়া বেশ সুখে দিনযাপন করিতে লাগিল।

এদিকে সওদাগর একটু সুস্থ হইলেই, উটওয়ালার কাছে গিয়া তাহার মাল দাবী করিল। কিন্তু লোকটা বলিল যে, সে সেই মালের সম্বন্ধে কিছুই জানে না। সে বলিল,—"আমি উট-ওয়ালা নই, তুমি ভুল করিয়া আমার কাছে আসিয়াছ।"

সওদাগর উত্তর দিল,—"আমি ভুল করি নাই!" তাহার পর সে কাজির কাছে গিয়া বিচারপ্রার্থী হইল।
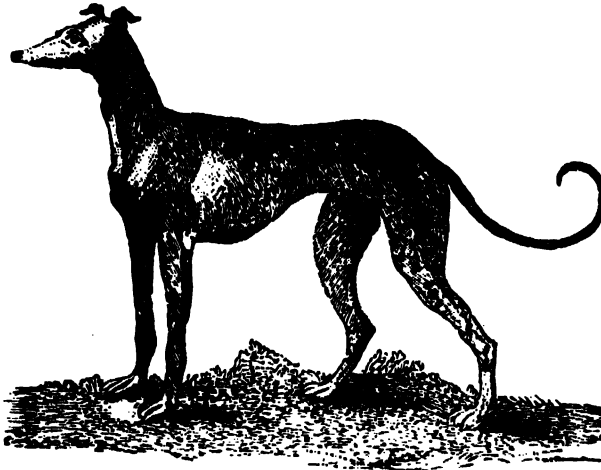
কাজির হুকুমে উটওয়ালাকে বিচারালয়ে আসিতে হইল। তাহাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, কাজি এমন ভাব দেখাইলেন, যেন তিনি সত্যই উট-ওয়ালার কথা বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহার পর তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। উটওয়ালা আদালতের দরজাপর্য্যন্ত গিয়াছে, এমন সময়ে কাজি চড়া-মেজাজে হঠাৎ ডাকিলেন,—"ওরে উট-ওয়ালা!"

লোকটা তখনই ফিরিয়া দেখিল। তখন কাজি বুঝিতে পারিলেন যে, লোকটা তাঁহাকে মিথ্যাকথা বলিয়াছে। উটওয়ালাকে সব টাকা সওদাগরকে ফিরাইয়া দিতে হইল এবং তাহার কঠিন দণ্ড হইল।

কাকাতুয়ার চাতুরী।

এক বড়লোক, কোন দূরদেশে যাইবার আগে, যখন তাঁহার পরিবারের সকলেরই জন্য কিছু-না-কিছু উপহার আনিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁহার প্রিয় কাকাতুয়াটার দিকে তাঁহার নজর পড়িল। তিনি কাকাতুয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার জন্য কি আনিব, বল।"

কাকাতুয়া বলিল,—"আপনি যে পথদিয়া যাইবেন, সেই পথে আমি যে বনে জন্মিয়াছি, সেই বনটি পড়িবে। ঐ বনে এখনও আমার কয়েকজন আত্মীয় বাঁচিয়া আছে। আপনার কাছে আমার সবিনয় অনুরোধ, আপনি একবার তাহাদের কাছে যাইবেন, গিয়া এই কথা বলিবেন যে, তাহারা ত বেশ যেখানে খুসি উড়িয়া বেড়াইতে পারে, কিন্তু আমি এখানে সোণার খাঁচায় কয়েদ থাকিয়া কাল কাটাইতেছি। তাহার উত্তরে তাহারা কি বলে, অনুগ্রহ করিয়া আসিয়া জানাইবেন।"

সেই বড়লোক তাহাই প্রতিশ্রুত হইয়া অবিলম্বে বিদেশযাত্রা করিলেন। গভীর বনের মধ্যে তাঁহার উল্লিখিত কাকাতুয়াদের সঙ্গে দেখা হইল; তাহাদের কাছে গিয়া তিনি তাঁহার ঘরের কাকাতুয়ার খবর তাহাদিগকে দিলেন। সেই কাকাতুয়াদের দলপতি, এক বৃদ্ধ কাকাতুয়া, ঐ কথা শুনিয়াই ঝট্‌পট্ করিয়া ধনীর পায়ের কাছে আসিয়া পড়িয়া যেন মরিয়া গেল।

তাহা দেখিয়া ধনী মনে মনে ভাবিল,—"বাঃ এই দুইটী কাকাতুয়ার মধ্যে বড়ই প্রেম ছিল ত। তাই একের দুঃখের কথা শুনিয়াই অন্যে প্রাণ হারাইল!"

অল্পদিন পরে, ধনী তাঁহার কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিলেন। সকলকে সকলের উপহার দিয়া শেষকালে তিনি কাকাতুয়ার কাছে আসিলেন। কহিলেন,—"হায়, তোমার জন্য আমি কিছুই আনিতে পারি নাই। তোমার দুঃখের কথা শুনিয়া তোমার বন্ধুদের এত দুঃখ হইয়াছিল যে, তাহাদের মধ্যে একজন আমার পায়ের কাছে পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে।"

ঐ কথা শুনিয়া কাকাতুয়া বলিয়া উঠিল,—"আহা!" তাহার পর সে যেন খাবি খাইয়া উল্‌টিয়া মরিয়া গেল।

ধনী ব্যক্তি তাঁহার প্রিয় পক্ষীটির মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া, খাঁচার দরজা খুলিয়া, পাখীটি বাহির করিয়া আনিল। তাহাতে পাখীটি উড়িয়া পলাইয়া এমন জায়গায় গেল, যেখানে তাহাকে ধরিবার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না, দেখিয়া ধনী হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। পাখীটি একটা গাছের ডালে বসিয়া বলিল,—"তুমি যতটা খবর আনিয়াছ মনে করিতেছ, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী খবর আমি তোমারই মুখে পাইয়াছি। তুমি বুঝিতে পার নাই, আমার বন্ধু আমাকে এই খবর দিয়া পাঠাইয়াছে,—'মরার ভাণ করিলে, তুমি ছাড়া পাইবে।'"

-:০:-

খেলায় সাধুতা

CHINIBADAM F. C.

1/1/17, Khanaywalla Gully.

To the Captain,
NATIONAL EMPIRE F. C.
21/3, Jhiku doray 2nd Bye Lane.

DEAR SIR,

We wish to play a match of foot-ball with your team on your ground with your ball on Fri. 31st June at 5-30 p. m. sharp. Please supply referee.

I remain,

Yours ffly.,
D. C. SEN,
Capt., C. B. F. C.

P. S. Or any other day.

গত ফুটবল-মরসুমে "বালকের" কত না বালক-পাঠক পার্শ্বলিখিত চিঠিখানি লিখিয়া পাঠাইয়াছে ও পাইয়াছে। ইংরাজী সাহিত্যের কোন কিছু ফাষ্টক্লাসহইতে আরম্ভ করিয়া সিক্‌স্‌থক্লাস-পর্য্যন্ত প্রায় সকল ছেলেরেই যদি জানা থাকে, তবে ঐ ধরণের চিঠিখানি। এখন প্রায় প্রত্যেক স্কুলেই একটী করিয়া ফুট্‌বল-টীম্ আছে। স্কুলের ছেলেদের লইয়াই সিনিয়র ক্লাবগুলি টীম্ গঠিত করিতেছে, এবং যে সব ছেলেদের একটী ফুট্‌বল আর অপরিমেয় উৎসাহছাড়া আর বড় কিছু সম্বল নাই, সে সব ছেলেরাও দল বাঁধিয়া প্রত্যেক পাড়াতেই এক-একটী করিয়া টীম্-খাড়া করিতেছে! এই সব টীমের 'গ্রাউণ্ড' নাই, রাস্তায় 'প্র্যাক্‌টিস্' করে, আর যে টীম 'ম্যাচ্' খেলিবার জন্য কোন টীমের গ্রাউণ্ড-যোগাড়

করিতে পারে, সেই টীমের সঙ্গেই ম্যাচ্ খেলে। পাড়ার ক্লাবের ছেলে বাছিয়া লইয়া স্কুলের ক্লাস-টীম্, ক্লাস-টীম্হইতে স্কুল-টীম্, স্কুল-টীম্হইতে জুনিয়ার টীম্, জুনিয়ার-টীম্হইতে সিনিয়ার-টীম্ এবং সিনিয়ার-টীম্হইতে লীগ্-ম্যাচে খেলিবার জন্য টীম্ হয়।

যদি তোমরা ভবিষ্যতে আই, এফ্, এ শিল্ড-ম্যাচে খেলিতে বাসনা কর, তবে এখন তোমাদের পাড়ায় জাঁকালো নামের যে একটা টীম্ আছে—সেই যে গো যাহারা অপর টীম্কে "চ্যালেঞ্জ" করিতে হইলে, দাদাদের দিয়া চ্যালেঞ্জ্ লিখাইয়া লয়—সেই টীমে যোগদিয়া ফুটবল-খেলায় 'হাতে খড়ি' কর।

আমি তোমাদের এসকল করিতে বারণ করিতেছি না; এসব শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ; কারণ, যে ছেলে ফুটবল-খেলায় ব্যস্ত থাকে, সে কোনরকম বদ্মায়েসী বা যাহা সে নিজেই মন্দ বলিয়া জানে, তাহা করিবার অবকাশ বা ফুরসৎ পায় না। উচিতপরিমিত সময় খেলায় অতিবাহিত করিলে, বালকমাত্রেই প্রতিদিনের পাঠ পূর্ব্বের অপেক্ষা ভাল্ করিয়া অভ্যাস করিতে পারে, তাহাছাড়া ভবিষ্যতে তাহাকে যে কঠিন পরিশ্রম করিতে হইবে, তজ্জন্য তাহার শরীরও সুগঠিত হয়। যথাপরিমিত ব্যায়ামের ফলে মনেরও প্রভূত উন্নতি দর্শে। কারণ উহাতে মস্তিষ্কে সর্ব্বদা নবশোণিত সঞ্চালিত হইতে থাকে, তাহাতে মস্তিষ্কের অবস্থা এমনই সবল হইয়া উঠে যে, উহা প্রচুর কার্য্য-ক্ষমতা লাভ করে; তদ্ভিন্ন উহাদ্বারা ন্যায়-অন্যায়-জ্ঞান ও অপরের সহিত মিশিয়া কার্য্য করিবার শক্তিও বিকশিত হয়।

কিন্তু বিশিষ্ট শক্তির সহিত বিশিষ্ট প্রলোভনও আসিয়া জুটে, সুতরাং সে সময়ে সতর্ক হইয়া না চলিলে, বিষম ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইতে হয়। অনেক জুনিয়ার কাপে ও লীগে খেলিতে গিয়া বিস্তর বাঙ্গালী বালক ঐরূপ ভুল করিয়া থাকে। এই সমস্ত কাপের 'ফাইন্যালে' খেলিবার সময়ে তাহারা সমস্ত কলিকাতা-সহরটা এবং এমন কি মফঃস্বলের টীম্গুলিহইতেও খেলোয়াড়-ধার করিয়া লয়, শেষকালে এমন হইয়া দাঁড়ায় যে, যে টীম্ ফাইন্যালে খেলিতেছে, সে টীমের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই বাহিরের হইয়া পড়ে; এরূপ করা হয় কেন? সম্প্রতি কলিকাতার একটি বড় স্কুলের একটি টীম্ একটি হকী-কাপে ফাইন্যালে খেলিয়াছিল, যাহারা সেই ফাইন্যালে খেলিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজনও স্কুল-টীমের খেলোয়াড় ছিল না। যখন ঐ টীম্ প্রথম ম্যাচ্ খেলে, তখন সব খেলোয়াড়গুলিই সেই স্কুলের ছেলে ছিল। যাহাতে টীম্গুলি নাম-এণ্টার করে, তাহার জন্য কাপ্গুলির প্রতিষ্ঠাতৃ-দিগকে কাপ্গুলির দাম কত, এবং কয়টা সোণার মেডেল দেওয়া হইবে, তাহা বিজ্ঞাপনদিয়া জানাইতে হয় কেন? যে কাপ্গুলির সেক্রেটারীদের আমরা জানি, কেবল সেই কাপ্গুলিতেই আমরা নাম-এণ্টার করি কেন? কারণ আমরা আশা করি যে, তাহা হইলে সেক্রেটারী আমাদের দিকে একটু টানিয়া চলিবেন, ফলে অন্য টীমের অপেক্ষা আমরা ঢের বেশী সুখ-সুবিধা পাইব। লেখক এমন একটি টীমের কথা জানেন, যে টীম্কে বলা হইয়াছিল যে, যদি উহা কোন একটি কাপে নাম-এণ্টার করে, তাহা হইলে উহাকে ফাইন্যালের পূর্ব্বে কোন ম্যাচ্ খেলিতে হইবে না। যখন একটী নূতন কাপ্ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন উহার প্রতিষ্ঠাতা বা প্রতিষ্ঠাতৃগণকে প্রথমে কোন্ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে হয়? প্রোটেষ্ট্-সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করিবার জন্য একটী কাউন্সিল্ ও প্রোটেষ্ট্-ফিয়েরই প্রথমে ব্যবস্থা করিতে হয়। আমাদের টীম্গুলি হারিয়া গেলে, আমরা প্রথমে কি করি? আমরা সর্ব্বাগ্রে প্রোটেষ্ট্ করিবার জন্য একটি ছিদ্র বা ছল খুঁজিবারই চেষ্টা করিয়া থাকি।

যতদিন এইরূপ সমস্ত অপচার চলিতে থাকিবে, ততদিন ব্যায়ামমূলক ক্রীড়াগুলি আমাদের কোনই উপকারে আসিবে না। খেলার এই ভাবটা সম্পূর্ণরূপে দোষাঘ্রাত ও প্রতারণাপূর্ণ। এই ভাবের পরিবর্ত্তন না ঘটিলে, আমাদের খেলাগুলি আমাদের ক্ষতিই করিবে। এই ক্রীড়াগুলির জয়-পরাজয়সম্বন্ধে ভ্রমাত্মিকা ধারণাই যত অনিষ্টের মূল। যতদিন আমাদের এই ধারণা থাকিবে যে, জয়লাভই এই সমস্ত খেলার একমাত্র উদ্দেশ্য, ততদিন পূর্ব্বোক্ত দোষগুলি এই সমস্ত খেলার সহিত জড়িত হইয়া থাকিবে। ঐ ধারণা আছে বলিয়াই, আমরা প্রত্যেকবারই, মাঠে না পারিলে, শেষে হয় "কাউন্সেল্-রুমে" গিয়া জিতিবার চেষ্টা করি, নয় প্রোটেষ্ট করি। ইহারই জন্য আমরা ফাইন্যালে খেলিবার সময় বাহিরের খেলোয়াড়দিয়া টীম ভরাই, অধিকসংখ্যক মেডেলওয়ালা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ কাপে নাম-এণ্টার করি এবং সেক্রেটারীর অনুগ্রহ-বলে অন্য টীমগুলির অপেক্ষা সুবিধা খুঁজি! আমাদের মধ্যে কেহই জানিয়া-শুনিয়া কাহারও পকেটে হাত দিয়া তাহার টাকা-চুরি করিবে না। কিন্তু আমাদেরই মধ্যে কয়জন, যে টীম্ মাঠে বাস্তবিকই আমাদের অপেক্ষা ভাল খেলিয়াছে, তাহাদের নিকটহইতে কাউন্সিল-মিটিংএ জুয়াচুরী করিয়া কোন একটী কাপ জিতিয়া লইতে দ্বিধাবোধ বা ইতস্ততঃ করিবে? কিন্তু ইহা আমাদের জানা উচিত যে, কাহারও পকেটমারা যেমন চুরি, তেমনই এমন করিয়া জয়ী হওয়াও চুরি।

ক্রীড়ামাত্রেরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ জয়লাভ নহে—ক্রীড়াই। হারিলে অপমান নাই, অন্যায় করিয়া জেতাই মহালজ্জাজনক কার্য্য। ক্রীড়াজনিত আমোদের জন্যই ও সদুপায়ে ক্রীড়া করা উচিত, যদি আমরা এই শিক্ষাটি গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যজীবনের নিমিত্ত একটি মহতী শিক্ষা-লাভ করা হইবে। পৃথিবীময় যে কোন খেলা যেখানেই খেলা হউক না কেন, যেই লোকেরা খেলাটির আমোদের কথা ভুলিয়া গিয়া জিতিবার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, অমনি খেলাটি মাটী হইয়া যায়; আর অল্পদিনের মধ্যেই কেবল ইতর লোকেই ঐ খেলা খেলে, ভদ্র লোকে ঐ খেলা একেবারে ছাড়িয়া দেয়।

এক মার্কিণ-মহাপুরুষের, অব্রাহাম লিঙ্কনের, ইহাই 'মটো' বা জীবন-নীতি ছিল যে, 'আমাকে যে জিতিতেই হইবে, তাহা নহে; আমাকে যাথার্থিক হইতেই হইবে'। হারি বা জিতি, আমাদের ন্যায়পরায়ণ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য,—ইংরাজজাতি যে ন্যায়-সঙ্গত ক্রীড়ার প্রতি সম্মান-প্রদর্শনজন্য প্রসিদ্ধ, আমাদেরও সেই ন্যায়-সঙ্গত ক্রীড়ার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিতে শিখিতে হইবে।

যদিও আমরা জানি যে, উপরে যে কুকার্য্যগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, সেগুলি বাস্তবিকই অন্যায় এবং আমাদের করা উচিত নহে, তবুও আমরা প্রায় সকলেই সেগুলি করিয়া থাকি। তবে আমরা কিরূপে ন্যায়-সঙ্গত ক্রীড়ার প্রতি সম্মান দেখাইতে পারি? নিম্নে অল্প কয়েকটি উপায়-নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

যে বালকটি ভাল খেলোয়াড় বলিয়াই তিন-চারিটী টীমে খেলা করে, তাহাকে স্বদলভুক্ত করিবে না। সে যেখানে বেশী ট্রাম-ভাড়া ও লিমনেড্ পাইবে, সেইখানেই সর্ব্বদা ছুটিবে। লেখক একবার একটি বালককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"তুমি অমুক টীম্ ছাড়িয়া অমুক টীমে কেন গিয়াছ"? সে উত্তর করিল,—"এই নতুন টীমে ম্যাচের পর দু'বোতল করিয়া লিমনেড্ খেতে দেয়, তা' ছাড়া 'হাফ্-টাইমে' নেবু ও বরফ পাওয়া যায়।" এই খেলোয়াড়েরাই ছেলেদের সব খেলা নষ্ট করিয়া দিতেছে। যতই ক্ষতি হউক না কেন, তোমরা কিছুতেই ঐরকম খেলোয়াড়দের তোমাদের দলে লইবে না। লইলে, তোমরা দেখিতে পাইবে, যখন তোমরা তাহাকে চাও, তখন সে আসিতে পারিবে না, ফলে তাহাতে দলের অন্য সব বালক দলপ্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবে। সদুপায়ে খেলিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইবে। কখন কাউন্সিল-মিটিংএ জিতিবার চেষ্টা করিবে না।

প্রতি খেলায় প্রোটেষ্ট করা ছাড়িয়া দিবে। সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপদেশ এই যে, যতবারই হার না কেন, হারটা হাসিমুখে মানিয়া লইতে মনস্থির করিবে।

যদি তোমরা ঐরূপ চেষ্টা করিতে চাও, তাহা হইলে মরসুম চলিয়া গেলে পর, তোমাদের টীম্‌টীকে এইরূপে পরীক্ষা করিবে—

(১) অন্য টীম্ কি তোমাদের গ্রাউণ্ডে খেলিতে এবং তোমাদের রেফ্রিকে মধ্যস্থ মানিতে ইচ্ছুক?

(২) তোমরা কি পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পসংখ্যক প্রোটেষ্ট করিয়াছ?

(৩) অন্য টীমগুলি কি বিশ্বাস করিবে যে, তোমাদের ক্লাবের সকল মেম্বরই আইনমত খেলিবার অধিকারী?

(৪) যখন ঐ টীমগুলি কাউন্সিলমিটিংএর অধিবেশন-প্রার্থী হয়, তখন তাহারা তোমাদের খেলোয়াড়দের কি মেম্বর করিতে চায়?

যখন তোমরা এই চারিটী প্রশ্নের উত্তরে "হাঁ" বলিতে সমর্থ হইবে, তখন তোমরা "ন্যায়সঙ্গত ক্রীড়া" কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারিবে।

গেছো ব্যাঙ

যাহারা গেছো ব্যাঙের কথা জানে না, তাহারা এই ক্ষুদ্র জীবগুলি যে কি অপূর্ব্ব শক্তি ধরে, তাহা কল্পনাও করিতে পারিবে না। উহারা বানরের মত লঘু ও ক্ষিপ্র এবং মাছির মত স্থিরপদ। তদ্ভিন্ন বহুরূপী গিরগিটির মত উহাদের চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী বস্তু-সকলের বর্ণপরিগ্রহের অনেকটা পরিমাণে ক্ষমতা আছে। উহাদের এই শেষোক্ত বিশেষত্বটুকু যে স্রষ্টা উহাদিগকে শত্রুহস্তহইতে আত্মরক্ষার নিমিত্তই দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; উহারা নব-পল্লবের উজ্জ্বলতম হরিদ্বর্ণ এবং বৃক্ষকাণ্ডের ঘোরতম পিঙ্গলবর্ণ-পর্য্যন্ত ধারণ করিতে পারে।

এই মণ্ডুকদিগের অধিকাংশকেই লাটিন-ভাষায় "হাইলা আর-বোরিয়া" কহে। দক্ষিণ-ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র, ভূমধ্যসাগরবর্ত্তী দ্বীপসমূহের অধিকাংশে, ক্ষুদ্র-আসিয়ায়, জাপানে ও উত্তরাফ্রিকায় উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। এইজাতীয় ভেকব্যতীত আর দুইজাতীয় ভেকের কথা ইউরোপ, আসিয়া, ও আফ্রিকার অধিবাসি-গণ অবগত আছে। অবশিষ্ট সকলপ্রকার মণ্ডুক কেবল আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়।

হাইলা আরবোরিয়া-জাতীয় ব্যাঙ্ দেখিতে বাস্তবিক বেশ সুন্দর। উহার শরীরের উপরিভাগ সচরাচর উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ এবং নিম্নভাগ ফিকা গোলাপী রঙের। উহার চক্ষুর্দ্বয়, মুখ এবং পার্শ্বের কৃষ্ণ চিহ্নগুলি সমুজ্জ্বল সোণালী বর্ণের দ্বারা বৃত, সেইজন্য উহাকে আরও সুন্দর দেখায়। স্বভাবতঃ এই উভচর জীব আর্দ্র বনে বৃক্ষ-পত্রমধ্যে বাস করিয়া থাকে; শীতকালে উহা কোন স্রোতোহীন ক্ষুদ্র জলাশয়ে একপ্রকার তন্দ্রিতভাবে অবস্থিতি করে। তাহাদের বাসার্থে নির্ম্মিত কোন কৃত্রিম আবাসেও যদি প্রশস্ত পত্রবিশিষ্ট কোন প্রকারের একটী গাছড়া, তাহাদের উঠিয়া বসিবার জন্য কয়েকটা মজবুত শাখা এবং একটী অপেক্ষাকৃত বড় জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা বেশ সুখে থাকিতে পারে। তাহাদের আবাসের তলদেশ একস্তর আর্দ্র শষ্প ও

শৈবালে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া উচিত, কারণ তাহাদের পক্ষে আর্দ্র আবহাওয়া একান্ত আবশ্যক। তাহারা যাহাতে কখন কখন গোপনে থাকিতে ও আশ্রয় লইতে পারে, সে জন্য কর্কগাছের কয়েকটুক্‌রা ছালও তাহাদের আবাসের মধ্যে দেওয়া উচিত।

গেছো ব্যাঙ (হাইলা আরবোরিয়া)
কাচাবাসের খাড়াদিকে নিঃশব্দে মাছি ধরিতেছে।

গেছো ব্যাঙদের ছায়াশূন্য তপ্ত রৌদ্রে রাখিয়া দিলে, তাহাদের প্রাণহানি হইতে পারে। উহারা কেঁচুয়া, আটা-ময়দার পোকা বা যে কোন ছোট ছোট পোকা খাইয়া জীবনধারণ করিতে পারে। তবে খাওয়াটা উহাদের যতই রকমারি করিয়া দেওয়া যায়, ততই উহারা বাড়ে। উহাদের আবাসের মধ্যে যদি একটী ছোট বার-কোশে করিয়া এক বারকোশ মাছির ডিম রাখিয়া দেওয়া যায় এবং সেগুলি যদি উহারা পাইবামাত্রই খাইয়া না ফেলে, তাহা হইলে সেই ডিমগুলি কয়েকদিনের মধ্যেই নীলাভ মাছি হইয়া উঠে, তখন গেছো ব্যাঙেরা উহাদের ধরিয়া খাইবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া উঠে।

এই ক্ষুদ্রকায় মণ্ডুকদের, তাহাদের "হাতগুলি" বেশ স্বচ্ছন্দে পেটের নীচে গুটাইয়া, গুঁড়ি মারিয়া বসার প্রকৃতিগত অভ্যাস আছে। সময়ে সময়ে উহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐরূপে একেবারে নিশ্চলভাবে বসিয়া কাটাইতে থাকে, কেবল উহাদের কণ্ঠার কাছে একটু ধুকধুক করিতে থাকে, তখন উহারা উহাদের চতুপার্শ্বস্থ বস্তুগুলির দিকে ভ্রুক্ষেপ করে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু কোন পোকা উহাদের কাছে আসিলে,যাহাতে সেই মুহূর্ত্তেই উহারা তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে, তজ্জন্য উহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে।

উহাদের আবাসের মধ্যে কয়েকটা মাছি ছাড়িয়া দিলে, উহারা বড়ই উত্তেজনা-প্রকাশ করে। তখন আবাসস্থ মণ্ডুকমাত্রেই যেন প্রখর ও সজাগ হইয়া উঠে এবং সকল ভেকেরই দৃষ্টি উড্ডীয়মান মক্ষী-কয়েকটির প্রতি সন্নদ্ধ হয়। তাহার পর, কোন কর্ম্মিষ্ঠ মণ্ডুক যেই কোন মাছি তাহার নাকের কাছদিয়া ভোঁ করিয়া উড়িয়া যায়, অমনি সেই ক্রীড়াপর মাছিটিকে ধরিবার প্রত্যাশায় মোরিয়া হইয়া বৃথা শূন্যে লম্ফ দেয়। সে শিকার ধরিতে না পারিলেও একেবারে ভূমিতে পড়িয়া যায় না, পড়িতে পড়িতে একটা সুবিধা-জনক পাতা আঁকড়িয়া ধরিয়া, শিক্ষিত ব্যায়ামবিদের মত ডিগ্‌-বাজী খায়। পরে তাহার অপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ কোন মণ্ডুক অব্যর্থলক্ষ্যে সেই মাছিটিকে তাহার চট্‌চটে জিবদিয়া ধরিয়া তৎক্ষণাৎ গিলিয়া ফেলে। অন্য ব্যাঙগুলি তখন ঐ উপাদেয় খাদ্যের অংশলাভজন্য ডিগ্‌বাজী খাইয়া সরু সরু বোঁটাগুলির উপর ও এমন কি তাহাদের সেই কাচাবাসের মসৃণ কাচ বহিয়া অবলীলাক্রমে উঠিতে ত্রুটি করে না। গেছো ব্যাঙের অঙ্গুলিগুলিতে আঠার মত একপ্রকার পদার্থ আছে বলিয়াই, উহারা ঐরূপ করিতে পারে।

সময়ে সময়ে এই মণ্ডুকপ্রবরেরা গীতালাপপূর্ব্বক তাহাদের হৃদয়-ভাব অভিব্যক্ত করিতে থাকে। তবে শ্রোতৃগণ যে সর্ব্বদা তাহাদের সেই 'তানসেন'-বৃত্তির রসগ্রহ করিতে পারে, তাহা নহে। তাহা-দের গীতালাপ-পদ্ধতি এইরূপ—প্রথমে একটী ভেক তীব্র কর্-কোরে আওয়াজে গান ধরে, তাহার পর অন্য সকলে একসঙ্গে তাহার সঙ্গে যোগ দেয়। তখন প্রতি মণ্ডুক-গায়কই, সুস্বরে না

গেছো ব্যাঙ (সম্মুখ-দৃশ্য)
কাচাবাসের কাচপ্রাচীর আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে।

হউক, উচ্চস্বরে অন্য সকলকে পরাভব করিবার চেষ্টা করে। সময়ে সময়ে দুই-একটী অল্পক্ষণ বিশ্রাম করে, তাহার পর আবার দ্বিগুণ-উৎসাহে গান জুড়িয়া দেয়। পরে গীতটি যেমন সহসা আরম্ভ হইয়াছিল, তেমনই সহসা থামিয়া যায়।

রবার

বাজারে আজকাল রবারের বড় খাঁই; খাঁই দিনের পর দিন বাড়িয়া উঠিতেছে, তাই রবারের দামও দিনের পর দিন চড়িয়া যাইতেছে। রবারদিয়া একশো-রকমেরও বেশী জিনিস তৈয়ারী হয়। রবার কি?—উহা কয়েকরকমের গুল্ম, গাছ ও লতার নির্য্যাস।

ভোরেই রবার-সংগ্রাহক বনের মধ্যে চলিয়া যায়। সে সঙ্গে একখানি ছোট হাত-কুঠার, একতাল কাদামাটী ও কয়েকটা বাটি লইয়া যায়। রবার-গাছ দেখিলেই উহার কাণ্ড বেড়িয়া ছালে কয়েকটা বিঁধ করিয়া সেই বিঁধগুলির নীচে নীচে এক-একটি বাটি কাদামাটী-দিয়া আট্‌কাইয়া দেয়। দুধের মত সাদা ও তরল নির্য্যাস ও আঠা ফোঁটা ফোঁটা করিয়া বাহির হইতে আরম্ভ করিলেই সে, সে গাছ ছাড়িয়া, আবার অন্য গাছ বিঁধ করিয়া বাটি আট্‌কাইতে যায়। বাটিগুলি আট্‌কাইবার কয়েকঘণ্টা পরে, রবার-সংগ্রাহক একটি তুম্বার খোল লইয়া গিয়া বাটিগুলির নির্য্যাস তাহাতে ঢালিয়া লয়। তাহার পর, অগ্নির উত্তাপে উহা জমাট ও পাকা করা হয়।
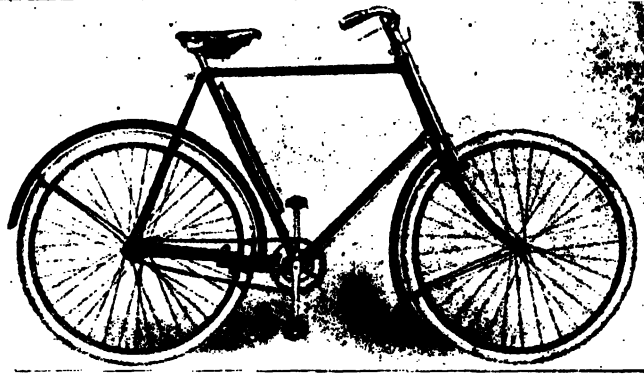
দক্ষিণাফ্রিকার 'পারা'-নামক বন্দরের অধিবাসীরাই নাকি রবার-নির্য্যাস পাকা ও জমাট করিতে সর্ব্বাপেক্ষা পটু। তাহারা তালজাতীয় একরকম গাছের ফল জ্বালাইয়া আগুন করে, সেই আগুনহইতে অল্প টক্ টক্ ও রোগবীজ-নাশক কালোরঙের গাঢ় ধোঁয়া বাহির হইতে থাকে; রবারে সেই ধোঁয়া লাগাইলে উহা পাকা হয়।

একটা ব্যাড্‌মিণ্টনের ব্যাটের আকৃতিবিশিষ্ট 'তাড়ু' ঐ দুগ্ধবৎ রবার-নিঃস্রাবে ডুবাইয়া রাখা হয়, তাহাতে একস্তর গলিত রবার ঐ তাড়ুতে লাগিয়া যায়, তখন তাড়ুটা প্রাগুক্ত ধোঁয়ার উপর ধরা হয়, তাহাতে তাড়ুসংলগ্ন রবার-দুগ্ধ ছিঁড়িয়া জমাট বাঁধিয়া যায়, তখন তাহা বাণিজ্যোপযোগী রবারে পরিণত হয়। পরে, তাড়ু আবার রবার-দুগ্ধে ডুবান হয়, আবার খানিকটা রবার-দুগ্ধ তাড়ুতে সংলগ্ন হয়, আবার তাহাতে ধোঁয়া-লাগান হয়, এইপ্রকারে রবার-স্তর যতক্ষণ না দুই বুরুল পুরু হয়, ততক্ষণ ঐ প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। পরে তাহার ধার ছাঁটিয়া রবারটুকুকে একটা বড় বিস্কুটের আকার করিয়া তাড়ুহইতে ছাড়াইয়া লওয়া হয়।

গাছে ও বাটিতে রবার-নিঃস্রাবের যে 'ছিট্‌ছাট্' বা 'চাঁচি' লাগিয়া থাকে, সে গুলি যত্নপূর্ব্বক জমা করিয়া যেমন-তেমন-ভাবে তাল-পাকান হয়, ঐ তালগুলির নাম 'কাফ্রি-মুণ্ড'; উহাও বিক্রয় হয়।

পারা-বন্দরের রবার এখনও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইয়া থাকে। পারায় রবারের গাছ বনজঙ্গলে আপনা-আপনি জন্মে। রবার-গাছ প্রায় ষাট ফিট্ উঁচু হয়। কিন্তু পারার এই গাছগুলিহইতেই যে, কেবল রবার পাওয়া যায়, তাহা নহে। অন্য অনেক গাছ, লতা ও গুল্মহইতেও রবার-নির্য্যাস পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও ফিজি দ্বীপ-পুঞ্জেও রবারস্রাবী উদ্ভিদ্ জন্মে।

ফিজি-দ্বীপবাসীরা বড় বিচিত্র উপায়ে রবার-সংগ্রহ করে, তাহারা গাছগুলির ডালপালা ভাঙ্গিয়া মুখে করিয়া উহার নির্য্যাস চুষিয়া লয়। তিন-চারি-মুখ জমা করিয়া একটা তাল করা হয়।

আফ্রিকার কোন কোন অংশে কাফ্রিরা আঙুলে করিয়া রবার-নির্য্যাস হাতে সূতার মত করিয়া লাগাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া জমাট করিয়া লয়, তাহার পরে সেই সূত্রবৎ রবারগুলি হাতহইতে ছাড়াইয়া লইয়া তাল-পাকান হয়।

আসামে আসাম-নামেই একপ্রকার রবার-গাছ পাওয়া যায়।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দপর্য্যন্ত রবার-সংগ্রহের জন্য রবার-ব্যবসায়ীরা দেশীয় সংগ্রাহকদের উপরই নির্ভর করিতেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দহইতে তাঁহারা উহার চাষ করিতে আরম্ভ করেন।

রবার-গাছের চারাগুলি আটহইতে দশফিট্ তফাৎ তফাৎ করিয়া পোঁতা হয়। তাহাতে পাশাপাশি গাছগুলি পরস্পরকে ছায়া দিতে পারে এবং মধ্যে কোন আগাছাও জন্মিতে পায় না। চারাগুলি বড় হইতে থাকিলে, যেগুলি 'মরকুটে' হয়, সেগুলি তুলিয়া ফেলিয়া, সুস্থ গাছগুলির মধ্যে আরও ব্যবধান করিয়া দেওয়া হয়। রবার-গাছ আটবছরের না হইলে সচরাচর তাহাহইতে নির্য্যাস-নিষ্কাশন করা উচিত নহে।

রবারদিয়া কোন কিছু তৈয়ারী করিবার আগে তাহা বেশ ভাল করিয়া শক্ত করিয়া লওয়া হয়। গন্ধক ও আরও কয়েকটা জিনিস মিশাইয়া উহাকে এমন করিয়া তোলা হয় যে, তখন উহা কৃষ্ণপ্রস্তরের মত শক্ত, চামড়ার মত ঘাতসহ অর্থাৎ চিম্‌ড়া ও রেশমের মত নরম হইয়া উঠে।

"টীম্"-নির্ব্বাচন-প্রতিযোগিতা।

মনে কর, কলিকাতার ও বাঙ্গলাদেশের অন্যান্য অংশের ক্রিকেট-ক্লাবগুলির মধ্যহইতে খেলোয়াড় বাছিয়া লইয়া এক ইংরাজ টীমের সহিত এক বাঙ্গালী টীম্ ম্যাচ্ খেলিবে, এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। সকলেরই ইচ্ছা হইয়াছে যে, এই ম্যাচে দুই পক্ষেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট খেলোয়াড়েরাই যেন খেলে, এবং, মনে কর, ক্রিকেট-কমিটি এই দুইটি টীমের নিমিত্ত উপযুক্ত খেলোয়াড় বাছিতে না পারিয়া "বালকের" পাঠকদের মতামত চাহিয়া পাঠাইয়াছে। "বালকের" পাঠকদের মধ্যে যাহারা ইচ্ছা করে, তাহারা এই দুইটা টীমের জন্ত খেলোয়াড়দের নাম করিয়া পাঠাইতে পারে, তবে তাহারা বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের নাম পৃষ্ঠার বামদিকে এবং ইংরাজ খেলোয়াড়দের নাম দক্ষিণদিকে লিখিয়া পাঠাইবে। এই তালিকা ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে "বালক"-সম্পাদকের হস্তগত হওয়া চাহি। এইরূপে প্রেরিত টীমগুলির খেলোয়াড়দের নাম বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া যে সমস্ত খেলোয়াড় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক "ভোট" পাইবে, তাহারাই "বালক"-কর্ত্তৃক গঠিত দুইটি টীমের খেলোয়াড় হইবে। এইরূপে টীম্-দুইটি গঠিত হইলে, আমরা দেখিব, কোন্ পাঠক এই দুই টীমে নির্ব্বাচিত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খেলোয়াড়দের নাম করিতে পারিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই প্রতিযোগিতায় সে-ই প্রথম হইয়া একটি পুরস্কার পাইবে। আর একটি কথা, এই নামগুলি কাগজের একপৃষ্ঠায় খুব স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। তাহাছাড়া নাম-প্রেরয়িতার নাম, ধাম ও বয়স দেওয়া চাহি। এই প্রতিযোগিতার ফলাফল ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারী-সংখ্যায় প্রকাশিত করা হইবে।

সম্পাদকের নিবেদন।

প্রিয় "বালক"-পাঠকগণ,

আমাদের মাসিক পত্রিকা একবৎসর চলিয়াছে। তোমরা সকলে, ভরসা করি, তাহা পড়িয়া যথেষ্ট সন্তোষ-লাভ করিয়াছ; আশা করি যে, আগামী বৎসরেও তোমরা যথেষ্ট সন্তোষ-লাভ করিবে। অনেক বালক অনেক বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছে কিংবা আমাদের কাছে প্রীতিসূচক পত্র লিখিয়াছে। দুঃখের বিষয়, আমরা ঐ সমস্ত প্রবন্ধ-প্রকাশ করিতে পারি নাই, এবং ঐ সকল পত্রের উত্তর দিবার সময় ও সুযোগ পাই নাই। এমন হইতে পারে যে, কোন কোন "বালক"-পাঠক তাহাদের প্রেরিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইতে না দেখিয়া কিংবা তাহাদের পত্রগুলির উত্তর না পাইয়া একট মনোদুঃখ করিতেছে। এবিষয়ে তোমরা এই একটি কথা মনে রাখিবে যে, "বালকের" কেবল ষোলটি পৃষ্ঠা আছে, কাজেই প্রেরিত প্রবন্ধ ও কবিতাগুলির অর্দ্ধাংশও প্রকাশিত করিতে গেলে, আমাদের পত্রিকার জায়গা কুলাইবে না। তাহাছাড়া তোমরা স্মরণে রাখিবে যে, "বালকের" সম্পাদক নানাপ্রকার কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন বলিয়া অতিকষ্টে পত্র লিখিবার সুযোগ পাইতে পারেন।

আমাদের ইচ্ছা এই, যেন আগামী বৎসরে পাঠকদের প্রেরিত পত্র ও প্রশ্নগুলির উত্তর দিবার জন্ত আমরা অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা রাখি। "বালক"-পাঠকগণ যে কোন বিষয়ে প্রবন্ধ বা পত্র লিখুক না কেন, তাহাদের পত্র বা প্রবন্ধ উপযুক্ত বোধ হইলে, আমরা, যতদুর সম্ভব, তাহার উত্তরে "বালকের" শেষপৃষ্ঠায় কিছু লিখিব, কিন্তু আমরা যে এইরূপে সমস্ত প্রেরিত প্রবন্ধ বা পত্র-লক্ষ্য করিয়া কিছু লিখিতে পারিব, তাহা বলিতে পারি না।

আমরা এখন ১৯১৩ সালের জন্য আমাদের পত্রিকার ব্যবস্থা করিতেছি। যাহারা নববর্ষের প্রথম সংখ্যাটি কিনিবে, তাহারা একখানি সুন্দর রঞ্জিত ছবি পাইবে। আমাদের নিবেদন এই যে, গ্রাহকেরা তাহাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে তাহা দেখাইয়া তাঁহাদিগকে গ্রাহক করিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ করিলে, আমাদের পত্রিকা যে বেশ চলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তোমরা যে কেবল এই প্রকারেই আমাদের সাহায্য করিতে পার, তাহা নয়; তোমরা অন্য একটা কার্য্যও করিয়া "বালকের" সম্পাদককে সাহায্য করিতে পারিবে। গত বৎসর যে সকল গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকলই তোমাদের কেমন লাগিয়াছে, এবং আগামী বৎসরে তোমরা কি কি বিষয়ে প্রবন্ধ পড়িতে চাও, ইহা আমরা জানিতে চাই। আমাদের একান্ত ইচ্ছা এই, যেন আমাদের পত্রিকা, যতদুর সম্ভব, বাঙ্গালী ছেলেদের উপকারী ও সন্তোষজনক হয়। আমরা যদি তোমাদের নিকট-হইতে উল্লিখিত সংবাদ পাই, তাহা হইলে আমাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইবার প্রচুর সম্ভাবনা হইবে।

মনুষ্যদের সমস্ত কার্য্যেই পরস্পর-সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; আমরা এই ক্ষুদ্র পত্রিকা-প্রকাশ করিয়া তোমাদিগকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; তোমরা আমাদের কাছে পত্র লিখিয়া ও অপর লোককে গ্রাহক করিতে চেষ্টা করিয়া আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবে। ইতি—

তোমাদের হিতৈষী

জে, এম্, বি, ডন্‌ক্যান,

"বালক"-সম্পাদক।